ক্রিস্টাবেল

ভিক্টোরিয়া হোল্ট

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার

[কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য]

ডি. এইচ. লরেন্স

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
অনূদিত

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৮৮
জুলাই, ১৯৮১

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত, ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : শ্যামলকুমার ঘোষ ॥ দি আনন্দম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ॥
৩২-২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারে'র মত আর কোন উপন্যাস অশ্লীলতার পঙ্কতিলকে এমনভাবে পরিচিহ্নিত হয়নি। এক অন্তহীন বিতর্কের প্রবলতম ঝড়ের প্রহারে এমন করে জর্জরিত হয়নি আর কোন উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের মূল কথা হলো এই যে এখানে নরনারীর যৌনক্রিয়া ও কামকলা নৈপুণ্যের যে নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার ও চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে তার কোন প্রকরণগত সম্পর্ক নেই। যে যৌনসম্পর্ক কামনায় অত্যুগ্র, নিবিড়তায় সতত উত্তপ্ত, এক অন্তহীন তৃপ্তিলাভের চিরচঞ্চল লালসায় পঙ্কিল সে সম্পর্কের এমন বিচিত্র প্রকাশকলায় চিত্রিত করার কি প্রয়োজন ছিল এখানে ?

লরেন্স এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বলেন, Inspite of all antagonism I put forth this novel a healthy book necessary for us today. The words that shock so much at first do not shock at all after a while. Is this because the mind is depraved by habit ? Not a bit. It is that the words merely shocked the eye, they never shocked the mind at all... People with minds realize that they are'nt shocked and never really were and they experience a sense of relief.

লরেন্স বলেছেন, যে যাই বলুক, যে যতই বিরোধিতা করুক এটিকে এমন এক সৎ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন বই হিসাবে রচনা করেছি যা আমাদের সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তি হলো এই যে এ বই পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে যে আপাত-আঘাতের এক বিচলন অনুভব করি আমরা সে আঘাত আসলে যৌনজীবন সম্পর্কিত কতকগুলি অনভ্যস্ত শব্দের আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়, সে আঘাতের বিচলন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে পীড়িত করে শুধু, মনের মর্মমূলে তা প্রবেশ করতে পারে না। আসলে যাদের মন আছে তারা অবশ্যই এ বই পাঠ করে যত সব অবরুদ্ধ আবেগের নিষ্ক্রমণজনিত এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তারা।

উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের আধুনিক প্রতিভূ ও অভিনব সংস্করণ স্যার ক্লিফোর্ডের স্ত্রী তার অক্ষম পঙ্গু স্বামীর কাছ থেকে কোন যৌনসুখ না পেয়ে একের পর এক করে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার পর অবশেষে স্থায়ীভাবে মিলিত হলো তাদেরই শিকার রক্ষক অলিভার মেলর্সের সঙ্গে। কিন্তু যদি সাধারণ এক নারীর যৌন সমস্যার কদর্য সমাধানই এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হত, কামকেলিপটীয়সী রতিবিলাসিনী এক নারীর যথেচ্ছ যৌনাচার ও ব্যভিচারই যদি এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হত তাহলে এ উপন্যাসকে অশ্লীলতার পঙ্কতিলকে পরিচিহ্নিত করা চলত স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু আসলে এ উপন্যাসে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন লরেন্স।

এই তৃপ্তি সারা জীবনে কখনও যারা পায়নি তারা কখনই সংযমে শাসিত করতে পারবে না নিজেদের, তারা কখনই বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না পরস্পরের প্রতি। দাম্পত্য সম্পর্কের সকল শুচিতা ও বিশ্বস্ততা এই যৌনতৃপ্তির নিবিড়তার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল। লরেন্স তাই বলেছেন, The instinct of fidelity is perhaps the deepest instinct in the great complex we call sex. Where there is real sex, there is the underlying passion for fidelity. এক নিবিড়তম যৌনতৃপ্তির দ্বারা সমৃদ্ধ যে দাম্পত্য-সম্পর্ক সে সম্পর্কের মধ্যে কোনদিন কোন অবিশ্বস্ততা আসতে পারে না। মেলর্সের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েও মেলর্সকে ভুলতে পারেনি কনি।

তবে লরেন্স এটাও দেখিয়েছেন যে দেহহীন মনোমিলন যেমন এক অলীক অর্থহীন ভাবসর্বস্বতা, তেমনি মনহীন দেহমিলনও এক অন্ধ জৈবিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম প্রথম মেলর্সের সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হয়ে তাকে ভালবাসতে না পারায় নিবিড় দেহমিলনের মাঝেও কেঁদেছে কনি। তারপর একদিন যখন এ মিলন নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে লাভ করে এক আশ্চর্য প্রগাঢ়তা, যখন একদিন মেলর্সের প্রতিটি জীবকোষ হতে নিঃসৃত দেহনির্যাস-স্বরূপ তার স্খলিত বীর্যের সঙ্গে তার আত্মাটা একনিমেষে সঞ্চারিত হয় কনির গর্ভদেশের গভীরে, তখন হঠাৎ গভীরভাবে মেলর্সকে ভালবেসে ফেলে কনি। কনি যেন তাদের এই দেহমিলনের মধ্য দিয়ে জৈবচেতনার সব রং রসের স্তরগুলি পার হয়ে এক আত্মিক মিলনের পরম সুখস্বর্গে উন্নীত হয়।

যে যৌনক্রিয়া সকল সৃষ্টির প্রাণরঙ্গভূমি, যে যৌনক্রিয়া দেহমনের স্বাস্থ্য ও ভারসাম্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক সে যৌনক্রিয়ার এমন নিখুঁত চিত্রায়ণ ও তার এমন শৈল্পিক বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল সাহিত্যে। যে প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে অপূর্ণতার অগৌরবে লজ্জানত ও হতম্লান হয়ে থাকতে হত বিশ্বসাহিত্যকে সে প্রয়োজন সিদ্ধ করে লরেন্স অর্জন করেছেন এক বিরল অবিস্মরণীয়তার গৌরব। এক অসাধারণ উপন্যাস হিসাবে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার একাধারে ভীষণ সুন্দর, তৃপ্তিলোলুপ অবাধ কামপ্রবৃত্তির পঙ্কিল জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা স্থিতবদ্ধ যেন এক লীলাকমল যার সহাস্য দৃষ্টির নির্মল শুভ্রতা দেহলালসার পঙ্কশয্যা হতে শুরু করে আত্মার আকাশটিকে পরিচুম্বন করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

অধ্যায় ১

এ যুগ দুঃখ ও বিষাদের যুগ, তাই আমরা এ যুগকে ঠিক দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই না। যেন এক বিরাট ও ব্যাপক ধ্বংসকার্য ঘটে গেছে, আমরা অমিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা নূতন করে ঘর বাঁধতে শুরু করেছি, বুকের মাঝে পোষণ করে চলেছি ছোট ছোট আশা আকাঙ্খা। কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন, কারণ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যাওয়ার কোন সহজ মসৃণ পথ নেই সেখানে যেতে হলে আমাদের অনেক পথ ঘুরতে হবে, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে আমাদের মাথার উপর অনেক আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমাদের বাঁচতে হবে।

কনস্ট্যান্স চ্যাটার্লির অবস্থাও তখন ছিল ঠিক এই রকম। যুদ্ধ তার মাথার উপর ছাদটাকে ধসিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে তাকে বাঁচতে হবে আর জীবনে ঠেকে ঠেকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

ক্লিফোর্ডকে সে বিয়ে করল ১৯১৭ সালে সে তখন এক মাসের জন্য ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। বিয়ের পর এক মাস তারা কাটিয়েছিল মধুচন্দ্রিমায়। তারপর ক্লিফোর্ড চলে গেল ফ্ল্যাণ্ডার্সে। কিন্তু ছয় মাস পরেই আবার তাকে আহত অবস্থায় ফেরৎ পাঠানো হয়। তখন তার বয়স ঊনত্রিশ এবং তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সএর বয়স তেইশ।

আঘাতের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রামের পর কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেল ক্লিফোর্ড। কিন্তু দুটি বছর শয্যাগত হয়ে চিকিৎসাধীনে থাকতে হলো তাকে। এর পর সে আরোগ্য হয়ে উঠল। আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মাঝে ফিরে এল সে। কিন্তু তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত গোটা নিম্নাঙ্গটা পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

এটা হলো ১৯২০ সালের কথা। ক্লিফোর্ড তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সকে নিয়ে ফিরে গেল তার পৈত্রিক বাড়ি র‍্যাগবি হলে। তার বাবা তখন মারা গেছেন তার বাবা একজন ব্যারণ ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই সে হলো একজন

ব্যারনেট এবং সে স্যার ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি নামে অভিহিত হতে লাগল। তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সকে বলা হতে লাগল লেডি চ্যাটার্লি। তাদের আয় খুব একটা স্বচ্ছল ছিল না এবং সেই আয়ের উপর ভিত্তি করেই তারা এই নির্জন বড় বাড়িটাতে ঘর-সংসার করতে এল। তাদের দাম্পত্য জীবন যাপন করতে এল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশে। ক্লিফোর্ডের এক বোন ছিল, কিন্তু তিনি আগেই গত হয়েছেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। তার বড় ভাই, গত যুদ্ধেই প্রাণ হারায়। সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে ক্লিফোর্ড বাস করতে এল তার পৈত্রিক নিবাস মিডল্যাণ্ডে। সে জানত সে কোনদিন সন্তানের পিতা হতে পারবে না আর জানত সে যতদিন বাঁচবে ঠিক ততদিনই বেঁচে থাকবে চ্যাটার্লি বংশের নাম বা ধারাটা

ক্লিফোর্ড কিন্তু খুব একটা ভেঙ্গে পড়েনি তাকে খুব একটা বিষণ্ণ দেখাত না তার একটা চাকাওয়ালা চেয়ার ছিল সেই চেয়ারে করে সে ইচ্ছামত বাগানে ও বিষাদসুন্দর পার্কটায় ঘুরে বেড়াত। পার্কটার জন্য সত্যিই গর্ব অনুভব করত সে। যদিও মুখে সেটাকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দিত না।

জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে করে সহনশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ক্লিফোর্ড। তবু তাকে হাসিখুশিতে উজ্জ্বল দেখাত সব সময়। তার মুখখানা দেখে কিছু বোঝাই যেত না। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মুখখানাকে স্বাস্থ্যে প্রদীপ্ত মনে হত। তার নীলচে চোখগুলোতে একটা উদ্ধত ভাব ছিল। তার কাঁধ দুটো ছিল চওড়া আর বলিষ্ঠ তার হাত দুটো ছিল লোহার মত শক্ত। বণ্ড স্ট্রীট থেকে কেনা দামী সুন্দর নেকটাই বা গলাবন্ধনী পরত সে। তবু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যেত তার দু' চোখের দৃষ্টির মধ্যে পঙ্গুজীবনের এক অসহায়তাবোধ ও একটা শূন্যতার ভাব ছিল।

মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেছে সে। মৃত্যুর হাত থেকে কোনরকমে যে জীবনকে ফিরে পেয়েছে, সে জীবনের অবশিষ্টাংশটুকু তার কাছে পরম মূল্যবান। সে জীবন উপভোগের এক আশ্চর্য আকুলতা উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে থাকে তার দু'চোখের তারায়। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে এক চরম আঘাত সহ্য করেও সে বাঁচতে পেরেছে বলে এক বিরল জয়ের গর্বে ও গৌরবে ফুলে ওঠে তার বুকটা তবু সে বুঝতে পারে কি যেন সে হারিয়েছে। তার প্রাণ-শক্তির এক উত্তপ্ত ধাতু হারিয়ে ফেলায় তার অনুভূতির জগতের এক বিরাট অংশ যেন এক শীতল শূন্যতায় ভরে গেছে।

তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সএর মুখের মধ্যে একটা গ্রাম্যতার ভাব ছিল। তার দেহটা ছিল বেশ বলিষ্ঠ আর তার চুলগুলো ছিল বাদামী। তার চোখগুলো ছিল বড় বড় এবং বিস্ময়াবিষ্ট। তার গলার স্বরটা ছিল খুব নরম আর নিচু। মনে হত সে যেন গ্রাম থেকে সদ্য এসেছে। তার মা ছিলেন প্রাক-রাফায়েল যুগের একজন ফেবীয়ান সমাজবাদী। সমাজবাদের কিছু প্রভাব

থাকা সত্ত্বেও বলা যায় কনস্ট্যান্স আর তার বোন হিলদা শিল্পীসুলভ আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে। একদিকে তাদের যেমন কলাবিদ্যার লীলাভূমি প্যারিস, রোম ও ফ্লোরেন্সে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি তাদের সমাজবাদী শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ও পীঠভূমি হেগ ও বার্লিনেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বক্তা এসে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দিতেন সমাজবাদের উপর।

দুই বোনই তাদের ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলা আর আদর্শ রাজনীতি—এই দুটি বিদ্যাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তারা ছিল একই সঙ্গে গ্রাম্য ও নাগরিক। তাদের সরল শিল্পাদর্শ ছিল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাদের বয়স যখন পনের তখন তাদের ড্রেসডেনে পাঠানো হয় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গানবাজনা শেখবার জন্য সেখানে সময়টা তাদের ভালভাবেই কাটতে থাকে। তারা সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করত তারা দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করত। পুরুষদের মত সব বিষয়েই তারা অগ্রণী ছিল। তারা গিটার হাতে শক্ত সমর্থ চেহারার যুবকদের সঙ্গে বেড়াতে যেত শহরের বাইরে দূর বনাঞ্চল দিয়ে। তারা গাইত শুবার্ট ও ভোগেদএর গান। তারা ছিল একেবারে স্বাধীন। উগ্রকাম মধুকণ্ঠ যুবকদের সঙ্গে বাইরের জগতে প্রথম সকালের বনভূমিতে বা যে কোন জায়গায় খেয়ালখুশিমত বাধাবন্ধহীনভাবে ঘুরে বেড়াত তারা। তারা যা খুশি করত, যা খুশি বলত। তবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলাটাই ছিল বড় কথা, ভালবাসাবাসিটা ছিল গৌণ ব্যাপার।

তাদের বয়স যখন মাত্র আঠারো তখন হিলদা আর কনস্ট্যান্স দুজনেই সাময়িক ভালবাসাবাসির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। ভালবাসার আস্বাদ লাভ করে। যে সব যুবকদের সঙ্গে তারা আবেগের সঙ্গে কথা বলত, যাদের সঙ্গে দ্রুত গান করত, যাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গাছতলায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করত তারা স্বভাবতই এক প্রেম সম্পর্কে বাঁধতে চাইত তাদের। মেয়েরা কিন্তু সন্দেহ না করে পারছিল না। কিন্তু তখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ছেলেরা ছিল বিনয়ী, কিন্তু তারা মেয়েদের নিবিড়ভাবে কামনা করত। দানশীলা রাণীর মত মেয়েরা কেন নিজেদের বিলিয়ে দেয় না তা তারা বুঝতে পারত না।

এইভাবে তাদের যে সব নির্বাচিত যুবকদের সঙ্গে তারা মেলামেশা করত ও বেশী কথাবার্তা বলত, যাদের সঙ্গে সূক্ষ্মনিবিড় এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করত ওরা। আলোচনা আর তর্কবিতর্কটাকেই ওরা বড় করে দেখত, ভালবাসাবাসি বা দেহ-সংসর্গের কাজটাকে এক আদিম ন্যক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে করত ওরা। এটা যেন প্রগতির পরিপন্থী একটা

কিছু। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কোন পুরুষবন্ধুকে ভালবাসা ত দূরের কথা, তাকে ঘৃণা করত। ভাবত কোন পুরুষ তার জীবনে এল মানে ব্যক্তিগত শুচিতা ও অন্তর্জীবনের স্বাধীনতার সীমা কারো অনধিকার প্রবেশের দ্বারা লঙ্ঘিত হলো। কারণ তারা নারী বলে তারা মনে ভাবত তাদের নারী-জীবনের সকল মর্যাদা ও অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত আছে। নারীজীবনের আর কি অর্থ থাকতে পারে? প্রাচীন প্রথাগত অধীনতামূলক সম্পর্কের বন্ধনগুলো সব ছিঁড়ে ফেলার থেকে নারী হিসাবে তাদের বড় কাজ আর কি হতে পারে? প্রাচীন প্রথাগত নারী পুরুষদের এই যৌন সম্পর্কটাকে অনেকে আবার আবেগের সঙ্গে আদর্শায়িত করে তুলতে পারে। যে সব কবি এই সম্পর্ককে তাঁদের কাব্যে গৌরবান্বিত করে তোলে তাঁরা সকলেই পুরুষ ছিল।

নারীরা এর থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর একটা কিছুকে চায়। নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কোন যৌনভিত্তিক প্রেমের থেকে অনেক বেশী সুন্দর ও আশ্চর্য-জনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরুষরা এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। কুকুরদের মত তারা যৌনসংসর্গের উপর জোর দেয় বেশী।

নারীরা পুরুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। একজন ক্ষুধার্ত পুরুষ শিশুর মতই অশান্ত অবুঝ তখন তারা যা চায় নারীদের তাই দিতে হয় তাদের শান্ত করার জন্য শিশুর মতই তখন পুরুষগুলো এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে তারা নরনারীর মধুর সম্পর্কটাকে অহেতুক নোংরা করে তোলে। কিন্তু একজন নারী তার অন্তর্জীবনের স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। অথচ ঋষিরা ও যৌন বিজ্ঞানের লেখকগণ এ কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেননি। কোন একজন নারী নিজেকে একেবারে বিলিয়ে না দিয়েও কোন পুরুষকে গ্রহণ করতে পারে। সে পুরুষের প্রভাবের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় না; বরং সে যৌন সংসর্গের ব্যাপারটাকে কৌশলগত এক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে পুরুষের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে চলে। যৌনসঙ্গমকালে নারীরা যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকতে চায়, তারা চায় এ বিষয়ে পুরুষরাই যথাসাধ্য তাদের শক্তি ও উদ্যমের অপচয় ঘটিয়ে নিঃস্ব হয়ে উঠুক। এইভাবে তাদের মধ্যে এক অতৃপ্তিকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের যৌনসম্পর্ককে দীর্ঘায়িত করতে চায় নারীরা। এইভাবে তাদের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য পূরণের যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে পুরুষরা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই দুই বোন প্রেম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাড়ি পাঠানো হয়। ওদের কাছে ভালবাসাবাসির অর্থ হলো কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় হয়ে ওঠা। যখন কোন যুবককে ভাল লেগেছে ওদের তখনি ওরা যত সব মিষ্টি কথাবার্তার সেতু পার হয়ে পরস্পরের অন্তরের মাঝে আনাগোনা করেছে।

ওদের চোখে ভাললাগা কোন সুচতুর যুবকের সঙ্গে বিচিত্র রসালাপে মত্ত হয়ে উঠতে গিয়ে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য অতিনিবিড় পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের দেহ। এ রসালাপ চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল, কেমন করে প্রেম জাগল তাদের হৃদয়ে তা তারা বুঝতেই পারল না। সে কি স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি! কথা বলার জন্য মনের মত এক মানুষ পাওয়া গেল। প্রতিশ্রুতিটা আসলে কি তা জানতে পারার আগেই সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে গেছে।

দীর্ঘ অন্তরঙ্গ রসালাপের পর তাদের সত্তার গভীরে যদি কোন দেহগত এক জৈব কামনা জেগে উঠত আর সেই কামনার তাড়নায় অপরিহার্য হয়ে উঠত তাদের দেহসংসর্গ, তাহলে সে দেহ সংসর্গে কোন আপত্তি থাকত না তাদের। যেন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হত এ সংসর্গে।

এ সংসর্গের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক বিশেষ রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সারা দেহ জুড়ে অনুভব করত তারা এক অদ্ভুত উত্তেজনার স্পন্দন, আত্মপ্রতিষ্ঠার এক অদম্য আবেগ কোন এক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিসূচক কতকগুলি তারকা চিহ্নের মত এ স্পন্দন এ রোমাঞ্চ এ আবেগ যেন এক অভিজ্ঞতার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করত।

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় যখন হিলদা আর'কনি বাড়ি এল তখন হিলদার বয়স কুড়ি আর কনির বয়স আঠারো, তখন তাদের বাবা বেশ বুঝতে পারল তারা প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

অনেকে বলেন, L' amour await passe par la কিন্তু ওদের বাবা অভিজ্ঞ লোক। তিনি জানতেন প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি নিজস্ব ধারা আছে। তাই তিনি তাঁর মেয়েদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথে কোন বাধা সৃষ্টি করতেন না। ওদের মা তাঁর শেষ জীবনে কয়েক মাস ধরে স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন তিনি চাইতেন তাঁর মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক এবং স্বাধীনভাবে তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করুক তিনি নিজে কখনো নিজের মতে স্বাধীনভাবে চলতে পারেননি। কিন্তু কেন তা কেউ জানে না, একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন। কারণ তিনি চাকরি করে টাকা রোজগার করতেন এবং তাকে কোন ব্যাপারে কেউ কোন বাধা দিত না। তবু তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন না। তার কারণ তাঁর মনে প্রভুত্বের একটা ধারণা এবং অধীনতামূলক একটা ভাব ছোট থেকেই ছিল। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে তাঁর স্বামী স্যার ম্যালকমের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর প্রতি স্নায়বিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ও উদার মনোভাবাপন্ন স্ত্রীর হাতে সংসার চালনার সব ভার দিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর মেয়েরা আবার ফিরে গেল ড্রেসডেনে। আবার তারা সেই পুরনো জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে গেল। সেই গানবাজনা,

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, যুবকবন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা—আবার সব কিছু আগের মতই চলতে লাগল। তারা তাদের আপন যুবকবন্ধুদের তেমনি ভালবাসতে লাগল। তাদের যুবকবন্ধুরাও তাদের প্রিয় বান্ধবীদের তাদের প্রেমাবেগের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে ভালবাসত। তারা যা কিছু লিখত, যা কিছু ভাবত বা প্রকাশ করত সবই তাদের বান্ধবীদের সম্বন্ধে। কনির যুবকবন্ধুটি ছিল গানের লোক আর হিলদার ভাবের লোকটি ছিল কারিগরী বিদ্যার লোক। কিন্তু তারা যেই হোক, তাদের দেখে মনে হত তারা যেন তাদের আপন আপন প্রেমিকাদের জন্যেই বেঁচে আছে। তাদের মানসিকতা আর মানসিক উত্তেজনা দেখে তাই মনে হত। এই উত্তেজনার জন্যই অন্য কোথাও জীবনে তারা প্রতিহত হলেও তারা তা জানতেই পারত না।

তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল প্রেম তাদের সত্তার গভীরে জড়িয়ে আছে তাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার পরতে পরতে ঢুকে গেছে। এই প্রেম নরনারীর দেহে কি অভ্রান্ত রূপান্তর নিয়ে আসে, একথা ভাবতে সত্যই অদ্ভুত লাগত তাদের। এই প্রেম আর দেহসংসর্গের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যটা আরো উজ্জ্বল হয়, তাদের দেহের শক্ত জায়গাগুলো বেশ নরম হয়, চেহারাটা মোটের উপর গোলগাল হয়ে ওঠে। পুরুষেরা এর ফলে আগের থেকে শান্ত হয়, তারা আরো অন্তর্মুখী হয়। তাদের কাঁধ বুক চওড়া হয়, তাদের হঠকারিতার ভাবটা কমে যায়, কোন কাজ তারা ভাবনা করে করতে শেখে

দেহে প্রথম যৌন রোমাঞ্চ জাগার সময় ওরা দুই বোনেই পুরুষদের আশ্চর্য শক্তির কাছে প্রথম প্রথম বিলিয়ে দেয় নিজেদের। কিন্তু কিছু পরেই তারা সামলে নেয় নিজেদের। এই যৌন রোমাঞ্চটাকে একটা সাধারণ চেতনা হিসাবে জ্ঞান করতে থাকে এবং নিজেদের সত্তার স্বাধীনতা আবার ফিরে পায়। এদিকে পুরুষরা তাদের যৌনতৃপ্তির জন্য নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাদের কাছে বিলিয়ে দিত নিজেদের আত্মাকে এবং পরে এমন একটা ভাব দেখাত যাতে মনে হত তারা এক শিলিং খরচ করে মাত্র ছয় পেনি পেয়েছে। কনির প্রেমিক ছিল একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অন্য দিকে হিলদার প্রেমিক ছিল হাসিখুশিতে ভরা। তবে অন্যান্য পুরুষদের মত তারাও ছিল চির অকৃতজ্ঞ, চির অতৃপ্ত। পুরুষজাতটার রীতিই হলো এই। মেয়েরা তাদের সঙ্গে কখনো কোন কারণে সহবাস করতে রাজী না হলেই তারা ঘৃণা করবে মেয়েদের, আবার সহবাস করতে রাজী হলেও তারা অন্য কোন না কোন কারণে ঘৃণা করবে তাদের। অনেক সময় আবার বিনা কারণেই ঘৃণা করতে থাকবে। মেয়েরা যাই করুক, অতৃপ্ত অবুঝ শিশুর মত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না তারা।

যাই হোক, এমন সময় জোর যুদ্ধ লাগায় কনি আর হিলদা দুজনেই বাড়ি ফিরে এল। এর কিছুদিন আগে মে মাসে তাদের মা মারা যাওয়ায় তারা

একবার বাড়ি এসেছিল তাদের মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে। ১৯১৪ সালের খৃস্টের জন্মদিন আসার আগেই তাদের দুই বোনের দুই জার্মান প্রেমিকই মারা যায়। তাদের হারিয়ে ওরা শোকাবেগে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ভুলে যেতে থাকে।

দুই বোনই তাদের বাবার কাছে তাদের মার বাড়ি কেনসিংটনে বাস করতে লাগল। তারা দুজনেই কেম্ব্রিজের সেই যুবকগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশা করত যারা ছিল অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী তারা ছিল অভিজাত বংশের ছেলে। কিন্তু ফ্লানেলের শার্ট আর পায়জামা পরত। তারা নিচু মেয়েলি গলায় কথা বলত, সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় দিত। আবেগানুভূতি প্রকাশের দিক থেকে তারা ছিল নৈরাজ্যবাদী, কোন নিয়মকানুন মেনে চলত না।

যাই হোক, এই যুবকগোষ্ঠীরই একজনকে বিয়ে করল হিলদা। যুবকটি তার থেকে দশ বছরের বড় যুবকটির মোটা রকমের টাকা পয়সা ছিল। সে একটা সরকারী চাকরি করত এবং মাঝে মাঝে সে কিছু দার্শনিক প্রবন্ধ লিখত। ওরা ওয়েস্টমিনস্টারের একটা ছোট ঘরে বাস করত। ওরা একটা ছোট ঘরে বাস করলেও এমন সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত যারা ছিল দেশের মধ্যে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ, যারা অনেক সব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলত।

কনি মিশত কেম্ব্রিজের পায়জামাপরা সেই সব উল্লাসিক যুবকদের সঙ্গে যারা সবকিছু উপহাস করে উড়িয়ে দিত তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি। ক্লিফোর্ড তখন বাইশ বছরের যুবক। সে বনে কয়লা খনি সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে করতে হঠাৎ চলে আসে। এর আগে সে দুবছর কেম্ব্রিজে ছিল তারপর সে সেনাদলে যোগ দেয় এবং প্রথম লেফটন্যান্টের পদে উন্নীত হয়। এবার সে সামরিক পোষাক পরে সহজেই সব কিছুকে উপহাস করে উড়িয়ে দিতে পারত

ক্লিফোর্ড ছিল কনির থেকে উঁচুস্তরের লোক কনি ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ কিন্তু ক্লিফোর্ড ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের। খুব একটা বড় দরের না হলেও তার বংশটা ছিল অভিজাত। তার বাবা ছিল একজন ছোটখাটো ব্যারণ আর তার মা ছিল কোন এক ভিস্‌কাউন্টের মেয়ে।

ক্লিফোর্ড কিন্তু কনির থেকে বড় বংশের ছেলে এবং সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ হলেও সে ছিল গ্রাম্য আর ভীরু প্রকৃতির। সে তার ভৌম আভিজাত্যের ছোট জগৎটায় বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত, কিন্তু শহরের বৃহত্তর পরিবেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করত। সত্যি কথা বলতে কি সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ভয় করত। সে অনেক শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও একটা অসহায়তা বোধ করত প্রায়ই মনে মনে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও আজকাল সচরাচর দেখা যায় এটা।

কনস্ট্যান্স বীডের নরম আশ্বাসের কথাগুলো তাই বড় ভাল লেগেছিল ক্লিফোর্ডের। বাইরের জগতে এই আশ্চর্য মেয়েটি যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করত সে ব্যক্তিত্ব তার ছিল না।

তবু ক্লিফোর্ডও একদিক দিয়ে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী ছিল। আপন শ্রেণীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত সে। বিদ্রোহ কথাটা হয়ত একটু বেশী কড়া হয়ে যায়। যে কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন সাধারণ মানুষের মনে যে একটা বিরূপ মনোভাব জেগেছিল, সে মনোভাবের হাওয়া তার মনেও লেগেছিল। প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত সব রীতিনীতিই নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ মনে হত তার। এমন কি নিজের বাবাকেও হাস্যাস্পদ মনে হত; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল দেশের সরকারের মধ্যে কোন অর্থ বা সারবত্তা খুঁজে পেত না। যুদ্ধ, সেনাবাহিনী, সেনানায়ক সব কিছুকেই হাস্যাস্পদ মনে হত তার।

আসলে প্রভুত্বমূলক যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যা কিছু জড়িয়ে ছিল তাকেই কম বেশী হাস্যাস্পদ বলে মনে হত তার। বিশেষ করে শাসকশ্রেণীর লোকদের বেশী হাস্যাস্পদ মনে হত। তার বাবা স্যার জিওফ্রেও কম হাস্যকর ছিলেন না। তিনি যত সব গাছ কেটে বন সাবাড় করতে থাকেন আর কোলিয়ারী থেকে লোকদের তাড়িয়ে যুদ্ধে পাঠাতে থাকেন। তিনি যুদ্ধ বিপর্যয়ের বাইরে নিরাপদে থেকে মুখে দেশপ্রেমিক হিসাবে জাহির করতেন নিজেকে। গ্রামাঞ্চলে সাধ্যের অতীত টাকা খরচ করতেন

ক্লিফোর্ডের বোন মিস্ চ্যাটার্লি লণ্ডনে যায় নার্সিংএর কাজ করতে। তার বড় ভাই হার্বার্ট তা নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে। আসলে ওরা সবাই ছিল হাস্যকর। ক্লিফোর্ড নিজেকেও কিছুটা হাস্যকর ভাবতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর এক মেয়ে কনিকে দেখে তাকে এক সত্যিকারের মানুষ বলে মনে হয় তার, কারণ সে একটা কিছু বিশ্বাস করত।

কনিরা অবশ্য টমি আর তার বন্ধুদের বলপূর্বক যুদ্ধে পাঠানোর ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী ছিল। আর একটা বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাদের। সেটা হলো কফি আর চিনির দুষ্প্রাপ্যতা। এই সব কারণেই তারা শাসনকর্তৃপক্ষকে হাস্যকর ভাবত।

তখনকার শাসনকর্তৃপক্ষ নিজেরাও হাস্যকর ভাবতে লাগল নিজেদের। হাস্যকরভাবেই সব কাজ সম্পন্ন করতে লাগল তারা। তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হতে লাগল এটা যেন পাগল টুপীওয়ালাদের চায়ের মজলিশ। এমন সময় ঘটনা আরো ঘোরালো হয়ে উঠলে লয়েড জর্জ এলেন অবস্থাকে উন্নত করার জন্য। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম আবার হাস্যকরতাকেও ছাপিয়ে গেল। উচ্ছল প্রকৃতির যুবকরাও হাসাহাসি বন্ধ করে দিল।

১৯১৬ সালে হার্বার্ট চ্যাটার্লি নিহত হতে ক্লিফোর্ডই উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হলো সব কিছুর। কিন্তু এতেও ভয় অনুভব করত সে স্যার

জিওফ্রের পুত্র এবং র‍্যাগবির বংশধর হিসাবে তার যে একটা গুরুত্ব আছে একথাটা কখনো ভুলতে পারেনি সে। আবার এটাও সে জানত যে বৃহত্তর জগতের পটভূমিকায় এ মনোভাব হাস্যকর। সে র‍্যাগবির উত্তরাধিকারী এবং তার সব কিছুর জন্য দায়ী এটা যেমন ভাবতে ভয় লাগত তেমনি ভালও লাগত। আমার মনে হয় এটা অবাস্তব।

স্যার জিওফ্রের কিন্তু এ ধরনের কোন মনোভাব ছিল না। তাঁর মুখখানা ছিল ম্লান অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাত সব সময়। তিনি সব সময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। দেশ ও জাতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদমর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য তিনি ছিলেন অনমনীয়ভাবে বদ্ধপরিকর। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার যোগ এতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে হোরেশিও বটমলিকেও ভাল বলে মনে হত তাঁর। স্যার জিওফ্রে ছিলেন ইংল্যাণ্ড আর প্লেয়েড জর্জের পক্ষে আর তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইংল্যাণ্ড আর সেণ্ট জর্জের পক্ষে

স্যার জিওফ্রে চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে ক্লিফোর্ড বিয়ে করে বংশ রক্ষা করুক ক্লিফোর্ড ভাবত তার বাবা একেবারে সেকালের মানুষ। কিন্তু সব কিছুকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার নিজের আর কি গুণ ছিল? তার নিজের অবস্থাও ত ছিল সমান হাস্যাস্পদ। তাই সে তার সামন্তপদ আর র‍্যাগবির পৈত্রিক বাড়ি নেহাৎ অবহেলাভরেই গ্রহণ করে।

যুদ্ধের প্রথম প্রথম যে আনন্দের উত্তেজনা খুঁজে পেয়েছিল তার মধ্যে, অত্যধিক মৃত্যুর বিভীষিকার ফলে সে উত্তেজনা পরে উবে যায়। বাঁচতে হলে জীবনে আরাম চাই, অবলম্বন চাই জগতে এক নিরাপদ আশ্রয় চাই। পুরুষ মানুষ মাত্রই একজন স্ত্রী চায়।

চ্যাটার্লি পরিবারের দুই ভাই এক বোন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাড়ির ভিতরেই দিন কাটাত আত্মীয় পরিজন অনেকে থাকলেও কারো সঙ্গে বড় একটা মিশত না তারা। তাদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের নিজেদের পারিবারিক সম্পর্কটাকে আরো নিবিড় করে তোলে তাদের বংশগত উপাধি ও ভূসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অসহায়বোধ করত। তারা শিল্পাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং স্যার জিওফ্রের একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য তাদের নিজেদের শ্রেণীভুক্ত লোকজনদের সঙ্গে কোন মেলামেশা ছিল না। তাদের বাবার কাজকর্মকে তারা উপহাসের চোখে দেখলেও তাঁকে তারা উপেক্ষা করতে পারত না কোন বিষয়ে।

তারা তিন ভাইবোনে বলাবলি করত তারা চিরদিন একসঙ্গে বাস করবে। কিন্তু হার্বার্টের অকালমৃত্যুর ফলে তা আর হয়ে উঠেনি স্যার জিওফ্রে খুব কম কথা বলতেন তিনি ক্লিফোর্ডের বিয়ের কথাটা শুধু একবার বললেন। কিন্তু তিনি বেশী কথা না বললেও ক্লিফোর্ডের দিদি এম্মা তা চায়নি। তার ইচ্ছা ছিল তাদের বাড়ির কোন ছেলে বিয়ে করবে না। এম্মা ছিল ক্লিফোর্ডের

থেকে দশ বছরের বড়। তার মতে তাদের বংশের ছেলেরা একদিন যে আদর্শ অন্তরে পোষণ করত, যার কথা সব সময় বলত, তাদের বিয়ে করাটা হবে সে আদর্শের পরিপন্থী।

তা সত্ত্বেও কনিকে বিয়ে করল ক্লিফোর্ড এবং তার সঙ্গে এক জায়গায় মধুচন্দ্রিমা করতে গেল। সেটা ছিল ১৯১৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর বছর। নিমজ্জমান একই জাহাজের যাত্রীদের মত সেই দুর্বছরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। বিয়ে করলেও অক্ষত রয়ে গেল ক্লিফোর্ডের কৌমার্য। কারণ যৌন বিষয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। দেহসংসর্গের ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে শুধু মনের মিলকে সম্বল করে পরস্পরে নিবিড় হয়ে উঠেছিল তারা এটাই যথেষ্ট ছিল তার কাছে। কনি কিন্তু যৌনসংসর্গহীন দেহতৃপ্তিহীন মিলন ও মেলামেশায় কোন আনন্দই পেল না। কিন্তু আর পাঁচজন মানুষের মত এই যৌনতৃপ্তিতে কোন আগ্রহ ছিল না ক্লিফোর্ডের। তার মতে কামগন্ধহীন এই মনোমিলনই নরনারীর সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। তার মনে যৌন ব্যাপারটা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, হঠাৎ যে কোন সময়ে ঘটে যেতে পারে; কিন্তু সেটা প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক ব্যাপার নয়। সে ভাবত, যৌনসংসর্গ একটা প্রাচীন সেকেলে ব্যাপার যা আসলে বড় কদর্য অথচ কনি তার ননদ এম্মার হাত থেকে ভবিষ্যতে বাঁচার জন্য সন্তান চাইত।

কিন্তু ১৯১৮ সালে ক্লিফোর্ড পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তখনো পর্যন্ত তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। জিওফ্রে সেই দুঃখে মারা যান।

অধ্যায় ২

১৯২০ সালের হেমন্তকালে র‍্যাগবির বাড়িতে এসে উঠল ক্লিফোর্ড আর কনি। ক্লিফোর্ডের বোন তার ভাইএর এই দুর্ঘটনায় তিতিবিরক্ত হয়ে চলে যায় পৈত্রিক বাসভবন থেকে সেখান থেকে গিয়ে লণ্ডনের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাস করতে থাকে।

লম্বা নিচু ধরনের র‍্যাগবির বাড়িটা বাদামী পাথরে তৈরি। বাড়ি তৈরির কাজটা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। তারপর ক্রমাগত বাড়ানো হতে হতে বৈশিষ্ট্যহীন একটা খোঁয়াড়ে পরিণত হয়। ওক গাছে ঘেরা একটা পার্কের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। কিন্তু হায়, অদূরেই চোখে পড়বে তেভারশাল খনির চিমনিটা। দেখা যাবে, চাপ চাপ ধোঁয়া আর বাষ্পের মেঘ জমে রয়েছে তার উপর সব সময়ের জন্য। দূরে কুয়াশাঢাকা এক অলস

পাহাড়ের উপর দেখা যায় সংগ্রামশীল তেভারশাল গ্রামের ছবি গ্রামের শুরু হয়েছে পার্কের গেটের কাছ থেকে এবং এক মাইলব্যাপী লম্বা হয়ে এলো-মেলো ও বিশ্রীভাবে চলে গেছে গ্রাম মানে পথের দুধারে বা একটু ভিতরে ইটের ছোট ছোট বাড়ি, তাদের মাথায় কালো কালো ছাদ। কেমন যেন একটা সীমাহীন শূন্যতা খাঁ খাঁ করত সারা বাড়িটাতে।

কনি মোটামুটি তিন জায়গার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। সে জায়গাগুলো হলো কেনসিংটন, স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় অঞ্চল আর সাসেক্সের ঢালু নিম্নাঞ্চল। কনি তখন ইংল্যাণ্ড বলতে এই তিনটি জায়গা বোঝাত। লোহা আর কয়লা-খনিতে ভরা মিডল্যাণ্ডের ভূপ্রকৃতিটাকে ভাল না লাগলেও একরকম শিশুসুলভ ঔদাসিন্যের সঙ্গে সব কিছু দেখত কনি।

র‍্যাগবির বাড়ির নির্জন নিরানন্দ ঘরের জানালা থেকে খনিটার নানারকমের আওয়াজ শুনতে পেত। খনির চালুনির শব্দ, এঞ্জিনের হুস্ হুস্ শব্দ। ট্রাক শান্টিং করার ক্লিং ক্লিং, কয়লাখনির সঙ্গে সংযুক্ত রেলের বাঁশির আওয়াজ অনবরত কানে আসত। তেভারশালের খাদের পাশটায় কত সব আগুন জ্বলছে। এ আগুন বছরের পর বছর ধরে জ্বলছে। এ আগুন নেভাতে হলে হাজার হাজার টাকার দরকার। কাজেই এ আগুন সমানে জ্বলে যাচ্ছে। আর যখন সেদিক থেকে বাতাস বয় তখন গন্ধকের সঙ্গে খনিগর্ভস্থ ময়লার গন্ধ মিলেমিশে একটা উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং বাতাসে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। যখন বাতাস সেদিকে বয় না তখনও ভূগর্ভস্থ লোহা, কয়লা বা এসিডের একটা না একটা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে এমন কি খৃস্টোৎসবের গোলাপের উপরেও কয়লার গুঁড়ো জমে থাকে। নরকের আকাশ থেকে ঝরে পড়া এক কালো নির্যাসের মতই অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার যেন।

অন্যান্য সব কিছুর মত এ ব্যাপারটাও ছিল বিধিনির্দিষ্ট দুর্বিসহও বটে। কিন্তু পা ছুঁড়ে লাভ কি? লাথি মেরে ত আর কোন অবস্থাকে সরানো যায় না। অন্য সব কিছুর মত জীবনও চলতে লাগল রাত্রিবেলায় আকাশে ঝুলতে থাকা কালো মেঘের গায়ে লাল ফুটকির মত, যন্ত্রণাদায়ক লাল দগদগে ঘায়ের মত-সেগুলো জ্বলতে থাকত। কখনো বাড়ত, কখনো কমত সেগুলো ছিল চুল্লির আগুন। প্রথম প্রথম সেগুলো ভাল লাগলেও ভয় লাগত। ওর মনে হত ও যেন মাটির নীচে বাস করছে। পরে সেগুলো গা সওয়া হয়ে যায় তার। সকালের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হত।

ক্লিফোর্ড বলত, র‍্যাগবি লণ্ডনের থেকে ভাল লাগে তার এই গ্রামাঞ্চলের যেন নিজস্ব একটা ইচ্ছাশক্তি আর স্বাধীনতা আছে। এখানকার অধিবাসীদেরও আছে একটা বলিষ্ঠতা। কিন্তু কনি অবাক হয়ে ভাবত, এখানকার লোকগুলোর আর যাই থাক, চোখ বা মন বলে কোন পদার্থ নেই। তার মতে এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির মতই এখানকার লোকগুলোও কুৎসিত, বিকৃতদেহী, নীরস,

অসামাজিক। শুধু তারা যখন এ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা দিয়ে ফিরত তখন তাদের খোলা ভরাট গলার আওয়াজে, ইতর কথাবার্তায় আর কাঁটামারা খাদের জুতোর শব্দে এমন একটা কিছু থাকত যা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর আর রহস্যময়।

এক যুবক জমিদার হিসাবে ক্লিফোর্ড যখন তার বাড়িতে এসে উঠল, কেউ তখন তাকে কোন অভ্যর্থনা জানাল না। তার জন্য কোন উৎসব হলো না। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এল না। শুধু ওরা মোটর গাড়িতে করে ছায়া-ঘেরা ঢালু পথের উপর দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে একটা ঘোর বাদামী রঙের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন সে বাড়ির কাছে কতকগুলো ভেড়া চড়ছিল আর বাড়ির ঝি আর তার স্বামী কোন রকমে দুটো অভ্যর্থনার কথা বলার জন্য ঘোরাফেরা করছিল।

র‍্যাগবি হল আর তেভারশাল গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে কোন যোগাযোগ হলো না। কেউ টুপী খুলে বা কোন ভাবে সম্মান বা সৌজন্য প্রকাশ করল না। কোলিয়ারির লোকরা তাদের দিকে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ব্যবসায়ীরা পরিচিত জনের মতই কনির পানে তাকিয়ে টুপী খুলে অভ্যর্থনা জানাল। ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে শুধু একবার অস্বস্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু এই পর্যন্ত। উভয় পক্ষের মধ্যে একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়ে গেল। উভয় পক্ষেই মৃদু ক্রোধের একটা অনুচ্চারিত বাধা রয়ে গেল। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের এই মানসিক বিচ্ছিন্নতায় কষ্ট পেত কনি। পরে সে তার মনটা শক্ত করে নেয় অবাঞ্ছিত অথচ অপরিহার্য টনিকের মতই এ অবস্থা মেনে নেয়। ক্লিফোর্ড বা কনির আচরণ অসামাজিক ছিল বলেই যে এ অবস্থার উদ্ভব হয় তা নয় এর আসল কারণ হলো এই যে, ওরা ওদের খনি শ্রমিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলে বনে করত। সুতরাং ব্যবধানটা বরাবর অনতিক্রম্য আর অবর্ণনীয় রয়ে গেল। ট্রেন্টের দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণতঃ এ ধরনের অবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু মিডল্যাণ্ড আর উত্তরাঞ্চলে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়ে যায়। তুমি তোমার দিকে থাক, আমি আমার দিকে। এই ধরনের একটা মনোভাব। এ ব্যবধান অতিক্রম করে সাধারণ মানবতার কোন নিবিড় স্পন্দন অনুভূত হয় না।

তবু উপরে উপরে মুখে সহানুভূতি জানাত কনি আর ক্লিফোর্ডকে। কিন্তু সে শুধু মুখে। উভয়পক্ষের মধ্যে কোন দেহগত সান্নিধ্য ছিল না।

রেক্টর ভদ্রলোক মানুষ হিসাবে ভালই ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ষাট এবং তিনি ছিলেন বড়ই কর্তব্যপরায়ণ। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁকে ত্যাগ করেছিল বলে তাঁকেও একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হত। খনি শ্রমিকদের স্ত্রীরা ছিল খৃস্টানধর্মাবলম্বী এবং মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ খনিশ্রমিকরা নিজেরা কোন ধর্মেই বিশ্বাস করত না। তাছাড়া গ্রামের যাজককে তাঁর পোষাকপরা অবস্থায় দেখলেই তারা ভাবত উনি আর যাই হোন আর পাঁচজন

সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক। তিনি মেল্টর এ্যাসাবি নামে কোন এক প্রার্থনা আর প্রচার প্রতিষ্ঠানের লোক এছাড়া তারা আর কিছু ভাবত না।

ওরা লেডি চ্যাটার্লি সম্বন্ধে এই কথাই ভাবত। ভাবত, তুমি যেই হও আমরাও তোমার থেকে কিছু কম নই। গ্রামবাসীদের এই অনমনীয় মনোভাব দেখেই হতবুদ্ধি হয়ে যায় কনি প্রথম প্রথম। যে সব শ্রমিকমেয়েরা লেডি চ্যাটার্লির কাছে দেখা করতে আসত তারা ছিল কৌতূহলী আর সন্দেহবাতিক। তাদের চোখে মুখে ছিল এক কপট মিত্রতার ভাব। তারা গর্বের সঙ্গে ভাবত, আমি লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু তারা কখনো ভাবত না, 'যোগ্যতার দিক থেকে আমি অনেক কম।' কিন্তু একথা তাদের মুখে কোনদিন শোনা যাবে না। অবস্থাটা ভয়ঙ্করভাবে দুঃসহ হলেও তার থেকে মুক্তিলাভের কোন আশা নেই।

ক্লিফোর্ড গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। তার দেখাদেখি কনিও তাদের এড়িয়ে চলত। কনি যখন তাদের সামনে দিয়ে কোথাও যেত তখন সে তাদের পানে তাকাত না। আর তারা কনির পানে এমনভাবে তাকাত যাতে মনে হবে সে যেন একটা চলমান মোমের পুতুল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে যখন ক্লিফোর্ডের কোন কাজ পড়ত বা গ্রামবাসীরা কোন ব্যাপারে তার কাছে আসত তখন ক্লিফোর্ড তাদের সঙ্গে দম্ভের সঙ্গে কথা বলত। তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। সে তার নিজের নীতির উপর শক্ত ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের সঙ্গে মিটমাটের কোন চেষ্টাই করত না। সে তার নিজের শ্রেণীর বাইরে যে কোন লোককেই ঘৃণার চোখে দেখত। অন্য দিকে গ্রামবাসীরা ক্লিফোর্ডকে পছন্দ অপছন্দ কিছুই করত না। তারা তাকে তাদের চারপাশের ভূ-প্রকৃতির কোন একটা বস্তুর মত জ্ঞান করত।

কিন্তু পঙ্গু হয়ে যাবার পর থেকে ক্লিফোর্ড অত্যন্ত লাজুক আর আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। সে তার ব্যক্তিগত চাকর ছাড়া আর সবাইকেই ঘৃণা করত। কারণ তাকে সব সময় চাকাওয়ালা চেয়ারে বা স্নানের চেয়ারে বসে থাকতে হত। তবু সে আগের মতই ভাল দর্জিদের দ্বারা তৈরি দামী পোষাক পরত পরিপাটি করে। বণ্ড স্ট্রীট থেকে আনা দামী নেকটাই পরত গলায়। উপর থেকে এক নজরে তাকে দেখলে আগের মতই চটপটে আর সুদর্শন দেখাত। সে কোন দিনই আজকালকার মেয়েলি ভাবওয়ালা যুবকদের মত ছিল না তার লাল মুখ আর চওড়া কাঁধ সত্ত্বেও সে বরং ছিল কিছুটা গ্রাম্যভাবাপন্ন। তার আসল স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তার উদ্ধত ও ত্রস্ত, নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত চোখের তারায়। তার স্বভাবটা ছিল আক্রমণাত্মকভাবে উদ্ধত ও দাম্ভিক, আবার একই সঙ্গে নম্রতা ও শালীনতায় ভরা, আত্মবিলীয়মানতায় মৃদু বিকম্পিত।

কিন্তু কনি একথা না ভেবে পারত না যে আসলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে

তার কোন সম্পর্ককে স্বীকার করতে চাইত না ক্লিফোর্ড খনিশ্রমিকদের সে কোন মানুষ বলে জ্ঞান করত না, তারা যেন তার খনিরই একটা নির্জীব অংশ। তারা যেন রূঢ় ভূপ্রকৃতির একটা অংশ, জীবন্ত মানুষ নয়। খনি-শ্রমিকদের কিছুটা ভয়ও করত ক্লিফোর্ড। ওর পানে তারা তাকিয়ে থাক তা সে চায় না। বিশেষ করে সে পঙ্গু বলেই এটা মনে হয়। শ্রমিকদের রূঢ় স্থূল জীবনযাত্রা বনশুয়োরদের মতই অস্বাভাবিক মনে হত তার কাছে।

আসলে কোন বিষয়েই আগ্রহ ছিল না তার। কোন অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা দূরবীক্ষণযন্ত্রে নিবদ্ধ দৃষ্টির মত তার দৃষ্টি ছিল বর্তমান হতে বিচ্ছিন্ন। আসলে কারো সঙ্গেই তার কোন নিবিড় সংস্পর্শ ছিল না। একমাত্র র‍্যাগবির এই পৈত্রিক বাড়িটার সঙ্গে এক প্রথাগত বংশগত সম্পর্ক আর এম্মার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়া কারো সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই ছিল না তার। এ ছাড়া কোন কিছুই মনকে স্পর্শ করতে পারত না তার। কনি বেশ বুঝতে পেরেছিল মনের দিক থেকে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার স্বামীর। সে যেন কারো কাছ থেকে কিছুই চায় না, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না। সে যেন চিরদিন এইভাবে মানবসম্পর্কবিহীন অবস্থাতেই থাকতে চায়।

কনির সঙ্গে তার মনের কোন সম্পর্ক না থাকলেও কনির উপর প্রতিটি মুহূর্তেই নির্ভর করতে হত তাকে তার দেহটা বলিষ্ঠ ও লম্বাচওড়া হলেও সে ছিল অসহায়। অবশ্য সে তার চাকাওয়ালা চেয়ারটাকে ইচ্ছামত ঘোরাতে ফেরাতে পারত, সে তার যন্ত্রবসানো স্নানের চেয়ারটা নিয়েও পার্কের চারপাশে ঘুরে আসতে পারত। তবু সে এক মুহূর্তও একা থাকতে পারত না। একা থাকলেই সে যেন তার নিজের অস্তিত্বকে নিজেই খুঁজে পেত না। মনে হত সে যেন কোন অজানায় হারিয়ে গেছে চিরতরে। তাই সে চাইত কনি তার কাছে সব সময় থাকুক, তার জীবনের চলমান অস্তিত্বকে প্রকটিত করে তুলুক তার কাছে।

এত কিছু সত্ত্বেও একটা উচ্চাভিলাষ ছিল ক্লিফোর্ডের। সে গল্প লেখা শুরু করেছিল। সে যাদের কথা ভালভাবে জানত তাদের সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গল্প লিখত সে। সে লেখার মধ্যে চাতুর্য ছিল; আবার কিছু বিদ্বেষও ছিল কিছু মানুষের প্রতি। তবে সেগুলি রহস্যময়ভাবে অর্থহীন। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং অদ্ভুত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, ছিল না কোন সংস্পর্শের নিবিড়তা। মনে হত গল্পবর্ণিত সব ঘটনা ঘটেছে শূন্যে। যেহেতু বর্তমান জীবন কৃত্রিম আলোয় ভরা এক রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেইহেতু তার আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে গল্পগুলোর একটা আবেদন ছিল। আধুনিক মানুষের মনের সঙ্গে তার একটা মিল ছিল।

বিশেষ করে তিনটি গল্পের প্রতি ক্লিফোর্ড ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। এ

বিষয়ে তাকে কিছু অপ্রকৃতিস্থ দেখাত। সে চাইত সকলেই ঐ গল্পগুলোর প্রশংসা করুক। ওগুলো এক বিশেষ ও অতিরিক্ত একটি গুণে ভূষিত। গল্পগুলি আধুনিক কতকগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাগুলি বিদগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই পায়। কিন্তু ক্লিফোর্ডের কাছে নিন্দাটা তার বুকে শেলের মত বেঁধে। তার মনে হত কে যেন ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে তার বুকে। তার মনে হত তার সমগ্র সত্তাটা গল্পের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কনি যতদূর পারত সাহায্য করত তাকে। প্রথম প্রথম এতে রোমাঞ্চ জাগে তার দেহে। সে জোর করে কনির সঙ্গে সব বিষয়ে একটানা কথা বলে যেত। তাকে জোর করে বসিয়ে রেখে কথা বলত এবং কনিকে বাধ্য হয়ে তার কথায় সাড়া দিতে হত। তার মনে হত তার দেহ, আত্মা আর তার যৌন জীবন যেন জাগ্রত হয়ে সেই গল্পগুলির মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। একথা মনে করে রোমাঞ্চ জাগত তার দেহে। তাদের দেহগত সংসর্গ বলতে কিছুই হত না। কনিকে বাড়ির সব কিছু তত্ত্বাবধান করতে হত। অবশ্য এ বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য অনেক আগে হতেই একজন ঝি ছিল। সে স্যার জিওফ্রের আমল থেকে চল্লিশ বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করে আসছে। খাবার পরিবেশন থেকে সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে করে আসছে। মেয়েটির বয়স হয়েছিল। কিন্তু ওর এই বয়োপ্রবীণতাটাই একেবারে ভাল লাগত না কনির। ও তাই সংসারের সব কিছু তারই উপর ছেড়ে দিত। বিরাট প্রাসাদের অসংখ্য শূন্য অব্যবহৃত ঘরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি সব কাজ যান্ত্রিকভাবে চলত। রাতির সব কাজ যন্ত্র-চালিত কাজের মত হয়ে যায়। তবু ক্লিফোর্ড একজন অভিজ্ঞ রাঁধুনিকে জোর করে নিযুক্ত করল। রাঁধুনি মানে একজন বয়স্ক মহিলা যে মহিলা ক্লিফোর্ড লণ্ডনের একটি বাড়িতে থাকাকালে তার সেবা করে। সারা সংসারের মধ্যে মাত্র এইটুকু পরিবর্তন ছাড়া আর সব কিছুই যথারীতি চলতে লাগল। কিন্তু কনির কাছে এই চলাটা এক যান্ত্রিক অরাজকতা বলে মনে হত। ঘর পরিষ্কারের কাজ, রান্নাবান্নার কাজ যন্ত্রের মত হয়ে যায়। সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই হয়ে যায়। যথাসময়ে এক সুকঠোর নিষ্ঠা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সব কিছু হয়ে যায়। তবু কনির মনে হয় এটা নিয়মিত বা নিয়মমাফিক অরাজকতা। এর মধ্যে প্রাণ নেই। কোন অনুভূতির উত্তাপ তার সঙ্গে এ রাতির সম্পর্ককে উত্তপ্ত ও নিবিড় করে তুলতে পারেনি। পরিত্যক্ত রাজ-পথের মতই বাড়িটাকে নীরস ও নির্জন মনে হত কনির।

বাড়ির সব ব্যাপারগুলোকে এইভাবে চলতে না দিয়েই বা কি করবে সে? মিস্ চ্যাটার্লি তার অভিজাতসুলভ সরু মুখখানা নিয়ে মাঝে মাঝে আসত। এসে যখন দেখত বাড়ির ভিতর আগের থেকে কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি তখন একটা জয়ের উল্লাস অনুভব করত। কনি তার ভাইএর সঙ্গে মনের দিক

থেকে তার যোগসূত্রটা ছিন্ন করে দিয়েছে, তার ভাইএর সঙ্গে তার আগেকার সেই অন্তরঙ্গতা আর নেই, এজন্য সে কনিকে ক্ষমা করতে পারেনি। অথচ সে অর্থাৎ এম্মা আর ক্লিফোর্ড এই দুজনেই বিরাট চ্যাটার্লি পরিবারের বংশগত ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। সুতরাং এম্মারই উচিত ছিল এ পরিবারের অতীতের যত সব অদ্ভুত কাহিনী বলে ক্লিফোর্ডকে গল্প লিখতে সাহায্য করা।

কনির বাবা একবার র‍্যাগবিতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি একদিন কনিকে গোপনে বললেন, ক্লিফোর্ডের লেখা গল্পগুলোর মধ্যে কিছুই নেই। এগুলো টিকবে না।

কনি তার বাবার কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা বুঝতে না পেরে সে তার বড় বড় নীল চোখদুটো তুলে তার বাবার পানে অপার বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বলল, গল্পগুলোর মধ্যে একেবারে কিছু নেই, তার বাবার একথার মানে কি। তাতে কিছু যদি না থাকবে তাহলে সমালোচকরা তার প্রশংসা করবে কেন? তাহলে ক্লিফোর্ডই বা এত নাম করছে কি করে আর তার থেকে টাকাই বা পাওয়া যায় কি করে? ক্লিফোর্ডের লেখার মধ্যে কিছু নেই একথার মানে কি বোঝাতে চাইছেন তার বাবা? তাহলে তার মধ্যে কি আছে?

আজকালকার যুবক যুবতীরা যা বলে কনির কথাও হলো তাই। তাদের মধ্যে জগৎ ও জীবনে সব সত্যই তাৎক্ষণিক প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছে। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত স্বতন্ত্র, স্বয়ংসিদ্ধ, একটির পর একটি করে পরপর বয়ে চলেছে; কিন্তু কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই।

র‍্যাগবিতে আসার পর দ্বিতীয় বছরে শীতকালে কনির বাবা একবার এসে তাকে বললেন, অবস্থার দ্বারা বাধ্য হয়ে তুমি নিশ্চয় আধা কুমারী অবস্থায় জীবন কাটাবে না?

কনি অস্পষ্টভাবে উত্তর করল, আধা কুমারী! কেন, কেন নয়?

তার বাবা তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অবশ্য তুমি যদি এটা না চাও।

ক্লিফোর্ডকেও একদিন দুজনে বেড়াবার সময় একই কথা বলল কনির বাবা। বলল, আমার মনে হয় এইভাবে আধা কুমারী থাকাটা কনির পক্ষে নিশ্চয়ই শোভা পাবে না।

প্রথমে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলল, আধা কুমারী! তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে রাগে লাল হয়ে উঠল। রুষ্ট হয়ে বলল, কোন্ অর্থে এটা তার পক্ষে শোভা পাচ্ছে না?

কনির বাবা বলল, সে ত আর রোগা পটকা ছোট একটা মেয়ে নয়। হাড় শক্ত বলিষ্ঠ চেহারার সে এক স্কটদেশীয় যুবতী।

ক্লিফোর্ড বলল, সেই সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক নিশ্চয়?

এই আধা কুমারীর ব্যাপারটা সম্বন্ধে ক্লিফোর্ডও কিছু বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বলতে পারেনি। কারণ একদিকে সে যেমন কনির সঙ্গে ছিল বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ, অন্যদিকে তেমনি কোন অন্তরঙ্গতাই ছিল না তার কনির সঙ্গে। মনের দিক থেকে তারা দুজনেই পরস্পরের খুব কাছাকাছি, দুজনে দুজনের গভীরভাবে অন্তরঙ্গ, কিন্তু দেহগত সম্পর্কের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। দেহের দিক থেকে তারা ছিল পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। মনের দিক থেকে এত অন্তরঙ্গ হয়েও তাদের মধ্যে কোন দেহগত সম্পর্ক না থাকায় দেহগত আনন্দের ব্যাপারে কোন কথা তুলতে পারত না। তুলতে দারুণ একটা দ্বিধা বোধ করত তারা।

কনি এটা অনুমান করেছিল যে তার বাবা যেকথা বলতে চেয়েছেন সেকথা ক্লিফোর্ডের মনে আগেই জেগেছে। সে জানত সে আধা কুমারী থাক বা না থাক তাতে ক্লিফোর্ডের কিছু যায় আসে না, কারণ তার কুমারী-জীবনের সব কথা, তার যৌন অভিজ্ঞতার কথা সে কিছুই জানে না আর সে তা জানে না বলেই তা মিথ্যা তার কাছে।

কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে র‍্যাগবির বাড়িতে দু' বছর ধরে বাস করে আসছে। তাদের কাজ বলতে শুধু ক্লিফোর্ড আর তার লেখার কাজে মগ্ন হয়ে থাকা। কিন্তু তাদের এই মগ্নতার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি ছিল, একটা শূন্যতা ছিল। এই লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যৌথ আগ্রহের ধারাটি থেমে যায়নি কখনো। তারা এই লেখার রচনাশৈলী নিয়ে কথা বলত, তর্কবিতর্ক করত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করত শূন্যে কোথায় কি যেন একটা ঘটছে, কিন্তু সেটা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

আসলে জীবন বলতে যা বোঝায় তা বোধ হয় আছে সেই দূরান্বিত শূন্যে। তার বাইরে অর্থাৎ বাস্তবে যে জীবন তারা যাপন করে চলেছে আসলে তার কোন অস্তিত্ব নেই সেই র‍্যাগবি ঠিকই আছে, বাড়ির মধ্যে আছে ঝি চাকর। কিন্তু তারা যেন সব ভূতুড়ে মানুষ। আসলে তাদের যেন কোন অস্তিত্ব নেই। কনি প্রায়ই পার্ক ও পার্কসংলগ্ন বন দিয়ে বেড়াতে যায় এবং সে বনের নির্জনতা ও রহস্যময়তাকে উপভোগ করে। যাবার পথে হেমন্তের বাদামী ঝরা পাতা মাড়িয়ে যায়, বসন্তের গোলাপ কুড়িয়ে নেয় হাতে। কিন্তু এ সব স্বপ্নমাত্র, বাস্তবের নকল মূর্তিমাত্র। যে সব ওক পাতা ও দেখছে তা আয়নায় দেখা আসল ওক পাতার প্রতিফলনমাত্র। সে নিজেও যেন বইয়ে পড়া গোলাপ ফুল কুড়ুতে থাকা কোন নারী চরিত্রমাত্র। একটা ছায়া বা বাস্তবের কাল্পনিক প্রতিরূপমাত্র। কোন বস্তু নেই তার মধ্যে, নেই কোন প্রাণের স্পর্শ। কোন কিছুর মধ্যে কোন বস্তু নেই। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার এই জীবনযাপন, মাকড়সার মত এক অন্তহীন জাল বুনে চলা, সব সময় এক খণ্ড চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলা, আর সেই সব গল্প শুনে চলা যা স্যার ম্যাল-কম বলে গেছেন একেবারে অর্থহীন, যার মধ্যে কোন বস্তু নেই এবং যা টিকবে

না। কিন্তু কেন তার মধ্যে বস্তু থাকবে এবং কেনই বা তা টিকবে? যে জিনিস যত বেশী টেকে তার মধ্যে তত বেশী অশুভ শক্তির জন্ম হয়, তার মধ্যে সত্য তত কম থাকে। আজকের এই মুহূর্তের জন্য সত্যের প্রতিভাসটুকুই যথেষ্ট।

ক্লিফোর্ডের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, ছিল অনেক পরিচিত ব্যক্তি সে তাদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করত তার র‍্যাগবির বাড়িতে। সে সব রকম লোকদেরই নিমন্ত্রণ করত, বিশেষ করে সেই সব সমালোচক আর লেখকদের যারা তার লেখা বইয়ের প্রশংসা করবে অথবা আলোচনার দ্বারা মানুষকে তা বুঝতে সাহায্য করবে। তারা র‍্যাগবিতে নিমন্ত্রিত হওয়ার জন্য গর্ববোধ করত। তারা সত্যি সত্যিই ক্লিফোর্ডের লেখার প্রশংসা করত। কনি সব কিছু ভালভাবেই বুঝত। কিন্তু কিছু মনে করত না। 'সে ভাবত কেন তা হবে না? এই সব কিছুই ত আয়নায় প্রতিফলিত চলমান ক্রমবিলীয়মান এক জীবনধারার ছবি। সব কিছু মিথ্যা। সুতরাং এতে দোষের কি থাকতে পারে?

কনি এই সব লোকদের দেখাশোনা করত। গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাকেই আপ্যায়িত করতে হত নিমন্ত্রিতদের। ক্লিফোর্ডের অভিজাত বংশের যত সব আত্মীয় কুটুম্ব এলেও সে-ই সবার দেখাশোনা করত। তার চেহারাটা নরম রক্তিম আর গ্রাম্য বালিকার মত দেখতে। তার চোখদুটো ছিল নীল, বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল আর মেদুর কণ্ঠস্বর। তার কটিদেশ ছিল বেশ শক্ত। সেই জন্য তাকে অনেকে স্কেকেলে আর একটু বেশী মেয়েলি ভাবাপন্ন বলত। আবার ছেলেদের মত ছোট হেরিং মাছের মত ছিল না। কিন্তু তার বুকটা ছিল ছেলেদের মতই সমতল আর নিতম্ব ছিল খুবই সরু।

কনির ভাল লাগত সেই সব লোকদের যারা যৌবনকাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছে। কিন্তু সে যদি তাদের সঙ্গে ক্ষণপ্রণয়ের খেলায় মেতে ওঠে তাহলে মনে মনে কতখানি কষ্ট ও যন্ত্রণা পাবে ক্লিফোর্ড সে তা জানত বলেই সে তাদের প্রতি কোন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাত না। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন মেলামেশা ছিল না তার। সে ছিল তাদের কাছে যেমন শান্ত তেমনি নিরুত্তাপ। সে তাদের কাউকে কখনো চাইত না। তাই ক্লিফোর্ড তার স্ত্রীর জন্য গর্ব অনুভব করত।

ক্লিফোর্ডের আত্মীয়রা কনিকে একটু দয়ার চোখে দেখত কনি বুঝত, মানুষ যতক্ষণ না তোমার কাছ থেকে কোন বিষয়ে ভয় না পাবে ততক্ষণ সে তোমায় ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু এতে তার কিছুই যেত আসত না। কারণ তাদের সঙ্গে কোন নিবিড় সংস্পর্শ ছিল না। তাই সে নীরবে সব কিছু সহ্য করে তাদের বুঝিয়ে দিল তাকে দয়া করে বা ঘৃণা করে তাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না। তার সঙ্গে বিরোধিতা বা শত্রুতা করে কোন লাভ হবে না। আসলে তার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে।

কনির মনে হতে লাগল কিছুই ঘটছে না। কারণ সব কিছুর থেকেই সে ছিল সুন্দরভাবে বিচ্ছিন্ন। আসলে ক্লিফোর্ড আর কনি বেঁচে ছিল তাদের ভাবের মধ্যে, ডুবে থাকত ক্লিফোর্ডের লেখা বইএর মধ্যে। সে সবাইকে আপ্যায়ণ করে···বাড়িতে সব সময়ই লোক আসে। ঘড়ির মতই সময় এগিয়ে চলে। সাড়ে সাতটার বদলে সাড়ে আটটা বাজে।

অধ্যায় ৩

এক ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রতি ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছিল কনি। তার বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উদ্ভূত হয়ে একটা অস্থিরতা উন্মত্ততার মতই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার সমগ্র দেহমনকে। সে ইচ্ছা না করলেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তখন মুচড়ে উঠত। যখন স্থির হয়ে আরামে বসে থাকতে চাইত তখন তার মেরুদণ্ডটা কেঁপে কেঁপে উঠত। তার দেহের মধ্যে পেটের ভিতরে অকারণে একটা রোমাঞ্চ জাগত আর ঠিক তখনি তার মনে হত এই উন্মাদসুলভ অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে অবশ্যই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে হবে। অকারণে তার বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দনটা বেড়ে যেত। তার শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল।

শুধু একটা অস্থিরতা, একটা উন্মাদনা মাঝে মাঝে সে ক্লিফোর্ডকে ছেড়ে বেগে পার্কের দিকে চলে যায়, পাতাবাহার গাছের তলায় শুয়ে পড়ে। এ বাড়ি, আর এ বাড়ির সকলের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে তাকে। ঐ বনই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল, জগতের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র জায়গা।

কিন্তু আসলে জায়গাটা তার আশ্রয়স্থল হতে পারে না কারণ জায়গাটার সঙ্গে তার কোন নিবিড় যোগাযোগ নেই। আসলে এ বন এমনই একটা জায়গা যেখানে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে উঠতে পারে। বনের আত্মা বলে যদি কোন জিনিস থেকে থাকে তাহলে সে আত্মা কোনদিনই স্পর্শ করেনি।

অস্পষ্টভাবে একটা কথা জানতে পারল কনি। জানতে পারল, সে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে অস্পষ্টভাবে আরও জানাল জগতের প্রাণকেন্দ্র হতে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। ক্লিফোর্ড আর তার বইকে কেন্দ্র করে যে জগৎ সে গড়ে তুলেছে সে জগতের আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। সে জগতে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। শূন্যতার শূন্য। সে জানতে পেরেছে সব কিছু। কিন্তু কি লাভ তাতে? পাথরে মাথা ঠোকার মত এ যেন এক অর্থহীন প্রয়াস।

তার বাবা আবার তাকে সাবধান করে দিলেন। তিনি একদিন বললেন,

তুমি কেন কোন এক সুন্দর ছেলে দেখে বিয়ে করছ না কনি ? তাতে তোমার যথার্থ কল্যাণ হবে।

সেবার শীতকালে মাইকেলিস কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এল ওদের বাড়িতে। এরই মধ্যে সে তার লেখা নাটক আমেরিকায় বিক্রি করে প্রচুর টাকা করেছে। সে ছিল এক আইরিশ যুবক। অভিজাত সমাজ নিয়ে লেখা তার নাটক লণ্ডনের অভিজাত সমাজের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। পরে যখন অভিজাত সমাজের লোকেরা বুঝতে পারে এই সব নাটকে ডাবলিনের এক ভবঘুরে যুবক তাদের উপহাসের পাত্র করে তুলেছে তখন তারা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। তাদের চোখে মাইকেলিস তখন নীচতা ও ইতরতার প্রতীক। আরও দেখা গেল, সে নাকি ইংরেজবিদ্বেষী এবং যে শ্রেণীর লোকেরা এটা আবিষ্কার করল তারা মাইকেলিসের কাজটাকে জঘন্যতম অপরাধের থেকেও খারাপ কাজ বলে মনে করতে লাগল। তাই তারা মনে মনে তাকে জ্যান্ত জবাই করে তার লাশটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

এই সব কিছু সত্ত্বেও মাইকেলিস মেফেয়ারে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতে লাগল। সে বণ্ড স্ট্রীট দিয়ে চকচকে পোষাক পরে একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের মতই ঘুরে বেড়াত। পয়সা দিলে দর্জিরা ভাল পোষাক তৈরি করে দেবেই।

এই যুবকের কর্মজীবনে সবচেয়ে দুঃসময়ে ক্লিফোর্ড তাকে আমন্ত্রণ জানাল তার বাড়িতে। সব কিছু জেনে শুনেও কোন দ্বিধা করল না সে এ বিষয়ে। মাইকেলিসের কথা তখন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শুনেছে। ক্লিফোর্ড ভাবল তার এই দুঃসময়ে অভিজাত সমাজের অন্য সব লোকেরা যখন তার গলা কাটছে তখন সে তাকে আমন্ত্রণ জানালে ঠিক সে আসবে। আর মাইকেলিস নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে ক্লিফোর্ডের কাছে এই কৃতজ্ঞতার জন্য সে হয়ত তার অনেক উপকার করবে আমেরিকা গিয়ে। কোন মানুষের মধ্যে কোন পদার্থ না থাকলেও শুধু প্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ক্লিফোর্ড নবাগত। সে উদীয়মান লেখক, তবু তার প্রচার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এবং কুশলী। অবশেষে মাইকেলিস তার একটা বড় উপকার করে। একটা নাটকে সে ক্লিফোর্ডকে নায়ক হিসাবে চিত্রিত করে। ক্লিফোর্ড হঠাৎ জনপ্রিয় নায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে যখন সে দেখল আসলে তাকে উপহাসের পাত্র করে তোলা হয়েছে তখন এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার মনে।

যে জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই তার, যে জগৎ তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা, সেই বিশাল জগতের মাঝে ক্লিফোর্ডের নিজেকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলার এক অন্ধ অত্যুগ্র প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কনি। আসলে যে জগৎকে কিছুটা ভয়ের চোখে দেখে ক্লিফোর্ড, সেই জগতের সে একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসাবে নাম করতে চায়। তার বাবা বৃদ্ধ স্যার ম্যালকমের কথা থেকে কনি আগেই জেনেছিল শিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের ঢাক পিটিয়ে

নিজেদের মাল চালাবার জন্য বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে বাবা কথাটা বলেছিল সেই সব শিল্পীদের সূত্র ধরে যারা নিজেদের ছবি নিজেরাই বিক্রি করে বেড়াত। এদিকে ক্লিফোর্ড আত্মপ্রচারের এক অভিনব ফন্দি খুঁজে পায়। সব রকমের উপায়ই পেয়ে যায় সে। নিজেকে কারো কাছে ছোট না করে তার র‍্যাগবির বাড়িতে সব রকমের লোককেই আমন্ত্রণ জানাত সে। আসলে নামযশ বা আত্মখ্যাতির এক বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে সে আর এজন্য হাতের কাছে যে ভাঙ্গা পাথরটা পেত তাকেই কাজে লাগাত।

যথাসময়ে মাইকেলিস এসে হাজির হলো। সে এল একটি চকচকে গাড়িতে করে, একজন চালক আর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। সে যেন খাঁটি বণ্ড স্ট্রীটের লোক। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ডের গ্রাম্য ভাবাপন্ন অন্তরে কেমন যেন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তার মনে হলো মাইকেলিসকে বাইরে যেমনটি দেখাচ্ছে আসলে সে যেন ঠিক তা নয়, ···মোটেই তা নয়। তবু লোকটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করল ক্লিফোর্ড, তার বিস্ময়কর সাফল্যকে সহজ-ভাবে মেনে নিল। সাফল্যের যে গর্জনশীলা কুহুরীদেবী আধা-বিনীত ও আধা-দুর্বিনীত ক্লিফোর্ডের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল, সে দেবীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। কারণ সে নিজেও নিজেকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছিল সে দেবীর কাছে। কারণ সে দেবী চাইলে সেও সাফল্য লাভ করবে।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে দামী পোষাক, টুপী, জুতো প্রভৃতি কিনে পরলেও এবং সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে চুল দাড়ি ছাঁটা সত্ত্বেও সে পুরোপুরি ইংরেজ হয়ে উঠতে পারেনি। তাকে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় সে ইংরেজ নয়। তার গোলগাল ম্লান মুখখানার ভাব দেখলেই বোঝা যায় কোথায় যেন একটা গলদ আছে। বোঝা যায় কার বিরুদ্ধে তার যেন একটা বিদ্বেষ আছে, কার বিরুদ্ধে তার যেন একটা অভিযোগ আছে। এ ভাব যে কোন সত্যিকারের ইংরেজের থাকে। কিন্তু সে তার হাবভাব বা আচরণে কখনো সেটা প্রকাশ করে না। তাকে দেখে বোঝা যায় সে অনেক ঘা খেয়েছে, অনেক পদাঘাত সে সহ্য করেছে, তাই চোখে আহত পশুর ত্রস্ত ভাব। সে তার বুদ্ধি আর দক্ষতার দ্বারা নাটক লিখে সাফল্য অর্জন করে জনগণের হৃদয় জয় করে। আজ তাই মাইকেলিস ভাবে তার অপমানের দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক তা হয়নি। মাইকেলিস এখন ইংরেজ অভিজাত সমাজে উঠতে চাইছে। অথচ এই অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই একদিন তাকে পদাঘাত করে। তারা তার দুঃখে মজা দেখে। আজ তাই সে তাদের ঘৃণা করে। আজ সে তাদের সমাজে উঠে তাদের দেখিয়ে দিতে চায়।

তবু ডাবলিনের এই খচ্চরটা তার চকচকে গাড়ি আর তার চাকর সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মাইকেলিসের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা কনি পছন্দ করত। সে কোন বিষয়ে কোন ভাণ করত না। কোন কপটতা ছিল না তার মধ্যে ক্লিফোর্ড তার কাছে যা যা জানতে চাইত সেই সেই বিষয়ে সে সংক্ষেপে সুন্দর ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলত সে বেশী কথা বলত না। অথবা আবেগে বিচলিত হত না। সে জানত র‍্যাগবিতে তাকে কোন্ কাজের জন্য ডাকা হয়েছে। সেও তাই সুচতুর বড় ব্যবসায়ীর মত সব প্রশ্ন চুপ করে ধৈর্য ধরে শুনে যথাসম্ভব অল্প কথায় কোন আবেগানুভূতির অপচয় না করেই উত্তর দেয়।

সে বলল, টাকা! টাকা এক ধরনের প্রবৃত্তি। টাকা রোজগার করা, টাকা সঞ্চয় করা মানুষের স্বভাবের একটা ধর্ম। আসলে এর মধ্যে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। তোমার স্বভাবের বশেই তুমি টাকা রোজগার করে যাবে একবার শুরু করলেই হলো। আপনা থেকে তুমি টাকা সঞ্চয় করে যাবে। তারপর একটা সীমায় গিয়ে থেমে যাবে।

ক্লিফোর্ড বলল, আপনি ত শুরু করেছেন সবেমাত্র।

হ্যাঁ ঠিক তাই। একবার শুরু করলে আর রক্ষে নেই। তখন আর কোন কাজ করতে পারবেন না।

ক্লিফোর্ড প্রশ্ন করল, আচ্ছা, নাটক ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা কি আপনি টাকা রোজগার করতে পারতেন?

সম্ভবতঃ তা নয়। আমি ভাল লেখক হিসাবে ভাল বা মন্দ যাই হতাম, তাতে কিছু যেত আসত না। আমি লেখক এবং নাট্যকার বলেই এই টাকা রোজগার সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

কনি বলল, আপনি কি মনে করেন লোকে যে ধরনের নাটক চায় সেই ধরনের নাটক লিখতে হবে?

ঠিক তাই। কনির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে উত্তর দিল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, তবে কি জানেন? জনপ্রিয়তার কোন দাম নেই। কিছুই নেই জনপ্রিয়তার মধ্যে। আমি আমার নাটকগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কিছুই করিনি। জনপ্রিয়তা ব্যাপারটাই বড় ক্ষণভঙ্গুর। ঠিক আবহাওয়ার মত। কখন কোন্ দিকে মোড় ফিরবে কেউ জানে না

এক অপরিসীম মোহমুক্তির স্বচ্ছ গভীরতায় স্থির দুচোখের পূর্ণায়ত দৃষ্টি কনির উপর এমনভাবে ফেলল মাইকেলিস যে কনির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল সহসা। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার অসুখ হয়েছে। শিলা-ভূগর্ভনিহিত বিভিন্ন স্তরের মত মোহমুক্তির যে সব স্তর আছে তার জীবনে তার গভীরে ঢুকে গেছে সে। তার জীবনের যত কিছু অভিজ্ঞতা এই মোহমুক্তির শিলাস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার উপর সে শিশুর মত একা। সে যেন সমাজচ্যুত। কিন্তু তার এই ইন্দ্রিয়সুলভ অস্তিত্বের মাঝে তার একটা বেপরোয়া ভাব আছে। আছে অপরিসীম সাহস।

ক্লিফোর্ড কি ভাবতে ভাবতে বলল, অন্ততঃ আপনি এই বয়সে যা করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

হঠাৎ এক অদ্ভুত হাসি হেসে মাইকেলিস বলে উঠল, হ্যাঁ আমার বয়স তিরিশ।

মাইকেলিস হাসছিল, কিন্তু হাসিটার মধ্যে জয়ের একটা গর্ব থাকলেও সে হাসি ছিল যেমন অসার তেমনি তিক্ত।

কনি প্রশ্ন করল, আপনি কি একা?

মাইকেলিস বলল, কি বলছেন আপনি? আমি একা বাস করি? আমার চাকর আছে। সে বলে জাতিতে গ্রীক। কিন্তু আসলে সে অপদার্থ। তবু আমি তাকে রেখেছি। আমি বিয়ে করতে চলেছি। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।

কনি এবার জোর হেসে উঠল। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি টনসিল অপারেশন করতে চলেছেন বিয়ে করবেন ত আবার চেষ্টার কি আছে?

কনির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল মাইকেলিস। বলল, বিশ্বাস করুন লেডি চ্যাটার্লি, যেমন করে হোক আমি একটা মেয়ে খুঁজে পাবই। তবে আমি কোন ইংরেজ বা আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করতে পারব বলে মনে হয় না।

ক্লিফোর্ড বলল, তাহলে এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করুন।

আগের মতই এক অসার হাসি হেসে মাইকেলিস বলল, আমেরিকান? না না। আমি আমার লোকটিকে বলে দিয়েছি একজন তুর্কী বা প্রাচ্যদেশীয় মেয়ে খোঁজার জন্য।

এক অসাধারণ সাফল্যে সমৃদ্ধ এই অদ্ভুত মানুষটাকে দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেত কনি। লোকে বলত শুধু আমেরিকা থেকেই সে নাকি বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পায়। মাঝে মাঝে পাশ থেকে বা নিচের থেকে আলোটা যখন তার উপর লম্বভাবে পড়ে তখন তাকে খুব সুন্দর দেখায়। তার খোদাই করা মুখ, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল, বড় বড় চোখের পূর্ণায়ত দৃষ্টি—সব মিলিয়ে তাকে সুন্দর দেখায়। তার ঠোঁটচাপা মুখের মধ্যে আছে এক যুগ হতে যুগান্তের গতিহীন অন্তহীন এক স্তব্ধতা। এই অবিচল স্তব্ধতা মুখের উপর ফুটিয়ে তোলার জন্য বুদ্ধ কত সাধনা করেছিলেন এবং নিগ্রোরা বিনা চেষ্টাতেই তা পেরেছিল। এই ভাব হচ্ছে জাতিগত ব্যক্তিগত প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই জাতিগত ভাবটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অকস্মাৎ তার জন্য এক সহানুভূতি অনুভব করল কনি, সহানুভূতির সঙ্গে মিশে ছিল এক ঘৃণা, আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকর্ষণের ভাব। আবার এই মিশ্র অনুভূতি ধীরে ধীরে পরিণত হলো প্রেমে। কিন্তু সে বাইরের লোক। লোকে তাকে বলে ইতর। কিন্তু তার থেকে ক্লিফোর্ড কত ইতর, প্রভুত্বমূলক তাছাড়া কত নির্বোধ।

মাইকেলিসও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কনির উপরে সে এই ক'দিনেই একটা রেখাপাত করেছে। সে তার বিস্ফারিত চোখের আরও উজ্জ্বল ও অনাসক্ত দৃষ্টি কনির উপর নিবদ্ধ করে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তার মনের উপর কতখানি প্রভাব সে বিস্তার করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সে বুঝল, ইংরেজদের সঙ্গে যত মেলামেশাই করো তারা পরকে আপন করে নিতে পারে না, ভালবাসাবাসি সত্ত্বেও তাদের কাছে বাইরের লোক হিসাবেই থাকতে হয়। তাকেও তাই থাকতে হবে। তবু মেয়েদের মন মানে না। এই বাইরের লোককেই মাঝে মাঝে ভালবাসে তারা। ইংরেজ মহিলারাও তাই করে।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার আসল সম্পর্কটা কি তা সে জানত। তারা যেন দুটি বিক্ষুব্ধ কুকুর, একে অন্যের প্রতি গর্জনে ফেটে পড়তে চাইত। আবার তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে জোর করে দেঁতো হাসি হাসত একে অন্যকে দেখে। কিন্তু মেয়েদের কাছে সে এই মনের জোর খুঁজে পেত না।

শোবার ঘরেই সবাইকে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হত। দুপুরের খাওয়ার সময় ছাড়া ক্লিফোর্ড খাবার ঘরে আসত না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাই কেমন যেন নীরস ও নিরানন্দ দেখাত খাবার ঘরটাকে। কফি খাওয়ার পর মাইকেলিস আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। অথচ ভেবে পেল না সে কি করবে। সেদিন ছিল নভেম্বরের কোন এক উজ্জ্বল দিন। র‍্যাগবিকে এই সব দিনে ভালই দেখায়। সহসা বিষণ্ণ নির্জন পার্কটার পানে একবার তাকাল মাইকেলিস। কী চমৎকার জায়গা!

সে একবার তার চাকরকে লেডি চ্যাটার্লির কাছে পাঠাল। জানতে চাইল তার কোন প্রয়োজন আছে কি না। তার ইচ্ছা ছিল সে শেফিল্ড যাবে গাড়িতে করে বেড়াতে। খবর এল, সে একবার লেডি চ্যাটার্লির বসার ঘরে গেলে ভাল হয়।

কনির বসার ঘরটা চারতলায়। এইটাই হচ্ছে এ বাড়ির শেষ তলা। ক্লিফোর্ডের ঘরগুলো একতলায়। লেডি চ্যাটার্লির চারতলার ঘরে মাইকেলিসের ডাক পড়ায় তার গর্ববোধ হচ্ছিল সে চাকরের পিছু পিছু অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল। তার আশেপাশে কোন দিকে একবার তাকালও না। কনির বসার ঘরে বেনোয়ার আর সেজানির ছুটো ছবি দেখল।

মাইকেলিস তার মুখে অদ্ভুত এক কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলল, এ জায়গাটা ত চমৎকার! আপনি এই উপরতলাটা বেছে নিয়ে খুব ভাল করেছেন।

কনি বলল, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সারা বাড়িটার মধ্যে একমাত্র এই ঘরটাই আধুনিক আসবাবপত্র ও আনন্দের আধুনিক উপকরণে সজ্জিত। সারা র‍্যাগবির মধ্যে এইখানেই কনির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত। ক্লিফোর্ড এ সব কোন

দিন দেখেনি এবং এখানে কাউকে বড় একটা ডাকে না কনি।

ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের দুধারে কনি আর মাইকেলিস বসে কথা বলতে লাগল দুজনে। কনি মাইকেলিসকে তার বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। তার বাবা, মা ও ভাই-এর কথা। বাইরের যে কোন লোক, ভিন্ন শ্রেণীর যে কোন লোক এক পরম বিস্ময়ের বস্তু তার কাছে। কিন্তু যখনি এই ধরনের কারো প্রতি তার সহানুভূতি জাগত তখনি সে শ্রেণীগত সব পার্থক্য ভুলে যেত। সরলভাবে কোন ভাণ না করে সব কথা বলল মাইকেলিস। সঙ্গে সঙ্গে তার উদাসীন ভবঘুরে আত্মার কথাটাও তুলে ধরল সে। তারপর এক অজানিত সাফল্যে প্রতিশোধাত্মক এক গর্বের হাসি হাসল সে।

কনি এক সময় জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি এমন নিঃসঙ্গ পাখির মত ঘুরে বেড়ান কেন?

মাইকেলিস আবার তার পানে তেমনি তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে তাকাল। সে বলল, কোন কোন পাখি এমনি নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে।

তারপর সাধারণ রসিকতার সুরে বলল, কিন্তু আপনার খবর কি? আপনি নিজেও কি এক নিঃসঙ্গ পাখির মতই ঘুরে বেড়াচ্ছেন না?

কথাটা শুনে কিছুটা চমকে উঠল কনি। একটু ভেবে বলল, কিছুটা, আপনার মত পুরোটা নিঃসঙ্গ নই।

মাইকেলিস একটু নীরস হাসি হেসে বলল, আমি কি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ?

তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টির মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় বিষাদ না ঔদাসীন্য, না মোহমুক্তি, না ভয় কি আছে তা কিছুই বোঝা যায় না।

তার পানে শ্বাসরুদ্ধভাবে তাকিয়ে কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, কেন, আপনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নন?

কনি অনুভব করল মাইকেলিসের কাছ থেকে একটা তীব্র আবেদন এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে আর সেই আবেদনের আঘাতে সে তার সত্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

আপনি ঠিকই বলেছেন। কথাটা বলেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কনির পানে পাশ থেকে অপাঙ্গে তাকাতে লাগল মাইকেলিস। তার স্থির দৃষ্টির মধ্যে এমন এক অকপট স্তব্ধতা ছিল যা আজকাল দেখা যায় না। আর তা দেখে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলল কনি। তার কেবলি মনে হতে লাগল মাইকেলিস যেন তার স্থিরনিবদ্ধ এই দৃষ্টি তার উপর থেকে কখনো ফিরিয়ে না নেয়।

এবার মাইকেলিস তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে কনির পানে তাকিয়ে তার ভিতরে সব কিছু যেন দেখে নিল। তার সত্তার গভীরের সব কিছু বুঝে নিল। হঠাৎ কনির বুকের মধ্যে একটা শিশু কেঁদে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মাইকেলিস বলল, আপনি যে আমার কথা ভাবেন এটা ভাবতে আমার ভয়ঙ্করভাবে ভাল লাগে।

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে কোন রকমে কনি বলল, কেন ভাবব না আপনার কথা?

মাইকেলিস একটুখানি হাসির শব্দ করে বলল, আচ্ছা, আমি কি আপনার হাতটা মিনিট খানেকের জন্য ধরতে পারি?

কনির উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল মাইকেলিস। তার মদির দৃষ্টির মধ্যে এমনই এক মায়াময় আবেদন ছিল যা সোজা কনির পেটের ভিতরে গিয়ে আঘাত করল।

কোন কথা না বলে কনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল মাইকেলিসের পানে হঠাৎ মাইকেলিস উঠে গিয়ে কনির পায়ের তলায় বসে তার পা দুটো দু হাতে ধরে তার পা দুটোর মধ্যে মুখটা মাথাটা রেখে স্থির হয়ে বসে রইল কনি তার বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে মাইকেলিসের ঘাড়ের উপরটা দেখতে লাগল আর মাইকেলিস তার মুখটা কনির জাঙ্ঘদুটোর উপর ঘষতে লাগল। কনির কেমন ভয় হচ্ছিল। একটা জ্বালা-জ্বালা ভয়ের সঙ্গে কনি মাইকেলিসের ঘাড়ের উপর হাত বোলাতে লাগল। কনির হাতের স্পর্শে মাইকেলিস কেঁপে উঠল।

মাইকেলিস এবার মুখ তুলে তাকাল কনির মুখ পানে। তার উজ্জ্বল চোখের সে দৃষ্টির মধ্যে এমন এক ভয়ঙ্কর আবেদন ছিল যা কোনমতেই আগ্রহ করতে পারছিল না কনি। তার অন্তরের গভীর থেকে একটা ব্যাকুল কামনা উৎসারিত হয়ে মাইকেলিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল। তার মনে হলো সে এই মুহূর্তে তার সব কিছু দিয়ে দিতে পারবে মাইকেলিসকে।

প্রেমিক হিসাবে মাইকেলিস বড় শান্ত, বড় ভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে সে বড় মার্জিত। এক অদম্য কামনার উত্তাপে বুকটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল যখন ঠিক তখনি এক নিগূঢ় অনাসক্তি পিছন থেকে টেনে ধরে অবদমিত করে রেখেছিল সে কামনাকে। সে কামনার প্রবলতায় একেবারে অন্ধ বা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েনি সে। তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিটি শব্দের প্রতি সে ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

কনি তখন নিজেকে মাইকেলিসের কাছে বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। এদিকে অবশেষে সমস্ত কম্পন থেমে গেল মাইকেলিসের। সে স্থিরভাবে মাথাটা কনির হাঁটুর উপর রাখল। কনি তখন তার হাতের আঙুলগুলো দিয়ে তার কোলের উপর রাখা মাইকেলিসের মাথাটার উপর হাত বোলাতে লাগল।

মাইকেলিস উঠে কনির হাতদুটো চুম্বন করল। তারপর তার উপর ঝুঁকে পড়ে তার চটিপরা পাদুটোও চুম্বন করে ঘরের একপাশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কনির দিকে পিছন ফিরে তাকাল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মাইকেলিস কনির কাছে ফিরে এল।

কনি আগুনের পাশে তখনো সেইভাবেই বসেছিল।

শান্ত কণ্ঠে মাইকেলিস বলল, এবার থেকে আপনি নিশ্চয় ঘৃণা করবেন আমাকে?

কনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কেন ঘৃণা করব?

মাইকেলিস বলল, মেয়েরা সাধারণতঃ তাই করে। বেশীর ভাগ মেয়েই তাই করে

কনি গম্ভীরভাবে কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল, আমি কখনই আপনাকে ঘৃণা করব না।

কণ্ঠটা করুণ করে মাইকেলিস বলল, আমি জানি তাই হবে। তবু ভীষণ ভাবে ভয় লাগছে আমার।

কিন্তু মাইকেলিসের দুঃখের কারণটা কোথায় কনি তা বুঝতে পারল না সে সহজভাবে বলল, আপনি আর বলবেন না?

মাইকেলিস দরজার পানে তাকাল। সে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড···তিনি রাগ করবেন না ত?

কনি তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ক্লিফোর্ডকে এসব কথা জানাতে চাই না। সে জানলে ব্যথা পাবে। কিন্তু এতে কোন অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি কি মনে করেন?

মাইকেলিস বলল, অন্যায়! হা ভগবান, অন্যায় কিসের? আপনাকে আমার দারুণ ভাল লাগছে।···আমি আর থাকতে পারছি না।

মাইকেলিস ঘুরে দাঁড়ালে কনি দেখল তার চোখদুটো ছলছল করছে। একটু পরেই সে হয়ত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ডকে জানাবার কোন দরকার নেই! জানলে সে খুব দুঃখ পাবে। না জানলে কোন সন্দেহও করবে না আর কোন ব্যথাও পাবে না।

মাইকেলিস হেসে বলল, আমার কাছ থেকে উনি কিছুই জানতে পারবেন না। আমি কখনো নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দেব না।

এ ধরনের ধারণাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল সে। তার পানে তাকিয়ে তার রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। মাইকেলিস এবার বলল, আমি কি আপনার হাতদুটো একবার চুম্বন করে চলে যেতে পারি? আমি একবার শেফিল্ড যাব। সেখানে গিয়েই লাঞ্চ খাব। তারপর চা খাবার সময় ফিরে আসব। আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি? আপনি যে আমাকে ঘৃণা করেন না এবং কোনদিন ঘৃণা করবেন না এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি ত?

কথাটার মধ্যে কেমন একটা সকরুণ হতাশার সুর ছিল।

কনি বলল, না, আমি আপনাকে ঘৃণা করি না। আমার মতে আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক।

উৎসাহিত হয়ে মাইকেলিস বলল, ভালবাসার কথার থেকে এ কথাটা আমার

কাছে অনেক দামী।···বিকালের আগে আর আমাদের মধ্যে দেখা হবে না। এর মধ্যে আমি অনেক কিছু ভাবতে পারব।

এই কথা বলে কনির হাতদুটো চুম্বন করে চলে গেল মাইকেলিস।

লাঞ্চ খাবার সময় ক্লিফোর্ড বলল, ছোকরাটাকে আর আমার ভাল লাগছে না। আমি ওকে সহ্য করতে পারব বলে মনে হয় না।

কনি বলল, কেন?

ক্লিফোর্ড বলল, লোকটা ভদ্র আচরণের অন্তরালে একটা ইতর ছাড়া কিছুই নয়।···আমাদের ঠকাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

কনি বলল, লোকে অন্যায়ভাবে অনেক বাজে কথা বলে ওঁর সম্বন্ধে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি এতে আশ্চর্য হচ্ছ? তুমি কি মনে করো ও সময় নষ্ট করে পরের উপকার করে যাচ্ছে?

আমার মনে হয় এক ধরনের উদারতা ওর মধ্যে আছে।

উদারতা, কার প্রতি?

আমি তা ঠিক জানি না।

না জানাটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় কুণ্ঠা বা দ্বিধাহীনতাটাকে উদারতা ভাবছ।

কনি থামল। সে কি সত্যিই তাই ভাবে? তা হতেও পারে। তবু মাইকেলিসের এই দ্বিধাহীনতাটার একটা মোহময় আবেদন আছে। ক্লিফোর্ড যেখানে ভীরুতার সঙ্গে কয়েক পা গেছে মাইকেলিস সেখানে সারা জগৎটাকে জয় করেছে। এই জগৎ ক্লিফোর্ড জয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। এই জয়ের জন্য মাইকেলিস যে পথ যে উপায় অবলম্বন করে তা কি ক্লিফোর্ডের পথের থেকে বেশী ঘৃণ্য? এই বহিরাগত যুবকটি পিছনের দরজা দিয়ে যে পথ অবলম্বন করেছে সে পথ কি ক্লিফোর্ডের জয়ঢাক নিনাদিত আত্মপ্রচারের পথের থেকে খারাপ? হাজার হাজার যে সব পথকুকুর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় স্তুতিগান করতে করতে সাফল্যের কুকুরী দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের মধ্যে যে প্রথম সে দেবীকে ধরতে পারে সে-ই হচ্ছে আসল কুকুর। মাইকেলিস ঠিক তাই। তাই সে তার লেজ সগর্বে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে তা করে না। বৈকালিক চা-পানের সময় সে ঠিক এসে গেল। সঙ্গে নিয়ে এল একমুঠো ভায়োলেট আর পদ্ম ফুল। মুখে সেই প্যানপেনে কথা। কনির মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাইকেলিসের কথা বলার এই ভঙ্গিমা প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করার এক ছলনাময় মুখোসমাত্র। সত্যিই কি সে এক দুঃখী কুকুর?

সারাটা সন্ধ্যা ধরে এক দুঃখী কুকুরের মতই তার নিস্তেজ নিরুত্তাপ অন্তরের যত সব কথা বলে চলল মাইকেলিস। আর ক্লিফোর্ড ভাবল এসব কথা অহঙ্কারের এবং এ সব কথার মধ্যে এক আক্রমণাত্মক মনোভাব গোপনে লুকিয়ে

আছে। কনি কিন্তু তা ভাবে না, কারণ এ সব কথার মধ্যে নারীজাতির প্রতি কোন আক্রমণ নেই। আক্রমণ যেটুকু আছে তা হলো পুরুষদের দুঃসাহসিকতা আর উদ্ধত অসঙ্গত কল্পনার প্রতি। এক অজ্ঞেয় অন্তর্নিহিত আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্যই মাইকেলিসের উপর সব পুরুষরাই চটে যায়। বাইরে যতই সে ভালমানুষি দেখাক তার সামান্য উপস্থিতির মধ্যেই একটা আক্রমণের ভাব আছে।

কনি মাইকেলিসের প্রেমে পড়ে গেছে। তবু সে একমনে সেলাইএর কাজ করে চলেছিল। আর ওরা দুজনে কথা বলতে লাগল। ওদের কথায় সে যোগদান না করলেও সে চলে গেল না সেখান থেকে। এদিকে মাইকেলিস গতকালকার সন্ধ্যার মতই সমানভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে রইল। হয়ে রইল একই সঙ্গে সমান মনোযোগী আর উদাসীন। তার গৃহস্বামীদের সঙ্গে প্রয়োজনমত অল্প দু চারটে কথা বললেও আসলে তাদের কাছ থেকে মনে মনে অনেক দূরে রয়ে গেল। একটি বারের জন্যও কাছে এল না। কনির মনে হলো মাইকেলিস হয়ত আজকের সকালের সেই ঘটনার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সত্যিই সে ভুলে যায়নি। সে জানে আসলে সে কোথায়···তার প্রকৃত অবস্থা কি সে জানে আসলে সে জন্মগতভাবে বিদেশী। বিদেশীরা যেখানে থাকে সে সেখানেই আছে বা থাকবে। তাই সে কনির ভালবাসাবাসির ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। এই সব ভালবাসাবাসি তার মত এক প্রভুহীন মালিকানাহীন পথকুক্কুরকে তার গলদেশে সোনার শিকল থাকা সত্ত্বেও উঁচু সমাজের এক গৃহস্থ কুক্কুরে পরিণত করতে পারবে না।

মোট কথা হলো এই যে আসলে অন্তরের দিক থেকে মাইকেলিস একজন বিদেশীই ছিল। মনেপ্রাণে একজন বিদেশী এবং অসামাজিক। বাইরে সে কেতাদুরস্ত বণ্ড স্ট্রীটের লোকের মত দেখতে হলেও অন্তরের দিক থেকে সে একজন বিদেশীই রয়ে গিয়েছিল। বাইরে সমাজের ভদ্র ও ধুরন্ধর লোকদের মেলামেশার যেমন একটা প্রয়োজন ছিল তার তেমনি অন্তরের দিক থেকে এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতারও তার একটা প্রয়োজন ছিল।

তবে সাময়িক এক আধটু ভালবাসাবাসি বেশ কিছুটা সান্ত্বনার বস্তু তার কাছে। সেটা এমন কিছু খারাপ লাগত না তার; বরং সে এর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল কনির প্রতি। কনি তার প্রতি স্বতস্ফূর্ত ও অশ্রুসিক্তপ্রায় যে করুণা দেখিয়েছে তার জন্য এক উত্তপ্ত ও মর্মস্পর্শী আবেগে ফেটে পড়ছিল সে তার আপাতমলিন, আপাতকঠোর ও মোহমুক্ত মুখমণ্ডলের অন্তরালে তার শিশু-সুলভ আত্মাটা এই নারীর জন্য কৃতজ্ঞতায় কাঁদছিল। নিঃসঙ্গ সে আত্মা এক জ্বলন্ত সঙ্গপিপাসায় কাছে আসতে চাইছিল তার। কারণ সে জানত সে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

হলঘরে বাতি জ্বালবার সময় কনির সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে,

গেল মাইকেলিস। বলল, আসতে পারি?

কনি বলল, আমি আপনার কাছে যাচ্ছি।

খুব ভাল।

মাইকেলিস অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল···অবশেষে অবশ্য সে এল।

মাইকেলিস এমনই একজন প্রেমিক, দেহসংসর্গের সময় যার চরম উত্তেজনার কম্পমান ক্ষণ আসে আর তাড়াতাড়ি চলে যায়। তার উলঙ্গ দেহটার মাঝে কেমন যেন এক শিশুসুলভ অসহায়তার ভাব আছে। অবশ্য রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তার কিছু কলা-কৌশল ও চাতুর্য জানা আছে। কিন্তু সে কৌশল ও চাতুর্যের ভূমিকা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার উলঙ্গতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। চরম পুলকলাভের আগে সে তখন তার শিথিল ও অশক্ত পুরুষাঙ্গটি নিয়ে অসহায় ও অর্থহীনভাবে লড়াই করে যেতে থাকে।

এইভাবে সে কনির মধ্যে একই সঙ্গে তার প্রতি এক করুণা আর এক দুর্বার দেহগত কামনা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু সে কামনা সে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। রতিক্রিয়ার সময় তার কাজ শুরু হতে না হতে তার সব উদ্যম ও উত্তেজনা ফুরিয়ে যায়। সে তখন কনির বুকের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। কিছু পরে সে যখন তার কিছুটা শক্তি ফিরে পায়, আবার একটা তৎপরতার ভাব দেখায় তখন কনি হতাশ হয়ে পড়ে আছে।

পরে ব্যাপারটা শিখে নিল কনি। মাইকেলিসের উত্তেজনা স্তিমিত বা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কনি তাকে জড়িয়ে ধরে নিজে তৎপর হয়ে তার পুরুষাঙ্গটি নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে মেতে উঠত এক বিপরীত রতিক্রিয়ার আশ্চর্য আবেগে। তখন মাইকেলিসও হঠাৎ আশ্চর্যভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। মাইকেলিস যখন দেখল তার শক্ত, উত্থিত অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষাঙ্গটি নিয়ে কনি তার পূর্ণ দেহতৃপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তখন সে এক অদ্ভুত গর্ব আর তৃপ্তি অনুভব করত।

এক কম্পিত পুলকাবেগে কনি ফিস ফিস করে বলল, আঃ কী আরাম! এই বলে সে মাইকেলিসকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। মাইকেলিস তখন মনে মনে একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা গর্বও বোধ করত।

সেবার মাইকেলিস মাত্র তিন দিন ছিল ওদের বাড়িতে। কিন্তু এই তিন দিনের শেষেও সে প্রথম দিনের মত পরবাসী রয়ে যায় তাদের দুজনের কাছেই। তাদের অন্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে বহিরাগত অতিথির মতই চলে যায়।

চলে যাওয়ার পর কনিকে প্রায়ই চিঠি লিখত মাইকেলিস। কিন্তু সে চিঠির মধ্যে থাকত এক সকরুণ বিষণ্ণতার সুর। থাকত বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কামগন্ধহীন ভালবাসার সুর। দূরত্বের ব্যবধানজনিত এক হতাশার সুর ফুটে উঠত সে ভালবাসার মধ্যে। আসলে মাইকেলিস যেন মনেপ্রাণে হতাশাটাকে পছন্দ করত। সে যেন আশাকে ঘৃণার চোখে দেখত। কোন কিছু কাম্যবস্তুর

প্রাপ্তির কোন আশাকেই পছন্দ করত না সে

কনি কোনদিন ঠিকমত বুঝতে পারেনি মাইকেলিসকে। তবু সে তার নিজের মত করে ভালবাসতে থাকে। তবু ঠিক সময় মাইকেলিসের সেই সর্বগ্রাসী হতাশার একটা আশ্চর্য প্রতিফলন অনুভব করে তার অন্তরে। কিন্তু এই হতাশার মধ্যে ঠিকমত ভালবাসতে পারে না সে। আর মাইকেলিস মনেপ্রাণে বরাবর হতাশ থেকে যাওয়ায় একেবারেই ভালবাসতে পারে না।

এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল। তারা দুজনেই দুজনকে চিঠি দিত মাঝে মাঝে। আবার লণ্ডনে মাঝে মাঝে তাদের দেখা হত। তাদের দেহসংসর্গও ঘটত। কনি আগের মতই চাইত যৌনতৃপ্তির এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। মাইকেলিসের অপেক্ষাকৃত ছোট উত্থিত জননাঙ্গটিকে নিয়ে নিজের মত করে তেমনিভাবে মেতে উঠত এক বিপরীত রতিক্রিয়ায়। আর মাইকেলিসও এইভাবে নিজের দেহটাকে সঁপে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকত। তাদের সম্পর্কটাকে বজায় রাখার পক্ষে এই মিলনই ছিল যথেষ্ট।

এই ধরনের মিলনের মধ্য দিয়ে এক সূক্ষ্ম অন্ধ অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠল কনির মনে। আপন জৈবশক্তির প্রতি এই অন্ধ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা বিষাদের সুর থাকলেও তাতে আনন্দ পেত কনি। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত সে।

র‍্যাগবিতে ফিরেই ভীষণভাবে মত্ত হয়ে উঠত কনি সে আনন্দের উচ্ছলতায়। তার সেই তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভব ক্লিফোর্ডের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিত বিভিন্নভাবে, যার ফলে ক্লিফোর্ডও সেই কৃত্রিম আনন্দের উচ্ছ্বাসে কিছু ভাল লেখা লিখে ফেলত। এইভাবে জঠরাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট মাইকেলিসের নিষ্ক্রিয় জননাঙ্গের উত্থিত দৃঢ়তায় যে যৌনতৃপ্তি লাভ করত কনি সে তৃপ্তির ফসল অন্ধের মত অজানিতে ভোগ করে যেত ক্লিফোর্ড। সে অবশ্য এর কিছুই জানত না। জানলে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দিত না কনিকে।

তবু যখন সেই আনন্দ আর তৃপ্তির আস্বাদে ধন্য দিনগুলি একেবারে হারিয়ে ফেলল কনি, যখন সে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হয়ে থাকত সময় সময় তখন ক্লিফোর্ড সেই দিনগুলোকেই ফিরে পেতে চাইল ব্যাকুলভাবে। যদি সে এর রহস্যময় কারণটা জানত তাহলে ক্লিফোর্ড হয়ত কনি ও মাইকেলিসকে এক সঙ্গে এক বাড়িতেই রেখে দিত।

অধ্যায় ৪

মিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কখন অবনতি ঘটে বা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ নিয়ে আশঙ্কার অন্ত ছিল না কনির মনে। লোকে মাইকেলিসকে সংক্ষেপে

মিক বলে ডাকত। কিন্তু এ নিয়ে আর কারো কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। ক্লিফোর্ড তার কাছ থেকে চাইত সেই প্রাণ-মাতানো আনন্দের উচ্ছ্বাস, সেই উদ্দাম প্রাণোচ্ছলতা। কিন্তু কনি চাইত এক শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষের সঙ্গসুখ যা ক্লিফোর্ড তাকে দিতে পারত না। মাঝে মাঝে মিকের কথাটা মনে পড়ত তার। একটা ভীষণ কম্পন অনুভব করত সারা অঙ্গে। কিন্তু অনেক আগে হতেই এ বিষয়ে একটা ভয় ছিল তার মনে। ভয় ছিল মিকের সঙ্গে তার এ সম্পর্ক টিকবে না। মিক সে মানুষ নয়, সে এ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে না। এটা তার স্বভাব। কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে না উঠতে তা ভেঙ্গে দেওয়ার একটা প্রবণতা তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আসলে সে মুক্তি চায়, নিঃসঙ্গ পথকুক্কুরের সেই অবাধ মুক্তি। এটা তার জীবনের যেন এক জৈবিক প্রয়োজন। অথচ সে বাইরে বলে বেড়াত কনিই তাকে ত্যাগ করেছে।

এ জগৎ কত সম্ভাবনায় ভরা, কিন্তু কিছু লোকের কাছে এ জগৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমুদ্রে অনেক ভাল মাছ আছে ঠিক। কিন্তু বেশীর ভাগ মাছই ম্যাকারীণ অথবা হেরিং। সুতরাং ভাল মাছ ধরা শক্ত।

ক্লিফোর্ড এবার যশ আর অর্থ দুটোই বেশ পাচ্ছিল; তাকে অনেকে দেখতে আসত। র‍্যাগবিতে অতিথির অভাব ছিল না। কিন্তু সমুদ্রের হেরিং অথবা ম্যাকারীণ মাছের মতই অতি সাধারণ তারা। কখনো কখনো দু-একটা ভাল মাছের দেখা পাওয়া যেত।

কিছু লোক বেশ কিছুদিন থেকে যেত। তাদের বেশীর ভাগ ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেছে। এদের মধ্যে ছিল টমি ডিউক, সেনাবিভাগে কাজ করত। ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদে উন্নীত হয়েছিল। সে বলত, সেনাবিভাগে কাজ করার জন্য আমি ভাববার সময় পাই। তাছাড়া যুদ্ধে যোগদান করতে গিয়ে অনেক কঠোর জীবনসংগ্রাম আমি এড়াতে পেরেছি।

একবার চার্লস মে নামে একজন লেখক আসে। সে নক্ষত্রের উপর কিছু বৈজ্ঞানিক লেখা লেখে। এছাড়া হামণ্ড নামে আর একজন লেখক আসে। এরা সবাই তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং ক্লিফোর্ডের সমবয়সী। এরা সবাই মনের স্বাস্থ্য আর মানসিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। মনের বাইরের যে কোন কাজকেই তারা ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয় ব্যাপার বলে মনে করত। এসব ব্যাপারে তাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। কেউ মলমূত্র ত্যাগ করতে গেলে যেমন তার কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না তেমনি কারো কোন দেহগত ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করাটা অশোভন বলে ভাবত তারা।

দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারকেই তারা ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয় ব্যাপার হিসাবে এড়িয়ে যেত। কে কিভাবে টাকা রোজগার করে, কে তার স্ত্রীকে ভালবাসে কি না অথবা কে কোন প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে আছে কি

না এ সব মলমূত্র ত্যাগের মত ছোটখাটো ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব বিষয়ে অন্য কারো কোন কৌতূহল থাকা উচিত নয়।

ওদের মধ্যে হামণ্ডের চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা। তার স্ত্রী এবং দুটো ছেলে ছিল। তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এক মেয়ে টাইপরাইটারের সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়েছিল সে। সে বলল, আসলে যৌন সমস্যাটা কোন সমস্যাই নয়। কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে শোবার ঘরে গেলে আমরা তার পিছু পিছু যাই না। এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলটাই অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক এবং সমস্যাটা সেইখানে।

ওদের মধ্যে একজন তখন হামণ্ডকে বলল, ঠিক ঠিক, হামণ্ড। কিন্তু কেউ যদি তোমার স্ত্রী জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে এবং সে যদি বাড়াবাড়ি করে বা অনেক দূর এগিয়ে যায় তাহলে তুমি রাগে ফেটে পড়বে।

হামণ্ড তখন বলল, নিশ্চয়। কেউ যদি আমার বসার ঘরের এক কোণে প্রস্রাব করে তাহলে আমি নিশ্চয় রাগ করব। এসব কাজের উপযুক্ত জায়গা আছে।

তাহলে কি তুমি বলতে চাও কেউ যদি কোন নির্জন গোপন জায়গায় জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করে তাহলে তুমি কিছু মনে করবে না?

চার্লি বেশ রসিক প্রকৃতির লোক। সে কিছুদিনের জন্য জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করায় হামণ্ড তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে।

হামণ্ড বলল, যৌন সম্পর্কটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ সম্পর্ক শুধু আমার আর জুলিয়ার মধ্যে। সে সম্পর্কের মধ্যে অন্য কেউ নাক গলাতে এলে সেটা অবশ্যই আমি সহ্য করব না।

এবার টমি ডিউক উত্তর দিল। টমি ডিউকের চেহারাটা রোগা রোগা। তাকে দেখে চার্লস মে'র থেকেও বেশী আইরীশ বলে মনে হয়। সে বলল, আসল কথা হলো হামণ্ড, সম্পত্তির আকাঙ্খা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটা তোমার খুব বেশী। তুমি জীবনে সাফল্য চাও, জয় চাও। আমি একদিন সৈন্য-বিভাগে ছিলাম, মানবসমাজ থেকে অনেক দূরে ছিলাম। সেখান থেকে মানুষের সমাজের মাঝে এসে দেখলাম, সাফল্য আর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটা অতিশয় প্রবল সব মানুষের মধ্যে। এ প্রবৃত্তি এমনই প্রবল যে এর দ্বারা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তোমার মত লোক অবশ্যই স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে বড় হতে চায়। এই জন্যই তুমি ঈর্ষান্বিত। তোমার কাছে যৌনসম্পর্কের অর্থ হলো তাই। তোমার ও জুলিয়ার মধ্যেও যে যৌনসম্পর্কের কথা বললে আসলে তা সাফল্য অর্জনের একটা বলিষ্ঠ ও গতিশীল উপায় বা অস্ত্র মাত্র। যদি তুমি প্রথম থেকে অসাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে জীবন শুরু করতে তাহলে চার্লির মত প্রেম করতে পারতে। তোমাদের মত বিবাহিত লোকদের বিদেশী ভ্রমণকারীদের বাক্সের মত একটা করে ছাপ

আছে। যেমন ধরো তোমার স্ত্রীর নামের উপর একটা ছাপ আছে। মিসেস বি আর্লন্ড, তোমার নামের উপর আছে আর্লন্ড বি হামণ্ড, কেয়ার অফ মিসেস আর্লন্ড বি হামণ্ড। তোমরাই ঠিক, কারণ মনের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য আরামপ্রদ একটা বাড়ি আর ভাল রান্নাবান্না চাই। আবার বংশধারা রক্ষার জন্য সন্তানসন্ততিও চাই। কিন্তু এই সব কিছুর মূলে আছে কিন্তু সাফল্য-লাভের প্রবৃত্তি বা উচ্চাভিলাষ। এই একটি জিনিসকে কেন্দ্র করেই সব জিনিস আবর্তিত হয়।

হামণ্ডকে দেখে প্রসন্ন মনে হলো। সে তার মানসিক সংহতি আর মনের অখণ্ডতার জন্য গর্বিত, সে সব সময় কাল বা অবস্থার দাস হয়ে তার দ্বারা বাধ্য হয়ে কাজ করে চলে না। তা সত্ত্বেও সে অবশ্য সাফল্য চায়।

এবার চার্লস মে বলল, একথা ঠিক যে টাকা ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। জীবনে বাঁচতে হলে কিছু টাকা তোমার চাই। এমন কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হলেও তোমার কিছু টাকা চাই, কারণ তোমার পাকস্থলী শূন্য থাকলে তুমি কোন চিন্তাই করতে পারবে না। কিন্তু আমার মতে বিয়ের ছাপটা অন্ততঃ ত্যাগ করতে পার। আমরা যদি স্বাধীনভাবে যে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি তাহলে কোন মেয়ে আমাদের সঙ্গে ভাব করতে চাইলে কেন আমরা ভালবাসব না তাকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার মধ্য দিয়ে এক উগ্রকামী ব্যভিচারী মন কথা বলছে।

চার্লস মে বলল, তা যদি বল ত বলতে পার। কোন মেয়েছেলের সঙ্গে নাচলে যেমন তার কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি তার সঙ্গে শুলে বা রাত্রিবাস করলেও তার কোন ক্ষতি হয় বলে আমার মনে হয় না। অথবা যদি কোন মেয়ের সঙ্গে আবহাওয়ার কথা বলি তাহলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। কারো সঙ্গে কথা বলে যেমন আমরা পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করি তেমনি কোন মেয়ের সঙ্গে দেহসংসর্গ করে দেহগত এক জৈবচেতনার বিনিময় করি।

হামণ্ড বলল, তার থেকে খড়গোসদের মত মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করে থাকতে পার।

কেন, ক্ষতি কি তাতে? খড়গোসদের কি ক্ষতি হচ্ছে তাতে? মানসিক রোগও বাতিকগ্রস্ত, বিদ্রোহাত্মক মনোভাবাপন্ন, স্নায়বিক ঘৃণাভাববিশিষ্ট ও নিঃসঙ্গ মানুষদের থেকে তারা কি কিছু খারাপ?

হামণ্ড বলল, তা হলেও আমরা ত আর খড়গোস নই।

মে বলল, ঠিক তাই। আমার মনে আছে, আমার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বা প্রভাব নিয়ে আমাকে অনেক সময় গণনা করতে হয়। অনেক সময় বদহজম হলে আমার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ক্ষুধাও আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। এইভাবে অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধাও আমাকে

বিচলিত করে আমার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাহলে কি করব?

হামণ্ড রসিকতার সুরে হাস্তোচ্ছলে বলল, খাদ্যদ্রব্যের বদহজমের মত অনেক সময় যৌনক্রিয়ার আতিশয্যের বদহজমও মানুষের মনকে সমানভাবে বিচলিত করে।

মোটেই তা নয়। আমি যেমন বেশী খাই না তেমনি যৌনক্রিয়ার ব্যাপারেও আমার কোন বাড়াবাড়ি নেই। কোন কোন লোক অবশ্য বেশী খেতে ভালবাসে। কিন্তু তুমি ত আমাকে একেবারে না খাইয়ে মারতে চাও।

না, তা নয়। তবে তুমি বিয়ে করতে পার।

কেমন করে জানলে তুমি যে আমি বিয়ে করতে পারি? এটা আমার মনের সঙ্গে খাপ খেতে নাও পারে। বিয়ে আমার মনের গতিকে রুদ্ধ বা স্তব্ধ করে দিতে পারে। আমি ঠিক ও পথের পথিক নই। কিন্তু তা বলে কি সন্ন্যাসীর মত কোন একটা ঘরে ভরে রাখবে? যত সব বাজে ধারণা। মাঝে মাঝে আমাকে যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে গণনা করতে হয় তেমনি মাঝে মাঝে কোন নারীকে আমার দরকার হয়। আমি যেমন এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করতে চাই না, তেমনি কারো কোন নিষেধাজ্ঞাও শুনতে চাই না। পোষাকভরা ছাপ দেওয়া বাক্সের মত কোন মেয়েকে নামের উপর ছাপ নিয়ে রেলস্টেশান বা কোথাও ঘুরে বেড়াতে দেখলে আমার বড় লজ্জা হয়।

জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারটা ওরা দুজনে কেউ ভুলতে পারেনি।

এবার ডিউক বলল, মজার কথা হলো এই যে যৌন ব্যাপারটা মুখে বলার নয়, হাতে কলমে করার। আমার মনে হয় তোমার কথাটা ঠিক। আমার মনে হয়, কোন মেয়ের সঙ্গে যেমন আমরা সহজভাবে আবহাওয়ার অবস্থা নিয়ে কথা বলতে পারি তেমনি তার সঙ্গে আমাদের জৈবিক চেতনা বা আবেগানুভূতির বিনিময় করতে পারি। যৌনসংসর্গের কাজটা নরনারীর মধ্যে এক দেহগত সংলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন না কোন মনের বা ভাবধারার মিল না হলে কোন মেয়ের সঙ্গে যেমন কথা বল না, তেমনি পারস্পরিক কোন আবেগ বা সহানুভূতির মিল না হলেও তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পার না।

চার্লি মে বলল, কোন মেয়ের সঙ্গে যদি ঠিকমত মনের ও আবেগানুভূতির মিল হয় তাহলে তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া ও ঘুমোন হবে উচিত কাজ। কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে যেমন তুমি তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বল তেমনি কোন মেয়ের সঙ্গে কোন বিষয়ে মনের বা মতের মিল হলে তার সঙ্গে দেহসংসর্গও ঘটাতে পার। কারো সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দাঁতের মাঝে জিবটাকে ভরে রেখে তা কামড়াও না। তোমার যা বলার তা বলে ফেল। তেমনি সহানুভূতিসম্পন্না কোন নারীকে পেয়েও যৌন আবেগকে চেপে রাখার

কোন অর্থ হয় না।

হামণ্ড বলল, না এটা অন্যায়। কোন নারীর সঙ্গে যৌনসংসর্গের ক্ষেত্রে তোমার অন্তর্নিহিত পৌরুষশক্তির অর্ধেক ব্যয় করেও তুমি তোমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে না, তোমার মন যতই ভাল থাক, যতই মনের মিল থাক। যৌন ব্যাপারে বাড়াবাড়ির ফল উল্টো হয়।

বাড়াবাড়ির ফল যেমন উল্টো হয় তেমনি যৌনক্রিয়ার আত্যন্তিক অভাবের ফলও উল্টো হয়, বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হও। কোনরূপ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে তুমি তোমার মনের পবিত্রতা বা অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পার, কিন্তু সে মন হয়ে উঠবে শুকনো, বাঁশের কাঠির মতই শুকনো। তুমি এ ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে কথার কচকচি দিয়ে ছোট করে দিচ্ছ।

টমি ডিউক জোরে হেসে উঠল। সে বলল, তোমরা দুজনে মন নিয়ে যত খুশি তর্ক করতে পার। কিন্তু আমার পানে তাকাও দেখি, আমি মনের কোন বড় কাজ করি না, শুধু কিছু চিন্তার জট পাকাই মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি বিয়ে করি না অথবা কোন মেয়ের পিছনে ছুটে বেড়াই না। আমার মনে হয় চার্লি ঠিক। সে যদি কোন মেয়ের পিছনে ছুটে চলে আমি তাকে বাধা দেব না, এ বিষয়ে তার স্বাধীনতা আছে। আবার হামণ্ডও ঠিক। তার সম্পদ-এষণা প্রবল। সুতরাং তার জন্য চাই সোজা লম্বা রাস্তা আর ছোট দরজা। সে ক, খ, গ শেখার মস্ত বড় বিদ্বান হতে চায়। আমার কথা যদি বল, আমি একটা হাতেছোঁড়া রকেট। আচ্ছা ক্লিফোর্ড, তুমি কি মনে করো, জগতে মানুষকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবার ব্যাপারে যৌন সম্পর্কের কোন প্রয়োজন আছে?

এই সব ক্ষেত্রে ক্লিফোর্ড কোন কথা বলে না। এই সব কথাবার্তা শুনে সে এমনই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে যে এ বিষয়ে সে কোন সুস্পষ্ট ধারণা খাড়া করতে পারত না। সব কিছু শুনে সে একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

ক্লিফোর্ড এক সময় বলল, যেহেতু আমি যৌনশক্তি হারিয়ে ফেলেছি, আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই।

এটা কোন কথাই নয়। তোমার দেহের উপর দিকের অংশটা ঠিক আছে, ওদিকটার প্রাণশক্তির কোন অভাব নেই। তোমার মনের স্বাস্থ্য বলিষ্ঠ ও অটুট আছে। সুতরাং তোমার মনোভাবের কথা আমরা শুনব।

ক্লিফোর্ড বলল, এ বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। আমি মনে করি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং অন্তরঙ্গতা থাকলে বিয়ে এবং ভালবাসা-বাসির ব্যাপারটা খুবই ভাল কথা।

টমি বলল, কেন ভাল কথা? কোন দিক থেকে?

এই সব আলোচনায় মেয়েরা যেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে, ক্লিফোর্ডও

সেই রকম অস্বস্তিকর এক লজ্জার মধ্যে দিয়ে বলল, বৈবাহিক সম্পর্ক নরনারীর অন্তরঙ্গতাকে পূর্ণতা দান করে।

টমি তখন বলল, ঠিক আছে, চার্লি এবং আমি বিশ্বাস করি যৌন সংসর্গ দ্বৈত সংলাপের মতই এক সহজ যোগাযোগের ব্যাপার। কোন নারী আমার সঙ্গে এই ধরনের কোন যোগাযোগ করতে চাইলে আমি যথাসময়ে তাকে নিয়ে বিছানায় যেতে পারি। কিন্তু কোন মেয়ে আমার কাছে এজন্য আসে না বলে আমাকে একাই বিছানায় শুতে যেতে হয়। কিন্তু এতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও কোন গণনার কাজ আমার নেই। কোন অমর সাহিত্য রচনার কাজও আমার নেই আমি হচ্ছি একজন সৈনিকমাত্র।

এবার সকলেই চুপ করল। নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। চারজন বন্ধুই ধূমপান করতে লাগল নীরবে। ওদিকে কনি চুপচাপ সেলাই করে যেতে লাগল। তার সেখানে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত এক শুষ্ক নীরবতায় জমাট বেঁধে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ এই চারজন চিন্তাশীল লোকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করার মত সামর্থ্য তার ছিল না। তবে তার সেখানে থাকার একটা প্রয়োজনও ছিল। কারণ তাকে ছাড়া ওদের চিন্তা-ভাবনার স্রোত এমন স্বচ্ছন্দভাবে বইতে পারত না। কনির অনুপস্থিতিতে ক্লিফোর্ড কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে উঠত মনে মনে। তার পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে উঠত। কনির উপস্থিতিতে টমি ডিউক একটা প্রেরণা পেত। হামণ্ডকে কনি মোটেই পছন্দ করত না, কারণ তাকে তার বড় স্বার্থপর মনে হত। মানসিকতার দিক থেকে চার্লস মেকে কিছুটা ভাল লাগলেও কিছুটা খারাপ লাগত।

কতদিন সন্ধ্যায় কনি এখানে বসে এই চারজন অথবা দুজন বন্ধুর মনের কথা শোনে। ওরা কখনো কোনভাবে খুব একটা আঘাত করে না তাকে। তাকে কোন কষ্ট দেয় না। বিশেষ করে টমি সেখানে থাকলে ওদের কথাবার্তা শুনতে ওর খুব ভাল লাগত। টমি থাকলে খুব মজা হত। তার মনে হত কতকগুলি আলোচনারত পুরুষ তাদের অনাবৃত দেহ নিয়ে তাকে চুম্বন বা আলিঙ্গন না করলেও তাদের মনটা যেন অনাবৃত করে দিচ্ছে তার সামনে। তবে তাদের সেই মনটা ছিল কিন্তু বড় নীরস।

আবার কিছুটা বিরক্তিকরও ছিল। কনি মাইকেলিসকে শ্রদ্ধা করত। অথচ মাইকেলিসের নামটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন তাদের একরাশ ঘৃণার গড়ল ঠেলে দিত। সে যেন ওদের চোখে একটা জন্তুবিশেষ বা অশিক্ষিত একটা ইতর। কিন্তু যাই হোক, মাইকেলিস যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত, ওদের মত মনের স্বাস্থ্য নিয়ে আঁকাবাঁকা ঘুরপথে অজস্র কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে যেত না শোভাযাত্রা করে।

ওদের এই মনের স্বাস্থ্যটাকে কনি যে একেবারে পছন্দ করত না, তা নয়।

এর থেকে রোমাঞ্চকর এক পুলক অনুভব করত সে। তবে তার মনে হত ওরা যেন কথাটা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে। তবু এই ধরনের কয়েকটি নিবিড় সন্ধ্যায় কয়েকজন পুরুষের মুখ থেকে উদ্গারিত সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকতে বড় ভাল লাগত তার। যখন সে ভাবত তার নীরব উপস্থিতি ছাড়া তাদের আলোচনা চলতে পারে না তখন তার বেশ মজা লাগত। বেশ কিছুটা গর্ববোধও করত। চিন্তার প্রতি একটা বিরাট আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল কনির এই লোকগুলো অন্ততঃ সৎভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে চিন্তার কোথায় যেন একটা গলদ ছিল যে গলদ যাবার নয়। তারা কিছু একটা বোঝাতে চাইত তাদের অজস্র কথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যাই বোঝাতে চাক, তার জীবনে কি তার দাম তা বুঝতে পারত না কনি। অবশ্য মিকও জীবনে খুব একটা অর্থময় হয়ে উঠতে পারেনি।

অবশ্য মিকও তখন এমন কিছু করছিল না। গতানুগতিকভাবে এগিয়ে চলেছিল জীবনের পথে আর পাঁচজনের মত। সত্যিই মিক অসামাজিকও ছিল। ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধুরা এ অভিযোগ প্রায়ই করত তার বিরুদ্ধে। আর যাই হোক, ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধুরা অসামাজিক ছিল না। তারা অল্পবিস্তর মানবজাতির উপকারের জন্য কিছু উপদেশ দিতে চাইত। মানবজাতিকে একটা সমস্যা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।

সেদিন রবিবার সন্ধ্যাবেলা। আবার প্রেম সম্বন্ধে কথা উঠল।

টমি ডিউক বলল, যে বন্ধন আমাদের অন্তরকে পরস্পরের মধ্যে আপন করে বেঁধে দেয় সে বন্ধন সত্যিই বড় মধুর। কিন্তু আমি জানতে চাই যে বন্ধনটা কি। যে বন্ধন আমাদের বেঁধে দেয় এক করে সেই বন্ধনই আবার দুজনের বিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। আমরা পরস্পরে পৃথক হয়ে উঠে ঘৃণার কথা ছুঁড়ে মারি পরস্পরের প্রতি। জগতে অনেক বুদ্ধিজীবিও তাই করে। যারাই এ কাজ করে তাদের সকলকেই ধিক। আবার আমরা যত সব মিথ্যা মনগড়া কৃত্রিম কথার প্রলেপ দিয়ে আমাদের মনের অনুভূত ঘৃণাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, মনের গভীর ও অন্তহীন ঘৃণার মধ্যে শিকড় চালিয়ে রস আহরণ করেই মনের স্বাস্থ্য বেঁচে থাকে, সজীব হয়ে বেড়ে ওঠে। সব সময় তাই হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও তাঁর শিষ্যদের পানে তাকিয়ে দেখ। দেখবে কেবল ঘৃণার ছড়াছড়ি। কাউকে না কাউকে ছোট করে তাকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার মধ্যে কত আনন্দ পেতেন তাঁরা।...তা সে প্রোতাগোরাস বা যেই হোক না কেন।

তাতে আলসিবিয়াদ ও অন্যান্য শিষ্যরা কুকুরের মত এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করত। আমি বলতে পারি, হয়ত অনেকে বুদ্ধকে পছন্দ করবেন, অথবা মনের কোন জৌলুস না দেখিয়ে শিষ্যদের উপদেশ-দানরত যীশুকে পছন্দ করবেন অনেকে। কিন্তু যাই হোক, এঁদের সকলের

মনের স্বাস্থ্যের মধ্যে কোথায় একটা মূলগত গলদ আছে, ফাঁকি আছে। এর সব কিছুর মূলে আছে যেন এক ঘৃণা বা ঈর্ষা। ফল দেখেই আমরা গাছের পরিচয় পাই।

ক্লিফোর্ড এর প্রতিবাদ করে বলল, আমার মনে হয় না আমরা সকলে ঘৃণাকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়ে চলি।

টমি বলল, হে আমার প্রিয় ক্লিফোর্ড, কিভাবে আমরা একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় একে অন্যকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করি? আমি নিজে এ বিষয়ে সবচেয়ে খারাপ, কারণ আমি আবার মিষ্টিমাখানো ঘৃণার থেকে স্বতস্ফূর্ত ঘৃণাকে বেশী পছন্দ করি। মিষ্টিমাখানো ঘৃণা বিষের সমান। যদি আমি উপরে মুখে বলি ক্লিফোর্ড কত ভাল লোক, কিন্তু ওর পিছনে ওর নিন্দা করি তাহলে ওর অবস্থাটা কেমন হয়? ঈশ্বরের নামে তাই বলছি যত সব ঘৃণার কথা আমার মুখের সামনে বলো। তখন আমি বুঝব তোমাদের কাছে আমার তবু অন্ততঃ কিছুটা মূল্য আছে। তা না হলে আমার সমূহ সর্বনাশ।

হামণ্ড বলল, কিন্তু আমরা সংজ্ঞার সঙ্গে একে অন্যকে ভালবাসি।

টমি বলল, হ্যাঁ তা অবশ্যই বাসি। কিন্তু সেক্ষেত্রে একে অন্যের পিছনে ঘৃণার কথা বলাবলি করে। এ বিষয়ে আমি নিজে সবচেয়ে খারাপ।

চার্লি বলল, আমার মনে হয় তুমি মনের স্বাস্থ্য আর সমালোচনামূলক কাজকর্মকে এক করে দেখছ। আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত যে সক্রেটিস সমালোচনামূলক কাজকর্মগুলোকে বড় করে দেখতেন।

টমি ডিউক সক্রেটিস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাল না।

হামণ্ড বলল, সমালোচনা আর জ্ঞান এক জিনিস নয়।

বেরি নামে এক বাদামী রঙের লাজুক প্রকৃতির যুবক ডিউকের সন্ধানে এসে থেকে যায়। সেও সেদিন ওদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। বেরি হামণ্ডের কথা শুনে বলল, তা অবশ্য নয়।

ওরা সবাই তখন বেরির পানে তাকাল। ওদের মনে হলো যেন একটা গাধা কথাটা বলছে।

ডিউক হেসে বলল, আমি বলছিলাম জ্ঞানের কথা, মানসিক স্বাস্থ্যের কথা। প্রকৃত জ্ঞান শুধু তোমার মন আর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসে না, বেরিয়ে আসে তোমার জঠর আর যৌনাঙ্গ থেকে, চেতনার সব স্তর ও দিক থেকে। মন শুধু সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার আর বিশ্লেষণ করতে পারে। যদি তোমার মন আর যুক্তিকে অন্যান্য সব চেতনার স্তর বা দিকের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে দাও তাহলে দেখবে সব চেতনা ও অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে আর তাদের শূন্য শ্মশানপটে তোমার মন আর যুক্তি শুধু দ্বৈতকণ্ঠে সমালোচনা করে চলেছে। আমি বলছি এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না আমরা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এখন সারা দুনিয়াটাই যেন সমালোচনা চায়।

তাতে মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই। এখন আমাদের সকলের মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করি। আমাদের ঘৃণাভরে গৌরবান্বিত করি যাতে সেই পুরনো পচা নাটকের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। কিন্তু মনে রাখবে আসল ব্যাপারটা হলো এই : তুমি যখন সমগ্রভাবে জীবন যাপন করবে তখন জীবনের সমস্ত অঙ্গ ও আন্তরযন্ত্রীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যখন তুমি মনের স্বাস্থ্য চাও, তখন তুমি সমগ্র জীবনরূপ বৃক্ষ হতে আপেলটিকে ছিঁড়ে নাও। তার মানে গাছ থেকে ফলকে বিচ্ছিন্ন করার মত সমগ্র জীবন থেকে একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। আর তুমি যদি মনসর্বস্ব হও, মনের স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু না জান তাহলে বুঝতে হবে তোমার অবস্থা হবে এক বৃন্তচ্যুত আপেলের মতই। তখন তুমি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ঘৃণাভাব পোষণ করতে থাক যেমন গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আপেল স্বাভাবিকভাবে পচে যায়, টক হয়ে যায়।

ক্লিফোর্ডের এসব কথা ভাল লাগছিল না। সে বড় বড় চোখ তুলে তাকাল। কনি নিজের মনে মনে হাসল।

হামণ্ড একটু তিক্ত ও রাগতভাবে বলল, তাহলে সবাই আমরা বৃক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন আপেল।

চার্লি বলল, তাহলে আমাদের জীবন থেকে আপেলের রস বানাও সবাই।

বেরি এবার হঠাৎ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে তোমরা কি মনে করো?

চার্লি লাফিয়ে উঠল কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে, সাবাস! বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কি মনে করো?

ডিউক বলল, এস, এবার বলশেভিকবাদের শ্রাদ্ধ করা যাক।

হামণ্ড তার মাথা নেড়ে বলল, আমার মনে হয় বলশেভিকবাদ একটা পুরনো ব্যাপার।

চার্লি বলল, আমার মতে বলশেভিকবাদ হচ্ছে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যাপারটা কি তা তাতে ভাল করে বলা হয়নি। আসলে এটা এক পুঁজিবাদ। বলশেভিকবাদের মতে মানুষের যত সব আবেগ অনুভূতি বুর্জোয়া। তাহলে ওদের মতে সেই মানুষই সবচেয়ে ভাল যার কোন আবেগ অনুভূতি নেই।

তাহলে যে কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়া। অতএব তাকে দমন করতে হবে। তোমাদের নিজেদের সব ব্যক্তিসত্তাকে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার আদর্শে ডুবিয়ে দিতে হবে। সুতরাং অনুভূতি বা চেতনাবিশিষ্ট যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বুর্জোয়া। তাহলে এই মতবাদ বা আদর্শ যান্ত্রিক হতে বাধ্য। যা একই ধরনের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি অথচ যার কোন জৈব চেতনা নেই তা হচ্ছে যন্ত্র। ওদের মতে প্রতিটি মানুষ এক একটা যন্ত্র আর সে যন্ত্রকে চালায় একটা মাত্র জিনিস। তা হলো বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঘৃণা। আমার মতে

এটাই হলো বলশেভিকবাদ।

টমি ডিউক বলল, যথার্থ বলেছ। তবে আমার মতে এটাই হলো আমাদের যুগের চূড়ান্ত শিল্পগত আদর্শ। এর মুখে রয়েছে ঘৃণা। মুখে স্বীকার করুক বা না করুক এই ঘৃণাই হলো কারখানার মালিকদের আদর্শ।

আসলে এটা সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি ঘৃণা। মিডল্যাণ্ডের এই সব অঞ্চলের দিকে চেয়ে দেখ। এটা তাদের মানসিক জীবন বা স্বাস্থ্যের অন্যতম পরিচয়।

হামণ্ড বলল, বলশেভিকবাদ কোন যুক্তি বা তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে বলে মনে হয় না। আশ্রয়বাক্যের প্রধান অংশকে অস্বীকার করে

টমি বলল, বিশুদ্ধ মনের মত এই বলশেভিকবাদ একান্তভাবে আশ্রয়বাক্যের বস্তুগত দিকটাকে মেনে নেয়।

চার্লি বলল, অবশেষে বলশেভিকবাদ তার তল খুঁজে পেয়েছে।

টমি বলল, তল খুঁজে পেয়েছে! সেই তল খুঁজে পেয়েছে যার কোন তল নেই। সারা জগতে ভাল ভাল যন্ত্রপাতি যত বাড়বে ততই বলশেভিকবাদীদের শক্তি বাড়বে। যন্ত্রপাতিই হলো ওদের সেনাবাহিনী।

হামণ্ড বলল, কিন্তু এ ধরনের জিনিস চলতে পারে না। এই ঘৃণার ব্যাপারটাই খারাপ। এর একটা প্রতিক্রিয়া হবেই।

আমরা দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছি। আমাদের ঘৃণার ভাবটা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ঘৃণা হচ্ছে জীবনের উপর কতকগুলো অনুভূতি ও প্রবৃত্তি জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রতিফল। আমাদের কতকগুলো বদ্ধ ধারণা অনুসারে আমাদের অনুভূতিগুলিকে চাপিয়ে দিই জীবনের উপর। যন্ত্রের মত কতকগুলো সূত্রকে ব্যবহার করি আমরা। আমরা আমাদের যুক্তিগত মন নিয়ে দেহকে শাসন করার চেষ্টা করি, তখন দেহটা পরিণত হয় ঘৃণায়। তখন দেহ ও মনের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। দেহ মনকে ঘৃণা করে, মন করে দেহকে ঘৃণা। আমরা সবাই বলশেভিক, আমরা সবাই বস্তু। কারণ আমরা মুখে তা স্বীকার করি না। রুশীয়রা বলশেভিকবাদী, কিন্তু ভণ্ড নয়।

হামণ্ড বলল, কিন্তু সোভিয়েত পন্থা ছাড়াও বলশেভিকবাদী হবার অন্য পথ আছে। বলশেভিকবাদীরা মোটেই বুদ্ধিমান নয়।

মোটেই তা নয়। অনেক সময় দেখবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিমানের ভাণ করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলশেভিকবাদকে আধাবুদ্ধিসম্পন্ন এক মতবাদ বলে মনে করি; কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্যের সমাজজীবনটাও ঠিক তাই নয় কি? আমরা গলাফোলা রোগীদের মতই নিরুত্তাপ, নির্বোধদের মতই নিস্তেজ। আমরা সবাই বলশেভিকবাদী, শুধু তার নামটা অন্য নিই। আমরা ভাবি আমরা ঈশ্বর, মানুষ হয়েও ঈশ্বর। এই মনোভাবটাই বলশেভিকবাদীদের মনোভাব। কেউ যদি ঈশ্বর বা বলশেভিকবাদী হতে চায় তাহলে তার কথা আলাদা। কিন্তু কেউ যদি সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হতে চায় তাহলে

তার হৃদয় আর যৌনাঙ্গ দুটোই চাই। বলশেভিক আর ঈশ্বর, দুটোই সমান। প্রকৃত পক্ষে ভালই হোক মন্দই হোক এই দুটোর কোনটাই বাস্তবে ঠিকমত হওয়া সম্ভব না।

এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে অনেকক্ষণ কাটিয়ে বেরি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আচ্ছা টমি, তুমি প্রেমে বিশ্বাস করো?

টমি বলল, হে সুন্দর কিশোর আমার, মোটেই না, দশভাগের ন'ভাগও না। আজকাল প্রেমও হচ্ছে আধাবুদ্ধিসম্পন্ন একটা ব্যাপার। কতকগুলো লোক ছেলেদের মত পাছাওয়ালা কতকগুলো নাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে সঙ্গম করে।

এটাকে তুমি সঙ্গম বল? ঠিক যেন সঙ্গমরত দুটো ঘোড়া। প্রেম মানে 'আমার স্বামী', 'আমার স্ত্রী' এই ধরনের যৌথ সম্পত্তিমূলক এক অধিকারগত মনোভাব। না, আমি এসব মোটেই বিশ্বাস করি না।

কিন্তু তুমি কিছু একটাতে বিশ্বাস করো।

আমি? হ্যাঁ, বুদ্ধিগতভাবে কিছু একটাতে করি। আমি চাই এক সৎ ও সরল অন্তঃকরণ, এক প্রাণবন্ত পুরুষাঙ্গ, সতেজ সজীব বুদ্ধি আর মেয়েদের সামনে সোজা হয়ে কথা বলার সাহস।

বেরি বলল, মনে করো তুমি এ সব পেয়ে গেছ।

জোর হাসিতে ফেটে পড়ল টমি ডিউক। হাসতে হাসতে বলল, যদি সত্যিই আমি তা পেতাম হে বালক। না, আমি কিছুই পাইনি হে দেবদূত। আমার অন্তর আলুর মতই নিস্তেজ, আমার পুরুষাঙ্গ নত হয়ে থাকে, মাথা তুলতে চায় না। আমার মা বা পিসির সামনে সঙ্গমের কথা বলার থেকে আমি আমার পুরুষাঙ্গটিকে একেবারে কেটে ফেলব। আমি প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান নই, শুধু মানসিক জীবন ও স্বাস্থ্যে বিশ্বাসী। প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান হওয়া সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহলে সে দেহ মনের ব্যক্ত অব্যক্ত প্রতিটি অংশের প্রতি সমানভাবে সচেতন হয়ে উঠবে। তখন তার পুরুষাঙ্গটি মাথা তুলে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে কেমন আছ? শিল্পী রেনয়ের বলত, সে নাকি তুলির বদলে তার লিঙ্গ নিয়ে ছবি আঁকত, আমিও যদি আমার লিঙ্গ নিয়ে কিছু একটা করতে পারতাম। হা ভগবান! মানুষ যদি তার দেহমনের সব কথা পরিষ্কার করে বলতে পারত! এই অব্যক্ত কথার হাহাকার আর এক নরকযন্ত্রণা। সক্রেটিস এই কথা বলার প্রথম চেষ্টা করেন।

অবশেষে কনি মুখ তুলে বলল, পৃথিবীতে অনেক ভাল মেয়েও আছে।

পুরুষরা সবাই এটা চায়নি। কারণ কনি এতক্ষণ আনমনে সেলাই করতে করতে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যাতে সকলের মনে হচ্ছিল সে তাদের কথা শুনছে না কিছুই। তারা যখন শুনল কনি তাদের সব কথা শুনছে তখন তারা বিরক্তিবোধ করতে লাগল।

টমি বলল, হে ভগবান! যদি তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে তাহলে আমিই বা তাদের কাছে ভাল হতে যাব কেন? না, না, কোন আশা নেই। কোন নারীর সঙ্গে মিলনের সময় আমি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে পারি না। কোন নারীকে হাতের মধ্যে পেয়েও তার সঙ্গে মিলতে পারি না। মন চায় না। আর আমি জোর করে নিজের উপর তা চাপিয়ে দিতেও চাই না। আমি যা আছি তাই থাকতে চাই এবং বরাবর মানসিক জীবন যাপন করে যেতে চাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। সে আনন্দ পবিত্র কিন্তু নৈরাশ্যজনকভাবে পবিত্র। আমার আর কোন আশা নেই। তুমি কি বল হিলদেব্রাণ্ড, মুরগীশাবক?

বেরি বলল, যত পবিত্র থাকবে জীবন তত কম জটিল হবে।

হ্যাঁ, জীবন খুবই সরল।

অধ্যায় ৫

ফেব্রুয়ারী মাসের বরফপড়া এক সকাল। ক্লিফোর্ড আর কনি পার্কের ভিতর দিয়ে বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার মানে ক্লিফোর্ড তার যান্ত্রিক চেয়ারে করে যাচ্ছিল আর কনি তার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল।

শুকনো বাতাসে ছিল গন্ধকের গন্ধ। কিন্তু ওরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তুষার আর ধোঁয়ায় দিগন্তটা কুহেলিকাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল ওদের মাথার উপরে ছিল নীল আকাশ। সব মিলিয়ে একটা বেষ্টনী রচনা করেছিল ওদের চারপাশে। আসলে মানুষের জীবনটাই যেন বেষ্টনীঘেরা এক স্বপ্ন অথবা এক অর্থহীন মত্ততা।

পার্কের ঘাসের উপর বরফ জমে ছিল। সে ঘাস খেতে গিয়ে ভেড়াগুলো কাশছিল। পার্কের মধ্যে দিয়ে বনের কাছ পর্যন্ত সোজা একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল। পথটা দেখাচ্ছিল গোলাপী রঙের একটা বেতের মত। ক্লিফোর্ড কয়লাখনির ধার থেকে পাথর এনে পথটা সম্প্রতি পাকা করেছে। গোলাপী রঙের পাথরগুলোর উপর দিয়ে পথ হাঁটতে বড় ভাল লাগছিল কনির উজ্জ্বল গোলাপী পাথরগুলোর উপর সাদা বরফ পড়ায় একটা নীলচে ভাব দেখা দিয়েছে।

বনে যাবার গেটটা খুলে দিল কনি। ক্লিফোর্ড তার যান্ত্রিক চেয়ারটা ধীর গতিতে চালিয়ে দিল। পথটা সোজা বনের দিকে চলে গেছে। পথের দুদিকে ছাঁটা গাছের বেড়া। এই বনে অতীতে রবিনহুড শিকার করে বেড়াত। এই বনের ভিতর দিয়ে ম্যানসফিল্ড যাবার রাস্তা ছিল। কিন্তু

বর্তমানে এটা ক্লিফোর্ডদের ব্যক্তিগত বনে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণের রাস্তাটা উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে গেছে।

সারা বনস্থলী একেবারে নিস্তব্ধ। বরফের উপরে শুকনো ঝরা পাতাগুলো পড়ে ছিল। অনেক ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে বনে আর শিকার হত না। শিকারের মত কোন পাখি ছিল না। যুদ্ধের সময় সব পাখি মরে যায়, সব নিহত হয়। বর্তমানে ক্লিফোর্ড আবার শিকারের জন্য লোক রেখেছে একজন।

ক্লিফোর্ড এই বনটাকে বড় ভালবাসত। ভালবাসত সব গাছগুলোকে। তার মনে হত এই গাছগুলো পুরুষানুক্রমে তাদের অধিকারে। সে তাদের সংরক্ষণে তৎপর ছিল। সে চাইত এই নির্জন অরণ্যঅঞ্চলটা সমস্ত জগৎ থেকে পৃথক হয়ে থাক।

ক্লিফোর্ডের যান্ত্রিক চেয়ারটার চাকাগুলো যেতে যেতে বরফের উপর আটকে যাচ্ছিল প্রায়ই। যেতে যেতে হঠাৎ বাঁদিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেখানে তখনো অনেক বড় বড় গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল। তার মাঝে মাঝে কিছু কালো দাগ দেখা গেল। কাঠুরিয়ারা কিছু ঝরা পাতা আর বাজে কাঠ পোড়ানোর জন্য ঐ দাগগুলো হয়।

স্যার জিওফ্রে যুদ্ধের সময় এই জায়গার গাছগুলো পরিখার কাঠের জন্য কাটেন। জায়গাটা ডান দিকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে। তার মাথার কাছটায় যেখানে একদিন অনেক ওক গাছ দাঁড়িয়ে ছিল আজ সেখানটা একেবারে ফাঁকা, জায়গাটার অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়ালে দূরে কলিয়ারির রেলপথ দেখা যায়। দেখা যায় আরো কিছু নূতন কল-কারখানা। কনি সেখানে দাঁড়িয়ে এই সব দেখেছে কিন্তু ক্লিফোর্ডকে সে কথা কিছু বলেনি।

এই জায়গাটা দেখলেই ক্লিফোর্ডের রাগ হয়। সে নিজে যুদ্ধে গিয়েছিল। এখানকার গাছগুলো কেন কাটা হয়, তাতে কি হয়, তা সে সব জানে। তবু এই ছোট টিলার মত জায়গাটার গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য তার রাগ হয় আর সেই রাগের বশবর্তী হয়ে সে ঘৃণা করতে থাকে স্যার জিওফ্রেকে।

তার চেয়ারটা যখন ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছিল তখন ক্লিফোর্ড তার মধ্যে গম্ভীর মুখে বসে ছিল কিন্তু উপরে ওঠার মুখটায় সে থেমে গেল। এতটা খাড়াই পথ কোন রকমে উঠে গেলেও নামার সময় অসুবিধা হবে বলে সে আর উঠল না। সে শুধু স্থির হয়ে ঢালু পথের দুধারের সবুজ গাছগুলোর পানে তাকিয়ে রইল। পথটা টিলাটার বুকের কাছ পর্যন্ত গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়।

ফেব্রুয়ারী মাসের ম্লান নিস্তেজ সূর্যালোকে আলোকিত জায়গাটায় ক্লিফোর্ড কনিকে বলল, এই জায়গাটাকে ইংল্যাণ্ডের আত্মা বলে মনে করি।

পথের উপর পড়ে থাকা একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে কনি বলল, তাই নাকি? তার পরনে ছিল নীল রঙের এক পোষাক।

ক্লিফোর্ড বলল, এটা হলো পুরনো ইংল্যাণ্ডের আত্মা এবং আমি এটা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই।

কনি বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কলিয়ারি থেকে এগারোটার ভোঁ বাজার শব্দ শুনতে পেল। এ শব্দ শুনতে অভ্যস্ত ছিল ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি এই বনটাকে একেবারে অক্ষত রাখতে চাই। কেউ যেন কোনভাবে একে স্পর্শ করতে না পারে, কেউ যেন এর মাঝে প্রবেশ করতে না পারে।

এই বনভূমির সঙ্গে এক সকরুণ দুঃখের কাহিনী জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের অরণ্যসমাচ্ছন্ন ভূপ্রকৃতির একটা রহস্য। কিন্তু স্যার জিওফ্রে এই বনভূমির একটা অংশে কিছু গাছ কেটে সে রহস্যকে একটা আঘাত দেন। ধূসর রঙের মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছগুলো তাদের সুজটিল শাখা-প্রশাখাগুলো আকাশের পানে তুলে ধরে কেমন সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকত টিলার পাথরের উপর। কত স্বচ্ছন্দভাবে এবং নিরাপদে পাখিরা উড়ে বেড়াত সে বনভূমিতে। একবার এ বনভূমিতে কিছু হরিণ দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কিছু তীরন্দাজ শিকারী। বনভূমির মধ্যবর্তী পথ দিয়ে গাধার পিঠে কত সন্ন্যাসী যাওয়া আসা করত। এই সব কিছুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এ বনভূমির সঙ্গে।

মসৃণ সুন্দর চুল আর রক্তাক্ত মুখের উপর শীতের দিনের স্তিমিতম্লান সূর্যের আলো মেখে এই সব কিছু ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড। তার মুখ-চোখের উপর ফুটে উঠেছিল বিষাদঘন এক রহস্যময়তার ভাব।

থমথমে গম্ভীর মুখখানা নিয়ে তার রহস্যঘন চোখের এক বিষাদময় দৃষ্টি ছড়িয়ে ক্লিফোর্ড বলল, আর কোথাও নয়, শুধু এই জায়গাটাতে এলেই আমার মনে হয় আমার একটি পুত্রসন্তান থাকলে ভাল হত।

কনি শান্তভাবে বলল, এই বনটা তোমাদের পরিবারের থেকে অনেক পুরনো।

ক্লিফোর্ড বলল, তা ত বটেই। কিন্তু আমরা এতদিন এটা রক্ষা করে এসেছি। আমরা ছাড়া এ বন কে রক্ষা করবে? এই অংশটার মত গোটা বনটাই চলে যেত। পুরনো ইংল্যাণ্ডের নিদর্শনস্বরূপ এ বনটা রক্ষা করা আমাদের উচিত।

কনি বলল, তাই নাকি? কিন্তু প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের সংরক্ষণ করতে গিয়ে যদি নূতন যুগের বিরোধিতা করতে হয় তাহলে সেটা হবে সত্যিই দুঃখজনক।

ক্লিফোর্ড বলল, প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের এই সব অংশ বা নিদর্শন যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে ইংল্যাণ্ড দেশটারই কিছু থাকবে না; বিশেষ করে আমাদের মত লোকের যাদের এই ধরনের সম্পত্তি আছে আর আছে সম্পত্তিগত

অধিকারবোধ তাদের এটা পরম কর্তব্য।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইল।

কনি বলল, হ্যাঁ কিছুকালের জন্য।

ক্লিফোর্ড বলল, কিছুকালের জন্য মানে? এটা আমাদের এক বিরাট কর্তব্য। আমরা অবশ্য এর অল্পই করতে পারি। এই জায়গাটা আমাদের অধিকারে আসার পর থেকে আমাদের বংশের লোকেরা তাদের কর্তব্যের খুব অল্পই করতে পেরেছে। আমরা পুরনো প্রথাকে লঙ্ঘন করতে পারি, কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করতে পারি না।

আবার দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

কনি বলল, কিসের ঐতিহ্য?

ক্লিফোর্ড বলল, এই ধরনের প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্য।

কনি শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ।

ক্লিফোর্ড বলল, এই জন্যই ছেলের দরকার। পুত্রসন্তানই বংশধারার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখে।

কনির কিন্তু এই বংশধারার ধারাবাহিকতায় কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে কোন কথা বলল না সে শুধু ক্লিফোর্ডের এই সন্তানকামনার অদ্ভুত নির্বিশেষত্ব নিয়ে ভাবতে লাগল।

অবশেষে কনি বলল, আমরা কোন সন্তান পেতে পারি না এজন্য দুঃখিত আমি।

তার আয়তজ্ঞান চোখের নীলাভ দৃষ্টি ছড়িয়ে কনির পানে স্থিরভাবে তাকাল ক্লিফোর্ড। তারপর বলল, তুমি যদি অপর কোন লোকের দ্বারা একটি সন্তান ধারণ করতে পারতে তাহলে বড় ভাল হত আমাদের পক্ষে। আমরা যদি সে সন্তানকে এই র‍্যাগবিতে রেখে পালন করি তাহলে সে আমাদেরি সন্তান হবে এবং আমাদের বংশেরই নাম রাখবে। আমি আমার পিতৃত্বে খুব একটা বিশ্বাস করি না। কোন ছেলেকে এখানে রেখে মানুষ করে তুললেই সে আমাদের বংশের নাম রাখবে। সেইটাই যথেষ্ট। তুমি কথাটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করো না?

কনি এবার ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। হ্যাঁ। সন্তান—তার সন্তান। সে সন্তান হবে একান্তভাবে তার; ক্লিফোর্ডের কাছে সেটা একটা সামান্য ব্যাপার। কনি বলল, কিন্তু কে সে অপর লোক যার দ্বারা সন্তান লাভ করব?

সেটা কি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? তার সঙ্গে আমাদের খুব একটা গভীর সম্পর্ক নেই। একদিন তোমার এক প্রেমিক ছিল জার্মানিতে। তাতে কি যায় আসে এখন? কিছুই না। আমার মনে হয় এই সব ছোটখাটো কাজ বা সম্পর্ক যা আমরা বিভিন্ন সময়ে করে থাকি তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই আমাদের জীবনে। ওগুলো খুবই ক্ষণস্থায়ী। দুদিন পরে তারা আর থাকে না।

যেমন ধরো গত বছরের পড়া বরফ আর এ বছরে থাকে না।···জীবনে যা দীর্ঘদিন থাকে, যা স্থায়ী হয় তারই গুরুত্ব আছে জীবনে। যেমন আমার এই জীবন সে জীবন বিভিন্ন বিবর্তন ও স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। এ জীবনের মাঝে সাময়িক ক্ষণভঙ্গুর সম্পর্কের দাম কোথায়? বিশেষ করে সাময়িক যৌনসম্পর্ক? লোকে যদি তা নিয়ে হাস্যাস্পদভাবে বাড়াবাড়ি না করে তাহলে মানুষের এই সব যৌনসম্পর্ক বা সাময়িক দেহমিলনের ব্যাপারটা পাখিদের ক্ষণকালীন যৌন মিলনের মতই তুচ্ছ। তাতে কিছুই যায় আসে না। যে মিলন যে সঙ্গ যে সাহচর্য সারা জীবনব্যাপী স্থায়ী হয় তারই একটা গুরুত্ব বা মূল্য আছে। কার সঙ্গে আমরা দিনের পর দিন জীবন যাপন করি সেইটাই হচ্ছে আমাদের কাছে বড় কথা, কার সঙ্গে দু একদিন বিছানায় শুলাম বা ঘুমোলাম সেটা বড় কথা নয়। তুমি আমি দুজনে বিবাহিত। আমাদের দুজনের অভ্যাসগত ক্রিয়াকর্ম এক। এ ক্ষেত্রে আমাদের কার জীবনে ছোটখাটো দু-একটা ঘটনা কখন কি ঘটল তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মতে মানুষের যে ক্রিয়া অভ্যাসগত, যে ক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় দিনের পর দিন চলতে থাকে সে ক্রিয়া সাময়িক উত্তেজনা বা সংক্ষোভগত ক্রিয়ার থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। কোন সাময়িক উত্তেজনা বা আবেগ নয়, যা ধীরগতি, দীর্ঘস্থায়ী এবং পৌনপুনিক তাই আমাদের জীবনধারণে সহায়তা করে। দিনের পর দিন দুজনে বাস করতে করতে দুটি মানুষ এক গভীর অন্তরঙ্গতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের অন্তর এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্পন্দিত হতে থাকে পরস্পরের সুখে দুঃখে। এইটাই বিয়ের মূলমন্ত্র। এটা মোটেই যৌনক্রিয়ার ব্যাপার নয়। যৌন সম্পর্ক ত কখনই পারে না। তুমি আমি আমরা দুজনে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা যদি এই বন্ধনের প্রতি সারা জীবন শ্রদ্ধাশীল থাকি তাহলে যৌন ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সহজে বোঝাপড়া করতে পারি দুজনের মধ্যে। যেমন দাঁতে ব্যথা হলে আমরা দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাই। নিয়তি যখন আমাদের সামনে এক দেহগত বাধা এনে দিয়েছে তখন সে বাধা অপসারণের চেষ্টা করতেই হবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে এক ধরনের ভয় আর বিস্ময় অনুভব করতে লাগল কনি। সে বুঝতে পারল না ক্লিফোর্ড ঠিক বলছে না ভুল বলছে। সে মনে মনে বলল, তার হাতের কাছে রয়েছে মাইকেলিস। মাইকেলিসকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে এক সাময়িক প্রমোদভ্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘ দিনের অন্তরঙ্গতা, সুখ-দুঃখ আর সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে তাদের এই বিবাহিত জীবন। তবু মানুষের ক্লান্ত মন মাঝে মাঝে চায় সাময়িক প্রমোদ-ভ্রমণ। সে বিষয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রমোদভ্রমণের অর্থ হলো দুদিন পরেই আবার সেই অভ্যস্ত জীবনধারায় ফিরে আসা।

কনি এবার জিজ্ঞাসা করল, কার সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করেছি সে বিষয়ে তুমি কিছু মনে করবে না ?

ক্লিফোর্ড বলল, কেন কনি, তোমার স্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্তির উপরেই নির্বাচনের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। কারণ তাতে আমার বিশ্বাস আছে। তুমি নিশ্চয় কোন বাজে লোককে নির্বাচিত করবে না।

কনি ভাবছিল মাইকেলিসের কথা। ক্লিফোর্ডের মতে মাইকেলিস নিশ্চয়ই একটা বাজে লোক।

কনি বলল, কিন্তু বাজে লোকের ধারণা সব নরনারীর সমান নয়।

ক্লিফোর্ড বলল, তা অবশ্য নয়। তুমি নিশ্চয় আমার কথা ভেবে নির্বাচন করবে। তুমি অবশ্যই এমন লোককে নির্বাচন করবে না যে আমার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করত। তোমার মনের স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম তা তোমায় করতে দেবে না।

কনি চুপ করে রইল। যে যুক্তিতে অন্তর সায় দেয় না সে যুক্তির উত্তর দেওয়া অর্থহীন।

কনি চঞ্চলভাবে ক্লিফোর্ডের পানে চোখ তুলে বলল, তুমি কি চাও আমি কোন লোকের নাম বলি ?

ক্লিফোর্ড বলল, না, মোটেই না। সে নাম আমার পক্ষে না জানাই ভাল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবে যে সাময়িক যৌন সম্পর্ক সুদীর্ঘলালিত কোন দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে কিছুই নয়। তুমি কি আমার মতে মত দিতে পার না ? যৌন ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক প্রয়োজনীয় বস্তুরাজির অধীন। এখন এটা প্রয়োজন। অতএব এটা ব্যবহার করো। এই সব সাময়িক উত্তেজনার কি কোন দাম আছে ? দীর্ঘদিন ধরে এক অখণ্ড ও সুসংহত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা ও অখণ্ড জীবন যাপন করাই হলো মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। খণ্ডিত জীবন যাপনের কোন অর্থই হয় না। যৌন অভিজ্ঞতা বা যৌন তৃপ্তির অভাব যদি তোমার জীবনবোধকে খণ্ডিত করে রাখে তাহলে অবশ্যই কারো সঙ্গে প্রেমসম্পর্কের মধ্য দিয়ে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করো। যদি সন্তানের অভাব তোমার জীবনবোধকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তাহলে সম্ভব হলে যে কোনভাবে এক সন্তান লাভ করো। কিন্তু এই সব কিছু এমনভাবে করবে যাতে তুমি অখণ্ড জীবন যাপন করতে পার। এই অখণ্ড জীবনবোধই আমাদের ছিন্নভিন্ন প্রাণশক্তিগুলিকে এক দীর্ঘায়িত ঐক্য দান করে। তুমি আমি দুজনে মিলে তাই করতে পারি। তুমি কি মনে করো ? প্রয়োজনের সঙ্গে অবশ্যই আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে নিজেদের। কিন্তু আমরা যে জীবন যাপন করছি সে জীবনের সঙ্গে এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে যেন সংগতি থাকে। তুমি কি বলো ?

কথাগুলো শুনে স্তব্ধ ও অভিভূত হয়ে গেল কনি। সে বুঝল তত্ত্বগতভাবে ক্লিফোর্ড ঠিক বলছে। কিন্তু যখন বাস্তবে সে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে যৌথভাবে যাপিত তার জীবনের কথাটা ভাবল তখন কুণ্ঠার কাঁটা এসে বিঁধতে লাগল তার মনটাকে। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে চিরদিন ধরে এক যৌথ জীবনের জাল বুনে চলাই কি হবে তার একমাত্র বিধিনির্দিষ্ট কাজ? তার অমোঘ নিয়তির অনপনেয় লিখন? এর থেকে কোন অব্যাহতি নেই?

তাই কি? চিরদিন ধরে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে এক অখণ্ড জীবনের একখানি বস্ত্র বয়ন করেই কি তৃপ্ত থাকতে হবে তাকে? তবে হয়ত সে বস্ত্রের উপর থাকবে সাময়িক প্রমোদভ্রমণস্বরূপ কিছু ফুলের কারুকার্য। কিন্তু কি করে সে বলবে পরের বছর তার মনের ভাব তার মনের অনুভূতি কি থাকবে? কি করে তা জানা সম্ভব? বছরের পর বছর ধরে একই 'হাঁ' কথাটা কে বলে যেতে পারে? এই ছোট হাঁ কথাটা কোথায় উড়ে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে! যে কথা প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে যায় সে কথার পলাতক প্রতিশ্রুতিজালে কেমন করে একটি মানুষ সারাজীবন আবদ্ধ থাকতে পারে? উড্ডীয়মান প্রজাপতির মত এই হাঁ বা না কথাটা অন্য কথার চাপে কোথায় উড়ে যেতে পারে।

কনি বলল, তুমি ঠিক বলেছ ক্লিফোর্ড। যতদূর আমি বুঝছি আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। তবে আমার মনে হচ্ছে এর থেকে জীবনের একটি ভিন্ন মুখ আমরা দেখতে পাব।

ক্লিফোর্ড বলল, যতদিন জীবন তার নূতন মুখে নূতনরূপে দেখা না দেয় ততদিন ত তুমি একমত আছ আমার সঙ্গে?

কনি বলল, নিশ্চয়। একমত আছি।

একটা বাদামী রঙের কুকুর নাকটা তুলে ওদের দিকেই আসছিল। কনি সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। কুকুরটা মৃদু স্বরে শব্দ করছিল। কুকুরটার পিছু পিছু বন্দুক হাতে একটা লোক হঠাৎ ওদের সামনে এসে হাজির হলো। লোকটা এত দ্রুত এসে হাজির হলো যে কনি ভয় পেয়ে গেল। লোকটাও প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে ওদের সামনে একবার এসে অভিবাদন করে চলে গেল। ও হচ্ছে এ বনের নূতন রক্ষক ও পশুপালক।

লোকটার পরনে ছিল সেকেলে ধরনের ঘন সবুজ রঙের মখমলের পোষাক। তার মুখটা লালচে ধরনের। তার মোচটাও লাল। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ভাসা ভাসা, কেমন যেন দূরগামী। ঢালু পথটা দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছিল সে

ক্লিফোর্ড ডাক দিল, মেলর্স।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে সৈনিকের মত অভিবাদন জানাল ক্লিফোর্ডকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি চেয়ারটা ঘুরিয়ে একটু চালিয়ে দেবে?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে শান্ত অথচ দ্রুত ভঙ্গিতে চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়াল। সে মাঝামাঝি ধরনের লম্বা; চেহারাটা দোহারা। কথা প্রায় বলেই না। সে কনির দিকে একবার তাকালও না, শুধু চেয়ারটার উপরেই নিবদ্ধ রাখল তার দৃষ্টি।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি, এ আমাদের বাগানের নূতন মালী। মেলর্স, তুমি তোমার গিন্নীমার সঙ্গে কথা বলনি এখনো?

শান্ত ও নির্বিকার কণ্ঠে লোকটি বলল, না স্যার।

লোকটি দাঁড়িয়ে তার টুপীটা মাথা থেকে তুলল। তার মাথার ঘন সুন্দর চুলগুলো দেখা গেল। এরপর সে কনির মুখপানে তার স্থির আয়ত অথচ নির্বিকার দৃষ্টি মেলে ভাল করে তাকাল, যেন কনি কি ধরনের মেয়ে তা সে খুঁটিয়ে দেখে নিল। কনি কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেল। লোকটি তার টুপীটা বাঁ হাতে ধরে কনির উদ্দেশ্যে মাথাটা একটু নত করল। কিন্তু কোন কথা বলল না। টুপীটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

কনি তাকে বলল, তুমি হয়ত এখানে বেশ কিছুদিন আছ?

সে তখন শান্তভাবে বলল, আট মাস ম্যাডাম।

কনি আবার বলল, জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়?

কথাটা বলে লোকটার মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটা তার চোখ দুটো কিছুটা সংকুচিত করে কনির পানে তাকাল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা শ্লেষ আর নির্লজ্জতার ভাব ছিল।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, ধন্যবাদ।

কথাটা বলেই মাথাটা একটু নত করে টুপীটা পরে চেয়ারটা ধরার জন্য এগিয়ে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে। তার শেষ কথাটার মধ্যে একটা আঞ্চলিক টান ছিল। তবে তার মধ্যে একটা কৃত্রিম সচেষ্টতা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ এর আগে সে যে সব কথা বলেছিল তার মধ্যে কোন আঞ্চলিকতার ছাপ ছিল না। হয়ত সে একজন প্রচ্ছন্ন ভদ্রলোক। যাই হোক, আর পাঁচজন লোক থেকে সে পৃথক, একক এবং আত্মস্থ, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এদিকে ক্লিফোর্ড এঞ্জিনটা চালাতে শুরু করল। লোকটা চেয়ারটার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে তারা সমতলবর্তী বনের দিকে এগিয়ে চলল।

লোকটি বলল, হয়েছে ত স্যার ক্লিফোর্ড?

ক্লিফোর্ড বলল, না তুমি সঙ্গে এস, যদি কোথাও আটকে যায়। উঁচু-নিচু পথের পক্ষে এঞ্জিনটা তত ভাল নয়।

লোকটি তখন কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে কুকুরটার পানে তাকাল। কুকুরটা তার পানে তাকিয়ে তার লেজ নাড়ল। একটুখানি মৃদু উপহাসের হাসি ফুটে উঠল লোকটির মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। ঢালু পথটা বেয়ে ওরা নেমে যেতে লাগল। লোকটি তার হাতদুটো চেয়ারের হাতলে রেখে

এগিয়ে চলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের ভৃত্য নয়, একজন স্বাধীন সৈনিক। তাকে দেখে টমি ডিউকের কথা মনে পড়ছিল কনির।

ওরা হেজেল বনের কাছে আসতেই কনি ওদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গিয়ে গেটের দরজাটা খুলে ধরে রইল। সে যখন গেটের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন গেটটা পার হবার সময় ওরা দুজনেই একসঙ্গে তাকাল তার পানে। ক্লিফোর্ডের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষের ভাব আর লোকটার দৃষ্টির মধ্যে ছিল এক শান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মনিরপেক্ষতার ভাব। কিন্তু আত্মনিরপেক্ষ হলেও সে দৃষ্টির মধ্যে উত্তাপ ছিল। তার নীল নির্বিকার চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে কনি দেখল, সে দৃষ্টির মধ্যে এক দীর্ঘ দুঃখভোগ আর অনাসক্তির ভাব ছিল। তার চোখে কিছু উত্তাপও ছিল। কিন্তু কেন সে একা একা থাকে? কেন আর পাঁচজন থেকে সে পৃথক? সৌজন্যসহকারে ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা থামাল গেটটা পার হয়ে। লোকটি তাড়াতাড়ি গিয়ে গেটটা বন্ধ করে দিল।

ক্লিফোর্ড কনিকে বলল, তুমি কেন গেটটা খুলতে গেলে? মেলর্স রয়েছে, ও খুলত।

শান্ত কণ্ঠে ক্লিফোর্ড কথাটা বললেও তার কথা শুনে বোঝা গেল সে অসন্তুষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে কনির প্রতি।

কনি বলল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা চলে যাবে গেটটা খোলা পেলে।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমাকে আমাদের পিছনে ছোটবার জন্য ফেলে যাব?

কনি বলল, আমি মাঝে মাঝে ছুটতে চাই।

মেলর্স আবার চেয়ারটা ধরে এগিয়ে চলল। সে যেন এসব কোন কথায় কান দেয়নি এমন একটা ভাব দেখাল। কিন্তু কনির মনে হলো সে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। সে যখন পার্কের উঁচু জায়গাটায় চেয়ারটা ঠেলছিল তখন হাঁপাচ্ছিল। তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে ছিল। তার দেহটা রোগা রোগা, কিন্তু অদ্ভুতভাবে প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর। রোগা হলেও সে শান্ত প্রকৃতির। কনির নারীমন খুঁটিয়ে দেখে এই সব বুঝতে পারল।

কনি ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়ল। ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা চলে যাক। দিনের আলো সব নিবে গিয়ে ধূসর হয়ে উঠছিল চারদিক। দিগন্তে ঢলে পড়া আকাশটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল কুয়াশায়। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। শীঘ্রই বরফ পড়তে শুরু করবে। চারদিক শুধু ধূসর আর ধূসর। একেবারে নিস্তেজ প্রাণহীন দেখাচ্ছিল সারা পৃথিবীটা।

উঁচু পথটায় উঠে গিয়ে চেয়ার থেকে পিছন ফিরে তাকাল ক্লিফোর্ড। বলল, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

কনি বলল, কই না ত।

কিন্তু সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কনি। ক্লান্ত পুরাতন এক কামনার ব্যাকুলতা, এক অদম্য অতৃপ্তি আবার মাথা তুলে উঠল তার মধ্যে। ক্লিফোর্ড তা লক্ষ্য করেনি। এ সব সে কোনদিনই লক্ষ্য করে না। এ সব তার কাছে লক্ষ্যনীয় বস্তু নয়। কিন্তু কনির নবপরিচিত লোকটি এ সব লক্ষ্য করেছে মনে হলো। কনির মনে হলো সমস্ত জগৎ ও জীবন অতিশয় প্রাচীন আর প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। মনে হলো, তার অতৃপ্তি ঐ পাহাড়টার থেকেও পুরনো।

ওরা বাড়ির কাছে আবার ফিরে এল। কিন্তু তখন যান্ত্রিক চেয়ারটা হতে তার বাড়ির চাকাওয়ালা চেয়ারটায় নিজে থেকেই উঠে বসল। তারপর কনি তার অসাড় পাদুটো তুলে দিল। কনি যখন তার পাদুটো হাত দিয়ে তুলছিল তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা ঘুরিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মেলর্সকে বলল, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ মেলর্স।

মেলর্স যেন কি ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে আনমনে বলল, আর কোন কাজ নেই স্যার?

না।

নমস্কার স্যার।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে কনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মেলর্সকে লক্ষ্য করে বলল, উঁচু পথে চেয়ারটা দয়া করে ঠেলে নিয়ে গিয়ে অনেক উপকার করেছ। তোমার কি খুব ভারী লাগছিল?

সহসা কনির প্রতি সচেতন হয়ে উঠল মেলর্স। ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠে যেন সে কনির পানে তাকাল চোখ মেলে। বলল, না না। মোটেই ভারী লাগেনি।

তারপর তার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, নমস্কার ম্যাডাম।

খাবার সময় ক্লিফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল কনি, লোকটা কে?

ক্লিফোর্ড বলল, মেলর্স, তুমি ত দেখলে।

হাঁ দেখেছি। কিন্তু লোকটা কোথা থেকে এসেছে?

কোথাও থেকে নয়, ও এখানকারই এক খনিশ্রমিকের ছেলে।

ও নিজেও কি খনিশ্রমিকের কাজ করত?

ক্লিফোর্ড বলল, ও আগে কামারের কাজ করত খাদের ধারে। যুদ্ধের দুবছর আগে ও আমাদের বাগানের মালী হিসাবে ঢোকে। তারপর যুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধ থেকে ও ফিরে এসে আবার কামারের কাজ শুরু করতে গেলে আমি ওকে এ কাজে নিযুক্ত করি, কারণ লোকটা সম্বন্ধে বাবার একটা ভাল ধারণা ছিল। আমি ওকে পেয়ে খুশি, কারণ এ কাজে ভাল লোক পাওয়াই যায় না। বিশেষ এমন একজন লোক যে এখানকার লোকদের চেনে।

লোকটি কি বিবাহিত?

হ্যা, বিয়ে একটা হয়েছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে যায়। এর ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। শেষে এক খনিশ্রমিকের সঙ্গে ঘর করতে থাকে। এখনো সেখানেই আছে।

তাহলে লোকটি একাই এখানে থাকে ?

ক্লিফোর্ড তার উপর ম্লান চোখ তুলে কনির পানে তাকাল।, তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট হয়ে উঠল সে যেন শুধু তার জীবনপথের সামনেটুকুই দেখতে পাচ্ছে, সেইটুকুর প্রতিই সচেতন পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু সে পথের অতিক্রান্ত সমগ্র পশ্চাদভূমিটি ধোঁয়া-ধোঁয়া এক নিবিড় কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সহসা তার মনে হলো পিছনের সেই কুয়াশাটা তার সামনে এসে হাজির হয়েছে। সে যখন মেলর্সএর জীবনকথা বলার সময় কনির পানে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিল তখন কনির মনে হচ্ছিল ক্লিফোর্ডের মনের সমগ্র পটভূমিটা জুড়ে বিরাজ করছে কুয়াশাঘেরা এক অন্তহীন শূন্যতা। তা দেখে ভয় পেয়ে গেল কনি। তার মনে হলো এই শূন্যতাই এক অর্থহীন ঔদাসীন্য আর অজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে ক্লিফোর্ডের মধ্যে।

সহসা মানবাত্মার এক সাধারণ নিয়মের প্রতি অস্পষ্টভাবে সচেতন হয়ে উঠল কনি। মানুষের আবেগানুভূতিশীল আত্মা যে আঘাত লাভ করে সে আঘাত তার দেহকে স্পর্শ করে না। কিন্তু দেহের আঘাত যেমন ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে তেমনি আত্মা বা মনের আঘাতও আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু এই আরোগ্যতা আপাতসত্য মাত্র। মন সে আঘাত আবার অনুভব করতে থাকে ধীরে ধীরে, ঠিক যেমন দেহগত গভীর ক্ষতস্থানের ব্যথাটি দেহের অভ্যন্তরভাগে গিয়ে অনুভূত হতে থাকে ধীরে ধীরে। যখনি আমাদের মনে হয় মন বা আত্মার সে আঘাত থেকে আরোগ্য হয়ে উঠেছি তখনি ভয়ঙ্কর-ভাবে অনুভূত হতে থাকে সে আঘাতের ব্যথা।

ক্লিফোর্ডেরও তাই হলো। র‍্যাগবিতে আসার পর একবার তার মনে হলো সে একেবারে সেরে উঠেছে দেহেমনে। দেহগত বিপর্যয়ের জন্য যে আঘাত সে মনে পায় লেখালেখি করার সময় ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে সে আঘাতের ব্যথা দীর্ঘ দিন পর জীবনে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সে। তার মনের ভারসাম্য আবার সে ফিরে পায়। কিন্তু আজ কনির মনে হলো কয়েক বছর পর সেই কঠিন শঙ্কা আর বিপন্ন ভাবটা আবার যেন ফিরে এসেছে ক্লিফোর্ডের মনে। তার মনের সমগ্র পটভূমি জুড়ে সে ভাব সে আঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এক সময় সে আঘাতের ব্যথাটা এত গভীর ছিল যে তা সে অনুভব করতেই পারত না। মনে হত, ব্যথাটা যেন আর একেবারেই নেই। আজ আবার সে ব্যথা দেখা দিয়েছে। পক্ষাঘাত রোগের মত সেই কঠিন শঙ্কাটা ছড়িয়ে পড়ছে তার মনে। মনে মনে আজও সে সতেজ এবং সজীব থাকলেও সেই আঘাতজনিত ক্ষতের ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিহত আত্মায়।

কনির মনে হলো শুধু ক্লিফোর্ডের মনে বা আত্মায় নয়। সে আঘাতের ব্যথাটা তার মনেও ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। একটা নিগূঢ়নিবিড় শঙ্কা, একটা শূন্যতা, সব কিছুর প্রতি একটা ঔদাসীন্য আর অনাসক্তি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে তার সমগ্র অন্তরাত্মা জুড়ে। একটু পরে ক্লিফোর্ডের চমক ভাঙলে সে চমৎকারভাবে কথা বলতে লাগল। যেমন একটু আগে বনভূমিতে বেড়াতে বেড়াতে তাকে সন্তান ধারণের কথা ও র‍্যাগবির উত্তরাধিকারীর কথা বলছিল। কিন্তু একদিন পরেই সেই সব কথা শুকনো ঝরা পাতার মতই অর্থহীন মনে হলো কনির যে কথার পাতা একটু পরেই গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাবে যে কোন দমকা বাতাসে। সে কথা কোন ফলপ্রসূ জীবন-বৃক্ষের অঙ্গীভূত কোন সজীব পাতা নয়, সে কথা হলো বন্ধ্যাবিশুষ্ক এক ব্যর্থ জীবনের ঝরা পাতা।

এই শুকনো ঝরা পাতা শুধু ক্লিফোর্ডের জীবনে নয়, সর্বত্র দেখতে পেল কনি। ত্রেভারশালের খনিশ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের কথা বলছিল। কনি এই ধর্মঘটের কথার মধ্যে কোন প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেল না, পেল এক অবদমিত সংগ্রামের পুনরুদ্দীপিত এক উদ্দামতার পরিচয়। এই উদ্দামতা আজ নূতন করে এক অশান্তির বেদনা, এক অতৃপ্তির আবেশ জাগিয়ে তোলে মনের মাঝে। এ সংগ্রামের প্রবৃত্তি ঢুকে গেছে উভয়পক্ষের রক্তের গভীরে এবং এ সংগ্রামের অবসানের জন্য উভয় পক্ষকেই বংশানুক্রমে রক্ত দান করে যেতে হবে।

হায়, বেচারী কনি। একটা শূন্যতাবোধ, একটা অনস্তিত্বের আশঙ্কা আচ্ছন্ন করে ফেলল তার সমগ্র মনকে। ক্লিফোর্ড ও তার দুজনেরই মন এ শূন্যতাকে অনুভব করতে শুরু করল। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, তাদের দুজনের অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা যা শুধু একটা মনগড়া অন্তরঙ্গতার অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা দুদিন পরে একটা মিথ্যা শূন্যতায় হবে পর্যবসিত। এ শুধু কথার কথা। সব মিথ্যা, এক্ষেত্রে একমাত্র সত্য হলো শূন্যতা, অন্তহীন অর্থহীন শূন্যতা।

ক্লিফোর্ড অবশ্য সাফল্য লাভ করেছে। সেই পথকুক্কুরীর কৃপালাভ করেছে। একথা সত্য যে সে এখন অনেকটা খ্যাতি লাভ করেছে। তার বই থেকে হাজার পাউণ্ড সে পেয়েছে। তার ছবি এখন সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। চিত্রশালায় তার আবক্ষ মূর্তি সংরক্ষিত আছে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে আধুনিক বলে গণ্য করা হয়। প্রচারের জন্য লালায়িত তার পঙ্গু ও বিকৃত প্রবৃত্তির দৌলতে সে মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যেই তরুণ উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ও খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্লিফোর্ডের লেখার মধ্যে বুদ্ধির ব্যাপারটা কোথা থেকে কিভাবে এল। একটা দিকে খুবই চালাক ক্লিফোর্ড। সে তার লেখার মধ্যে কিছুটা হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষ আর তার যৌন প্রবৃত্তিগুলোকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা ছিন্নভিন্ন

করে দিয়েছে। কিন্তু তার কাজটা কুকুর-ছানাদের ঘরের সোফার গদি ছেঁড়ার মতই অর্থহীন। তবে তফাৎটা এই যে ক্লিফোর্ড বয়সে কুকুরছানার মত নবীন নয়, তার বয়স হয়েছে এবং সে একগুঁয়ে আর অহংকারী। সমস্ত ব্যাপারটাই কনির কাছে ভুতুড়ে আর অর্থহীন। এই কথাটাই কনির অন্তরাত্মার তল-দেশের গভীরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বারবার, আসলে এগুলো কিছুই না। শুধু এক অর্থহীন শূন্যতার বিস্ময়কর ও বর্ণাঢ্য প্রকাশমাত্র। শুধু এক বর্ণাঢ্য প্রকাশ। অর্থহীন আত্মপ্রচার।

ক্লিফোর্ডকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে একটা নাটক লিখছে মাইকেলিস। প্রথম অঙ্ক ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে। কনির মতে এর কারণ হলো, এই অসার শূন্যতার প্রচারের দিক থেকে ক্লিফোর্ডের থেকে মাইকেলিস বেশী পারদর্শী। আত্মপ্রচারই এই লোকগুলোর জীবনের একমাত্র ধর্ম। এই আত্মপ্রচারের আবেগ ওদের অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে এ ছাড়া আর ওরা কিছুই জানে না। যৌন ব্যাপারে ওদের কোন আবেগ নেই, উৎসাহ নেই ; এ ব্যাপারে ওরা একেবারে মৃত। মাইকেলিস এখন আর টাকা চায় না, চায় আত্মপ্রচার। কখনই তা চায়নি, আত্মপ্রচারের পথে যেতে যেতে ঘটনাক্রমে যা পেয়েছে তাই নিয়েছে। ক্লিফোর্ডও তা চায়নি, যখন যা পেয়েছে নিয়েছে। তাছাড়া টাকাটা সাফল্যের সীলমোহর বলে এই টাকা ওদের করতে হয়েছে। ওরা চেয়েছিল সাফল্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল টাকা। আসলে এই দুটোই আত্মপ্রচারের চরম উপাদান বলে ওরা এই দুটোই চেয়েছিল। চেয়েছিল এই চূড়ান্ত আত্মপ্রচারের মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য জনগণের হৃদয় জয় করতে।

সত্যিই কি আশ্চর্যের কথা! সেই পথকুকুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি করা। কনির কাছে এর কোন দাম নেই, এসব অর্থহীন, অসার শূন্যতা, কারণ সে এ সবের বাইরে আছে চিরদিন, কারণ ওদের এই সব সাফল্যের ঘটনা রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগাতে পারেনি কোনদিন। যদিও যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য বার সেই পথকুকুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি করে এসেছে তবু কনি জানে আসলে এ সাফল্যের কোন মূল্য নেই, কোন অর্থ নেই, কোন সারবত্তা নেই। মাইকেলিস একদিন ক্লিফোর্ডের কাছে চিঠি লিখে জানাল নাটকটার কথা। একথা সে আগেই জানত। কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলকের শিহরণ জাগল ক্লিফোর্ডের মধ্যে। এর মাধ্যমেও তার প্রচার ঘটবে। এ ক্ষেত্রে সে নিজে নিজের প্রচার করছে না, প্রচার করছে অন্য জন। ক্লিফোর্ডকে নাটকটার প্রথম অঙ্ক নিয়ে র‍্যাগবিতে আসতে বলল।

মাইকেলিস এল গ্রীষ্মকালে। তার পরনে ছিল হালকা রঙের সুট। হাতে ছিল সাদা দস্তানা। আর কনির জন্য কিছু ফুল। ফুলগুলো সত্যিই ছিল

বড় সুন্দর। নাটকের প্রথম অঙ্কটা সত্যিই চমৎকার হয়েছে। ক্লিফোর্ডের মত সেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তা পড়ে। তার দেহের মধ্যে যেটুকু অস্থিমজ্জা অবশিষ্ট ছিল তা শিহরিত হয়ে উঠল। মানুষের মধ্যে এই রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগানোর এক বিরল ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারায় মাইকেলিসকে বিস্ময়কর-ভাবে সুন্দর দেখাচ্ছিল কনির চোখে। কনি মাইকেলিসের মধ্যে খুঁজে পায় প্রাচীন সেই মানবজাতির এক সনাতন অপরিবর্তনীয়তার ছবি, যে মানুষ তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পবিত্রতা সম্পর্কিত ভাবমূর্তি হতে মোহমুক্ত হতে চায় না কোনক্রমে। সেই পথকুক্কুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপারে মাইকেলিস যেন হাতির দাঁতের এক আফ্রিকান মুখোস যা পবিত্রতার মাঝে অপবিত্রতার স্বপ্ন দেখে।

যে মুহূর্তে মাইকেলিস চ্যাটার্লি পরিবারের এই নায়ক-নায়িকাকে আনন্দে আত্মহারা করে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই মুহূর্তটি তার জীবনে যেন সবচেয়ে মূল্যবান এক চরম মুহূর্ত। সত্যিই সে সফল হয়েছে। সার্থক হয়েছে তার শ্রম। তাদের সে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষণিকের জন্য হলেও ক্লিফোর্ডও তাকে ভালবেসে ফেলে।

পরের দিন সকালে মিককে দারুণ অশান্ত ও চঞ্চল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিসের একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করছে সে। কনি গত রাতে তার কাছে আসেনি।···মিক কনির শোবার ঘর খুঁজে পায়নি রাতে। তার এই জয়ের গৌরবময় মুহূর্তে কনি যেন ছলনা করছে তার সঙ্গে।

সকাল হতেই তাই মিক সোজা কনির বসার ঘরে চলে গেল। কনি জানত সে আসবে। মিকের মধ্যে চঞ্চল ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মিক তার নাটকের কথা জানতে চাইল কনির কাছ থেকে। জানতে চাইল নাটকটা তার ভাল লাগছে কি না। এ নাটকের প্রশংসা কনির মুখ থেকে শুনতে চায় সে। এ প্রশংসা হৃদয়ে তার তার যে শিহরণ জাগাবে সে শিহরণ যে কোন যৌন-তৃপ্তিসঞ্জাত শিহরণের থেকে অনেক বেশী দামী। কনি আবেগের সঙ্গে তার প্রশংসা করল। কিন্তু মুখে এ কথা সে বললেও অন্তরের গভীরে সে বেশ বুঝতে পারছিল আসলে ওটা কিছুই হয় নি।

হঠাৎ মিক বলে বসল, দেখ, কেন আমরা পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটার মোকাবিলা করছি না? কেন আমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি না?

কনি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। কিন্তু আসলে কথাটার মধ্যে কোন গুরুত্ব সে খুঁজে পেল না। সে শুধু বলল, কিন্তু আমি ত বিবাহিত।

মিক বলল, তাতে কি হয়েছে। ও না হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ করবে। তুমি আমি কেন আমরা বিয়ে করছি না? আমি এখন বিয়ে করতে চাই। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়। এখন আমাকে বিয়ে করে নিয়মিত

সংসার-জীবন যাপন করতে হবে। আমি কি ভয়ংকর জীবন যাপন করছি তা ভেবে দেখ একবার। আমি শুধু নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি। একবার ভেবে দেখ, আমরা দুজনে পরস্পরের জন্যই তৈরি হয়েছি। যেমন হাত আর দস্তানা, অভিন্নহৃদয় দুজনে। কেন তবে বিয়ে করছি না আমরা? এর কারণ তুমি কিছু জান কি?

কনি মিকের দিকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কিন্তু মিকের এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন গুরুত্ব অনুভব করল না। তার মনে হলো, এই সব পুরুষগুলো সকলেই স্বভাবতঃ এক। তারা সব কিছু প্রকাশ করে ফেলতে চায়। কোন কিছু গোপন করে রাখতে পারে না। তারা আতসবাজীর মত মাথা ফুঁড়ে ফেটে বেরিয়ে পড়ে আকাশের পানে ছুটে যেতে চায়।

কনি বলল, কিন্তু আমি বিবাহিত। তুমি জান ক্লিফোর্ডকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না।

মিক জোর গলায় বলল, কেন পার না? তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার ছ' মাস পরেও সে জানতে বা বুঝতে পারবে না। সে একমাত্র নিজের ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখে না আমি যতদূর দেখছি তোমাকে ভদ্রলোকের কোন প্রয়োজনই নেই। সে একেবারে নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে আছে।

একথার সত্যতা বুঝতে পারল কনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারল যে মিক নিঃস্বার্থভাবে একথা বলছে না, তার একথার মধ্যেও আছে আত্মপ্রচারের মোহ।

কনি বলল, সব মানুষই কি নিজেকে নিয়ে মত্ত হয়ে নেই?

মিক বলল, আমি স্বীকার করি অল্পবিস্তর সব মানুষই তাই। বাঁচতে হলে সকলকেই তাই করতে হবে। কিন্তু সেটা এমন বড় কথা নয়, বড় কথা হলো এই যে, একটা মানুষ কতখানি সময় তার স্ত্রীকে দিতে পারবে। যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি বেশী সময় দিতে না পারে তাহলে তার স্ত্রীর উপর কোন অধিকারই নেই।

এবার মিক তার চোখগুলো বড় বড় করে কনির মুখপানে তাকাল। তারপর আবার বলল, আমি এখন কোন নারীকে তার প্রয়োজনমত অনেক সময় দান করতে পারি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কি ধরনের সময়? প্রশ্নটা করেই মিকের দিকে তাকাল কনি। তার দৃষ্টির মধ্যে তখনো ছিল সেই বিস্ময় আর রোমাঞ্চকর মাদকতা। তবু মিকের কথার মধ্যে কোন গুরুত্ব খুঁজে পেল না সে।

মিকের প্রতিটি কথার মধ্যে এক বিজয়গর্বের উদ্দামতা আর উজ্জ্বলতা ফেটে পড়ছিল। কনি তার দিকে তেমনি এক আপাতমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মিক তার সামনে যে উজ্জ্বল লোভনীয় ছবি তুলে ধরল তাতে তার

মনের উপরিপৃষ্ঠে বিস্ময়ের যত রোমাঞ্চই জাগুক না কেন তার মনের গভীরতম তলদেশে কোন অনুভূতিই জাগল না সে ছবির উদ্দীপনায়। সে মিকের দিকে তেমনিই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কিন্তু অন্তরে কিছুই অনুভব করল না। শুধু তার কথার মধ্যে, আশ্বাসের উজ্জ্বল নিবিড়তার মধ্যে সেই কুজুরীদেবীর একটা গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিকর। কেমন যেন দুঃসহভাবে উৎকট।

তার চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে রইল মিক। কনির উপর নিবদ্ধ তার অপ্রকৃতিস্থ চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ছড়িয়ে তখনো সেইভাবে তাকিয়ে রইল। তার প্রস্তাবের উত্তরে কনি কি বলবে সে বিষয়ে অহঙ্কার না আশঙ্কা কি ছিল তার মনে তা তার দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

কনি বলল, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। এখনি কিছু বলতে পারছি না। তোমার মনে হচ্ছে ক্লিফোর্ড আমার উপর গুরুত্ব দেয় না কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেন তা তার দেহগত অসামর্থ্য বা পঙ্গুতার কথা বিবেচনা করে বোঝা উচিত।

রেখে দাও ও সব কথা। একটা লোক যদি তার পঙ্গুতাকে ভাঙ্গিয়ে সারা-জীবন খায়, যদি তার এই পঙ্গুতা ছাড়া আর কোন গুণ না থাকে তাহলে কি বলতে হয়? তার থেকে তার একা থাকাই ভাল সারাজীবন।

কথাটা বলে তার পায়জামার পকেটের ভিতরে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল মিক। সেদিন সন্ধ্যায় সে কনিকে বলল, আজ রাতে আমার ঘরে আসছ ত? তোমার ঘরটা কোথায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।

কনি বলল, ঠিক আছে।

সেদিন রাতে মিকের যৌন উত্তেজনার পরিমাণটা বেশী মনে হলো আগের থেকে। তবু তার নগ্ন দেহটা ছোট ছেলের মতই কেমন যেন অপুষ্ট ও অশক্ত মনে হচ্ছিল কনির। তাদের সঙ্গম শুরু হলে কনি তার অন্তানন্দ পাওয়ার আগেই অর্থাৎ তার চরম মুহূর্তটা আসতে না আসতেই মিকের কাজ শেষ হয়ে গেল। শায়িত হয়ে পড়ল তার শক্তোত্থিত লিঙ্গটি অথচ মিকের গোপনাঙ্গের এই নগ্নতা ও তার অনুত্থিত লিঙ্গের মেদুরতা কনির কামনা ও যৌন ক্ষুধাকে দুর্বারভাবে জাগিয়ে তুলল। সে ক্ষুধা তৃপ্ত করার জন্য তার পাছা দুলিয়ে এক আদিম উদ্দামতায় সক্রিয় হয়ে উঠল কনি আর মিক তার তলায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বীরের মত পড়ে রইল। তার চরম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত এইভাবে এক বিপরীত রতি যৌনক্রিয়ায় মেতে রইল কনি। পরে সে তার আকাঙ্ক্ষিত যৌনতৃপ্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তৃপ্তিসূচক শব্দ করল।

কনির কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মিক কিছুটা তিক্তভাবে বলল, তোমরা পুরুষদের মত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পার না। আরো আগে আমাকে তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

মিকের কথাটা এই মুহূর্তে বিরাট হয়ে দেখা দিল কনির জীবনে। কারণ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকাটাই মিকের একমাত্র সঙ্গম-প্রক্রিয়া। একে তার পুরুষোচিত যৌন সক্রিয়তা বা সামর্থ্য নেই, তার উপর সে যদি এই নিষ্ক্রিয়তার মাঝেও কনিকে এই সময় দান না করে, যদি সে এতেও বিরক্তি বোধ করে তাহলে কি করে চলতে পারে?

কনি বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

মিক বলল, তুমি জান আমি কি বলতে চাইছি। আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তোমার কাজ চালিয়ে যাও এবং তুমি নিজে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকতে হয়

ঠিক এই মুহূর্তে কনি যখন এক অনির্বচনীয় পুলকের শিহরণ তার সারা অঙ্গে অনুভব করছিল, যখন মিকের প্রতি একটা ভালবাসা তার দেহগত অস্তিত্বের গভীর হতে উঠে আসতে শুরু করছিল ঠিক তখনি মিকের এই কথার তিক্ততাটা এক অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতায় আঘাত হানল কনির মনে। মিকের এটা বোঝা উচিত আজকালকার বেশীর ভাগ পুরুষ মানুষদের মত তার যখন যৌনক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তখন মেয়েদের সক্রিয় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

কনি বলল, কিন্তু আমি তৃপ্তি পাই এটাও তুমি চাও ত?

একটুখানি ম্লান হাসি হাসল মিক। তা আমি চাই। তা অবশ্য ভাল। তবে তুমি যখন আমার বদলে কাজ চালিয়ে যাবে আমাকে দাঁত চেপে শুয়ে থাকতে হবে।

কনি বলল, তা কি তুমি একান্তই চাও না?

এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মিক। সে বলল, সব মেয়েগুলোই এই একরকম। হয় তারা সঙ্গমকালে পুরুষদের ছাড়তে চায় না, মড়ার মত তাদের উপর পরে থাকে বা জড়িয়ে থাকে অথবা সে একেবারে ক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত তার উপর পীড়ন চালিয়ে যাবে। আমি একটা মেয়েকেও দেখলাম না যে সঙ্গমকালে আমার সঙ্গে একই সময়ে তার যৌনক্রিয়া শেষ করে ছেড়ে দিল আমাকে।

কনি পুরুষদের যৌনক্রিয়াসম্পর্কিত এই সব তথ্য ভাল করে শুনল না। তার বিরুদ্ধে মিক যে অভিযোগ এনেছে তা শুনে সে শুধু অভিভূত হয়ে পড়ল। তার প্রতি মিকের এই নিষ্ঠুরতার অর্থ ঠিক সে বুঝতে পারল না। তার শুধু মনে হতে লাগল সে একেবারে নির্দোষ এ ব্যাপারে।

কনি আবার বলল, আমি তৃপ্তি পাই এটা তুমি নিশ্চয় চাও। তা চাও না কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক, আমি অবশ্যই তা চাই। তবে তুমি কখন তৃপ্তি পাবে তার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলব···

এটা কিন্তু কনির জীবনে চরম আঘাত। মিকের এ কথা, এ অভিযোগ তার জীবনের পরম আকাঙ্খিত কি একটা বস্তুকে যেন হত্যা করে ফেলল। সে কিন্তু এ সঙ্গমের ব্যাপারে মাইকেলিসকে কখনই চায়নি। মাইকেলিসই এ বিষয়ে প্রথম তৎপর হয়ে এ কাজ শুরু করে। তার আগে এ ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মাইকেলিস যখন যৌনসংসর্গের এ কাজ শুরু করে তখন অবশ্যই তার থেকে তার যৌনতৃপ্তি লাভ করতে হবে। তাকে সেই চরম মুহূর্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে আর এই তৃপ্তির জন্যই সে রাত্রিতে সে তাকে হঠাৎ ভালবেসে ফেলে। তাকে সে বিয়ে পর্যন্ত করতে চায় মনে মনে। একথা মিকও হয়ত ধরতে পারে হয়ত এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অবচেতন মনের গভীরে আর সেই জন্যই হয়ত অকস্মাৎ এক শক্ত কথার অপ্রত্যাশিত আঘাতে বৈবাহিক বন্ধনের ব্যাপারটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চায় সে, দুদিনের জন্য বাঁধা তাদের ঘরটাকে ভেঙ্গে দিতে চায় সেই রাত্রিতে মিকের প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি তার নিগূঢ়নিবিড় আসক্তিটা তার নারীসত্তার গভীরে জেগে উঠতে না উঠতেই ঘুমিয়ে পড়ে তা চিরদিনের মত। মিকের কাছ থেকে তার জীবনটাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিল সে যাতে তার মনে হলো মিক বলে কোন লোকের অস্তিত্বই ছিল না কখনো। যেন সে লোকটা কখনো কোনদিন আসেনি তার জীবনে।

এর পর থেকে আবার নীরসভাবে একঘেঁয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি করে চলল কনি। ক্লিফোর্ড যে জীবনকে অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা বলে অভিহিত করে সেই শূন্য অসার জীবনের দুর্বিসহ বৃত্তের মধ্যে আবার আগের মতই ঘুরপাক খেতে লাগল কনি। ঘুরপাক খেতে লাগল অন্তহীনভাবে। মনের দিক থেকে পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে থেকেও শুধু এক অভ্যাসগত সান্নিধ্যে দুজনে পাশাপাশি বাস করে যেতে লাগল একই বাড়িতে।

সেই শূন্যতা। সেই অর্থহীনতা। যে বস্তুটাকে তাদের এই যৌথ জীবন-যাপনের পবিত্রতম লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে আসলে সেটা অর্থহীন অসার এক শূন্যতা আর সেই শূন্যতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে তাদের। দিনের পর দিন যন্ত্রচালিতের মত তাদের সেই সব কাজ করে যেতে হবে যে সব কাজের সমষ্টিগত সমন্বয় সেই শূন্যতাকেই বাড়িয়ে দেবে।

অধ্যায় ৬

আচ্ছা আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেন পরস্পরকে সত্যি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে চায় না?

কথাটা একদিন টমি ডিউককে প্রশ্ন করে বসল কনি। একমাত্র টমির

কথাগুলোকেই দৈববাণীর মত মনে হত কনির।

তারা অবশ্যই তা করে। আজকাল ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে যত বেশী পছন্দ করে এমনটি এর আগে আর কখনো করেছিল বলে আমার মনে হয় না। আমার কথাই ধর না···আমি পুরুষদের থেকে মেয়েদের বেশী পছন্দ করি। তারা বেশী সাহসী। যে কোন মানুষ তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারে

কথাটা ভেবে দেখতে লাগল কনি।

কনি বলল, কিন্তু তাদের নিয়ে তোমার করার কিছু ত নেই।

টমি বলল, আবার কি করব? একজন নারীর সঙ্গে সরলভাবে প্রাণ খুলে কথা বলছি, আর কি করব?

হাঁা, শুধু কথা···

তুমি যদি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতে তাহলে এইভাবে কথা বলা ছাড়া আর কি করতাম?

হয়ত আর কিছু নয়। তবু একজন নারী·

একজন নারী চায় কোন পুরুষ একই সঙ্গে তাকে পছন্দ করুক আর তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলুক, আবার সেই সঙ্গে তাকে কামনা করুক আর তাকে ভালবাসুক। কিন্তু আমার মতে এই দুটো জিনিস আলাদা, একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই।

কিন্তু এই পার্থক্য থাকা উচিত নয়

হয়ত জলের সিক্ততা গুণ খুব বেশী অন্য সব বস্তুকে তা ছাড়িয়ে যায়। তবু জল যা তাই থাকবে। আমি মেয়েদের পছন্দ করি, তাদের আমার ভাল লাগে এবং আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি। আর তাই বলেই আমি তাদের কামনা করি না বা তাদের ভালবাসি না এই দুটো জিনিস একসঙ্গে আমার হয় না

আমার মতে তা হওয়া উচিত।

তা হয়ত উচিত, কিন্তু কোন জিনিস আসলে যা তাই আমি মেনে নিই। কোন জিনিসের এটা না হয়ে ওটা হওয়া উচিত ছিল, এটা আমি কখনই বলি না। এটা আমার ধাতুতে সয় না।

কনি একটু ভেবে বলল, এটা সত্য নয়। মানুষ কোন নারীকে ভালবাসে আবার তার সঙ্গে কথাও বলে কেমন করে কোন মানুষ কোন মেয়েকে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কথা না বলে ভালবাসতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। কি করে হতে পারে?

টমি বলল, কেমন করে তা হয় তা জানি না। তাছাড়া সামান্যীকরণ করে আমার লাভ কি? আমি শুধু আমার কথাটাই বলতে পারি। মেয়েদের আমার ভাল লাগে, কিন্তু তাদের আমি কামনা করি না। আমি তাদের

সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি যেমন একদিক দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি তাদের সঙ্গে, তেমনি চুম্বন ইত্যাদি শৃঙ্গার বা দেহসংসর্গের ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ রয়ে যাই। কথাটা হলো এই। কিন্তু আমার কথাটা সর্বসাধারণের কথা বলে ধরা উচিত নয়। এটা এক বিশেষ ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের আমার ভাল লাগলেও আমি তাদের ভালবাসি না এবং যদি তারা আমায় তাদের প্রতি ভালবাসার ভান করতে বাধ্য করে অথবা কোন জটিল প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলে তাহলে তাদের আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু এতে তোমার মনে কষ্ট হয় না?

কেন হবে? একটুও না। চার্লি মে বা অন্য সব লোকের দিকে দেখ যারা প্রেম করে বেড়ায়। আমি তাদের মোটেই ঈর্ষা করি না। ভাগ্য যদি আমার কাছে কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় ত ভাল। কিন্তু এমন কোন মেয়েকে আমি জানি না যাকে আমি চাই। তবে আমি উপরে যত উদাসীন ভাব দেখাই না কেন কোন কোন মেয়েকে আমি খুবই পছন্দ করি।

কনি বলল, তুমি কি আমাকে পছন্দ করো?

খুব পছন্দ করি। কিন্তু পছন্দ করি বলেই যে চুম্বন করতে হবে এমন কোন মানে নেই। এর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কনি বলল, মোটেই না। তবু এটা করা উচিত নয় কি?

ঈশ্বরের নামে বল কেন উচিত হবে? আমি ক্লিফোর্ডকে পছন্দ করি বলে যদি আমি এখনি গিয়ে তাকে চুম্বন করি তাহলে তুমি কি বলবে?

কিন্তু এ দুইয়ে পার্থক্য নেই কি?

কিন্তু আসলে পার্থক্যটা কোথায়? আমরা সবাই বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এখানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এসব কথা এখন সরিয়ে রাখ। এখন আমি যদি এক মার্কামারা পুরুষরূপে সারা বিশ্বে যৌন ব্যাপারে আমার বাহাদুরির কথা জাহির করে বেড়াই তাহলে কি তুমি বলবে? তুমি কি তাই চাও?

আমি তা ঘৃণাই করব।

তাহলে শোন, আমি যেহেতু একজন পুরুষ, আমি কোন মেয়ের পিছনে ছুটি না। আবার আমি মেয়েদের পছন্দও করি। কিন্তু কেউ আমাকে জোর করে তাদের ভালবাসার ভান করাতে পারবে না বা যৌনখেলায় মাতিয়ে তুলতে পারবে না।

না, আমি তা করছি না। কিন্তু তোমার এই গোঁড়ামিটা অন্যায় নয় কি?

তুমি তা মনে ভাবতে পার, কিন্তু আমি তা মনে করি না।

বুঝেছি, আজ পুরুষদের কাছে মেয়েদের কোন আকর্ষণ নেই।

মেয়েদের কাছে পুরুষদেরই কি আছে?

কনি এবিষয়ে অর্থাৎ তার কথার উল্টো দিকটা একটু ভেবে দেখল। তারপর তার অনুভূত সত্যের কথাটা বলে ফেলল। বলল, যদিও এমন বেশী কিছু নয়, তাহলেও ও সব বাদ দাও। মানুষের মত সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো। কৃত্রিম যৌন উত্তেজনার কথা দূরে ঠেলে দাও। আমি ও উত্তেজনা চাই না।

কনি জানত সে ঠিকই বলছে। সত্যিই ঠিক বলছে। তবু সে অন্তরের নিভৃতে এক নিঃসঙ্গ একাকীত্বের একটা বেদনাকে অনুভব করতে লাগল। কোন জনহীন সরোবরের অসহায় মীনের মত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তার নিজের যুক্তির সারবত্তাই বা কোথায় তা বুঝে উঠতে পারল না।

তার যৌবন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল হঠাৎ। এই সব পুরুষগুলো সবাই যেন বৃদ্ধের মত হিমশীতল হয়ে উঠেছে একেবারে। তাদের মধ্যে সব কিছুই নিরুত্তাপ, নিস্তেজ। মাইকেলিসও একটা অপদার্থ। পুরুষ কখনো পুরুষকে চায় না, তারা আসলে চায় নারীকে। কিন্তু মাইকেলিস কোন নারীকে চায় না।

কনির মনে হলো যে সব ইতর অভদ্র লোকেরা নারীদের চায় এবং যখন তখন যৌনসংসর্গ শুরু করে দেয়, তারা আবার ওদের থেকে আরও খারাপ।

ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হলেও তা সহ্য করে যেতে হবে। আসলে নারীদের কাছে পুরুষদের কোন চমক নেই। যদি কোন নারী কোন পুরুষের মধ্যে এই চমক খুঁজে পায়, যেমন কনি একদিন মাইকেলিসের মধ্যে পেয়েছিল তাহলে সে একটি আস্ত বোকা। একথা জেনেও পুরুষদের নিয়ে চলতেই হবে। সম্পর্কের এই শূন্যতা সত্ত্বেও এর উপরেই বাঁচতে হবে। কনি এবার ভালভাবেই বুঝতে পারল কেন লোকে রাতের পর রাত ককটেল পার্টিতে যায়, জাজ নৃত্যের সান্ধ্য আসরে ভিড় জমায়, কেন তারা একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঢলে না পড়া পর্যন্ত নেচে চলে। যৌবনের উদ্দাম অদম্য বেগ এইভাবে মানুষকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তা না হলে সেই অবদমিত বেগ মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাক করে ফেলবে। কী ভয়ঙ্কর বস্তু এই যৌবন। তুমি নিজেকে যত বৃদ্ধ যত হিমশীতল ভাব না কেন, যৌবনের জ্বালা তোমাকে অহোরহঃ পীড়িত করবেই। তোমাকে একটুও স্বস্তি দেবে না। কী হীন জীবন না তোমাকে যাপন করতে হবে। কোন আশা নেই। আশা নেই বলেই কনির ইচ্ছা হচ্ছিল, সে মিকের সঙ্গে চলে গিয়ে ঘর বাঁধবে নতুন করে। ককটেল পার্টির রাত বা জাজ নৃত্যের সান্ধ্য আসরের মতই জীবনটা কাটিয়ে দেবে তার। এইভাবে একা একা বসে বসে হা-হুতাশ করে জীবন কাটানোর থেকে সেটা অনেক ভাল।

একদিন একা একা যখন সময় কাটছিল না তখন আনমনে বেড়াতে বেড়াতে তাদের বাড়ির সংলগ্ন বনটা দিয়ে চলে গেল। কোন দিকে দৃষ্টি বা খেয়াল ছিল না তার। এক মনে কি ভাবছিল সে। এমন সময় অদূরে হঠাৎ একটা বন্দুকের

গুলির শব্দে চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো তার।

আর একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকজন মানুষের গলার আওয়াজ পেল কনি। এখানেও আবার লোক! সে লোকের মুখ দেখতে চায়নি বলেই এই নির্জন বনভূমি দিয়ে বেড়াতে এসেছে। হঠাৎ কনি কান্নার শব্দ পেল তার কানে। দেখল একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁদছে। নিশ্চয় কেউ দুর্ব্যবহার করছিল মেয়েটার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সে ঘটনাস্থলের দিকে। রাগে ফুলে উঠতে লাগল। এই নিয়ে একটা হৈ চৈ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল মনে মনে।

কনি দেখল সেখান থেকে কিছু দূরে তাদের শিকার রক্ষক দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে তার কাছে।

শিকার রক্ষক মেলর্স রেগে বলল, চুপ কর, কুক্কুরী কোথাকার।

তার কথায় মেয়েটি আরো জোরে কেঁদে উঠল।

কনি তাদের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। রাগে তার চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল কনিকে। তারও মুখখানা রাগে মলিন হয়েছিল।

কনি রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি হয়েছে, ও কাঁদছে কেন?

মেলর্স তার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, ও কিছু না, ম্যাডাম। তার মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

কনির মনে হলো, মেলর্স যেন তার মুখে একটা চড় মেরেছে। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তার নীল জ্বলজ্বলে চোখগুলো তুলে মেলর্সের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছি?

এতক্ষণে তার মাথার টুপীটা তুলে একটু নত হয়ে সম্মান জানাল সে কনির প্রতি। বলল, হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মুখে এক ম্লান বিরক্তি নিয়ে এক অদ্ভুত সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে রইল মেলর্স।

কনি এবার মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি হয়েছে তোমার? মেয়েটির বয়স নয় কি দশ। তার মাথার চুল কালো। কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব মধুর করে কনি আবার বলল, বল আমাকে কেন কাঁদছ?

মেয়েটি আরো জোরে কেঁদে উঠল। কনি কণ্ঠটাকে আরো মধুর করে বলল, কেঁদো না। বল আমাকে ওরা তোমার কি করেছে?···কনি এমন সময় তার জ্যাকেটটার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছয় পেনি মুদ্রা খুঁজে পেল। মেয়েটির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, কেঁদো না, এই দেখ, এটা তোমার জন্য আমি এনেছি।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে তার কালো চোখের দৃষ্টি মেলে পেনিটার পানে তাকাল। তার কান্নার বেগটা একেবারে না থামলেও তার শব্দটা চাপা হয়ে উঠল। কনি তার নোংরা হাতে পেনিটা গুঁজে দিয়ে বলল, বল কি হয়েছে?

মেয়েটি বলল, আমার বিড়াল···বিড়াল।

আবার চাপা কান্নার শিহরণ।

কনি বলল, কোন বিড়াল বল ত?

ঐ যে।

মেয়েটি হাতের মুঠোর মধ্যে পেনিটা ধরে অদূরে একটা ঝোপের ধারে হাত বাড়িয়ে দেখাল। আবার বলল, ঐখানে।

কনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল একটা বড় কালো বিড়াল গায়ে রক্তের দাগ নিয়ে পড়ে রয়েছে।

কনি বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওঃ।

মেলর্স তাচ্ছিল্যভরে বলল, বন্দুকের গুলিটা লেগে গেছে।

কনি রাগের সঙ্গে তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি যখন গুলি করো, তখন ও নিশ্চয় বিড়ালটা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল তোমায়।

মেলর্স স্থিরভাবে কনির মুখপানে তাকাল যাতে সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হলো সে বাড়াবাড়ি করেছে এবং লোকটি তাকে মানছে না।

কনি মেয়েটিকে খেলার ছলে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি? তোমার নাম বলবে না?

একটা হাঁচি হেঁচে মেয়েটি বলল, কনি মেলর্স।

কনি বলল, কনি মেলর্স। ঠিক আছে। সুন্দর নাম। তুমি তাহলে তোমার বাবার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলে আর তোমার বাবা বিড়ালটাকে গুলি করে। কিন্তু বিড়ালটা পাজী বিড়াল। খারাপ বিড়াল।

মেয়েটি তার চোখ মেলে এবার ভাল করে কনির পানে তাকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, আমি আমার ঠাকুর্মার কাছে থাকতে চেয়েছিলাম।

কনি বলল, কোথায় তোমার ঠাকুর্মা?

মেয়েটি দূরে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল, আমাদের কুটিরে।

কুটিরে? তুমি তোমার ঠাকুর্মার কাছে ফিরে যেতে চাও?

ঠাকুর্মার কথা মনে পড়ায় একবার শিউরে উঠে মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

কনি বলল, তাহলে এস। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার বাবা তাহলে তার কাজ সব ঠিকমত করতে পারবে।

এরপর মেলর্সের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, এটি তোমার মেয়ে?

মেলর্স অভিবাদন করে সমর্থনে ঘাড় নাড়ল।

কনি বলল, আমি ওকে কুটিরে নিয়ে যেতে পারি?

ম্যাডাম ইচ্ছা করলে নিশ্চয় যেতে পারেন।

মেলর্স আবার তার শান্ত অথচ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কনির পানে তাকাল। সে দৃষ্টির মধ্যে কনির মনের কথা জানার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের

অনাসক্তি আর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক অব্যক্ত বেদনা ছিল।

কনি মেয়েটিকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে তোমাদের কুটিরে যাবে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ যাব।

কনি মেয়েটিকে ভবিষ্যৎ নারীর এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হিসাবে খুব একটা পছন্দ না করলেও তার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে তার হাত ধরল রাস্তা হাঁটার জন্য।

নীরবে অভিবাদন জানাল মেলর্স। কনি বলল, প্রাতঃ নমস্কার।

সেখান থেকে ওদের কুটিরটা এক মাইল পথ। পথ চলতে চলতে ছোট কনি সাহস পেয়ে কথায় কথায় পাগল করে তুলতে লাগল বড় কনিকে। বড় কনি কিছুটা বিরক্তিও অনুভব করল মনে মনে। অবশেষে কুটিরটা দেখা গেল।

কুটিরের দরজাটা খোলা ছিল। ছোট কনি ঢুকে গেল তার মধ্যে। ঢুকেই চিৎকার করে বলল, ঠাকুর্মা, ঠাকুর্মা।

এর মধ্যেই ফিরে এলি কেন?

সেদিন ছিল শনিবারের সকাল। ঠাকুর্মা একটা স্টোভ জ্বালছিল। সে দরজার কাছে এগিয়ে এল। তার হাতে নাকে কালো দাগ ছিল।

কনিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মেলর্সের মা হাত মুখ মোছার চেষ্টা করল।

কনি বলল, প্রাতঃ নমস্কার। ও কাঁদছিল বলে আমি ওকে নিয়ে এলাম।

ঠাকুর্মা ছোট কনির পানে তাকিয়ে বলল, কাঁদছিলি কেন, তোর বাবা কোথায় ছিল?

মেয়েটি তার ঠাকুর্মার আঁচলটা আঁকড়ে ধরে রইল জড়োসড়ো হয়ে। কনি বলল, ওর বাবা ওখানেই ছিল। কিন্তু সে একটা বিড়াল মেরে ফেলায় ও বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়ে।

মেলর্সের মা ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনার অশেষ দয়া লেডি চ্যাটার্লি। কিন্তু ওর অতখানি বিচলিত হওয়া উচিত হয়নি।

তারপর মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখছ বাছা, তোমার জন্য ওঁর কত কষ্ট হলো। ওঁর অবশ্য এতখানি চিন্তিত হওয়া উচিত হয়নি।

কনি হেসে বলল, এতে বিচলিত হওয়া বা কষ্টের কিছু নেই। আমি একটু বেড়িয়ে গেলাম।

মেলর্সের মা বলল, আপনার অশেষ দয়া। তবু মেয়েটা কাঁদছিল। আমি তখনই বুঝেছিলাম, ওরা দুজনে দূরে গেলেই এমনি কিছু একটা হবে। মেয়েটা ওর বাবার কাছে থাকতে চায় না। ওর কাছে এর বাবাকে বিদেশী লোক বলে মনে হয়। ওর বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে।

কনি কি বলবে তা খুঁজে পেল না।

মেয়েটি তার ঠাকুর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এই দেখ ঠাকুর্মা।'...এই বলে তার হাতের পেনিটা দেখাল।

বুড়ী তখন মেয়েটার হাতের পেনিটা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, ও বাবা, ছয় পেনি! না ম্যাডাম, ওকে এটা দেওয়া উচিত হয়নি।

তারপর মেয়েটিকে বলল, তোমার খুব ভাগ্য ভাল ম্যাডাম তোমাকে পেনি দিয়েছেন। লেডি চ্যাটার্লি তোমাকে ভালবেসে কি দিয়েছে দেখ।

বুড়ী যখন তার হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে মুখখানা মুছছিল তখন তার মুখ বিশেষ করে নাকটার পানে তাকিয়ে রইল কনি।

কনি বলল, ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি। সে চলে যাচ্ছিল।

বুড়ী বলল, আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত লেডি চ্যাটার্লি।

মেয়েটি বিদায়কালে কনিকে বলল, ধন্যবাদ।

কনি হেসে বলল, তোমাকেও ধন্যবাদ। এই বলে চলে গেল সে।

বাইরে বেরিয়ে বাড়ির পথে যেতে যেতে কনি ভাবতে লাগল মেলর্সের মত এমন অহঙ্কারী ছেলের এমন আলাপী ও অতিথিবৎসলা মা হলো কি করে।

কনি চলে গেলে মেলর্সের মা ঘরের ভিতর গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখে অবাক হয়ে গেল। ভাবল, উনি আমার মোটা জামা আর নোংরা মুখখানা দেখে ফেলেছেন। আমার সম্বন্ধে কি ধারণা হবে ওর?

র‍্যাগবির বাড়িতে চলে গেল কনি। হ্যাঁ বাড়িই বটে……একটা ক্লান্তিকর বিরাট বাসাকে এই ভাল নামটা দেওয়া হয়েছে শুধু। নামটা শুনে মনে হবে কতই যেন আন্তরিকতার উত্তাপে ভরা। কিন্তু একদিন অর্থাৎ, অতীতে, কনির মতে, মানুষের বাড়িগুলো আন্তরিকতার উত্তাপে ভরা ছিল। এখন এ নামের আর কোন মাহাত্ম্য নেই। এখন প্রেম, আনন্দ, সুখ, ঘর, বাবা, মা, স্বামী প্রভৃতি এই সব বড় বড় নামগুলো তাদের মাহাত্ম্য হারিয়ে অর্থমৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এখন বাড়ি মানে মানুষ যেখানে বাস করে। প্রেম মানে যা দিয়ে মানুষ পরস্পরকে বোকা বানায়। সুখ হচ্ছে এমন এক ভণ্ডামি যা মিথ্যা আশা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে। বাবা হচ্ছেন এমনই এক ব্যক্তি যার একটা অস্তিত্ব আছে, স্বামী এমন একজন লোক বিয়ের পর যার সঙ্গে মেয়েরা বাস করে এবং মনের দিক থেকে মানিয়ে চলে। তারপর কাম বা যৌন ব্যাপার যা এই সব বড় বড় কথাগুলোর শেষ কথা। ব্যাপারটা অনেকটা ককটেল পার্টিতে অনুভূত এক তরল উত্তেজনার মত যা ক্ষণিকের জন্য সমগ্র দেহমনে এক উন্মাদনা এনে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ক্লান্ত ও নিঃশেষিত করে দিয়ে যায়। যেন মনে হয় আমরা যে ধাতু দিয়ে তৈরি তা যেন খুব সস্তা এবং তা যেন ফুরিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল।

যা শুধু বাকি রইল তা হলো স্টইক সন্ন্যাসবাদ। স্টইক সন্ন্যাসীদের এই ত্যাগের মন্ত্রে সত্যিই একটা আনন্দ আছে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে জীবন ও জগতের এই অসারতার উপলব্ধিতে সত্যিই একটা আনন্দ আছে। ঘরবাড়ি,

প্রেম, বিবাহ, মাইফেলিস এইগুলোকে শেষ কথা বলে মানুষ মনে করে জীবনে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথাগুলো অর্থহীন অলীক হয়ে যায়।

টাকা? এখানেও সেই একই কথা। লোকে সব সময়েই টাকা চায়। সকলেই টাকা ও সাফল্যস্বরূপা সেই পথকুক্কুরীদেবীর ভজনা করে। হেনরি জেমসের এই কথাটা টমি ভিউক প্রায়ই বলে। টাকা আর সাফল্য—এই দুটো জিনিসের মানুষের সব সময়েই প্রয়োজন। তুমি কখনই তোমার হাতের শেষ কপর্দকটা খরচ করে দিয়ে বলতে পার না টাকার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে যদি আর দশটা মিনিটও বাঁচতে হয় তাহলে আরো কিছু কপর্দক চাই কোন না কোন কারণে। তোমার এই জৈব জীবন যান্ত্রিকভাবে যাপন করে যেতে হলে টাকা চাই। টাকা তোমার চাই-ই। জীবনে যদি সত্যিকারের প্রয়োজন বলে কিছু থাকে ত সে হলো টাকা। প্রয়োজনের এমন তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা আর কোন বিষয়ে অনুভব করা যায় না। এটাই হলো আসল কথা। অবশ্য বেঁচে থাকাটা কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, এটা কারো দোষ নয়। কিন্তু বাঁচতে হলে টাকা চাই। এটা এক সর্বাত্মক প্রয়োজন। অন্যান্য সব প্রয়োজনকে তুমি কাটিয়ে উঠতে পার, টাকার প্রয়োজন কাটানো যায় না। এটাই হলো জগতের রীতি।

কনি একবার মাইকেলিসের কথা ভাবল। ভাবল, মাইকেলিস অনেক টাকা করেছে এবং মাইকেলিসের সঙ্গে তার জীবনকে যুক্ত করলে সেও অনেক টাকা পাবে। তবু তা চাইল না সে। তার সহায়তায় ক্লিফোর্ড লিখে যে টাকা রোজগার করছে ও করবে তার পরিমাণ অল্প হলেও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চাইল। সে মনে মনে বলল, আমি ও ক্লিফোর্ড দুজনে মিলে লেখালেখির মধ্য দিয়ে বছরে বারোশো পাউণ্ড রোজগার করব। এর বেশী টাকা চাও ত করো। এ আর এমন কি কথা। কোথাও কিছু নেই, কল্পনার সাহায্যে শূন্যতা থেকে শুধু গল্প বানিয়ে যাও। তবে বেশী টাকা করলে তাতে অহঙ্কারের ভয় আছে।

কনি তাই বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল। বাড়ি গিয়ে সে ক্লিফোর্ডের কাছে তার শক্তি যোগাবে, তাকে প্রেরণা দেবে সে যাতে শূন্যতা থেকে আবার একটা গল্প বানাতে পারে। আর গল্প মানেই টাকা। ক্লিফোর্ড অবশ্য দেখতে চায় তার লেখা গল্পগুলো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকৃতি হিসাবে গণ্য হচ্ছে কিনা। কিন্তু সে নিজে তা চায় না। কনির বাবা বলে, এসব লেখার মধ্যে আসলে কিছুই নেই। তার উত্তরে কনি তাড়াতাড়ি বলেছিল, এই লেখা থেকে বছরে বারোশো পাউণ্ড এসেছে। এটাই যথেষ্ট।

তোমার বয়স যদি কম থাকে ত তুমি দাঁতে দাঁত দিয়ে লেগে থাকতে পার। দেখবে কোন অদৃশ্য উৎস থেকে টাকা জলের স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে, দরকার শুধু তোমার মনের জোর আর ইচ্ছাশক্তি। আসলে এই ইচ্ছাশক্তিই সব। মানুষের এই ইচ্ছাশক্তিই শূন্যতার ভিতর থেকে টাকার মত একটা

অসার বস্তুকে এনে দেয় মানুষের হাতে। এই শূন্যতা হলো কাগজের উপর একটুকরো লেখা। এ এক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কি? এ এক বিরাট জয়। সেই কুব্জুরীদের কথা এসে গেল। কাউকে যদি কারো কাছে বেশ্যাবৃত্তি করতেই হয় তাহলে সেই দেবীর কাছে করাই ভাল। অনেকে আবার সেই দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি বা দাসত্ব করেও সে দেবীর নিন্দা করে মুখে।

ক্লিফোর্ডের আবার কতকগুলো শিশুসুলভ বাতিক আছে। সে চায় লোকে সত্যি সত্যিই তাকে ভাল বলুক। এই ভাল কথাটাই বাজে কথা। মোরগ নাচের মতই একটা বাজে ব্যাপার। সত্যিকারের ভাল হয়ে কোন লাভ নেই। জীবনে শুধু ভাল নিয়ে থাকলে আর কিছু হবে না। যারা শুধু ভাল নিয়ে থাকে জীবনে তারা বাস ফেল-করা লোকের মত পিছিয়ে থাকে জীবনের পথে। আসল কথা, তোমাকে বাঁচতে হবে, জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে। কিন্তু যদি তুমি বাস ফেল করো তাহলে তোমাকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার মানে তুমি পিছিয়ে পড়বে জীবনের পথে। তখন শুধু ব্যর্থতার বোঝা জমে উঠবে তোমার ঘাড়ে।

কনি ভাবছিল শীতকালটা এবার লণ্ডনে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কাটাবে। যেন তারা দুজনে একই জীবনপথের যাত্রী, একই পথ ধরে পথের শেষ পর্যন্ত যেতে চায় এবং যাবেও।

তবে ক্লিফোর্ডের একটা দোষ। ও আবার মাঝে মাঝে কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে ওঠে ওর কথাবার্তা। এক বিষাদময় শূন্যতাবোধ আচ্ছন্ন করে তোলে ওর মনটাকে। আসলে এর মাধ্যমে ওর মনের ক্ষতটাই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কনির তাতে খুব খারাপ লাগে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, হে ভগবান, মনের ভিতর চেতনার যন্ত্রটা যদি একবার বিকল হয়ে যায় তাহলে কি হবে? চুলোয় যাক। তাহলে কি সারাজীবন বিষাদে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে তাকে? তার থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই?

মাঝে মাঝে কনি ফুঁপিয়ে চিড়িবিড়ি করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু যখন সে কাঁদতে থাকে এইভাবে তখনও সে নিজেকে বোঝায়। নিজেকে নিজে বলে, বোকা কোথাকার! এতে কিছু হবে? এমনভাবে কাঁদছ যেন এতে তোমার সব সমস্যার সমাধান হবে।

মাইকেলিসের সংস্পর্শে আসার পর থেকে কনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে সে আর কিছুই চাইবে না তার জীবনে। জীবনে যে সমস্যা সমাধানের অতীত সে সমস্যার এমন সরলতম সমাধান আর কিছু হতে পারে না। জীবনে যা সে সহজভাবে পেয়েছে শুধু তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। যা পেয়েছে তাই নিয়েই সে এগিয়ে যেতে চায়। ক্লিফোর্ড, তার লেখা গল্প, র‍্যাগবি, লেডি চ্যাটার্লি, ব্যবসার কথা, টাকাকড়ি···এই সব নিয়েই থাকতে চায় সে। প্রেম,

যৌনাচার প্রভৃতি বিষয়গুলো জলজমা বরফের মতই অর্থহীন, একটুতেই গলে যায়। এগুলোকে যত পার ভুলে যাও। এ নিয়ে যদি খুব বেশী মাথা না ঘামাও, ওসব কথা মনে যদি বেশী না করো তাহলে এ সব কিছুই না। বিশেষ করে যৌন ব্যাপার···আসলে যা কিছুই না। এ ব্যাপারে তুমি দৃঢ়ভাবে মন-স্থির করে ফেল দেখবে আর কোন সমস্যাই নেই। যৌন ব্যাপার আর ককটেল পার্টি দুটোই একই ব্যাপার। দুটো ব্যাপারের স্থায়িত্ব এক, পরিণাম এবং উদ্দেশ্য এক।

কিন্তু সন্তান বা একটা ছেলে! ব্যাপারটা কেমন যেন উত্তেজনাময়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এগোতে হবে তাকে। প্রথমে তাকে ঠিক করতে হবে কার সন্তান সে ধারণ করবে তার গর্ভে। মিকের সন্তান! ভাবতেও ঘৃণাবোধ হয়। তার থেকে একটা খড়গোশের বাচ্ছা পেটে ধরা ভাল। টমি ডিউক? লোকটা ভাল, কিন্তু যে সন্তান একটা যুগ ধরে প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের বংশধারার সে সন্তান টমির কাছে চাওয়া যায় না। কারণ সে নিজের মধ্যেই নিজে ফুরিয়ে যায়। এছাড়া ক্লিফোর্ডের পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের বৃত্তটা বেশ বিস্তৃত হলেও তার মধ্যে এমন একজনও নেই যার সন্তান গর্ভে ধারণ করার কথা ভাবতে গেলে কোনরূপ ঘৃণা জাগে না কনির মনে। তাদের মধ্যে অনেককেই প্রেমিক হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে, যেমন মিক। কিন্তু তাদের কাউকে তার সন্তান উৎপাদন করতে দিতে পারে না কনি। আঃ, কী অপমান আর ঘৃণার কথা!

সুতরাং ব্যাপারটা এইভাবেই রয়ে গেল।

তবু সন্তানের কথাটা ঠিক জেগে রইল মনের পশ্চাদপটে। থাম, থাম, সে গোটা পুরুষ জাতটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে তাদের মধ্যে কার সন্তান গর্ভে ধারণ করা যেতে পারে। সে জেরুজালেম শহরে গিয়ে তার পথে পথে ও অলিতে গলিতে ঘুরে বেরিয়ে সেরকম কোন যোগ্য লোক পাওয়া যায় কি না দেখবে। পবিত্র পয়গম্বরের জেরুজালেম নগরীতে হাজার হাজার পুরুষ আছে ঠিক, কিন্তু প্রকৃত মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

একবার কনির মনে হলো সে মানুষ যেন ইংরেজ বা আয়ারবাসী না হয়। অবশ্যই তাকে হতে হবে একজন বিদেশী।

থাম, থাম। অত অধৈর্য হবার কিছু নেই। পরের শীতে ও ক্লিফোর্ডকে লণ্ডনে নিয়ে যাবে। তার পরের বছর ও তাকে নিয়ে যাবে দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইটালিতে। থাম, থাম, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সন্তানের জন্য এমন কিছু ব্যগ্রতা তার নেই। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে সে তার সমগ্র অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত তোলপাড় করে ভেবে দেখেছে। কোন আগন্তুক বা হঠাৎ এসে-পড়া কোন লোককে দিয়ে এ কাজ করানোর কোন ঝুঁকি সে নিতে পারে না। যে কোন সময়ে একটা লোককে প্রেমিক হিসাবে ধরে নিয়ে ভালবাসা যায় কিন্তু কাউকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করানোটা ভিন্ন

ব্যাপার। এটা সামান্য ভালবাসাবাসির কথা নয়, কথা হলো মানুষের মত একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া। এমন কি যার সন্তান তুমি ধারণ করছ গর্ভে তাকে তুমি ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু সে যদি সত্যিকারের মানুষ হয় তবে তার সন্তান ধারণ করতেই হবে। সেখানে ব্যক্তিগত ঘৃণা বা ভালবাসায় কিছু যায় আসে না। এটা হলো ব্যক্তিসত্তার অন্য একটা দিক।

অন্য দিনকার মত সেদিনও বৃষ্টি পড়ছিল। পথ ঘাট জলে ভিজে গেছে। ক্লিফোর্ডের চেয়ার চলবে না। কনি তবু বাইরে যাবে বেড়াতে। এই সময় রোজ সে বন দিয়ে বেড়াতে যায়। সেখানে কাউকে দেখা যায় না। সে বেশ একা একা বেড়ায়।

আজ কি একটা কাজে মালীর কাছে লোক পাঠাবার দরকার ছিল ক্লিফোর্ডের। যে ছেলেটা ফরমাস খাটে সে ছেলেটার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। র‍্যাগবিতে প্রায়ই কারো না কারো ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। কনি তখন বলল সে খবর দিতে যাবে তার কুঁড়েতে।

আজ বাতাসটা একেবারে নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ। মনে হচ্ছিল সারা জগৎটা যেন মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে। একটু পরেই মরবে। আজ কোলিয়ারির খাদগুলো বন্ধ থাকায় সেখানেও কোন কর্মব্যস্ততা নেই।

আজ জগতে যেন সব কিছুই নিষ্ক্রিয় আর স্তব্ধ অচল হয়ে আছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু গাছের শাখাগুলো থেকে বরফ পড়ার একটা শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা গভীর ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল গাছগুলো। সব কিছুই আশাহীন, অনড়, স্তব্ধ, শীতল এক শূন্যতায় ভরা।

বিষণ্ণভাবে ধীর গতিতে পথ হাঁটতে লাগল কনি। পুরনো বনভূমি হতে উঠে আসা এক শীতল শায়িত বিষাদটাকে বাইরের জগতের দুঃসহ নিষ্প্রাণতার থেকে অনেক ভাল লাগছিল। অবশিষ্ট বনভূমির স্থিতিশীলতা আর গাছগুলোর ভাষাহীন অব্যক্ত গম্ভীর ভাব ভাল লাগছিল তার। দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা যেন কথা বলতে পারলেও স্তব্ধ হয়ে আছে জোর করে। এর দ্বারা তাদের নীরব থাকার ক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে থাকলেও ওদের উপস্থিতির একটা মূল্য বেশ বোঝা যায়। তারাও যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছে যুগ যুগ ধরে। স্টইক সন্ন্যাসীদের মত কিসের প্রতীক্ষা করতে গিয়ে নীরব থাকার পরিচয় দান করছে। হয়ত তারা তাদের শেষ দিনের কথা ভাবছিল। হয়ত সেই শেষ দিনের জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। কবে তাদের কাটা হবে ওরা যেন তারই প্রতীক্ষা করছিল। দেখতে দেখতে কবে এই সমগ্র বনভূমিটা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের কাছে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে ওরা হয়ত তাই ভাবছিল। ওদের কাছে এই আভিজাত্যসুলভ সুপ্রাচীন নীরবতার একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

বন থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে কিছুটা যেতেই ওদের ঘন বাদামী রঙের

কুটিরটা নজরে পড়ল। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হলো তার মধ্যে কোন লোক নেই। কুটিরটা একেবারে নির্জন আর স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। শুধু চিমনি থেকে সুতোর মত একটা সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছিল। কুটিরটার সামনে বেড়া দেওয়া বাগানটায় সদ্য মাটি কোপানো হয়েছে। বাগানটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। সদর দরজাটা বন্ধ ছিল।

বাড়িটার এত কাছে এসে লজ্জা করছিল কনির লোকটার কাছে যেতে। তার অদ্ভুত দুটো চোখের দূরান্বিত উদাস দৃষ্টিটার কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছিল তার। একবার চলে যেতে ইচ্ছা করল তার। বন্ধ দরজার উপর মৃদু টোকা দিল কনি। কিন্তু কেউ এসে দরজা খুলল না। সে আবার খুব আস্তে দরজার কড়া নাড়ল। এবারও কেউ এল না। তখন কনি একটা আধখোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাল। ভিতরটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল বলে কিছু দেখতে পেল না। বাইরের কেউ হঠাৎ যাতে এই ছোট ঘরখানার ভেতরটা দেখতে না পায় তার জন্যই একটা গোপনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল কনি, কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগল। তার মনে হলো বাড়ির পিছন দিক থেকে কার কথা বলার শব্দ আসছে। কনির তাতে আশা হলো। এতটা এসে সে ফিরে যাবে না দেখা না করে।

তাই বাড়িটার পিছনের দিকে চলে গেল কনি। বাড়ির পিছনটা একটা পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কনি একটা কোণ দিয়ে উঠোনে ঢুকে দেখল লোকটা সাবান জল দিয়ে গা ধুচ্ছে। তার কোমর পর্যন্ত গা-টা নগ্ন ছিল। সে সাবান জলের উপর পিঠ বেঁকিয়ে গা-মুখ ধুচ্ছিল। সে জানত বাড়িতে সে একেবারে একা এবং কেউ কোথাও আশেপাশে নেই বলে নিশ্চিন্তে স্নান করছিল। কনি তা একবার দেখে যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গেল। আবার সে বনে চলে গেল। এ বিষয়ে সে কিছু মনে না করলেও তার গা-টা শিউরে উঠল। কিন্তু একটা লোক গা ধুচ্ছে এটা ত একটা নিতান্ত সাধারণ দৃশ্য।

তবু কনি এটা অস্বীকার করতে পারল না যে দৃশ্যটা মনে রাখার মত। তার সারা দেহটার ভিতর পর্যন্ত শিউরে উঠল এ দৃশ্য দেখে। লোকটার সাদা ধবধবে সরু কোমরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কনির যেটা মনে ধরল সেটা লোকটার দেহের নগ্নতা নয়, সৌন্দর্যের কোন উপাদান তার এই নগ্ন দেহগাত্রের মধ্যে খুঁজে পায়নি সে। এ দৃশ্য দেখে কনির যেটা সবচেয়ে ভাল লাগল সেটা হলো অবাধ অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার মাঝে যাপন করতে থাকা এক নিঃসঙ্গ জীবনের নিবিড়তা। সেই নিঃসঙ্গ নিবিড় জীবনের একটা শুভ্রমধুর উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা যেন তার মনের মধ্যে উপচে পড়ছিল, তার দেহগাত্রের মধ্যে ঝরে পড়ছিল।

এই দৃশ্যের একটা অবাধ্য শিহরণ তার পেটের মধ্যে অনুভব করল কনি।

সে আরও অনুভব করল এ শিহরণ ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়নি জাগতে না জাগতে, এ শিহরণ তখনো সমানে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল তার দেহের মধ্যে। কিন্তু তার দেহের মধ্যে যাই হোক, মনে মনে এ দৃশ্যের সমস্ত গুরুত্বটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল কনি। একটা লোক নিশ্চয় দুর্গন্ধওয়ালা একটা হলদে রঙের সাবান দিয়ে গা ধুচ্ছে। বরং তার কিছুটা বিরক্তিও হলো। কেন সে দাঁড়িয়ে এই সব নোংরা দৃশ্য দেখবে?

তাই সে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে যেতে যেতে থেমে গিয়ে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। কি করবে তা সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এই বিমূঢ়তা সত্ত্বেও মনে মনে একটা সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠল কনি। সে কিছুতেই হার মেনে চলে যাবে না। সে লোকটাকে অবশ্যই খবরটা দেবে। যে কাজের জন্য এসেছে সে কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করে যাবে ও। লোকটা স্নান সেরে পোষাক পরে নিশ্চয় কোথাও যাবে। ও যতক্ষণ বাসা থেকে না বার হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করবে ও।

কিছুক্ষণ পর কুটিরটাতে আবার ফিরে গেল কনি। বাড়িটাকে আগের মতই নির্জন ও পরিত্যক্ত দেখাচ্ছিল। কনি কান পেতে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা দেখতে লাগল। দেখল কোন জনমানবের শব্দ নেই, শুধু একটা কুকুর ডাকছে, কনি দরজার কড়া নাড়ল। সে শক্ত থাকার চেষ্টা করলেও তার বুকটা লাফাচ্ছিল। সে শুনতে পেল লোকটা ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই কনি যেন হঠাৎ চমকে গেল লোকটাকে দেখে। লোকটা যেন অস্বস্তিবোধ করল হঠাৎ কনিকে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, লেডি চ্যাটার্লি! দয়া করে ভিতরে আসবেন?

লোকটার আচরণ সত্যিই বড় ভদ্র এবং সহজ ও সাবলীল। কনি দরজাটা পার হয়ে তার ছোট্ট বসার ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। কনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি বলল, আমি স্যার ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে একটা খবর এনেছি দেবার জন্য।

লোকটা তার নীল চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে এমনভাবে কনির পানে তাকাতে লাগল যাতে কনি বাধ্য হয়ে তার মুখটা ঘুরিয়ে নিল। কনিকে তার ভালই লাগছিল। তার লজ্জানত ভঙ্গিতে তার দেহসৌন্দর্য আরো বেড়ে গিয়েছিল।

কনিকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বলল, দয়া করে বসবেন?

কিন্তু কনি বসবে না ধরে নিয়ে ঘরের দরজাটা খোলা রেখে দিল।

কনি বলল, না থাক, ধন্যবাদ। স্যার ক্লিফোর্ড ভেবেছিল তুমি কোথাও যাবে···বলতে বলতে কনি নিজের অগোচরেই লোকটার চোখের পানে তাকাল। কনি দেখল এখন তার চোখের দৃষ্টিটা বেশ সহজ আন্তরিকতায় নিবিড়

হয়ে উঠেছে।

লোকটা বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি এখনি দেখছি।

মালিকের আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারাটা একেবারে বদলে গেল, কেমন যেন কড়া হয়ে গেল তার মনটা। আবার তার দৃষ্টিটা উদাস ও দুরান্বিত হয়ে উঠল আগেকার মত। কনিকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কনি পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। যেতে গিয়েও যেতে পারল না। ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করছিল তার।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি একেবারে একা থাক ?

হ্যাঁ ম্যাডাম, একেবারে একা।

কিন্তু তোমার মা···?

মা বাস করে তার গাঁয়ের ঘরে।

বাচ্চাটা তারই কাছে থাকে ?

হ্যাঁ, সেখানেই থাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার সরল সাদাসিদে মুখখানায় কেমন যেন এক অব্যক্ত উপহাসের ভাব ফুটে উঠল। তার মুখখানা এমনই এক অদ্ভুত রহস্যময় মুখ যার ভাবটা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। কনিকে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বলল, আমার মা প্রতি শনিবার এসে ঘরগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, বাকি দিনগুলোতে আমিই করি।

কনি আবার তাকাল তার মুখপানে। এবার দেখল তার মুখখানায় হাসি ফুটে উঠেছে। সে হাসিতে ছিল কিছু উপহাসের ভাব। তবে তার নীল চোখের দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা আন্তরিকতার ভাবও ছিল।

কনি যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটার পরনে ছিল পাজামা, একটা ফ্লানেলের শার্ট আর ছাই রঙের নেকটাই। তার মুখখানা ভিজে ভিজে আর ম্লান মনে হলেও দেখতে ভাল লাগছিল। তার চোখ মুখের হাসিটা থেমে গেলেও সে মুখের উপর আন্তরিকতার একটা ভাব ছিল। তবু নিঃসঙ্গতার ভাবটা কাটল না সে মুখ থেকে। কনি তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার উপস্থিতির যেন কোন দাম নেই তার কাছে।

কনির যেন অনেক কিছু বলার ছিল। অনেক কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলল না। শুধু তার পানে আবার একবার তাকাল। তাকিয়ে বলল, আমি নিশ্চয় তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি।

লোকটার চোখের কোণে আবার এক চিলতে উপহাসের হাসি খেলে গেল। বলল, আমি তখন মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। আমি তখনো কোটটা পরিনি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার এখানে কেউ ত আসে না, কেউ কড়া নাড়ে না। তাই অপ্রত্যাশিত কড়ানাড়ার শব্দে কোন অশুভ ঘটনার

আভাস পেয়ে চমকে উঠেছিলাম।

লোকটা কনির সঙ্গে তাদের বাগান পার হয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এল। তার গায়ে তখন সেই বিশ্রী ভেলভেটের কোটটা না থাকায় ভালই লাগছিল। কনি দেখল লোকটার চেহারাটা রোগা। কিন্তু তা হলেও তার মাথার চুলের সৌন্দর্যে আর চোখের দৃষ্টির মৃদু চঞ্চলতায় যৌবনের একটা অদম্য উচ্ছলতা ছিল। কনির মনে হলো তার বয়স সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ হবে।

কনি হেঁটে চলল নির্জন বনভূমির ভিতর দিয়ে। সে বেশ বুঝল লোকটা তার পিছনে সমানে তাকিয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠল সে।

এদিকে লোকটা তার বাসার ভিতরে গিয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটা সত্যিই দেখতে সুন্দরী। খুবই সুন্দরী। ও কত সুন্দরী ও তা নিজেই জানে না।

কনি একথা যতই ভাবছিল ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল যে লোকটাকে দেখে মালী বা শিকার রক্ষক বলে মনেই হয় না। অথবা যে কোন সাধারণ শ্রমিকের মতও নয়। সে দেখতে কিছুটা সাধারণ মানুষের মত হলেও আবার কিছুটা অসাধারণত্বও তার মধ্যে আছে।

ক্লিফোর্ডের কাছে কনি সেদিন বলল, শিকার রক্ষক মেলর্স এক অদ্ভুত ধরনের লোক। ও সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারত।

ক্লিফোর্ড বলল, পারত? আমি তার কিছু দেখিনি।

কনি আবার জোর দিয়ে বলল, কিন্তু তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওনি?

ক্লিফোর্ড বলল, আমার মতে লোকটা ভাল, কিন্তু তার বিষয়ে আমি বেশী কিছু জানি না। লোকটা মাত্র এক বছর আগে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় ও ছিল ভারতবর্ষে। সেখানে ও হয়ত কোন অফিসারের চাকর ছিল। সেখান থেকেই ও কিছু কলাকৌশল শিখে এসেছে। সেই অফিসারের দৌলতেই ওরও উন্নতি হয়। ওদের জাতের লোকরা এমনি করেই উন্নতি করে। কিন্তু এর ফল খুব একটা ভাল হয় না ওদের জীবনে। কারণ দেশে ফিরে এসে আবার ওদের সেই পুরনো পেশা আর পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হয়।

ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কনি। অভিজাত সমাজের লোকদের এইটাই হলো রীতি। তথাকথিত নিচু শ্রেণীর কোন লোক ছোট থেকে বড় হোক, উন্নতি করুক এটা ওরা চায় না।

কনি আবার বলল, কিন্তু লোকটার মধ্যে নিশ্চয় একটা বৈশিষ্ট্য আছে তুমি এটা লক্ষ্য করনি?

না, লক্ষ্য করিনি সত্য কথা বলছি।

ক্লিফোর্ড অস্বস্তির সঙ্গে কনির পানে তাকাল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা

কৌতূহল আর কিছুটা সন্দেহ ছিল। কনি বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড তাকে সত্য কথা বলছে না। নিজের কাছেও সত্য বললে না সে। ব্যাপারটা হলো তাই। সে চায় পৃথিবীর সব লোক তার স্তরের নিচে অথবা সমান হয়ে থাকবে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মানুষ তার সামনে বড় হয়ে উঠুক এটা সে চায় না।

কনি এ যুগের মানুষদের মানসিক সংকীর্ণতার কথাটা ভাবতে লাগল নূতন করে। একদিক দিয়ে কঠোর হতে গিয়ে আসলে জীবন থেকেই দূরে সরে যায় ওরা।

অধ্যায় ৭

সেদিন রাতে তার শোবার ঘরে গিয়ে এমন একটা কাজ করল কনি যা এর আগে কোনদিন করেনি সে। একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সব পোষাক একে একে খুলে ফেলে বাতি হাতে নিজের নগ্ন মূর্তিটাকে দেখতে লাগল একদৃষ্টিতে। কিন্তু তার এই আপন দেহের নগ্নতার মধ্যে কি সে খুঁজছে, কি সে চাইছে তা জানে না। নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারে না। তবু জ্বলন্ত বাতিটা ধরে তার আলোয় দেখে যেতে লাগল খুঁটিয়ে। তার একটা কথা কেবলি মনে হতে লাগল, কত অসহায়ভাবে ভঙ্গুর, কত শোচনীয়ভাবে অপূর্ণ এই মানুষের দেহ। তার উপর নগ্ন হলে তা কত খারাপ দেখায়। তার চেহারাটা দেখে লোকে তাকে সুন্দরী বলে। কিন্তু তার মনে হলো সে আর ঠিক তরুণী নেই, যৌবনের তারুণ্য পার হয়ে সে এখন পরিণতবয়স্কা নারীতে পরিণত হয়ে উঠেছে। সে খুব একটা লম্বা নয়, বরং স্কটদের মত কিছুটা বেঁটে। কিন্তু তার চেহারার মধ্যে এমন একটা সরল সাবলীল ভাব আছে যেটাকে এক নজরেই সৌন্দর্য বলে মনে হয়। তার গায়ের রংটা তামাটে, তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটা কেমন শক্ত শক্ত। তার দেহটা আরো পুষ্ট, আরো স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে সে দেহের মাঝে। তা ছাড়া তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে কোন কমনীয়তা নেই।

তার চেহারাটা দেখে যেমন সত্যিকারের নারী বলে মনে হয় না, তেমনি সে চেহারাটা কোন যুবক পুরুষের মতও মনে হয় না। তার প্রতিটি অঙ্গ কোন না কোন কারণে উপযুক্ত পূর্ণতা বা পুষ্টতা না পেয়ে দুর্বোধ্য ও অপূর্ণ রয়ে গেছে, একটা সুন্দর স্বচ্ছতা পায়নি।

তার বুকের স্তনগুলো কেমন ছোট ছোট, ঠিকমত পুষ্ট হয়ে ওঠেনি। একটু ঝুলন্ত ভাব আসেনি। সেই জার্মান ছেলেটার সঙ্গে যখন তার দেহসংসর্গ ছিল, যার সঙ্গে তার একটা দেহগত প্রেম বেশ জমে উঠেছিল তখন তার পেটের মধ্যে একটা মাংসল ও নধর ভাব ছিল, এখন সেটা নেই। তেমন মাংস না থাকায় সেটা পাতলা ও শক্ত কাঠ-কাঠ দেখাচ্ছে। আগেকার মত যৌবনসুলভ চকচকে ভাব নেই। কেমন যেন থলথলে হয়ে গেছে বুড়ীদের মত। তার জাহুগুলোও আগে বেশ কেমন সুবর্তুল ছিল, কেমন গোলগাল দেখাত। এখন সেগুলো সরু হয়ে গেছে।

এখন তার সারা দেহটাই যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। হয়ে উঠেছে অস্বচ্ছ ও গুরুত্বহীন। কথাটা ভেবে অস্বাভাবিকভাবে বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে উঠল কনি। আর কোন আশা নেই তার জীবনে। মাত্র এই সাতাশ বছর বয়সেই সে বুড়ী হয়ে গেছে। তার গাত্রত্বকের সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সে। ক্রমাগত অবহেলা আর উপযুক্ত সমঝদারের অভাবে তার যৌবনসৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে অকালে। তাকে দিয়েছে এক শোচনীয় অকালবার্ধক্য। সৌখীন-মনা নারীরা বাইরের সমঝদারদের সপ্রশংস দৃষ্টির সাহায্যেই অটুট ও উজ্জ্বল রাখতে পারে তাদের দেহসৌন্দর্যকে। কিন্তু সে তা পারে না, চায় না। কারণ তার মন। হয়ত তার মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই তা পারেনি। কথাটা মনে পড়তেই এক প্রচণ্ড রাগে ও ঘৃণায় ফেটে পড়ল কনি।

এবার পিছনের দিকে আয়নাটার পানে তাকাল কনি। সে আয়নায় প্রতিফলিত তার দেহের পিছনটা দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। তার কোমর, পাছা প্রভৃতি যতই দেখতে লাগল সে ততই তার মনে হতে লাগল এগুলো সব যেন ক্লান্ত ও বিষাদম্লান হয়ে উঠেছে। অথচ আগে একদিন এখানে ছিল আনন্দের উজ্জ্বলতা। তার পাছা জঘন ও জঙ্ঘাদেশের ঢালু জায়গাটা আগে কত মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাত যেটা একমাত্র সেই জার্মান যুবকটা ভালবাসত। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর থেকে এ জায়গার সে উজ্জ্বলতা আর নেই। দশ বছর হলো সে মারা গেছে। আজ সে মাত্র সাতাশ বছরের এবং তার সারা জীবনটাই পড়ে আছে। বলিষ্ঠদেহী সেই জার্মান যুবকটা ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তার ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যে একটা কুৎসিত নগ্নতা ছিল যেটাকে সে তখন ঘৃণা করত। কিন্তু আজ সে মনেপ্রাণে সেইটাই চায় অথচ কোথাও পাবে না আর। আজকালকার পুরুষদের মধ্যে থেকে ইন্দ্রিয়াবেগের সেই কদর্য বলিষ্ঠতা, নর্ম-ক্রীড়ার সেই নোংরামির নিবিড়তা নিঃশেষে চলে গেছে। আজকালকার পুরুষদের যৌনক্রিয়া মানে মাইকেলিসের মত দু সেকেণ্ডের এক তরল উত্তেজনা। কিন্তু পৌরুষসুলভ যে দুরন্ত ও বলিষ্ঠ যৌনাবেগ নারীদেহের শায়িতশীতল রক্তকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে তোলে, তাদের সত্তাকে সজীব করে তোলে সে যৌনাবেগ আজ কোন পুরুষের মধ্যেই পাওয়া যায় না।

তবু তার মনে হলো তার পিঠের যে দিকটা ঢালু হয়ে পাছার দিকে নেমে গেছে সেইখানেই কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তার দেহের সামনের দিকটা দেখে একেবারে হতাশ হয়ে উঠল সে। তার পেট বুক যেন সব যৌবন-সুলভ পুষ্টতা, পরিণতি আর উজ্জ্বলতা পাবার আগেই বার্ধক্যসুলভ এক জড়তা আর বিশুষ্কতায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবতে লাগল যে সন্তানের কথা ভাবছে সে সন্তান কি করে গর্ভে ধারণ করবে সে? তার এই দেহ কি সন্তান ধারণের যোগ্য?

যাই হোক, রাতের পোষাক পরে বিছানায় চলে গেল কনি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগল। অন্তহীন তিক্ততার মাঝে ক্লিফোর্ড, তার লেখা, তার কথাবার্তা, তার বন্ধুবান্ধব সব কিছুর প্রতি একটা হিমশীতল ঘৃণা আর রাগ শক্ত হয়ে দানা বেঁধে উঠতে লাগল ক্রমশঃ। ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা সব এক জাতের। ওরা কোন নারীকে তার উপযুক্ত দেহগত মর্যাদা দিতেও জানে না।

অবিচার, ঘোর অবিচার। দেহগত অবিচারের এক প্রতিহত চেতনা একটা দুঃসহ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল তার সমগ্র অন্তরাত্মার গভীরে।

সে যাই হোক, তবু তাকে পরদিন সকালে ঠিক সাতটার সময়েই উঠতে হলো। উঠেই ক্লিফোর্ডের কাছে নিচের তলায় চলে গেল কনি। কারণ ক্লিফোর্ডকে তার কতকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্মে সাহায্য করতে হবে তাকে। এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তার কোন পুরুষ বা মেয়ে চাকর নেই। বাড়ির যে পুরনো চাকর তাকে এই সব কাজে সাহায্য করে তার বয়স হওয়ায় সে ভারী জিনিস তুলতে পারে না। কনি তাই স্বেচ্ছায় সেই সব করে। তার দ্বারা যা যা সম্ভব সব করে যায়।

এই জন্যই মাত্র দু একদিনের জন্য ছাড়া র‍্যাগবি থেকে কোথাও যেত না কনি। কনি না থাকলে ক্লিফোর্ডের পুরাতন ভৃত্যের স্ত্রী মিসেস বেটস্ এই সব কাজকর্ম করে আর ক্লিফোর্ডও তা বাধ্য হয়ে মেনে নেয়।

তবু তার মনের গভীরে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতারণাজনিত এক অবিচার-বোধ তুষের আগুনের মত অনতিতীব্র অথচ অবিচ্ছিন্ন ধারায় জ্বলে যাচ্ছিল। তার জ্বালায় মনটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল কনির। দেহগত প্রতারণা বা অবিচারের এই আশাহত চেতনা, এই ব্যর্থতাবোধ একবার জাগলে বড় ভয়ংকর, বড় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ চেতনা এ বোধের উপযুক্ত আত্মপ্রকাশের পথ অবশ্যই করে দিতে হবে। তা না হলে যাকে কেন্দ্র করে এ চেতনা জ্বলে ওঠে তাকে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বেচারা ক্লিফোর্ডকে এ জন্য দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সে কনির থেকে বড় রকমের এক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পড়েছে। আসলে এর জন্য দায়ী তাদের এক বিরাট ভাগ্য-বিপর্যয়।

তবু একদিক দিয়ে সে কি দোষের পাত্র নয়? সব কিছু সত্ত্বেও তাদের দেহগত সান্নিধ্যের একটা নিবিড়তা ও আন্তরিকতার অভাবের জন্য তাকে কি দায়ী করা যায় না? কনির প্রতি আচরণে কোনদিনই সে আন্তরিকতা বা এমন কি একটু দয়ামায়ারও পরিচয় দেয়নি। অভিজাত সমাজের চিন্তাশীল লোকদের মত শুধু এক নীরস সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে এসেছে কনির প্রতি। কিন্তু একজন পুরুষের একজন নারীর প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিত, তার পৌরুষ-সুলভ হাসিখুশির উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা দিয়ে যেভাবে হিমশীতল নারীমনের অস্ফুট কুসুমকোরকগুলিকে ফুটিয়ে তোলা উচিত তা কোনদিন করেনি ক্লিফোর্ড।

কিন্তু ক্লিফোর্ড এই ধরনের পুরুষ নয়। শুধু সে নয়, তাদের সমাজের কোন পুরুষই তা করে না। আসলে অন্তরের দিক থেকে ওরা সকলেই স্বতন্ত্র এক অবিগলিত অবিচলিত কাঠিন্যে প্রস্তরীভূত। ওদের কাছে আন্তরিকতা হলো সুরুচির পরিচায়ক। আন্তরিক না হয়েও জীবনে বেশই চলা যায়। ওদের জীবনের পথে চলার সময় সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে, নিজের সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে চলবে। যদি তুমি অভিজাত শ্রেণীর লোক হও, তাহলে কোন কথা নয়। তাহলে আপন শ্রেণীগত আধিপত্যের কথা ভেবে স্বচ্ছন্দে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পার। কিন্তু তুমি যদি অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক হও, তোমার সে সম্ভ্রমবোধ থাকতে পারে না, তুমি অভিজাত বা শাসকশ্রেণীর লোক একথা কখনই ভাবতে পার না। তাছাড়া যারা অভিজাত সমাজের চূড়ামণি তাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই যাকে তারা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হিসাবে ধারণ করে চলতে পারে। সুতরাং কি তার শাসন করবে? তাদের শাসন হলো হাস্যাস্পদ এক কুশাসন। আসলে এর মধ্যে সত্য কোথায়? গোটা ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় করে যাওয়া এক বাজে বোকামির কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক বিদ্রোহের ভাব ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল কনির মধ্যে। এর মধ্যে ভাল বলতে কি আছে? তার এই তিল তিল আত্মত্যাগ আর ক্লিফোর্ডের প্রতি তার এই অনুরক্তি ও আনুগত্যের মধ্যে কি ভাব থাকতে পারে? তাছাড়া তার দেখারই বা কি অর্থ থাকতে পারে? যে সেবার মধ্যে কোন মানসিক আন্তরিক-তার কোন স্পর্শ নেই তা নীচু জাতের ইহুদীদের কুক্কুরীদেবী উন্নতির কাছে বেশ্যাবৃত্তির মতই দুর্নীতিমূলক। যে ক্লিফোর্ড বলে সে শাসকশ্রেণীর লোক সেই ক্লিফোর্ড আবার উন্নতির কুক্কুরীদেবীর পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে। এ বিষয়ে কোন লজ্জা সে অনুভব করে না বা তার জিবটা মুখ থেকে খসে পড়ে না। এ ব্যাপারে মাইকেলিসের তবু আত্মমর্যাদাবোধ আছে। অথচ সে ক্লিফোর্ডের থেকে বেশী উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেছে। যদি কেউ খুঁটিয়ে দেখে ক্লিফোর্ডকে তাহলে সে বুঝবে ক্লিফোর্ড একটা বোকা ভাঁড়। মাইকেলিস

যদি ইতর হয় ত হোক, ভাঁড় হওয়াটা ইতর হওয়ার থেকে বেশী অপমানজনক।

যদি বিচার করা হয়, মাইকেলিস আর ক্লিফোর্ড এই দুইজন মানুষের মধ্যে কার প্রয়োজন বেশী তার কাছে তাহলে দেখা যাবে মাইকেলিসের প্রয়োজনই বেশী কনির কাছে। ক্লিফোর্ডের প্রয়োজন মানে ত শুধু সেবা আর যে কোন একজন ভাল নার্স ক্লিফোর্ডের পঙ্গু পায়ের সেবা করতে পারে।

ক্লিফোর্ডের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তাকে নিয়ে কথা হয় মাঝে মাঝে। এঁদের মধ্যে আছেন ক্লিফোর্ডের পিসি লেডি বেনারলি বা ইভা পিসি। তাঁর বয়স ষাট, রোগা-রোগা চেহারা। তিনি অভিজাত বংশের মেয়ে এবং এই আভিজাত্যের ধারাটা সারা জীবন ধরে বজায় রেখে চলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নিজেদের আভিজাত্যের গরিমা আর বংশগৌরবকে সব সময় বড় করে আর অপর সকল মানুষকে হীন মনে করার এক সামাজিক খেলায় পারদর্শিনী তিনি।

ইভা আর যাই হোক, কনিকে কিন্তু তিনি ভালবাসতেন। একটু স্নেহের চোখে দেখতেন। একদিন তিনি আভিজাত্যসুলভ ভারিক্কি চালে কনিকে বললেন, সত্যিই তুমি অদ্ভুত মেয়ে আমার মতে। তুমি ক্লিফোর্ডের জন্য যা করছ তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমি কোন উদীয়মান প্রতিভা চোখে দেখিনি, কিন্তু ক্লিফোর্ড হলো তাই।

ইভা পিসি ক্লিফোর্ডের সাফল্যে গর্বিত। অবশ্য ক্লিফোর্ড কি বই লিখেছে তা তিনি দেখতে চান না। দেখার দরকার আছে বলে মনেও করেন না।

কনি বলল, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

ইভা পিসি বললেন, তোমার কাজ বা কৃতিত্ব আর কার বা হবে? আর আমার মনে হয় তার উপযুক্ত প্রতিফল বা পুরস্কার তুমি পাও না।

ও কথা কেন বলছেন?

আচ্ছা দেখ ত, কেমন করে তুমি বন্দী হয়ে থাক বাড়িটার মধ্যে। আমি একদিন ক্লিফোর্ডকে বলেছিলাম, মেয়েটা যদি কোনদিন বিদ্রোহ করে তাহলে তোমাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে তাকে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড ত আমাকে কোন কিছু দিতে অরাজী হয় না।

কনির ঘাড়ের উপর তাঁর রোগা রোগা হাতটা রেখে ইভা পিসি বললেন, দেখ বাছা, নারী হয়ে যখন জন্মেছ তখন নারীদের মত করে বাঁচতে হবে। তা না হলে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

আর এক পাত্র মদ খেলেন ইভা পিসি।

কনি বলল, কেন, আমিও ত নারীজীবন যাপন করে চলি।

কিন্তু আমার মনোমত নয়। ক্লিফোর্ডের উচিত তোমাকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া। সেখানে তোমাকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে দেওয়া উচিত। তার বন্ধুবান্ধবরা তার কাছে ভাল। তার কাছে তাদের দাম আছে। কিন্তু

তোমার কাছে কি মূল্য তাদের? আমি ত এর মধ্যে কোন ভাল দেখি না। আমি চাই না তোমার যৌবন এইভাবে বিনষ্ট হয়ে যাক আর তুমি মধ্য বয়সে ও শেষ বয়সে এর জন্য অনুশোচনা করতে থাক।

ইভা পিসি এবার চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন। আর এক পাত্র করে মদ খেতে লাগলেন।

কনি কিন্তু আপাততঃ লণ্ডনে গিয়ে লেডি বেনারলির সমাজে মেলামেশা করতে চাইল না। সে নিজেকে চটপটে আধুনিকা হিসাবে কোনদিনই ভাবতে চায় না। তার মনে হলো এই সব আনন্দোচ্ছলতার অন্তরালে একটা হিমশীতল শুষ্কতা আছে, ঠিক যেন শীতল লাব্রাডার স্রোত, যার উপরিপৃষ্ঠে কিছু হাসিখুশির ফুল ভেসে গেলেও ভিতরে পা ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে হিমে পা জমে যায়।

টমি ডিউক তখন র‍্যাগবিতে ছিল। তার সঙ্গে এসেছিল হ্যারি উইন্টারলো আর জ্যাক স্ট্রেঞ্জওয়েজ আর তার স্ত্রী অলিভ। তখন আবহাওয়াটা খারাপ ছিল বলে বাইরে কেউ বেরোত না। শুধু বসে বসে গল্প আর গল্প করছিল সবাই। গল্প হল আর মাঝে মাঝে বিলিয়ার্ড খেলা চলল।

অলিভ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিল। বইটাতে ছিল সেই অনাগত যুগের কথা যখন বোতলে শিশুর জন্ম হবে আর নারীদের সন্তান ধারণ করতে হবে না। ফলে নারীরা ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবে জীবনটাকে অর্থাৎ নারীদের এমনভাবে নির্বীর্যকরণ করা হবে যাতে তারা সন্তান ধারণ করতে না পারে অথচ যাতে তাদের দেহসৌন্দর্যের কোনরূপ বিকৃতি না ঘটে।

পড়তে পড়তে অলিভ একসময় বলল, কী মজা হবে তখন। তখনই একমাত্র মেয়েরা সত্যিকারের উপভোগ করতে পারবে জীবনটাকে।

তার স্বামী স্ট্রেঞ্জওয়েজ সন্তান চায়, অলিভ চায় না।

উইন্টারলো দুষ্টু হাসি হেসে অলিভকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ধরনের নির্বীর্যকরণ চান?

অলিভ বলল, আমি এমনিতেই নিরাপদে আছি। আশা করি ভবিষ্যতে মানুষের বোধশক্তি আরও বাড়বে এবং নারীদের সন্তানধারণের কাজে টেনে আনা হবে না।

ডিউক বলল, হয়ত তখন নারীরা আকাশে ভাসবে।

ক্লিফোর্ড বলল, সভ্যতা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহগত বাধা-বিপত্তিগুলোকে অপসারিত করা উচিত। আমার মনে হয় যদি আমরা বোতলের মধ্যে সন্তানে উৎপাদন করতে পারি তাহলে ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা একেবারে চলে যাবে।

অলিভ বলল, বোধ হয় না। মনে হয় তা আরও বেড়ে যাবে।

চিন্তান্বিতভাবে লেডি বেনারলি বললো, যদি ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা চলে যায় একেবারে তাহলে তার জায়গায় অন্য কোন একটা নেশা এসে জুটবে

মানুষের মধ্যে। হয়ত মর্ফিয়ার নেশা। এ নেশা খুব ভাল। উন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে সকলের মধ্যে।

জ্যাক স্ট্রেঞ্জওয়েজ বলল, প্রতি শনিবার যদি বাতাসে একটু করে মর্ফিয়া ছড়িয়ে দেয় ত ভাল হয়, সপ্তার শেষটা ভাল কাটে। কথাটা হয়ত শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু তার পরের দিনগুলো কি করে কাটবে ?

লেডি বেনারলি বললেন, যতদিন মানুষ তার দেহটার কথা ভুলে থাকবে ততদিন ভাল। কিন্তু দেহের কথা একবার মনে পড়লেই তুমি গেলে। যদি সভ্যতা মানুষের কোন মঙ্গল বা উপকার করতে পারে ত তা যেন মানুষকে তার দেহের কথা ভুলিয়ে দেয়। তাহলে দিনগুলো আমাদের কোন দিকে কেটে যাবে তা আমরা বুঝতেই পারব না।

উইন্টার্লো বলল, হ্যাঁ, আমাদের দেহের পীড়ন থেকে মুক্ত করতে হবে। এখন সত্যিই তার সময় এসেছে। মানুষের স্বভাবের দিকটা দেহগত বা জৈবিক, সেদিকটার উন্নতি সাধন করা উচিত

কনি বলল, ধরে নাও, আমরা সিগারেটের ধোঁয়ার মত শূন্যে ভাসতে থাকি।

ডিউক বলল, তা হতেই পারে না। তা যদি হয় অর্থাৎ আমাদের দেহগত কামনা বাসনা বলতে কিছু না থাকে ত আমাদের সভ্যতাই থাকবে না তা কোন অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। তখন সে সভ্যতাকে সেই অতলগর্ভ থেকে একটামাত্র জিনিসই আবার তুলতে পারে। আর তা হলো মানুষের জননেন্দ্রিয়।

অলিভ বলল, না সেনাপতি মশায়, তা অসম্ভব।

ইভা পিসি বললেন, আমাদের সভ্যতা ধ্বংস হতে বসেছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তার বদলে কি আসছে ?

ইভা পিসি বললেন, আমার সে বিষয়ে কোন ধারণা নেই। তবে কিছু একটা আসবে ঠিক তার বদলে।

কনি বলল, কিছুই হবে না। লোকে ধোঁয়া ছাড়া কিছুই চায় না। সব শূন্যতা। অলিভ বলে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেদিন নারীদের আর সন্তান ধারণ করতে হবে না। এবং বোতলের ভিতর শিশুর জন্ম হবে। ডিউক বলে, মানুষের সব সভ্যতা অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। শুধু মানুষের জননেন্দ্রিয়টাই সেই অতল গহ্বরের উপর এক নূতন সভ্যতার সেতুবন্ধন করবে। ক্লিফোর্ড বলে, আসলে এর পরিবর্তে কোন সভ্যতা আসবে তা ঠিক বুঝতে পারছি না

অলিভ বলল, ওসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। কেবলমাত্র বোতলে যাতে বাচ্চা হয় তার জন্য চেষ্টা করো আমাদের অর্থাৎ নারীজাতিকে অব্যাহতি দাও সন্তানধারণের দুঃসহ পীড়ন থেকে।

টমি বলল, মানবসভ্যতার পরের স্তরে আসতে পারে এক বিরাট পরিবর্তন। তখন হয়ত প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত নরনারী আসতে পারে যারা হবে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা কেউ সত্যিকারের মানুষ নই। সত্যিকারের মনুষ্যত্ব

অর্জন করতে পারিনি আমরা। আমরা আমাদের সব বুদ্ধিগত ও কারিগরী বিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। এর পর যে নূতন সভ্যতা আসবে সে সভ্যতা হয়ত আজকের এই সব চতুর কুশলী লোকদের পরিবর্তে সত্যিকারের নরনারী নিয়ে আসবে। তারা ধোঁয়ার মানুষ হবে না, আবার বোতলের বাচ্চাও হবে না।

অলিভ বলল, লোকে যখন প্রকৃত নারীর কথা বলে তখন আমি হাল ছেড়ে দিই একেবারে।

উইন্টার্লো বলল, আমাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভাল বস্তু সেটা হলো আমাদের আত্মা। আধুনিক জীবনধারা থেকে আর কোন উপাদান আমরা পেতে পারি না।

জ্যাক মদ খেতে খেতে বলল, আত্মা?

ডিউক বলল, তুমি কি ভাব? আমি চাই সভ্যতা মরে যাক। মানুষগুলো মরে যাক, তারপর তাদের দেহগুলোর শুধু পুনরভ্যুত্থান হোক। মন বস্তুটাকে আমরা যেন চিরতরে নির্বাসন দিতে পারি। আমরা মন না থাকলেই টাকা পয়সা বা অন্যান্য বস্তুকে পরিহার করে চলতে পারব। তখন আমরা সকলেই সকলের দেহকে স্পর্শ করতে পারব। অবশ্য তাই বলে সকলের টাকা সকলে পাবে না।

কথাটা যেন বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কনির অন্তরে। সে বলতে লাগল, মনে মনে দেহাত্মবাদের প্রতিভূস্বরূপ স্পর্শের স্বাধীনতা আমাকে দাও! এ কথার অর্থ কি তা ঠিক জানে না ও, তবু কথাটা ভাল লাগছিল তার। যেমন অনেক অর্থহীন কথাই তার ভাল লাগে।

আসলে সব কিছুই বাজে। সব কিছুর উপরেই রাগ হচ্ছিল কনির। ক্লিফোর্ড, ইভা পিসি, অলিভ, জ্যাক, উইন্টার্লো, ডিউক—সব। এরা সবাই বাজে। শুধু কথা আর কথা। এইসব অন্তহীন কথার কচকচির অর্থ কি?

কিন্তু এই সব কথার কচকচি যখন থেমে গেল, যখন সবাই চলে গেল তখনও কিছু সুবিধা হলো না কনির। ক্লান্তির বোঝাটা দিনে দিনে বেড়ে চলতে লাগল তার মনে। রাগ আর অসহিষ্ণুতার অব্যক্ত প্রচণ্ডতাটা তার মন থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসে তার দেহের নিম্নাঙ্গটাকে গ্রাস করে ফেলল। তার থেকে কোনক্রমেই অব্যাহতি পেল না সে। মনে হতে লাগল এক দুঃসহ বেদনায় নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তার সারা নিম্নাঙ্গটা। তার শরীরটা কেমন যেন শুকিয়ে প্যাকাটি হয়ে যেতে লাগল।

তাদের বাড়ির পুরনো ঝি এটা লক্ষ্য করল। টমি ডিউক একদিন বলল তার শরীরটা নিশ্চয় ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু কনি তা স্বীকার করল না। বলল ভালই আছে। শরীরটা যতই তার শুকিয়ে যাক তার জন্য যেন কোন ভয় নেই কনির। কনির শুধু একটা বিষয়ে ভয় হয়। সে যখন বাগানে বা বনভূমিতে বেড়াতে গিয়ে তাদের পারিবারিক সমাধিভূমির পানে তাকায় অথবা

তার চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ পড়ে যায় তার উপর তাহলে তখন যেন সেই সব ভূতুড়ে সমাধিস্তম্ভগুলো এক ভয়ঙ্কর দৈত্যে হাসিতে ফেটে পড়ে যেন তার পানে তাকায়। তাকে যেন এক অমোঘ অদৃশ্য ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দেয় তাকেও একদিন ওখানে তাদের মাঝখানে যেতে হবে। নীরবে শায়িত ও সমাহিত হয়ে থাকতে হবে তার এই ব্যর্থ প্রতিহত জীবনের যত সব অসার লীলাখেলা সাঙ্গ করে।

তার বোনকে একটা চিঠি লিখল কনি। তার বোন হিলদা থাকে স্কটল্যাণ্ডে। চিঠি পেয়ে তার ছোট গাড়িটা নিজে চালিয়ে সোজা চলে এল হিলদা। তখন মার্চ মাস। কনি লিখেছিল, আমি মোটেই ভাল নেই। অথচ রোগটা কি তা ধরতে পারছি না।

হিলদার গাড়িটা কনিদের বাড়ির সামনে এসে থামতেই কনি ছুটে গেল। গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই বোনকে চুম্বন করল হিলদা। বলল, কি ব্যাপার?

কনি লজ্জা পেয়ে বলল, কিছু না।

মুখে কিছু না বললেও কনি তার মনে প্রাণে হাড়ে হাড়ে জানে কিভাবে এক দুঃসহ যন্ত্রণার নিবিড়তার দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে সে প্রতি মুহূর্তে। দুই বোন, একই ধরনের সোনালী উজ্জ্বল গাত্রত্বক, নরম বাদামী চুল, আর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য পেয়েছে জন্মসূত্রে। হিলদা মাত্র দু বছরের বড় তার থেকে। তবু এরই মধ্যে চেহারাটা কত রোগা হয়ে গেছে কনির। তার চেহারার সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সে।

হিলদা আর কনি দুজনেরই গলার স্বর এক। কনির মতই মোলায়েম নরম গলায় হিলদা বলল, কিন্তু সত্যিই তুমি অসুস্থ বোন।

মুখে সামান্য একফালি সকরুণ হাসি হেসে কনি বলল, মোটেই না। মনে হয় আমি কিছুটা ক্লান্ত। মানসিক ক্লান্তির জন্যই এরকম মনে হচ্ছে।

হিলদার মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। নারীসুলভ কমনীয়তা আর উজ্জ্বলতার অভাব নেই তার দেহে। তবু কোন পুরুষের সঙ্গে খুব বেশী খাপ খায় না তার। পাকা পীয়ার ফলের মত দেখাচ্ছিল তাকে।

হিলদা র‍্যাগবির চারদিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে বলল, এই জায়গাটা একেবারে বাজে।

এবার তাড়াতাড়ি ক্লিফোর্ডের কাছে চলে গেল হিলদা। হিলদাকে দেখে ক্লিফোর্ড ভাবতে লাগল, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে। তবু তার শ্বশুরবাড়ির কোন লোকদের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় না ক্লিফোর্ড। কারণ তাদের জীবনযাত্রা ও রুচিবোধের সঙ্গে ওদের মেলে না। তবে হিলদার আচরণের মধ্যে এমনই একটা অপ্রতিরোধ্য আবেদন আছে যাতে সাড়া না দিয়ে পারে না ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড একটু দূরে চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসল। তার মাথার সুন্দর চুলগুলো বেশ চকচক করছিল। তার চোখ ও মুখখানা ম্লান দেখালেও তার চোখের মধ্যে একটা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ছিল আর তার মুখের মধ্যে একটা আভিজাত্যসুলভ গাম্ভীর্যের ভাব ছিল। সে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু হিলদা তার এই ভাবটাকে ধৃষ্টতা বলে ধরে নিল। ভাবল একটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। ক্লিফোর্ডের এই গাম্ভীর্যের ভাবটাকে মোটেই গ্রাহ্য করল না হিলদা। ক্লিফোর্ড যদি পোপের পদে অধিষ্ঠিত থাকত তাহলেও তাতে তার কিছু যেত আসত না।

তার সুন্দর দু চোখের দৃষ্টির শর দিয়ে ক্লিফোর্ডকে বিদ্ধ করে হিলদা বলল, কনিকে দারুণ অসুস্থ দেখাচ্ছে। কনির মতই হিলদাকেও কুমারী কুমারী দেখাচ্ছিল। তবু ক্লিফোর্ড বেশ বুঝতে পারল ওদের আপাতসরল কৌমার্য-ভাবের অন্তরালে স্কটদেশীয় একটা দৃঢ়তা আর একগুঁয়েমি লুকিয়ে আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, ও একটু রোগা হয়ে গেছে।

হিলদা বলল, এ বিষয়ে তুমি কিছু করনি?

ক্লিফোর্ড প্রশ্ন করল, এ বিষয়ে করার কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন? তার কণ্ঠের মধ্যে ভদ্রতার সঙ্গে ইংরেজসুলভ একটা কঠোরতার ভাব মিশে ছিল।

হিলদা কোন কথা না বলে শুধু ক্লিফোর্ডের পানে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। কনির মত মুখের উপর সঙ্গে সঙ্গে কারো কথার জবাব দেওয়া তার স্বভাব নয়। হিলদার চোখপানে ক্লিফোর্ড একবার তাকিয়েও অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার মনে হলো হিলদা এভাবে তার পানে না তাকিয়ে যদি তার কথার কোন কড়া জবাব দিত তাহলে ভাল হত।

অবশেষে হিলদা বলল, আমি তাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুমি কাছাকাছি কোন ভাল ডাক্তারের নাম বলতে পার?

ক্লিফোর্ড বলল, দুঃখিত, এমন কোন ডাক্তারের নাম আমার জানা নেই।

হিলদা বলল, আমি ওকে লণ্ডনে নিয়ে যাব। সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত একজন ডাক্তার আছে।

জ্বলন্ত রাগের আগুনে তার মনটা টগবগ করে ফুটলেও ক্লিফোর্ড মুখে কিছুই বলল না।

হিলদা বলল, আজ রাতটা আমি এখানেই থাকব। পরদিন ওকে আমি গাড়িতে করে লণ্ডনে নিয়ে যাব।

রাগে মুখখানা হলুদ পাণ্ডুর হয়ে গেল ক্লিফোর্ডের। তবু হিলদার চেহারাটাকে দেখতে বড় ভাল লাগছিল তার।

রাত্রিতে খাবার পর কফি খেতে খেতে হিলদা ক্লিফোর্ডকে বলল, তোমাকে দেখাশোনার জন্য একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করো। এজন্য তোমার

একজন পুরুষ ভৃত্য রাখা উচিত।

কথাগুলো হিলদা বেশ নরম মোলায়েম গলায় বললেও ক্লিফোর্ডের মনে হচ্ছিল সে যেন তার মাথায় একটা ধারাল অস্ত্রের কামড় বসিয়ে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ড নীরসভাবে বলল, আপনি তাই মনে করেন?

হিলদা বলল হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এটা যদি দরকার হয় তো করো, তা না হলে বাবা ও আমি কনিকে কয়েক মাসের জন্য নিয়ে যাব। এ ধরনের ব্যাপার চলতে পারে না।

কি ধরনের ব্যাপার চলতে পারে না?

হিলদা পরিপূর্ণভাবে ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছ? তুমি দেখনি কি অবস্থা হয়েছে ওর?

ক্লিফোর্ডকে ঠিক সেই মুহূর্তে দেখে সিদ্ধ ক্রে মাছের মত মনে হচ্ছিল হিলদার।

ক্লিফোর্ড বলল, কনিতে আমাতে ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখব।

হিলদা বলল, তাতে আমাতে আগেই আলোচনা করেছি ব্যাপারটা।

ক্লিফোর্ড এর আগে অনেকদিন ধরে নার্সদের হাতে ছিল। কিন্তু ওরা ক্লিফোর্ডকে একবারও ঠিকমত একা থাকতে দেয় না। আর পুরুষচাকর? পুরুষচাকর একটা ঘাড়ের কাছে সব সময় ঝুলতে থাকবে এটা মোটেই পছন্দ করে না সে। তার থেকে যে কোন মেয়ে একজন হলেই ভাল। তবে কনিই বা থাকবে না কেন?

পরদিন সকালে দুই বোনে বেরিয়ে গেল। হিলদার পাশে কনিকে ঈস্টারের শান্ত মেঘের মতই দেখাচ্ছিল। হিলদা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। স্যার ম্যালকম তখন বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু বাড়িটা খোলা ছিল।

ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করল কনিকে। তার জীবন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সবকিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। ডাক্তার বলল, আমি আপনার ও স্যার ক্লিফোর্ডের ছবি কিছু সচিত্র পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। আমি আপনাকে দেখলাম, দেহযন্ত্রের কোণ কিছু বিকল হয় নি। কিন্তু আপনার জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে। এভাবে চলতে পারে না আপনাকে শহরে আসতে হবে। আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হবে। আপনার জীবনীশক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে আপনার হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুগুলো এর মধ্যেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, শুধু স্নায়ুগুলো। আমি আপনাকে অবশ্য আপাততঃ মাসখানেকের মধ্যে ঠিক করে দেব। সুস্থ করে দেব। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না আপনারা যদি আমার কথা না শোনেন, যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন না করেন তাহলে পরে কোন অশুভ পরিণামের জন্য আমাকে যেন দোষ দেবেন না। আপনি আপনার জীবনীশক্তির ক্ষয় করে যাচ্ছেন দিনে দিনে। কিন্তু তা পূরণ করছেন না। তা পূরণ হচ্ছে না। যে কোন রকমের হাসিখুশি, বলিষ্ঠ আমোদ-প্রমোদ আপনার দরকার। এই

বিমর্ষ ভাবটা অবশ্যই কাটাতে হবে।

হিলদা সমর্থনে তার চোয়ালটা একবার নাড়ল!

মাইকেলিস শুনতে পেল কনি শহরে এসেছে তার দিদির সঙ্গে। খবর পাওয়ামাত্র গোলাপ ফুল নিয়ে ছুটে এল দেখা করতে। কনিকে দেখেই সে চিৎকার করে উঠল, এ কি দশা হয়েছে তোমার? নিশ্চয় কিছু একটা গলদ হয়েছে কোথাও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমার ছায়ামাত্র। চেহারার এমন পরিবর্তন কখনো দেখিনি আমি। একথা আমাকে জানাওনি কেন তুমি? আমার কাছে চলে আসনি কেন? চল, আমার সঙ্গে সিসিলি চল। এখন সিসিলি জায়গাটা দারুণ ভাল লাগবে। তোমার এখন দরকার সূর্যালোকের। তোমার চাই এখন প্রাণের উত্তাপ। কেন তুমি নিজেকে এভাবে ক্ষয় করে চলেছ? চল, আফ্রিকা চল আমার সঙ্গে। গুলি মেরে দাও ক্লিফোর্ডের কথায়। ও চুলোয় যাক, জাহান্নামে যাক। ওকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এস। যে মুহূর্তে ও তোমার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে সেই মুহূর্তে আমি তোমাকে বিয়ে করব। চলে এস, এক নতুন জীবন শুরু করো। ঈশ্বরের নামে বলছি, ঐ র‍্যাগবি জায়গাতে যে থাকবে সেই মরবে। ওখানে মানুষ থাকে না, পশু থাকে। বাজে জায়গা, মানুষ মারা সর্বনেশে জায়গা। তার চেয়ে আমার সঙ্গে সূর্যালোকের রাজ্যে চল। তোমার এখন চাই প্রচুর সূর্যালোক। চাই পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আর স্বাভাবিক জীবনের এক মধুর উত্তাপ।

কিন্তু ক্লিফোর্ডকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করার কথা ভেবে কনির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থেমে গেল। সে তা পারবে না। না না……সে তা কিছুতেই পারবে না ওকে র‍্যাগবি ফিরে যেতেই হবে।

কথাটা শুনে মাইকেলিস বিরক্ত হয়ে উঠল। হিলদা মাইকেলিসকে দেখতে পারত না ঠিক তবু ক্লিফোর্ডের থেকে অনেক ভাল সে। যাই হোক দুই বোনে আবার সেই মিডল্যাণ্ডেই ফিরে এল।

ক্লিফোর্ডের চোখের তারাগুলো তখনো রাগে হলুদ হয়ে ছিল। হিলদা ক্লিফোর্ডের কাছে কথাটা তুলল। ক্লিফোর্ড এসব কিছু শুনতে না চাইলেও কনি তা বলল। ডাক্তার যা যা বলেছে তা সব বলল হিলদা। বলল না শুধু মাইকেলিসের কথাগুলো। অস্বস্তিকর অবাঞ্ছিত এক নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে সব কিছু শুনে যেতে লাগল ক্লিফোর্ড।

অবশেষে হিলদা বলল, এই হচ্ছে এক পুরুষ চাকরের ঠিকানা। ও একটা পঙ্গু লোককে দেখাশোনা করত। লোকটা মারা যাওয়ায় এখন তার ছুটি হয়েছে।

কিন্তু ক্লিফোর্ড বোকার মত বলল, আমি ত আর পঙ্গু নই একেবারে। আমি পুরুষচাকর চাই না।

হিলদা বলল, এই নাও দুটি মেয়ের ঠিকানা। ওদের মধ্যে আমি একটিকে

আগেই দেখেছি। বছর পঞ্চাশ বয়স। শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা। মন খুব ভাল। শান্ত প্রকৃতির, বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্না।

ক্লিফোর্ড তেমনি সেই নীরবতায় স্তব্ধ গাম্ভীর্যে জমাট বেঁধে রইল পাথরের মত। কথাটার কোন উত্তর দিল না।

হিলদা বলল, ঠিক আছে, ক্লিফোর্ড, কালকের মধ্যে যদি একটা ব্যবস্থা না করো তাহলে আমি বাবাকে টেলিগ্রাম করব। কনিকে আমরা নিয়ে যাব।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি যাবে?

সে যেতে চায় না। তবু তাকে যেতেই হবে। আমাদের মা ক্যান্সারে মারা যায়। আমরা আর কোন ঝুঁকি নেব না।

পরের দিন ক্লিফোর্ড নার্সের জন্য মিসেস বোল্টনের নাম প্রস্তাব করল। মিসেস বোল্টন হলো ত্রেভারশালের গ্রাম্য মিশনারী হাসপাতালের ধাত্রী। সেখান থেকে অবসর পেয়ে এখন সে ব্যক্তিগতভাবে লোকের বাড়িতে রোগীর সেবা করার কাজ করে বেড়ায়। ক্লিফোর্ড কোন অপরিচিত মেয়েকে নার্স হিসাবে পছন্দ করে না। মিসেস বোল্টন আগে একবার ক্লিফোর্ডের সেবা করে। তাই এবারও ক্লিফোর্ড তারই নাম করল।

পরদিন সকালেই দুই বোনে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে দেখা করল। বছর চল্লিশ বয়স। বলিষ্ঠ চেহারা। নার্সের পোষাক পরনে। তার আচরণ খুবই ভদ্র। কথাবার্তা বেশ মিষ্টি, গাঁয়ের সব লোক তাকে শ্রদ্ধা করে।

মিসেস বোল্টন ওদের মুখ থেকে সব কিছু শুনে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই লেডি চ্যাটার্লিকে দেখে ভাল মনে হচ্ছে না, ওঁর শরীর ভাল হবে, না কোথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। সত্যিই দুঃখের বিষয়। বেচারা ক্লিফোর্ড। সেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা যুদ্ধ। এর উপর কোন কথা নেই, প্রতিকার নেই।

মিসেস বোল্টন আগামীকালই র‍্যাগবিতে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ডাক্তার শার্লো যদি তাকে ছেড়ে দেন। কারণ সে এখন যেখানে কাজ করছে সেখানে সরকারীভাবে এখনো পনের দিনের কাজ তার হাতে আছে। নিয়মমত এটা সেরে দিয়ে যাওয়া উচিত মিসেস বোল্টনের। তবে ডাক্তার ইচ্ছা করলে তার একটা বিকল্প যোগাড় করে নিতে পারেন।

হিলদা নিজে গিয়ে দেখা করল ডাক্তার শার্লোর সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে গেল। ডাক্তার শার্লো মিসেস বোল্টনকে ছেড়ে দিলেন। পরের রবিবার মিসেস বোল্টন বাক্স প্যাটরা নিয়ে র‍্যাগবি রওনা হয়ে পড়ল। হিলদা মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কথা বলে দেখল তার বয়স সাতচল্লিশ হলেও তাকে দেখে অনেক কম বয়সের মনে হয়।

মিসেস বোল্টনের স্বামী টেড বোল্টন আজ হতে বাইশ বছর আগে খাদে কাজ করতে করতে মারা যায়। তখন ছিল খৃস্টোৎসব। দুটি শিশুকে স্ত্রীর হাতে দিয়ে অকালে চলে গেল স্বামী। তাদের মধ্যে একটি শিশু ছিল

দুগ্ধপোষ্য। সেদিনের সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু এডিস আজ বিবাহিতা। শেফিল্ডের এক কেমিস্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। আর একজন স্কুল মাস্টার, চেস্টার-ফিল্ডে মাস্টারি করে। বোল্টনদের দুটি সন্তানই মেয়ে।

টেড বোল্টন যখন খাদের ভিতর এক বিস্ফোরণের ফলে মারা যায় তখন তার বয়স আটাশ। বিস্ফোরণের সময় মোট চারজন এক জায়গায় ছিল। তারা সবাই শুয়ে পড়ে সময়ে। কিন্তু টেড একা সেই বিস্ফোরণে মারা যায়। ওরা বলে টেড ভয় পেয়ে পালাতে যায়। তাই মারা যায়। এটা যেন তার দোষ। তাই তার মৃত্যুর জন্য মালিকরা মাত্র তিনশো পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়। তারা বলে টেড সময়মত কর্তৃপক্ষের আদেশ মানে নি। এটা যেন তাদের দয়ার দান। তাও টাকাটা একবারে দেয়নি। বলেছিলে মিসেস বোল্টন মদ খেয়ে তা উড়িয়ে দেবে। তাই তাকে প্রতি সপ্তায় তিরিশ শিলিং করে তুলে নিতে হবে। মিসেস বোল্টন চেয়েছিল টাকাটা একসঙ্গে পেলে সে তাই দিয়ে একটা দোকান খুলবে। যাই হোক, এই টাকাটা তোলার জন্য তাকে প্রতি সোমবার অফিসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কিন্তু এই সামান্য টাকা সারা সপ্তাটা দুটো ছেলে নিয়ে কি করে চলবে? তবে টেডের মা বড় দয়াবতী নারী ছিলেন। তিনি আইভি বোল্টনকে স্নেহের চোখে দেখতেন। আইভি যখন শেফিল্ডে নার্সিং শেখার জন্য ক্লাস করতে যেত তখন টেডের মা শিশু দুটির দেখাশোনা করতেন। চার বছর শিক্ষার পর নার্সিং ভালভাবে পাশ করে একটা হাসপাতালে কাজ নেয় আইভি। তারপর স্যার ব্রেভারশালে খনি কোম্পানি খুললে সেখানকার গ্রাম্য হাসপাতালে তাকে কাজ দেন। লোকে ভাবত কোম্পানি তার জন্য অনেক কিছু করেছে।

কথাটা শুনে মিসেস বোল্টন একবার বলে, হ্যাঁ কোম্পানি আমার অনেক ভাল করেছে। টেডের সম্বন্ধে কোম্পানি যে কি বলেছে আমি তা ভুলিনি। টেডকে কোম্পানি দেখতে পারত না কারণ সে ছিল নির্ভীক, সে ছিল দৃঢ়চেতা। তবু তাকে বাধ্য হয়ে খাঁচার বন্ধন মেনে নিতে হয় এবং লোকে তাকে কাপুরুষ ভাবত।

মিসেস বোল্টনের কথার মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ অনুভূতির এক অদ্ভুত মিশ্রণ ছিল। সে কোলিয়ারির খনি শ্রমিকদের ভালবাসত, তাদের অনেকদিন থেকে সেবা শুশ্রূষা করে আসছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের থেকে নিজেকে বড় ভাবত। নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে ভাবত, আবার সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর লোকদের ও মালিক পক্ষকে সে ঘৃণা করত। যে কোন শ্রমিক মালিক বিরোধের ক্ষেত্রে সে শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করত। কিন্তু যখন কোন বিরোধ থাকত না, তখন নিজেকে উচ্চ অভিজাত শ্রেণীরই একজন হিসেবে ভাবত। উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তার একটা মোহ ছিল, কারণ তার মনের মাঝে ইংরেজ-সুলভ যে প্রভুত্বস্পৃহা ছিল যে স্পৃহা একমাত্র উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর

লোকেরাই মেটাতে পারে। তাই স্যার জিওফ্রের বাড়ি র‍্যাগবিতে যেতে ভাল লাগত তার। সেখানে যেতে গায়ে রোমাঞ্চ জাগত তার। রোমাঞ্চ জাগত তার লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে যখন সে কথা বলত। তবু একটু লক্ষ্য করলেই যে কেউ বুঝতে পারত তার কথার ফাঁকে ফাঁকে র‍্যাগবির মালিকদের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিদ্বেষ উঁকি মারত। তার কারণ এই যে র‍্যাগবির এই বর্তমান বংশধরেরাই খনির মালিক।

সব কিছু শুনে মিসেস বোল্টন র‍্যাগবিতে এসে কনিকে বলল, এ রোগ আপনার দেহটাকে ক্ষয় করে দেবে একেবারে। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে আপনার এই বিপদে সাহায্য করার মত এমন এক বোন ছিল। কি উঁচু কি নিচু সব সমাজের পুরুষরাই এক। তারা মেয়েদের কথা মোটেই ভাবে না, শুধু তাদের সেবার সব কাজ গ্রহণ করে। আমি একথা কতবার কোলিয়ারির লোকদের বলেছি। তবে ক্লিফোর্ডের পক্ষে আঘাতটা সত্যিই মর্মান্তিক। এমনভাবে পঙ্গু হয়ে থাকা সারাজীবন। ওঁরা মানুষ হিসাবে বড় অহঙ্কারী ছিলেন। অভিজাত সমাজের লোক অহঙ্কারী হবারই ত কথা। কিন্তু সে অহঙ্কারের প্রতিফল এমন হবে এটা কেউ ভাবতে পারেনি। এর প্রতিফল সব-চেয়ে বেশী ভয়ংকর ও দুর্বিসহ হয়ে উঠল লেডি চ্যাটার্লির জীবনে। উনি জীবনে যা হারালেন তা আর ফিরে পাবেন না কখনো। আমিও টেডকে হারিয়েছি তাকে মাত্র পেয়েছিলাম তিন বছরের জন্য। কিন্তু স্বামী হিসাবে এমন গুণবান ছিল যে এই তিন বছরের মধ্যেই এক চিরস্থায়ী দাগ কেটে যায় আমার মনে। তাকে কোনদিন ভুলতে পারব না আমি। সে ছিল দিবা-লোকের মতই সব সময় হাসিখুশিতে উজ্জ্বল। এমন লোক এত তাড়াতাড়ি মরবে কেউ ভাবতেই পারেনি। আমি নিজেও একথা বিশ্বাস করতে পারিনি। তার মৃতদেহটাকে আমি নিজের হাতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেও একথা আজও বিশ্বাস করতে পারি না। সে আমার কাছে আজও ঠিক মৃত নয়। আমার কাছে তার মৃত্যু কোনদিনই ঘটেনি।

এ ধরনের কথা র‍্যাগবিতে এই প্রথম। এমন কথা কোনদিন কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি এ বাড়িতে। কনি একথা জীবনে আজ প্রথম শুনল। একেবারে নতুন ঠেকল তার কানে। এ কথার মানে খোঁজার এক আশ্চর্য আগ্রহ জাগল তার মনে।

মিসেস বোল্টন এবার খুব গম্ভীরভাবে কাজকর্ম করে যেতে লাগল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন নতুন মানুষ। সেই হাসিখুশির ভাব আর নেই। ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে কেমন লজ্জা আর ভয়ে ভয়ে সব কাজ নীরবে নিঃশব্দে করে যেতে থাকে। ক্লিফোর্ডও সব সময় তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য আর মালিকসুলভ মনোভাব বজায় রেখে চলে।

মিসেস বোল্টন সম্বন্ধে ক্লিফোর্ড কনিকে একদিন বলল, কাজ করে ভালই।

কিন্তু শুধু প্রয়োজনই মেটায়। এর বেশী কোন মূল্য নেই।

একথার কোন প্রতিবাদ করল না কনি। শুধু ভাবল একই ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মনোভাব কত ভিন্ন হতে পারে।

ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ ও মনোভাবই প্রত্যাশা করেছিল মিসেস বোল্টন। সে জানত একই ধরনের ব্যবহার সকলের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সে যখন কোলিয়ারির খনি শ্রমিকদের কোন ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিত অথবা কোন রোগীর সেবা করত তখন তারা সরলভাবে তার জীবনের কত কথা বলত, তাকে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তাদের কাছে মিসেস বোল্টনের মনে হত সে যেন মানবী নয়, দেবী অথবা অনেক উচ্চশ্রেণীর মানুষ। আর আজ ক্লিফোর্ডের কাছে থেকে তার ব্যবহারে মনে হয় সে কত ছোট, সে একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। তবু নীরবে অবনত চিত্তে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় নতুন পরিবেশে।

তার লম্বাটে ধরনের সুন্দর নির্বাক মুখখানা নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্লিফোর্ডের কাছে এসে মিসেস বোল্টন বলত, এটা করব স্যার ক্লিফোর্ড? ওটা করব?

ক্লিফোর্ডও কড়াভাবে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, পরে হবে। এখন থাক।

বোল্টন তখন বলে, ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

আধ ঘণ্টা পরে এস।

ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

আসবার সময় পুরনো কাগজগুলো নিয়ে এস। বুঝলে?

ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। আবার আধ ঘণ্টা পরে তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এল। তাকে ছোট ভাবা হয় তবু তাতে সে কিছু মনে করে না। অভিজাত সমাজের লোকদের সম্বন্ধে সে শুধু এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ক্লিফোর্ডকে সে অপছন্দ করে না বা তার উপর রাগও করে না। সে যেন অমোঘ অপরিহার্য ঘটনার এক নিষ্প্রাণ অংশ। যে অভিজাত সমাজ এক মূঢ় অহঙ্কারে ও মিথ্যা আত্মগরিমায় ভরা ক্লিফোর্ড তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতদিন এটা সে ভাল করে জানত না, আজ জানছে। সে বরং লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশত, কথা বলত।

মিসেস্ বোল্টন রাতে বিছানায় শুতে যেতে সাহায্য করত ক্লিফোর্ডকে তারপর তার ঘরের বাইরে বারান্দাটায় নিজে শুত। রাতে কোন দরকার পড়লে ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজালেই উঠে আসত বোল্টন আবার সকালে উঠতে সাহায্য করত তাকে। তাকে মুখ হাত ধুইয়ে দাড়ি কামিয়ে পর্যন্ত দিত নারী-সুলভ নরম হাতে। সে ছিল যেমন যোগ্য তেমনি মধুরস্বভাবী। সে জানত কিভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষকে বশীভূত করতে হয়। ক্লিফোর্ডের মুখে

দাড়ি কামানোর আগে সাবান ঘষতে ঘষতে তার মনে হত একদিক দিয়ে সে অন্য সব মানুষ থেকে খুব একটা পৃথক নয়। ক্লিফোর্ডের আভিজাত্যসুলভ স্বাতন্ত্র্যভাব আর সরলতার অভাবটাকে আর তেমন খারাপ লাগত না মিসেস বোল্টনের। মোটের উপর সে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে জীবনে।

ক্লিফোর্ড কিন্তু তার নিজের কাজের ভার অপর একজন বাইরের মেয়ের উপর তুলে দেওয়ার জন্য কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না কনিকে। সে নিজেকে মনে মনে প্রায়ই বলত, এর ফলে তার সঙ্গে কনির আসল অন্তরঙ্গতার ফুলটি অকালে ঝরে গেল। কনি কিন্তু মোটেই তা মনে করত না। তার বরং মনে হতে লাগল সেই অন্তরঙ্গতার ফুল কাঁটা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জীবন-রূপ বৃক্ষের এক বোঝাসর্বস্ব পরগাছা। সে ফুল বড় ম্লান আর বিবর্ণ ঠেকতে লাগল তার চোখে।

কনি এখন আগের থেকে অনেক সময় পেয়েছে। এখন যে পিয়ানো বাজিয়ে গান করে। কাঁটাভরা ফুলের গাছে কখনো হাত দিও না···প্রেমের হাত আলগা করা ঠিক হবে না। এর আগে কনি কখনো এমন করে বুঝতে পারেনি প্রেমের হাত আলগা করার বেদনা কতখানি। তবু এ হাত আলগা করার জন্য আজ সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না। এখন সম্পূর্ণ একা থাকতে কত খুশি সে। অনবরত এখন আর কথা বলতে হয় না। এর আগে ক্লিফোর্ড যখন নিজের মনে টাইপ করে যেত তখন সে নিজের কাজ নিয়েই থাকত শুধু। কিন্তু হাতে যখন তার কোন কাজ থাকত না তখন সে শুধু কথা বলে যেত কনির সঙ্গে। কত শত মানুষের চরিত্র আর তাদের আশা আকাঙ্খা এষণা, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি ও তাদের বিচিত্র পরিণতি সম্পর্কে অনর্গল বকে যেত ক্লিফোর্ড। সে কথার যেন আর শেষ থাকত না। শুনতে শুনতে বিরক্ত বোধ হত কনির। বছরের পর বছর ধরে এই ক্লান্তিকর বিরক্তির কথাগুলো একটানা শুনে এসেছে ও। প্রথম প্রথম ও শুনতে ভালবেসেছে। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। এখন তার বিরক্তবোধ হয়। এখন সে একা থাকতে পেয়ে সেই সব কথার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে ধন্য।

যেন তাদের প্রেমের ছোট চারাগাছটাকে ঘিরে তাদের দুজনের অজস্র সুতোর জট পাকিয়ে উঠেছিল। সেই সব জটের চাপে গাছটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল। কনি জটগুলোকে একে একে খুলে ফেলে। মুক্তিলাভের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠে সেই সব চেতনার সুতোগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু ছিঁড়তে গিয়ে বোঝে বন্ধনের বেদনার থেকে বন্ধনচ্ছেদের বেদনা আরও বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে এটাও বোঝে যে মিসেস বোল্টন এ বাড়িতে আসাতে তার অনেক উপকার হয়েছে।

ক্লিফোর্ড কিন্তু আজও প্রতি সন্ধ্যায় কনিকে কাছে পেতে চায়। সে চায় সারা সন্ধ্যাটা কনির সঙ্গে কথা বলে যাবে, অথচ কনির সামনে সে চেঁচিয়ে

তার লেখা পড়ে যাবে। কনি তাতে রাজি হয়েছে একটা শর্তে। এই শর্তে যে মিসেস বোল্টন ঠিক দশটা বাজলেই এসে পড়বে ক্লিফোর্ডের কাছে আর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কনি উপর তলায় উঠে যাবে। উপর তলায় নিজের ঘরে গিয়ে আবার সে একা থাকতে পারবে। এখন ক্লিফোর্ড মিসেস বোল্টনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে।

মিসেস বোল্টন থাকে বাড়ির পুরনো ঝি মিসেস বেটস্‌এর ঘরের কাছে। তার ফলে একতলায় ক্লিফোর্ডের বসবার ঘরের অনেক কাছেই যেন ঝি চাকরের ঘরগুলো এগিয়ে এসেছে। ক্লিফোর্ডের বসার ঘরে তার কাছে বসে থেকে তাদের কথা কানে শুনতে পায় কনি।

সন্ধ্যাবেলাটা এইভাবে ক্লিফোর্ডের কাছে কাটালেও মুক্তির এক অফুরন্ত আস্বাদ লাভ করল কনি। তার মনে হতে লাগল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে সে যেন এই প্রথম প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। তবু একটা বিষয়ে ভয় হয় কনির। তার মনে হয় যৌথ চেতনার জটিল জটগুলো ছিঁড়ে দিলেও তাদের নীতিগত অনেক জট আজও জড়িয়ে আছে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে। সে যাই হোক, আগের থেকে সে এখন অনেক মুক্ত, তার জীবনে এক নূতন স্তর যেন শুরু হতে চলেছে।

অধ্যায় ৮

মিসেস বোল্টন শুধু ক্লিফোর্ডের সেবা নয়, কনির উপরেও সমানে স্নেহশীল দৃষ্টি রেখে চলত। কনি যখন তার ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে বসে থাকত, বই পড়া বা সেলাই করার ভান করত সে তখন তাকে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করত। ঘরে একা একা বসে না থেকে বাইরে যাবার জন্য প্রায়ই তাড়া দিত তাকে। এইভাবে তার মমতাময় প্রভুত্ব ধীরে ধীরে কনির উপর বিস্তার করেও তার চাকরির ভিত্তিটাকে পাকা করে তোলার ব্যবস্থা করল মিসেস বোল্টন।

হিলদা র‍্যাগবির বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ক'দিন ধরে জোর হাওয়া বইতে লাগল। এই রকম এক দিনে মিসেস বোল্টন কনিকে বলল, আপনি এখন ঘরে বসে? বন দিয়েও ত একটু বেড়িয়ে আসতে পারেন। মালীর ঘরের পিছনের দিকটায় প্রচুর ডাফোডিল ফুল ফুটেছে। দৃশ্যটা দেখতে বড় চমৎকার লাগবে। আপনি দুটো ফুল আপনার ঘরের জন্যও আনতে পারেন।

কথাটা ভেবে দেখল কনি। তবু ভাল ডাফোডিল ফুল দেখা। মানুষ ঘরে বসে বসে নিজের আত্মার রস ত আর পান করে যেতে পারে না।

ঋতুবৈচিত্র্যের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রস পান করে যেতে হয়। কনি দেখল বসন্ত এসেছে। এক ঋতু গিয়ে আর এক ঋতু আসে, দিন গিয়ে রাত্রি আসে। কিন্তু তার জীবনে ছোট বড় কোন পরিবর্তন নেই। তার কাছে দিন রাত্রি সকাল সন্ধ্যা শীত বসন্ত যেন তাদের আপন আপন প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়েএকাকার হয়ে গেছে।

আর মালী বা শিকার রক্ষক মানে ত রোগা-রোগা চেহারার সাদা ধবধবে রংওয়ালা একটা লোক, অবশ্য ফুলের মত সে একা একা থাকে। এই ক'দিনের ঝামেলায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল কনি। এখন আবার মনে পড়ল। তার সেই চিরমলিন নিঃসঙ্গ মুখখানা।

এখন একটু গায়ে বল পেয়েছে কনি। এখন সে হাঁটতে পারে স্বচ্ছন্দে। বনের মধ্যে গিয়ে দেখল বাতাসটা তত জোর নয়। পথ হাঁটতে হাঁটতে কনির মনে হলো এ জগতের সব কিছু ভুলে যেতে চায় সে। ভুলে যেতে চায় পচা দুর্গন্ধওয়ালা দেহধারী সব মানুষগুলোকে। কিন্তু দেহ থাকলেই তার থেকে নতুন দেহ বেরিয়ে আসবে দেহের পুনরভ্যুত্থানে সেও বিশ্বাসী। বসন্তের উতল বাতাসের মদির আঘাতে দুলে উঠল যেন তার চেতনা আর দোদুল্যমান সেই চেতনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথাই উঁকি মারতে লাগল তার মনে। তার মনে হলো, ফুলের কুঁড়িগুলো যখন ফুটে উঠছে তখন আমার শুকনো মরা দেহটাতেও আবার ফুল ফুটবে। আমি আবার সূর্য দেখব। আবার অফুরন্ত সূর্যালোকে অভিস্নাত হব।

বনের ভিতর বাতাসের বেগ তত নেই। তবে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার এক একটা বেগ এসে গাছগুলোকে ভীষণভাবে দুলিয়ে দিচ্ছিল আর এক ঝলক করে সূর্যরশ্মি এসে বনভূমিতে পড়ছিল। আর তাতে বনছায়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কনির মনে হচ্ছিল, নরক থেকে উঠে আসা পার্সিফোনের হিমশীতল দীর্ঘশ্বাসের এক সকরুণ আঘাতে যেন সারা বনভূমিটা এমন করে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে ; এ্যাবসালমের মত ক্রুদ্ধ বাতাস গর্জন করছিল মাথার উপরে কনির মনে হচ্ছিল বড় বড় গাছগুলোর জটিল শাখা-প্রশাখায় আবদ্ধ বাতাস যেন নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। তবু তারই মাঝে ফুলগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠছে একে একে।

গা-টা শীত শীত করছিল কনির। সমগ্র বনস্থলী জুড়ে যেন হিমশীতল কনকনে ঠাণ্ডার একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল আর মাথার উপরে শোনা যাচ্ছিল ক্রুদ্ধ গর্জন। সহসা কেমন এক উত্তেজনা দেখা দিল কনির মধ্যে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি তার মুখের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গালগুলো রঙীন হয়ে উঠল। এক নীল আলো ফুটে উঠল তার চোখে। পথে যেতে যেতে ভায়োলেট, প্রিমরোজ প্রভৃতি কিছু ফুল তুলে নিল। ফুলগুলো ঠাণ্ডা কিন্তু তাদের

গন্ধ বড় মিষ্টি। কোথায় যাচ্ছে তা না জেনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে লাগল কনি।

বনটা এইভাবে পার হয়ে ওদের কুটিরটার সামনে এসে পড়ল। কুটিরটাকে সূর্যের আলোয় কেমন গোলাপী দেখাচ্ছিল। ব্যাঙের ছাতার বুকের নিচে যে গোলাপী রং থাকে সেই রকম গোলাপী দেখাচ্ছিল বাড়িটা। দরজার সামনে যুঁই ফুল ফুটে ছিল। কিন্তু বাড়িটার ভিতরে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। চিমনিতে ধোঁয়া উঠছিল না। কুকুরটাও আজ ডাকছিল না।

কনি নিঃশব্দে সোজা বাড়িটার পিছন দিকে চলে গেল। সে শুধু ডাফোডিল ফুলগুলো দেখতে চায়। অন্য কোন দরকার নেই।

সত্যিই অপূর্ব। অসংখ্য ফুল একসঙ্গে বাতাসে কাঁপছিল, দুলছিল। কিন্তু কোথাও লুকোবার জায়গা পাচ্ছিল না। বাতাসের ঘায়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও তারা যেন দুলতে ভালবাসছিল।

একটা ছোট পাইন গাছে হেলান দিয়ে বসে রইল কনি। সূর্যের আলোয় সোনার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ফুলগুলোকে। মাথায় সূর্যালোকের মুকুটপরা পাইন গাছটাকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল কনির। সূর্যের এক ফালি তপ্ত রশ্মি তার কোলে এসে পড়েছিল। সেই সূর্যের আলোয় ডাফোডিল ফুলগুলোকে সোনার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে ফুলের কিছু গন্ধও সে পাচ্ছিল। তার এই একান্ত-বাঞ্ছিত একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে কনি ভাবছিল সে যেন তার আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির রাজ্যে এসে পড়েছে। যে অচ্ছেদ্য বন্ধুর দ্বারা তার জীবনতরীটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সহসা একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে যেন তার বন্ধন। তাই আপন মনে অবাধে ভেসে চলেছে যেন সে তরীটি

সূর্যরশ্মিগুলো সরে যেতেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ফুলগুলো। আবার ঠাণ্ডা হিম হয়ে উঠল ফুলগুলো। ঘনায়মান এই গোধূলিবেলা হতে শুরু করে সারা রাত তাদের এইভাবে থাকতে হবে।

গোটাকতক ডাফোডিল ফুল নিয়ে উঠে পড়ল কনি। ফুলগুলোকে গাছ থেকে ছিঁড়তে তার ইচ্ছা করছিল না। তবু দু একটা ফুল সে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিল তাকে আবার র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে হবে। সেই বিরাট প্রাচীর আর ঘন দেওয়ালের মাঝে ফিরে যেতে ঘৃণা বোধ করছিল তার। তবু হিমশীতল বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সেই দেওয়ালের মধ্যে ঢুকতেই হবে মানুষকে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ড তাকে বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

কনি বলল, বন দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখ দেখ, কি সুন্দর ডাফোডিল ফুলগুলো!

ক্লিফোর্ড বলল, প্রচুর আলোবাতাসের জন্যই এরকম হয়েছে।

কিন্তু মাটিতেই ওদের জন্ম।

ক্লিফোর্ডের কথাটাকে এত তাড়াতাড়ি খণ্ডন করার জন্য নিজেই বিস্ময় বোধ করছিল কনি।

পরের দিন বিকালে আবার বন দিয়ে বেড়াতে গেল কনি। আজ সে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছায়াঘেরা একটা ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছল। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। নিচের দিকটা অন্ধকার। ঝর্ণাটার গায়ে কতকগুলো নুড়িপাথর পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বসার পর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলো কনি। অল্প কিছুটা যাবার পর কাঠ কাটার শব্দ পেল পথের ডান দিকে। মনে হলো হয় কোন কাঠুরিয়া গাছ কাটছে অথবা কোন কাঠঠোকরা পাখি গাছ ঠোকরাচ্ছে।

শব্দটা শুনতে শুনতে এগিয়ে যেতে লাগল কনি। ছোট ছোট ফার গাছের মাঝখান দিয়ে একটা ছোট পথ দেখতে পেল সে। পথটা কোথায় গেছে বোঝা গেল না। কনি দেখল পথটা কিছুদূর গিয়ে ওক গাছের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কনি পথটা ধরে যতই এগিয়ে যেতে থাকে ততই কাঠ কাটার শব্দটাও কাছে মনে হয়।

কনি তার সামনে একফালি ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। এদিকটায় সে কখনো আসেনি এর আগে। কনি বুঝতে পারল এই নির্জন ফাঁকা জায়গাটাতেই শিকারী পাখিগুলোকে লালন করত শিকার রক্ষক মালী নতজানু হয়ে হাতুড়ী পিটছিল কি একটা কাজে। হঠাৎ কনিকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। কিন্তু কনিকে তার দিকে নীরবে এগিয়ে আসতে দেখে বিরক্তি আর রাগ অনুভব করছিল মনে মনে। কারণ এক অবাধ নির্জনতা দিয়ে ঘেরা তার এই একমাত্র স্বাধীনতার আস্বাদনে কেউ ব্যাঘাত ঘটাক তা সে চায় না।

লোকটা এমনভাবে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে ছিল যে তা দেখে কনি যেন ভয় পেয়ে গেল। তার উপর অনেকখানি পথ হেঁটে বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। কনি ক্লান্তির সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি ভাবছিলাম শব্দটা কিসের।

লোকটা বলল, আমি পাখির ছানাগুলোর জন্যে খাবার তৈরি করছিলাম।

এর উত্তরে কনি কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। তেমনি ক্লান্তভাবেই সে বলল, আমি কিছুক্ষণের জন্য বসতে চাই।

লোকটি তখন তাড়াতাড়ি কনির সামনে দিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে একটা কাঠের চেয়ার বার করে এনে বলল, এটাতে বসুন।

তারপর আবার বলল, আমি আগুন জ্বালাব?

কনি বলল, না, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

কিন্তু সে শুনল না। কনির হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল হাতগুলো

ঠাণ্ডায় নীলচে মত হয়ে গেছে। আর কোন কথা না বলে কিছু কাঠ এনে কনির সামনে একটা উনোনের মধ্যে আগুন জ্বেলে দিল। কনি সেই চেয়ার-টায় বসে সেই আগুনের আঁচে হাত পা সেঁকতে লাগল। লোকটার কণ্ঠের মধ্যে এমন এক স্নেহশীল প্রভুত্বের সুর ছিল যা কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারল না কনি। হাত সেঁকতে সেঁকতে নিজেও তখন কাঠের টুকরো ফেলে দিতে লাগল আগুনটায়।

কুঁড়ের ভিতরটায় চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল কনি। ঘরটার মধ্যে কোন জানালা নেই। দরজার কপাট খোলা। খোলা দরজা দিয়ে সব সময়েই আলো আসে। তার চেয়ারটার পাশে একটা কাঠের টেবিল ছিল। একদিকে একটা বেঞ্চি পাতা। আর এখানে সেখানে কিছু যন্ত্রপাতি ছড়ানো।

লোকটা আগুন জ্বেলে দিয়ে আবার তার কাজে চলে গেছে। আবার তেমনি হাতুড়ীর শব্দ হতে লাগল। শব্দটা শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না কনির। এদিকে লোকটারও ভাল লাগছিল না। লোকটা চাইছিল মনে-প্রাণে একা থাকতে। তার এই নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রায় কেউ এসে ব্যাঘাত ঘটালে বিশেষ করে কোন একজন নারী হলে তার খুবই খারাপ লাগে। তথাপি এক্ষেত্রে সে অসহায়। তার আকাঙ্খিত ও একান্তবাঞ্ছিত এই নিঃসঙ্গতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না সে। কারণ কনি ওর মালিক, তার প্রভু আর ও তাদের বেতনভোগী কর্মচারী।

একজন নারীর কাছ থেকে যে বিরাট আঘাত সে পেয়েছে সেই আঘাতের ফলেই সে আর কোন নারীর সংস্পর্শে আসতে চায় না। তার মনে হয় সে যদি একা থাকতে না পায় তাহলে সে মরে যাবে। বাইরের জগৎ থেকে সে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে এই বনের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে সে। এই বনটাই যেন জীবনে তার একমাত্র আশ্রয়।

ঘরের মধ্যে যে আগুনটা জ্বলছিল তা আগের থেকে বড় হয়ে গেছে। সেই আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কনির গাটা। সে উঠে দরজার চৌকাঠের উপর একটা টুলের উপর বসে লোকটার কাজ দেখতে লাগল। লোকটা এমনভাবে একমনে কাজ করে যেতে লাগল যাতে মনে হবে সে কনিকে একে-বারে দেখছে না। কিন্তু ও জানত কনি কি করছে! ও কাজ করে যাচ্ছিল আর ওর বাদামী রঙের কুকুরটা লেজের উপর ভর দিয়ে বসেছিল।

কৃশকায় ও ক্ষিপ্রগতি লোকটা পাখিদের খাবার প্রস্তুত করার পর তা যথাস্থানে নিয়ে গেল। কনিকে সে একটা কথাও বলল না। কনির উপস্থিতিটা সে যেন ইচ্ছা করেই লক্ষ্য করছে না। কনির উপস্থিতি সম্বন্ধে সে যে সচেতন সে বিষয়ে কোন লক্ষণই দেখাল না সে।

কনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। দেখল সেদিন লোকটা যখন স্নান করছিল তখন তার মধ্যে যে নিঃসঙ্গতা যে বিষাদ লক্ষ্য করেছিল আজও

সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাকে জমাট বেঁধে থাকতে দেখছে। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন কোন ভারবাহী পশু নীরবে নিঃশব্দে আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে একা একা। সে যেন ইচ্ছা করেই মানবজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। নীরবে পরম ধৈর্যসহকারে লোকটা কনিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কনির কিন্তু মনে হলো, লোকটার এই অন্তহীন ধৈর্য আর নীরবতার মধ্যে অধীর অশান্ত একটা কিছু লুকিয়ে আছে আর সেই অজানিত আবেগটার এক নীরব আঘাতে শিউরে উঠল তার পেটের ভিতরটা। কনি একমনে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তার মাথাটা নত করে ঘাড়টা বাঁকিয়ে ও পাছাটা নাড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা। কনির মনে হলো লোকটার নিম্নাঙ্গের অভিজ্ঞতা তার থেকে অনেক বেশী। সে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ব্যাপক আর গভীর।

বর্তমানের স্থান কাল সব কিছু ভুলে স্বপ্নের এক মধুর উত্তাপে মশগুল হয়ে রইল কনি। এমনই আনমনা হয়ে সে ভাবছিল যে একবার তার পানে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল লোকটা। তার মনে হলো কনির আপাতশূন্য দৃষ্টির মধ্যে কার জন্য এক নিরুচ্চার প্রতীক্ষা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তার অন্তরে বাইরে আজ যে নিঃসঙ্গতা নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে সেই নিঃসঙ্গতাবোধই এই প্রতীক্ষার ছদ্মরূপ ধরে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টির শূন্যতায়। সহসা তার পিঠের নিচের দিকটায় তার মেরুদণ্ডের ভিত্তিমূলে একটা জ্বালা অনুভব করল লোকটা। মানুষ যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, যেমন এড়িয়ে চলতে চায়, আজও তেমনি কোন মানুষের বিশেষ করে কোন নারীর সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে সে। সে এখন মনেপ্রাণে একটা জিনিসই চাইছিল। তা হলো এই যে কনি এই মুহূর্তে চলে যাক তার কাছ থেকে। আধুনিক নারীমনের যে প্রভুত্বস্পৃহা তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ভয় করে সে, কনি যেন সেই স্পৃহা ও প্রবৃত্তিরই মূর্ত প্রতীক। তার উপর কনি আবার অভিজাত সমাজের মেয়ে। তার প্রভুত্বের স্পৃহাটা আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মোট কথা এখানে কনির উপস্থিতিটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখে।

হঠাৎ একটা তীব্র অস্বস্তিবোধের সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেল কনি। সে উঠে দাঁড়াল। বিকাল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। তবু সে চলে যেতে পারছিল না। লোকটার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তারই পানে তাকিয়ে। তার মুখখানা কেমন শক্ত, কড়া কড়া ভাব, তার দু চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা।

কনি বলল, জায়গাটা এত নির্জন, এত সুন্দর! আমি এর আগে কখনো আসিনি।

আসেননি?

আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে বসব।

ঠিক আছে।

আচ্ছা, তুমি যখন এখানে থাক না তখন কি ঘরটায় চাবি দেওয়া থাকে ?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

কনি বলল, দুটো চাবি আছে ? একটা আমার কাছে থাকলে আমি যখন মনে হবে এখানে এসে বসতে পারতাম।

আমি যতদূর জানি দুটো চাবি নেই।

কনির একটু দ্বিধাবোধ হচ্ছিল। তার মনে হলো লোকটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে। ঘরটা কি তার নিজের ?

আমরা কি আর একটা চাবি করিয়ে নিতে পারি না ?

কথাটা কনি শান্ত কণ্ঠে বললেও লোকটার মনে হলো সে কণ্ঠের মধ্যে নারী-সুলভ একটা জেদ লুকিয়ে আছে।

লোকটা রাগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আর একটা চাবি ?

কিছুটা লজ্জা পেয়ে কনি বলল, হ্যাঁ, আর একটা।

লোকটা বলল, ক্লিফোর্ড হয়ত জানতে পারে।

কনি বলল, হ্যাঁ, তার কাছে একটা থাকতে পারে। তা না হলে আমরা আর একটা চাবি করিয়ে নিতে পারি। মাত্র একদিনের ব্যাপার।

লোকটা বলল, কিন্তু ম্যাডাম, আমি জানি এ অঞ্চলে চাবি তৈরি করতে পারে এমন কোন লোক নেই।

কনি হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে। আমি দেখব পাওয়া যায় কি না।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

তাদের দুজনের চোখ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো। লোকটার চোখে ছিল এক কুৎসিত বিতৃষ্ণা, ঘৃণা আর ঔদাসিন্যের ভাব। কনির চোখে ছিল এক তপ্ত ক্রোধের ভাব।

কনির চোখে যাই থাক তার অন্তরটা কেমন যেন জমে গেল। কনি লক্ষ্য করল কোন বিষয়ে সে লোকটার অমতে গেলেই তার চোখে মুখে কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে। কনি বুঝতে পারল লোকটা তাকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

কনি বলল, বিদায়। শুভ সন্ধ্যা।

বিদায়। শুভ সন্ধ্যা।

কনিকে কোনরকমে দায়সারা গোছের অভিবাদন জানিয়েই পিছন ফিরে চলে গেল লোকটা। সে বুঝতে পারল স্বৈরিণী স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েদের বিরুদ্ধে পোষণ করতে থাকা তার সেই পুরনো ক্রোধের ঘুমন্ত কুকুরটাকে জাগিয়ে তুলেছে কনি। অথচ সে জানে, সে অসহায় এ বিষয়ে।

এদিকে কনিও রেগে গেল লোকটার উপর। তার মনে হলো, লোকটা স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক। একটা সামান্য চাকর হয়ে এতটা দম্ভ দেখানো উচিত

নয়। মনে এক নিদারুণ ক্রোধের আবেগ নিয়ে বাড়ি ফিরল কনি।

কনি দেখল, বাড়ির বাইরে বড় বীচ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস বোল্টন। সে যেন তারই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোল্টন বলল, আমি ভাবছিলাম ম্যাডাম কখন আসবেন।

কনি বলল, আমার কি দেরি হয়ে গেছে?

মিসেস বোল্টন বলল, কেন, স্যার ক্লিফোর্ড চা খাবার জন্যে বসে আছেন।

কেন, তুমি তৈরি করে দাও নি?

আমার মনে হয়, এটা আমার কাজ নয়। আমার মনে হয় উনি তা পছন্দ করবেন না।

কনি বলল, কেন করবেন না, তা আমি বুঝতে পারছি না।

কনি সোজা ক্লিফোর্ডের পড়ার ঘরে চলে গেল। দেখল ট্রের উপর পিতলের কেটলিটা বসানো রয়েছে।

কনি টেবিলের উপর হাতের ফুলগুলো রেখে চায়ের ট্রেটা ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কি খুব দেরি হয়ে গেছে ক্লিফোর্ড?

তার মাথার টুপিটা না খুলেই চা করতে শুরু করে দিল কনি। বলল, তুমি মিসেস বোল্টনকে চা করতে দাওনি কেন?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি চাই না, চায়ের টেবিলেও সে সভাপতিত্ব করুক।

চা করতে করতে কনি বলল, চায়ের রূপোর পাত্রটা এমন পবিত্র একটা কিছু নয়।

কনির মুখপানে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ক্লিফোর্ড বলল, সারা বিকালটা কি করো তুমি?

কনি বলল, বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই বিরাট জাম গাছটায় এখনো জাম ধরে আছে জান কি?

কনি স্কার্টটা খুলে রাখল। কিন্তু টুপীটা খুলল না। টোস্টে মাখন লাগাতে হবে। কনি হঠাৎ উঠে এক গ্লাস জল এনে ভায়োলেট ফুলগুলোকে রেখে দিল তাতে।

কনি বলল, ফুলগুলো আবার বেঁচে উঠবে।

এই বলে ফুলসমেত গ্লাসটা ক্লিফোর্ডের সামনে রেখে দিল যাতে সে ফুলগুলোর গন্ধ উপভোগ করতে পারে।

ক্লিফোর্ড বলল, জুনোর চোখের পাতার থেকে আরো সুন্দর।

কনি বলল, আমি ত আসল ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে এ কথার অর্থের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাই না।

কনি ক্লিফোর্ডের চা ঢেলে দিল।

কনি বলল, আচ্ছা, জনের ঝর্ণার কাছে যে কুঁড়েটায় শিকারী পাখিগুলোকে পোষা হয় সেটায় আর একটা চাবি আছে?

ক্লিফোর্ড বলল, থাকতে পারে। কিন্তু কেন?

কনি বলল, জায়গাটা আজই খুঁজে পেলাম। এর আগে কখনো যাইনি। জায়গাটা কিন্তু চমৎকার। আমি ওখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতে পারি। তাই নয় কি?

মেলর্স ওখানে ছিল?

হ্যাঁ, তার হাতুরীর শব্দ শুনেই ত ওখানে গিয়ে পড়ি আমি। ওখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ায় ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। আমি ওকে দ্বিতীয় একটা চাবি চাওয়ায় ও আমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে।

ও কি বলে?

না, এমন কিছু না। ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় শুধু বলে ও চাবির বিষয়ে কিছুই জানে না।

একটা চাবি হয়ত বাবার পড়ার ঘরে আছে। বেটারা জানে তা। আমি দেখছি ব্যাপারটা তাকে ডেকে।

না না, থাক।

তাহলে মেলর্স এরকম অভদ্র আচরণ করে?

এমন কিছু না। তবে আমার মনে হতো, ও চায় না যে আমি ঐ ঘরটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করি।

আমার মনে হয় ঠিক তা নয়।

তবু আমি বুঝতে পারি না কেন সে এ বিষয়ে কিছু মনে করবে। এটা তার বাড়ি নয়। ব্যক্তিগত বাসভবন নয়। বুঝতে পারি না কেন আমি আমার ইচ্ছা হলে সে ঘরে বসতে পাব না।

ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ নিশ্চয় পাবে। লোকটা ভাবে ও খুব বেশী বোঝে। হ্যাঁ ঐ লোকটা।

তুমি কি তাই মনে করো?

নিশ্চয়। ও ভাবে ও অসাধারণ একটা কিছু। তুমি শুনেছ ওর একটা স্ত্রী ছিল যার সঙ্গে ওর বনিবনাও হয়নি। তাই ও যুদ্ধে যোগদান করে। ওকে ভারতে পাঠানো হয়। আমার মনে হয় মিশরে যুদ্ধ চলাকালীন অশ্বারোহী বিভাগে কামারের কাজ করে। ওর কাজ ছিল যত সব ঘোড়া নিয়ে। তাই ও খুব চালাকচতুর হয়ে ওঠে। তারপর ভারতের কোন এক কর্ণেলের চোখে পড়ে যায় ও। সেই কর্ণেল ওকে পরে লেফটেন্যান্ট করে তোলে। কর্তৃপক্ষ আবার ওকে ভারতে পাঠায়। আমার মনে হয় ওর কর্ণেলের সঙ্গে আবার ভারতে ফিরে যায়। ওরা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও একটা বৃত্তি পায় আজো। কিন্তু ওর মত লোকের পক্ষে আবার তার সেই পুরনো জীবনযাত্রার স্তরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অসংগতি দেখা দিতে বাধ্য। তবে আমার সব কাজ ও ঠিকমত করে যায়। কর্তব্যপরায়ণ। তবে

আমি ওর মধ্যে লেফটন্যান্ট জাতীয় মনোভাব আশা করতে পারি না।

ও যখন এখনো দেহাতী ভাষায় কথা বলে তখন ওকে কি করে লেফটন্যান্টের পদ দান করল?

আসলে ও কাজই করত না। করতো কখনো কেমনে। ও নিজের দেহাতী কথা ভালই বলতে পারে। তবে আমার মনে হয় যে আবার ওর শ্রেণীগত জীবনযাত্রার মাঝখানে ফিরে এসেছে।

কনি বলল, ওর কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

এসব রোমান্সের ব্যাপারে আমার কোন ধৈর্য নেই। কোন আগ্রহ নেই। এসব সত্যিই এক দুঃখজনক ঘটনা এবং প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে।

কনিও এ বিষয়ে একমত হলো। যারা সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট এবং কারো সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তাদের মধ্যে কোন ভাল গুণ থাকতে পারে না।

এরপর আবহাওয়া ভাল থাকলে ক্লিফোর্ডও এক একদিন বনের মাঝে সেই কুঁড়েটা দিয়ে বেড়াতে যেতে লাগল। সেদিন আবহাওয়াটা ভাল দেখে ক্লিফোর্ড বেড়াতে গেল সেখানে কনিকে নিয়ে। বাতাসটা ঠাণ্ডা থাকলেও খুব একটা খারাপ লাগছিল না। সূর্যের আলোয় ছিল এক মধুর উত্তাপ।

কনি একসময় বলল, দিনটা কেমন উজ্জ্বল, বাতাসটা কত চমৎকার। কিন্তু কত মানুষ তার বিদ্বেষের বিষ দিয়ে ভারী করে তুলছে এই বাতাসটাকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তা কি মনে করো?

হ্যাঁ, কনি। মানুষের অকারণ অসন্তোষ, বিতৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণার বিষ এই বাতাসের আনন্দোচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্যটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাকে হত্যা করছে।

ক্লিফোর্ড বলল, হয়ত আবহাওয়ার কোন প্রতিকূল অবস্থা মানুষের প্রাণ-প্রাচুর্যটাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

কনি জোর দিয়ে বলল, না, মানুষই পৃথিবীটাকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তার নিজের মাথাটাকে নিজেই কলুষিত করে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা এগিয়ে চলল। কনি দেখতে লাগল পথের ধারে আগের মতই কত বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আছে। কয়েকটা ফুল তুলে এনে ক্লিফোর্ডকে দিল কনি। একটা ফুল থেকে আপেলের কুঁড়ির গন্ধ আসছিল।

ক্লিফোর্ড ফুলগুলো নিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল। তারপর আপনমনে বলল, শান্তির আর নীরবতার অধর্ষিতা অক্ষতযৌবনা কন্যা।

কনি বলল, অধর্ষিতা কথাটা কেন? একমাত্র মানুষই ধর্ষণ করে।

ক্লিফোর্ড বলল, মানুষ করে, না শামুকে করে তা আমি জানি না।

কনি বলল, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব ধর্ষণ করে না।

ক্লিফোর্ডের উপর রাগ হল কনির। তার একটা বড় দোষ। যে কোন বস্তু বা ঘটনাকে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে শুধু কথার জাল বুনবে। শুধু কথা আর

কথা। কোন ফুল জুনোর চোখের পাতা, কোন ফুল শান্তির অধর্ষিতা কন্যা। কথাকে ঘৃণা করে কনি। তার মনে হয় এই কথাই আজ সব সময় মানুষ আর জীবনের মাঝে দাঁড়িয়ে সব সুখের অন্তরায় হচ্ছে। তার নিজের জীবনের সামনেই এই কথার অন্তরায়। অর্থহীন কথার অচলায়তন। যদি কেউ ধর্ষণ করে ত তা হলো এই কথা। এই কথার অবাঞ্ছিত অচলায়তনই মানুষের জীবনকে ধর্ষণ করে তার সব প্রাণরস শোষণ করে নিচ্ছে।

কিন্তু কনির সঙ্গে ক্লিফোর্ডের এই বেড়ানোর ব্যাপারটা খুব একটা শান্তি-পূর্ণ হত না। ওরা স্বীকার করতে না চাইলেও ওদের দুজনের মাঝখানে এক অঘোষিত মানষিক দ্বন্দ্বের অদৃশ্য অথচ অস্বস্তিকর প্রাচীর ধীরে ধীরে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা ওরা নিজেরাই জানে না। তার গূঢ় এষণা আর নারীসুলভ প্রবৃত্তির সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্লিফোর্ডকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল কনি। ক্লিফোর্ডের চিন্তা চেতনা, কথাবার্তা, তার উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল সে। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল তার কথা। তার কথা শুনতে আর মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

ভাল আবহাওয়াটা আবার খারাপ হয়ে উঠল। বৃষ্টি নামল। তবু একদিন বৃষ্টির মধ্যেই বেড়িয়ে পড়ল কনি। একমনে বনের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটে যেতে লাগল।

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডাটা সেদিন খুব একটা বেশী ছিল না। কনির মনে হলো, বৃষ্টিস্নাত এই বনভূমির নির্জনতা যেন আরো বেড়ে গেছে। মেঘচ্ছায়ামণ্ডিত এই গোধূলিবেলায় বাইরের জগৎ থেকে এ বনভূমির দূরত্বটা সহসা যেন অনেক বেড়ে গেছে।

কনি সেই কুঁড়েটার সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে থামল। ঘরটা তালা দেওয়া আছে। তবু সে দরজার কাছে একটা কাঠের উপরে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। বাতাসের মধ্যে কোন বেগ ছিল না। তবু গাছের উপরকার ডালগুলো কাঁপছিল। জায়গাটার নিচেটা পরিষ্কার। বিশেষ কোন আগাছা নেই। চারিদিকে শুধু বড় বড় ওক গাছ। গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়িগুলো বৃষ্টির জলে কালো দেখাচ্ছিল। কনির মনে হলো জগতের মধ্যে এই জায়গাটাই একমাত্র অধর্ষিত। অবিচ্ছিন্ন নীরবতায় চিরস্তব্ধ। কিন্তু পরক্ষণেই কথাটা মনঃপূত হলো না তার। তার মনে হলো সারা জগৎটাই ধর্ষিত। এ জগতের মধ্যে সত্যিকারের অধর্ষিত জায়গা বলে কিছু নেই।

কনি ভাবল, কতকগুলো জিনিস আছে যা ধর্ষণ করা যায় না। যেমন সার্ডিন মাছের টিন। যেমন কোন কোন মেয়ে। কিন্তু পৃথিবী—।

বৃষ্টিটা কমে আসছিল। বৃষ্টির জন্য ওক গাছের ছায়াগুলো খুব বেশী ঘন দেখাচ্ছিল। কনি এবার উঠে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। শীত লাগছিল গায়ে। তবু অনির্দেশ্য অব্যক্ত এক চাপা ক্রোধের আতিশয্য

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত তাকে সেইখানে অবশ জড় পদার্থে পরিণত করে বসিয়ে রাখল।

নিজের মনে মনে বলতে লাগল কনি। ধর্ষিত! অনেক সময় কেউ কারো দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়েও ধর্ষিত হতে পারে। সে নিজে যেমন কতকগুলো মৃত কথা, মৃত চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে। বিপন্ন ও বিব্রত হচ্ছে ধর্ষিত নারীর মত।

বাদামী রঙের একটা ভিজে কুকুর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো। লেজটা তুলে সে নাড়তে লাগল। কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাও এসে হাজির হলো। তার পরনে ছিল কালো চামড়ার একটা জ্যাকেট। কনির মনে হলো তাকে দেখেই দমে গেল লোকটা। কনি উঠে দাঁড়াল। লোকটা কোন কথা না বলে অভিবাদন জানাল কনিকে। কনির দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই কনি সরে গেল। বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

কনির দিকে না তাকিয়ে লোকটা বলল, আপনি কি ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ?

কনি বলল, না, আমি শুধু একটু বসেছিলাম ছাঁচের তলাটায়। বিশেষ আত্মমর্যাদার সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথাটা বলল কনি।

লোকটা কনির পানে তাকাল। কনিকে কেমন ঔদাসিন্যে শীতল দেখাল। লোকটা বলল, ক্লিফোর্ডের কাছে আর চাবি নেই ?

কনি বলল, না নেই। কিন্তু তাতে যায় আসে না। আমি ঘরের বাইরে ছাঁচের তলায় এই জায়গাটুকুতে বসেই কিছুক্ষণ কাটাতে পারি। আচ্ছা বিদায়।

লোকটার দেহাতী আঞ্চলিক ভাষার কথাবার্তা।

কনি পিছন ফিরে চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই লোকটা তার জ্যাকেটের পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবি বার করে বলল, আপনি চাবিটা নিয়ে যান। আমি বরং পাখিগুলোকে নিয়ে অন্য কোন একটা জায়গায় যাব।

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, কি বলতে চাইছ তুমি ?

লোকটা বলল, আমি বলতে চাইছি, আমি এই পাখিগুলোকে অন্য কোথাও লালন পালন করব। আপনি চাবিটা নিয়ে যান। আপনাকে তাহলে আর অপেক্ষা করতে হবে না বাইরে বসে।

তার আঞ্চলিক ভাষার অস্পষ্টতা থেকে একটা মানে খুঁজে বার করল কনি। তারপর বলল, তুমি সাধারণ ইংরাজি ভাষায় কথা বল না কেন ?

লোকটা বলল, আমার সে সাধারণ ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না।

রাগের চাপে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল কনি।

লোকটা বলল, যদি দরকার হয় তাহলে চাবিটা নিতে পারেন। আর যদি বলেন ত ঘরের সব জিনিসগুলো সরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে পারি।

কনি আরও রেগে গেল। বলল, আমি তোমার চাবি চাই না। আমি

তোমাকে ঘরের জিনিসপত্র সরাতেও বলছি না। আমি তোমাকে ঘর থেকে সরে যেতেও বলছি না। আমি আজকের মত বাইরেই বসতে পারি। ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে হবে না।

লোকটা তার নীল চোখের কুটিল দৃষ্টি দিয়ে তাকাল কনির পানে। বলল, কেন ম্যাডাম, আপনি এ কুঁড়েতে আসবেন। খৃস্টোৎসবের মতই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। সারা শীতকাল ধরে পাখিগুলোকে লালন পালন করে যেতে হয়। বসন্ত এলেও ওগুলোকে কাজে নামাতে হয়। আপনি যখন এখানে থাকেন তখন ম্যাডাম নিশ্চয়ই চান না আমি আপনার কাছে ঘুরঘুর করি।

এক অস্পষ্ট ও তরল বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটার পানে তাকিয়ে রইল কনি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার কাছে থাকলে কেন আমি কিছু মনে করব?

লোকটা আবার অদ্ভুতভাবে তাকাল কনির দিকে। বলল, এটা আমার খারাপ লাগে।

কনি কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তবে এটা যেন তুমি মনে করো না যে তুমি এখানে পাখিদের কাজ করলে আমি কিছু মনে করব। আমি বসে বসে তা দেখি। দেখতে বরং ভালই লাগে। তবে তোমার যখন ভাল লাগে না তখন আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই। মনে রেখো, তুমি ক্লিফোর্ডের কর্মচারী, আমার নও।

কথাটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগল কনির। কেন সে এ কথা বলল তা বলতে পারবে না। তবু তার মুখ থেকে এমনি বেরিয়ে গেল।

লোকটা বলল, না ম্যাডাম। এটা আপনার নিজস্ব ঘর মনে করবেন। যখন খুশি আসবেন। আপনি এক সপ্তার নোটিশেই আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন। শুধু···

কনি বলল, কি শুধু?

লোকটা বলল, শুধু বলতে চাই যে আপনি যখন এখানে থাকবেন তখন আমি এখানে থেকে গোলমাল করে আপনার শান্তি নষ্ট করি এটা ঠিক নয়।

কনি রেগে গিয়ে বলল, কিন্তু কেন? তুমি কি একজন সভ্য মানুষ নও? কেন তোমাকে আমি ভয় করব? তুমি এখানে থাকলেই যে তোমাকে দেখতে হবে তার মানে কি?

লোকটা এবার তার মুখে চতুর হাসি ফুটিয়ে কনির পানে তাকাল। বলল, না, ঠিক তা বলছি না ম্যাডাম।

তবে কি? কনি জিজ্ঞাসা করল।

একটা চাবি দেব কি আপনাকে?

না, ধন্যবাদ। তার আর দরকার হবে না।

আমি যেমন করে হোক আর একটা চাবি করিয়ে রাখব। কখন কি দরকার হয় তার ঠিক নেই।

কনি রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি মনে করি তুমি বড় দুর্বিনীত। কথা শোন না।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না না, ওকথা বলবেন না। তা আমি বলতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম আপনি থাকলে বা এখানে এলে আমাকে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তার ফলে আমার কাজকর্ম অনেক বেড়ে যাবে। আমার কাজকর্ম ছাড়াও ওদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু আপনি ওসব কিছু যদি লক্ষ্য না করেন, আমি কি কাজ করছি না করছি যদি তা লক্ষ্য না করেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার যখন যা ইচ্ছা যায় তাই করবেন।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে চলে গেল কনি। সে রেগে গেছে না অপমানিত বোধ করছে লোকটার ব্যবহারে তা সে নিজেই বুঝতে পারল না ভাল করে। হয়ত লোকটা যা বলছে তাই সত্যি। সে ভেবেছিল কনি এটা চায় না সে তার কাছে বসে কাজ করুক। কনি একথা যে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তা তার জ্ঞান নেই। সে আরও ভেবেছিল সে এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যার দিকে কনি বসে থাকতে থাকতে প্রায়ই তাকাবে। ভেবেছিল তার মত একটা বোকা লোকের উপস্থিতিরও কোন দাম আছে কনির কাছে, অনেক দাম আছে?

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল কনি। অথচ সে বুঝতে পারল না, কি সে ভাবছে। আসলে কি সে অনুভব করছে।

অধ্যায় ৯

ক্লিফোর্ডের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান বিরাগ দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। তার আরও মনে হলো, সে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি ক্লিফোর্ডকে। তবে অবশ্য ঘৃণাও করেনি। আসলে তার প্রতি তার সম্পর্কে ঘৃণা বা ভালবাসার কোন আবেগই ছিল না। দেহের দিক থেকে কোনদিনই তাকে পছন্দ করেনি কনি। তার মনে হলো, দেহের দিক থেকে ক্লিফোর্ডকে সে কোনদিন পছন্দ করতে পারেনি বলেই তাকে সে বিয়ে করেছে। সে তাকে বিয়ে করেছে এই কারণে যে মনের দিক থেকে তার একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিল সে। তার নারীসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। আসলে তাকে দেখে তার মনে হয়েছিল সে যেন তার শিক্ষাগুরু। তার থেকে বড়।

এখন যেহেতু সেই মানসিক উত্তেজনাটা আর নেই কনির মধ্যে, ক্লিফোর্ডের

প্রতি তার দেহগত বিতৃষ্ণাটাই প্রকট হয়ে উঠল তার মনে। এ বিরাগ এ বিতৃষ্ণা তার অস্তিত্বের গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে এবং সে বুঝল এটা তার জীবনটাকে ভিতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাক করে ফেলছে।

একই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে একটা নিদারুণ দুর্বলতা আর নিঃসঙ্গতা অনুভব করল কনি। তার প্রায়ই ইচ্ছা জাগছিল মনে, বাইরে থেকে কোন একটা সাহায্য এসে অকস্মাৎ উদ্ধার করে ফেলুক তাকে। কিন্তু সারা জগতের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা সাহায্য নেই। সমস্ত সমাজটা ভয়ঙ্কর, কারণ সে সমাজের সব মানুষই অপ্রকৃতিস্থ। সভ্য সমাজ মাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। টাকা আর তথাকথিত ভালবাসা হচ্ছে তার দুটো বাতিক এবং তার মধ্যে বাতিক হিসাবে টাকাটাই প্রধান। ছিন্নভিন্ন এক অপ্রকৃতিস্থ চেতনার বশবর্তী হয়ে মানুষ এই দুটো জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে নিজেকে। টাকা আর ভালবাসা। মাইকেলিসের কথাটাই একবার ভাব। তার গোটা জীবন আর সমস্ত কাজকর্মই এক মানসিক অপ্রকৃতিস্থতায় ভরা। তার ভালবাসার আসল প্রকৃতিটাই হলো ঠিক তাই।

আর ক্লিফোর্ডও ঠিক তাই। তার সমস্ত কথাবার্তা, সমস্ত লেখা, যশ মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য তার উন্মাদসুলভ সংগ্রাম—এই সব কিছুই তার অপ্রকৃতিস্থ মনোভাবের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এগুলো ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এগুলো সব একে একে বাতিকে পরিণত হচ্ছে।

কনির মনে হলো তার মধ্যে নিঃসঙ্গতার একটা অব্যক্ত বেদনা থাকতে পারে, কিন্তু কোন ভয় নয়। সব নদী পার হয়ে এক নিরাপদ কূলে উঠে এসেছে ও। এদিকে ক্লিফোর্ড তার আসক্তিটা কনির উপর থেকে তুলে নিয়ে তা মিসেস বোল্টনের উপর স্থাপন করেছে। কিন্তু ক্লিফোর্ড নিজেই তা বুঝতে পারেনি। অনেক অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতই তার অপ্রকৃতিস্থতার মূল কারণটা তার চেতনায় ধরা পড়ে না।

কতকগুলো বিষয়ে মিসেস বোল্টনের সত্যিই প্রশংসনীয় গুণ ছিল। কিন্তু তার আবার অদ্ভুত ধরনের এক খবরদারির ভাবও ছিল। সব বিষয়ে নিজের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশিকে অপরের উপর চাপিয়ে দেবার এই প্রবণতা, আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই অশান্ত আবেগ আজকাল অনেক আধুনিক নারীর মধ্যেই অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। মিসেস বোল্টন ভাবল, সে অপরের অধীনে থেকে অপরের ভালর জন্যই সব কাজ করে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডকে তার ভাল লাগে, কারণ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগটা তার থেকে আরো সূক্ষ্ম। তার প্রবৃত্তিটা আরো মার্জিত। তাই ক্লিফোর্ডের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো প্রায়ই হার মেনে যায়। ক্লিফোর্ডকে এই জন্যই ভাল লাগে তার।

হয়ত এই জন্যই কনিরও ভাল লেগেছিল ক্লিফোর্ডকে।

কোনদিন হয়ত মিসেস বোল্টন স্নেহশীল কণ্ঠে বলল, দিনটা কী চমৎকার। আমার মনে হয় এখন চেয়ারে করে আপনি একটু বেড়িয়ে আসুন। সূর্যের আলোটা আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ক্লিফোর্ড তখন বলল, হ্যাঁ। আমাকে সেই বইটা একটু দেবেন? সেই হলুদ রঙের বইটা? আমার মনে হয় সেই ফুলগুলো ওখর থেকে বার করে আনলে ভাল হয়।

তখন বোল্টন বলল, ফুলগুলো সত্যিই বড় সুন্দর। গন্ধটাও বড় চমৎকার। 'সুন্দর' কথাটার উপর জোর দিয়ে বলল।

ক্লিফোর্ড বলল, গন্ধটা আমি পছন্দ করি না। এর মাঝে কেমন একটা মরা মরা ভাব।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি তাই মনে করেন?

ক্লিফোর্ডের কথায় মনে মনে একটুখানি রুষ্ট হলেও গন্ধের প্রতি তার এই দার্শনিকসুলভ এক মহত্তর বিরাগ দেখে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গেল মিসেস বোল্টন। সে তখন নীরবে ফুলগুলো পাশের ঘর থেকে বার করে আনল।

মিসেস বোল্টন এর পর জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে এখন কামিয়ে দেব, না আপনি নিজেই কামাবেন?

সব সময়েই বোল্টনের কণ্ঠে থাকে একই রকমের সুর। তার কণ্ঠটা সব সময় একইভাবে থাকে মেদুর, স্নেহশীল আর আত্মপ্রতিষ্ঠাসূচক।

ক্লিফোর্ড তার উত্তরে বলল, ঠিক এখনি এটা ভাবছি না। আপনি একটু অপেক্ষা করবেন? আমি আপনাকে ডাকব তৈরি হয়ে।

মিসেস বোল্টন উত্তরে বলল, ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

কথাটা নরম আর আত্মসমর্পণের সুরে বললেও তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তার দুর্মর ইচ্ছাশক্তির এক প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা।

ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো।

তখন ক্লিফোর্ড বলল, আজ আমাকে আপনিই দাড়িটা কামিয়ে দিন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং সে কণ্ঠটাকে আরো বেশী মেদুর করে বলল, খুব ভাল কথা স্যার ক্লিফোর্ড।

প্রথম প্রথম তার দাড়ি কামানোর সময় যখন মিসেস বোল্টনের নরম হাতের আঙুলগুলো অনেকক্ষণ ধরে ছুঁয়ে থাকত তার গালটাকে তখন খারাপ লাগত, রাগ হত ক্লিফোর্ডের। কিন্তু এখন ভাল লাগে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা জারজ লালসাও জাগে। প্রায় প্রতিদিনই মিসেস বোল্টনের হাতে দাড়ি কামাত ক্লিফোর্ড। মিসেস বোল্টনের মুখটা তার মুখের অনেক কাছে চলে আসত, তার একাগ্র দৃষ্টি নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত হত তার গালের উপর তার আঙুলগুলো ক্লিফোর্ডের সারা মুখমণ্ডলের প্রতিটি অংশ নির্ভুলভাবে চিনে ফেলেছিল। শুধু ক্লিফোর্ড নয়, মিসেস বোল্টনেরও একাজ করতে ভাল লাগত।

ক্লিফোর্ডের মুখ, তার গণ্ড ও গলদেশ দেখতে সুন্দর। তার খাওয়া দাওয়া ভাল, সে ভদ্র ও অভিজাত বংশীয়। তার গাত্রত্বক সুন্দর ও মসৃণ।

মিসেস বোল্টনও দেখতে বেশই সুন্দরী। তার মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের ও ম্লান মনে হলেও তা বেশ শান্ত এবং স্তব্ধ। তার চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল এবং সপ্রতিভ। ধীরে ধীরে তার মোলায়েম আচরণের অন্তহীন মেদুরতা দিয়ে ক্লিফোর্ডের ঘাড় ধরে তাকে কাছে যেন টেনে আনছিল মিসেস বোল্টন আর ক্লিফোর্ডও এক নীরব আত্মসমর্পণে ঢলে পড়ছিল তার মাঝে।

মিসেস বোল্টন এখন ক্লিফোর্ডের খুঁটিনাটি সব কাজই করে। আর তার এই সব কাজে তার সেবা গ্রহণে আগের মত আর কোন লজ্জা অনুভব করত না ক্লিফোর্ড। এখন সে মিসেস বোল্টনের কাছে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। কনির কাছে সে যতটা সহজ হতে না পারে মিসেস বোল্টনের কাছে তার চেয়ে বেশী সহজ হতে পারে। মিসেস বোল্টনও ক্লিফোর্ডের দেহটা যত বেশী সম্ভব ধরা ছোঁয়া করতে ভালবাসে। তাই তার সব কাজ সে করে দিতে চায়। করে দেবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। মিসেস বোল্টন একদিন কনিকে বলল, আসলে সব পুরুষই একদিক দিয়ে শিশু। আমি এর আগে তেভারশালের বহু কড়া লোকের সেবা করেছি। আসলে তারা সবাই বড় শিশু। আসলে সব পুরুষ মানুষই এক।

মিসেস বোল্টন প্রথমে ভেবেছিল ক্লিফোর্ডের মত ভদ্রলোকরা সাধারণ পুরুষদের থেকে পৃথক। কিছু একটা পার্থক্য তাদের মধ্যে আছে। প্রথম প্রথম তার এই ধারণাটা সত্য বলেই মনে হয়। সে তাই তাকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করে চলত। একটা ব্যবধান রেখে চলত মাঝখানে। কিন্তু যতই তার গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, তার তলদেশে নামতে লাগল ততই সে দেখল আসলে সে আর পাঁচজন পুরুষের মতই একটা শিশু। তবে তার মনটা একটু সংযত। তাছাড়া অন্যান্য পুরুষের মত ক্লিফোর্ডও নারীমন জয় করার মত এমন কতকগুলো ছলাকলা জানে যা সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন এবং যা দিয়ে সে তাকে পীড়িত করছে মনে মনে।

মাঝে মাঝে ক্লিফোর্ডকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছিল কনির। কথাটা বলার একটা লোভ জাগছিল মাঝে মাঝে। বলতে ইচ্ছা করছিল, দয়া করে ঈশ্বরের খাতিরে ঐ মেয়েটার মধ্যে এমন ভয়ঙ্করভাবে এমন শোচনীয়ভাবে ডুবে যেও না। এমন করে নিজেকে ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল কনি, একথা বলার এখন আর কোন অর্থই হয় না। কারণ ক্লিফোর্ডের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহই অনুভব করে না। এত কিছু সত্ত্বেও সন্ধ্যেবেলাটা কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে একসঙ্গে কাটাত। রাত্রি দশটা পর্যন্ত থাকত সন্ধ্যে থেকে। তারপর তারা হয় কথা বলত দুজনে, অথবা বই পড়ত। অথবা ক্লিফোর্ডের পাণ্ডুলিপিটা ঘাঁটাঘাঁটি করত। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিটা দেখে বা পড়ে আর কোন আনন্দের

উত্তেজনা অনুভব করে না। তবু সে কর্তব্যের খাতিরে ক্লিফোর্ডের লেখাগুলো টাইপ করে দেয়। কিন্তু যথা সময়ে মিসেস বোল্টন সে কাজটা করে দেবে।

কনি একদিন মিসেস বোল্টনকে বলল যে তাকে টাইপ করার কাজটা শিখে নিতে হবে। মিসেস বোল্টনও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে তা শিখতে শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে ক্লিফোর্ড তাকে একটা চিঠি টাইপ করতে দেয়। শক্ত কথাগুলোর বানান বলে দেয়। মিসেস বোল্টনের টাইপ করতে দেরি হয় বলে ক্লিফোর্ড ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে ফরাসী শব্দগুচ্ছ থাকলে তারও বানান বলে দেয়। মিসেস বোল্টনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। এই লেখার নির্দেশ দানের ব্যাপারে ক্লিফোর্ডও বেশ আনন্দ অনুভব করে।

আজকাল খাওয়ার পর ক্লিফোর্ডের ঘরে যায় না কনি। প্রায়ই মাথা ধরার অজুহাত দেখায়। ক্লিফোর্ডকে বলে, এখন মিসেস বোল্টন হয়ত পিকেত খেলবে তোমার সঙ্গে।

ক্লিফোর্ড বলে, ঠিক আছে প্রিয়তমা, আমি বেশ থাকব। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পার।

কনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস বোল্টনকে ডাকে। তারপর তাস বা দাবা খেলতে বলে তার সঙ্গে। সে তাকে এই সব খেলা শিখিয়েছে। কনি যখন দেখে মিসেস বোল্টন অল্প বয়সী তরুণীর মত এক মদির লজ্জায় রাঙা হয়ে বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে তাদের রাণী বা সাহেবের উপর কুণ্ঠিত আঙুল দিয়ে আবার সরিয়ে নেয়, তখন তার কাছে সেটা খুবই আপত্তিকর মনে হয়। এদিকে ক্লিফোর্ড তখন মৃদু হেসে কিছুটা বিদ্রূপাত্মক প্রভুত্বের ভঙ্গিতে বলে, বল 'যাহবে'।

মিসেস বোল্টন উজ্জ্বল চোখ তুলে ক্লিফোর্ডের পানে লজ্জানত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একান্ত বশংবদের মত বলে, 'যাহবে'।

ক্লিফোর্ড তাকে সত্যিই সব কিছু শেখাচ্ছে। এসব শেখাতে ভাল লাগে ক্লিফোর্ডের। এতে তার প্রভুত্ববোধ তৃপ্ত হয় তির্যকভাবে। মিসেস বোল্টনেরও গাটা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। একে একে সে সেই সব জিনিস শিখে নিচ্ছে যা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জানে। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যে জীবন যাপন করে, যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের সব রীতিনীতি, আদব কায়দা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর সব খুঁটিনাটি শিখতে গিয়ে রোমাঞ্চ জাগে তার। তার মনে হয় একমাত্র টাকা আর ধনসম্পত্তি ছাড়া অভিজাত সমাজের সব ঐশ্বর্য পেয়ে গেছে। এটা ভাবতে মিসেস বোল্টনের সত্যিই রোমাঞ্চ জাগে যে এক সূক্ষ্মগভীর তোষামোদের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ক্রমশই প্রিয় করে তুলছে, তার উপস্থিতিকে অত্যাবশ্যক করে তুলছে তার কাছে।

কনির কাছে ক্লিফোর্ডের যথার্থ স্বরূপটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরকার খোলস বা ছদ্ম আবরণটা সরিয়ে নিয়ে তার সামনে যথার্থ স্বরূপে বেরিয়ে আসে ক্লিফোর্ড। তার মনে হয় ক্লিফোর্ড আর পাঁচজন পুরুষের মতই সাধারণ, কুৎসিত কুরুচিসম্পন্ন, নিস্তেজ এবং স্থূল। সঙ্গে সঙ্গে আইভি বোল্টনের ছলাকলা আর খবরদারি মনোভাবটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। ক্লিফোর্ডের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে মিসেস বোল্টনের মধ্যে তা দেখে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়ে যায়। মিসেস বোল্টন ক্লিফোর্ডের প্রেমে পড়ে গেছে একথা বলা হয়ত ঠিক হবে না। ক্লিফোর্ড একজন উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোক; সে গল্প কবিতা লিখতে পারে, তার ছবি ছাপা হয় পত্র পত্রিকায়। এই ধরনের একজন লোকের সংস্পর্শে আসার জন্য এক বিরল পুলকের রোমাঞ্চ জাগে মিসেস বোল্টনের মধ্যে আর সেই রোমাঞ্চ তার চোখে মুখে ও সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে। ক্লিফোর্ড যখন তাকে কোন বিষয়ে কিছু শেখায় তখন অজানা অব্যক্ত এক আবেগের এমন এক উত্তেজনা অনুভব করে বোল্টন যা তা প্রেমের উত্তেজনার থেকে অনেক গভীর। তাছাড়া ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কোন ভালবাসাবাসির ব্যাপার সম্ভব নয়, এই ভেবে তার পুলকের আবেগ আর জানার আকাঙ্ক্ষাটা বেড়ে যায়।

আমরা প্রেম বলতে যাই বুঝি না কেন, মিসেস বোল্টন নামে মহিলাটি যে ক্লিফোর্ডকে কিছুটা ভালবাসতে শুরু করেছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। মিসেস বোল্টনকে এখনো বেশ সুন্দরী বলেই মনে হয়। বয়স অনুপাতে তাকে কম বয়সী এবং যুবতী বলে মনে হয়। তার ধূসর চোখগুলো সুন্দর দেখায়। এক সূক্ষ্ম জয়ের গর্বের সঙ্গে মেদুর তৃপ্তির একটা বিরল আনন্দ প্রতিনিয়ত এক শিহরণ জাগায় যেন তার সর্বাঙ্গে।

এদিকে ক্লিফোর্ডও এই মহিলাটির কাছে ধরা দিয়ে ফেলেছে নিজেকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার স্বভাবসুলভ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে তাকে শ্রদ্ধা করে যায়, তার সেবায় সঁপে দেয় নিজেকে। ক্লিফোর্ড তাকে দিয়ে যা খুশি করতে পারে, খুশিমত তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। ক্লিফোর্ডও এতে আনন্দ পায়।

আইভি বোল্টন আর ক্লিফোর্ড যখন এক দীর্ঘ আলোচনায় মেতে উঠত তখন সে আলোচনা খেয়াল করে শুনত কনি। সে আলোচনায় বোল্টনের কথাই বেশী শোনা যেত। সে বলত তেভারশাল গাঁয়ের কথা। একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না বোল্টন। সে যেন কোন লেখিকার মত অনর্গল মানবচরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞানের কথা সব বলে যাচ্ছে কারো অনুলিখনের জন্য। তার কথা শুনে মনে হত তেভারশালের যত সব নোংরা লোকের কথা তার মুখ থেকে এইভাবে শোনাটা অপমানজনক। প্রথম প্রথম তেভারশালের কথা বলতে সাহস পেত না মিসেস বোল্টন। কিন্তু একবার শুরু করার পর থেকেই

তা আর থামতে চাইছে না। ক্লিফোর্ড এই সব কথা থেকে তার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে। প্রচুর পরিমাণে সে উপাদান পেয়েও যায়। কনি এখন বেশ বুঝতে পারে ক্লিফোর্ডের যা কিছু প্রতিভা তা শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তাগুলোকে প্রাঞ্জলভাবে লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার প্রতিভা হলো আপাতনৈর্ব্যক্তিক এক কৃত্রিম চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মিসেস বোল্টন কিন্তু তেভারশালের এই সব কথা বলতে বলতে আবেগের তাড়নায় আর থামতেই চায় না। যে সব কাহিনী বাস্তবে একদিন ঘটে গেছে, সে সব কাহিনীর সব কিছু সে জানে। সে কথা বলতে বলতে সে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করে। তার সব কথা ও কাহিনী ঠিকমত লিখলে হয়ত ডজনখানেক মোটা মোটা বই লেখা হবে।

কনিও তার কথা শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরে কিছুটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। ভাবে এমন উন্মাদসুলভ এক কৌতূহলের সঙ্গে একথা শোনা তার উচিত হয়নি। তবে অবশ্য যে কেউ অন্য সব মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা, তাদের সংগ্রামের কথা একটা শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে শুনতে পারে। এমন কি বিদ্রূপ বা হাস্যরসাত্মক কাহিনীর মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি থাকে। এইখানে উপন্যাসের এক বিরাট সার্থকতা অনুভব করা যায়। ঠিকমত লিখতে পারলে কোন উপন্যাস আমাদের সহানুভূতিশীল সংবেদনশীল চেতনার প্রবাহকে যথাস্থানে চালিত করে নিয়ে যেতে পারে। মৃত ব্যক্তির উপর থেকে সে চেতনাকে সরিয়ে এনে জীবন্ত মানুষের উপর নিবদ্ধ করতে পারে। তাছাড়া উপন্যাস মানবজীবনের সেই সব গোপন আবেগ অনুভূতির উৎসগুলিকে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় যার কথা জানলে আমাদের চেতনা সজীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু উপন্যাস আবার আমাদের মনের পক্ষে ক্ষতিকর সহানুভূতিও জাগাতে পারে। উপন্যাস আমাদের কুরুচিপূর্ণ অনুভূতিগুলিকেও গৌরবান্বিত করতে পারে। পরচর্চার মত উপন্যাসের কাহিনী অনেক সময় দুরভিসন্ধিমূলক হতে পারে। মিসেস বোল্টনের পরচর্চার মধ্যে একটা জিনিস বুঝতে পারল কনি, মিসেস বোল্টন সব সময় মেয়েদের পক্ষে। সে যে সব কাহিনী শোনায় তাদের তাতে মেয়েরা সব ভাল। আর সব পুরুষরা খারাপ। সে প্রায়ই বলত কথায় কথায়, 'লোকটা এত খারাপ আর মেয়েটা এত ভাল।' আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কথায়। মেয়েরা সব মিষ্টভাষিণী আর পুরুষরা সৎ হলেও কটুভাষী। ক্রুদ্ধস্বভাব সৎ লোকের কোন দাম নেই, তাই মিসেস বোল্টনের সমস্ত সহানুভূতির প্রবাহ নারীদের দিকেই প্রবাহিত হয়েছে।

বক্তার এই অকারণ পক্ষপাতিত্বের জন্যই যে কোন পরচর্চা খারাপ। আর এই কারণেই বেশীর ভাগ জনপ্রিয় উপন্যাস খারাপ। তাতে পরনিন্দা থাকে বলেই সাধারণ মানুষ তা বেশী পড়ে।

তবু মিসেস বোল্টনের কথা থেকে তেভারশাল গাঁ সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা

হলো ওদের। গাঁটা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারল ওরা। ওদের কাছে তেভারশাল গাঁটা একটা ভয়ঙ্কর জায়গা বলে মনে হত যেখানে যত সব কুৎসিত লোকগুলো থাকে। মিসেস বোল্টন যাদের কথা গল্পে বলত ক্লিফোর্ড তাদের অবশ্য অনেককেই চিনত। কিন্তু কনি শুধু তাদের মধ্যে দু একজনক চিনত। তাদের মনে হত আসলে তেভারশাল যেন ইংল্যাণ্ডের একটা গাঁ নয়, ওটা যেন মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত একটা জঙ্গল।

মিসেস বোল্টন একদিন একটা গল্প বলতে গিয়ে বলল, আপনি এ্যালসপের বিয়ের কথাটা শুনেছেন? গত সপ্তায় তার বিয়ে হয়। এ্যালসপ হচ্ছে বুড়ো জেমস্-এর মেয়ে। ওরা একটা বাড়িও করেছিল। বুড়ো জেমস্ তিরাশি বছর বয়সে গত বছর পড়ে গিয়ে মারা যায়। লোকটা কিন্তু শিশুর মত সরল ছিল। পাহাড়ের ঢালু থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় আর উরুটা ভেঙ্গে যায়। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। বুড়ো কিন্তু ছেলেদের একটা পয়সাও দিয়ে যায়নি; সব টাকা মেয়ে তাত্তিকে দিয়ে যায়। তাত্তির বয়স গত শরতে তিপ্পান্ন বছরে পড়েছে। ও চ্যাপেল স্কুলে অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছে। তাত্তি অবশেষে একটা বুড়ো লোককে ভালবাসে। লোকটার বয়স এখন পঁয়ষট্টি। হ্যারিসনের কাছে কাজ করে। কিন্তু ওদের দেখলে মনে হবে ওরা যেন দুটি তরুণ তরুণী। যেন কূজনরত দুটি কপোত-কপোতী। তারা প্রায়ই হাত ধরাধরি করে হাঁটে, গেটের কাছে তারা পরস্পরকে চুম্বন করে। পাইক্রফট্ রোডের ধারে খোলা জানালার গায়ে মেয়েটা সকলের চোখের সামনে লোকটার হাঁটুর উপরে বসে থাকে। লোকটার প্রায় চল্লিশ বছরের উপর বয়সের ছেলে আছে। দুবছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। এই লোকটার সঙ্গে এ্যালসপের সম্প্রতি বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর ওরা কিলব্রুকে চলে যায় নতুন ঘর বাঁধতে। লোকে বলে মেয়েটা নাকি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা ড্রেসিং গাউন পরে সব জায়গায় যাওয়া আসা করে। বিশ্রী ব্যাপার! বুড়োদের কাজকর্ম দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। যুবক যুবতীদের থেকে ওরা অনেক খারাপ এবং বিরক্তিকর। আমি ছায়াছবির লোকদের ব্যাপারটা বলেছিলাম। আপনিও এগুলো এড়িয়ে যেতে পারেন না। বুড়োরা শিশু ও যুবকদের থেকে অনেক খারাপ। নীতির কথা বলছেন? কেউ নীতি মেনে চলে না। কেউ তা গ্রাহ্য করে না। লোকে যে যা চায় তাই করে। কিন্তু এখন তাদের রস গুটিয়ে এসেছে অনেকটা। খাদের কাজকর্ম ভাল চলছে না।

এখন তাদের টাকা নেই। ফলে ঝগড়া হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে মেয়েরা বেশী উগ্র ও অধৈর্য। অপেক্ষাকৃতভাবে পুরুষরা অনেক বেশী সহনশীল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, কোলিয়ারির ছেলেমেয়েরা পোষাকের প্রতি বেশী নজর রাখে। কি ছেলে কি মেয়ে, তাদের খরচের বেশীর ভাগ খরচ করে পোষাকে। ছেলেরা আবার মদ খেয়েও অনেক খরচ করে। সপ্তায়

দু তিন দিন তাদের শেফিল্ড শহরে যাওয়া চাই। বয়স্ক লোকেরা ধৈর্যশীল; মেয়েদের বাড়াবাড়ি ও উচ্ছৃংখলতা দেখেও কিছু বলে না। ফলে মেয়েরা এক একটা দানবী হয়ে ওঠে। আবার ছেলেরা তাদের বাবাদের মত হয় না। তাদের যদি তাদের বাবাদের মত কিছু করে সঞ্চয় করতে বলা হয় তাহলে তারা বলবে, ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা এখন জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

তাদের গাঁটা সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা পেল ক্লিফোর্ড। আগে গাঁটার নাম শুনলেই ভয় হত। সে সমস্ত গাঁটাকে একটা ঘোড়ার আস্তাবল মনে করত। কিন্তু এখন··· ?

ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল, গাঁয়ের লোকগুলো সমাজবাদ, বলশেভিকবাদ প্রভৃতির ভক্ত হয়ে উঠেছে নাকি ?

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কিছুসংখ্যক সোচ্চার লোকের কথা শুনেছেন। তাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগ মেয়ে। পুরুষগুলোর এসব বিষয়ে কোন খেয়াল নেই। আমার মনে হয় না তেভারশাল গাঁটাকে আপনি কখনো লালে লাল করে তুলতে পারবেন। সেদিক দিয়ে তারা খুব ভাল। শুধু কিছু যুবক মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, তারা এই সব আদর্শে বিশ্বাস করে। আসলে তারা পকেটে পয়সা না থাকলেই ওই সব দিকে মন দেয়। তারা শহরে গিয়ে কিছু খরচ করার জন্য কিছু টাকা চায়। পকেটে টাকা না থাকলেই তারা ঐ বামপন্থী রাজনীতির বক্তৃতা শুনবে। কিন্তু আসলে তারা এসবে বিশ্বাস করে না।

তাহলে আপনি বলছেন বিপদের কোন আশঙ্কা নেই ?

মোটেই না। যতদিন ওদের হাতে রস থাকবে ততদিন কোন বিপদের ভয় নেই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওদের আর্থিক অবস্থা খারাপ চললে তরুণ যুবকরাও খারাপ হতে শুরু করবে। আসলে ওরা সবাই স্বার্থপর বকাটে ছোকরা। কিন্তু আমার মনে হয় না সত্যি সত্যিই তারা কিছু করবে। তারা শুধু মাঝে মাঝে মটর বাইকে চড়া আর শেফিল্ডে গিয়ে একবার করে নাচা ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেয় না। আপনি তাদের কোন বিষয়েই কোন গুরুত্ব দান করতে দেখতে পাবেন না। যে কাজে তারা গুরুত্ব দেয় তা শুধু হলো সন্ধ্যের সময় ভাল পোষাক পরে হয় বাসে না হয় মোটরে অথবা মোটর-বাইকে চেপে মেয়েদের সঙ্গে করে নাচতে যাওয়া। আর একটা ব্যাপারে তারা গুরুত্ব দেয় তা হলো ডার্বি, জনকাস্টার প্রভৃতি রেস খেলার ব্যাপারে। যে কোন রেস খেলাতেই তারা বাজী ধরে আর ফুটবল ? তারা বলে ফুটবল খেলা দেখাটা একটা পরিশ্রমের কাজ। তার চেয়ে মোটরবাইকে করে শনিবার বিকালে শেফিল্ড অথবা নটিংহাম যাওয়া অনেক ভাল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কি করে ?

শুধু ঘুরে বেড়ায়। হয় মিকাডো বা অন্য কোন চায়ের দোকানে চা খাবে অথবা কোন ছায়াছবি দেখবে বা কোন থিয়েটারে যাবে। যেখানেই যাক তাদের সঙ্গে থাকবে কোন না কোন মেয়ে। ছেলেদের মত মেয়েরাও স্বাধীন। যা ইচ্ছা করে।

আর যখন তাদের হাতে টাকা থাকে না তখন কি করে?

তখন তারা পরস্পরের মধ্যে যত সব বাজে কথা নিয়ে আলোচনা, করে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ওরা যখন ভাল পোষাক পরে ফূর্তি করার জন্য টাকা ছাড়া আর কোন কিছুই জানে না তখন আপনি ওদের কিভাবে বলশেভিকবাদে দীক্ষিত করে তুলবেন? ছেলেদের মত মেয়েদেরও ঐ একই অবস্থা। সমাজবাদী হওয়ার মত মাথা নেই ওদের। কোন চিন্তাশক্তি নেই। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে মন দেবার মত ওদের মনই নেই আর সে মন কখনো হবেও না।

কনি এই সব শুনে শুধু একটা কথাই ভাবল, অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের মত নিম্নশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদেরও একই অবস্থা। তেভারশাল, মেফেয়ার বা কেনসিংটন সব জায়গারই অবস্থা এক। কনির মনে হলো আজকের দিনে সারা দুনিয়ায় শুধু একটা শ্রেণীই আছে আর তা হলো অর্থলোলুপ মানুষের শ্রেণী, কি মেয়ে কি পুরুষ সব মানুষ শুধু টাকা চাইছে। তফাৎ শুধু পাওয়ার তারতম্যে। চাইছে সবাই। যে বেশী পায় সেই হয় ধনী। যে চেয়েও কিছু পায় না সে থেকে যায় গরীব।

মিসেস বোল্টনের কথাবার্তার প্রভাবে পড়ে আশপাশের খনিগুলোর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ক্লিফোর্ড। একটা মালিকানা ও প্রভুত্বচেতনা পেয়ে বসল তাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা আবেগ জেগে উঠল ধীরে ধীরে তার মধ্যে। আসলে সেই হচ্ছে তেভারশাল গাঁয়ের মালিক, এখানকার খনিগুলোর মালিকও সে। যে প্রভুত্বের ভাবটা আগে এক অহেতুক ভয়ের চাপে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আজ সেটা আবার জেগে উঠল।

তেভারশালের খাদগুলো খুব একটা ভাল চলছে না। মাত্র দুটো খনি চলছে, তেভারশাল আর নিউ লণ্ডন। তেভারশাল একদিন এক বিখ্যাত খনি ছিল। কিন্তু আজ তেভারশালের সে দিন আর নেই। খনি হিসাবে নিউ লণ্ডন কোনদিনই ভাল ছিল না। আজ তার অবস্থা আরো খারাপ।

মিসেস বোল্টন বলল, তেভারশাল খাদের অনেক লোক আজ স্ট্যাকগেট অথবা হোয়াইটওভারে চলে গেছে। যুদ্ধের পর খোলা স্ট্যাকগেট কোলিয়ারি আপনি বোধহয় কখনো দেখেননি স্যার ক্লিফোর্ড? একদিন দেখে আসবেন। একেবারে নতুন। গেটের সামনেটা দেখে মনে হবে যেন এক বিরাট ওষুধের কারখানা। দেখে কোলিয়ারি বলে মনেই হবে না। ওরা বলে ওষুধের জিনিসপত্র বেচে কয়লার থেকে বেশী টাকা পায়। কত বড় বড় বাড়ি তৈরি

হয়েছে কর্মচারিদের থাকার জন্য। দেশের বহু জায়গা থেকেই লোক আসছে; সেখানে কাজ করছে। তবু তেভারশালের অনেক লোক আজ যেখানে কাজ করছে তারা ভালই আছে ওখানকার খনিতে কাজ করতে থাকা লোকদের থেকে। তারা বলে, তেভারশাল খনির প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েক বছর। তারপর এ খনিকে বন্ধ করে দিতে হবে। নিউ লণ্ডন খনি তার আগেই যাবে। কিন্তু তা যদি সত্যিই হয় তাহলে ব্যাপারটা কি খুব খারাপ হবে না? এ খনি কি আজকের? আমি যখন বাচ্চা মেয়ে ছিলাম তখন এ খনি ছিল দেশের একটা সেরা খনি। এখানে যারা কাজ করত তারা ভাগ্যবান মনে করত নিজেদের। কত টাকা রোজগার হয়েছে এ খনি থেকে। আর আজ লোকে বলে এটা নাকি এক নিমজ্জমান জাহাজ। এটা শুনতে খারাপ লাগে না কি? অবশ্য এমন কিছু শ্রমিক আছে যারা আজকের কোন নতুন খনিতে কাজ করতে যাবে না। এই সব নতুন খনিগুলোর গভীরতা অনেক বেশী আর এতে সব কাজ হয় যন্ত্রপাতিতে। শ্রমিকরা বলে মেশিন নয়, ওরা যেন যন্ত্রদানব। আগে মানুষে যে কয়লা তুলত আজ মেশিনে তা তুলছে। এতে কয়লা কিছু লোকসান হলেও বেতনে পুষিয়ে যায়, কারণ এতে কম লোক দরকার হয়। মনে হয় কিছুকাল পরে পৃথিবীতে সব কাজই হয়ত যন্ত্রের দ্বারা হবে; কোন কাজের জন্য কোন লোকের দরকার হবে না। ওরা বলে, তারা নতুন যুগের সূচনাকে সহ্য করতে পারে না, যারা পুরনো ব্যবস্থাকে ছাড়তে চায় না, তারাই এসব কথা বলে। ওরা বলে স্ট্যাকগেট কোলিয়ারির কয়লা থেকে যে সব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় তা তেভারশালের কয়লা থেকে পাওয়া যায় না। অথচ দুটো কোলিয়ারির মাঝখানে মাত্র তিন মাইলের ব্যবধান। কিন্তু পাঁচজনে বলাবলি করছে, এটা লজ্জার কথা যে খনিটার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করা হচ্ছে না। এখানকার মেয়েরা শেফিল্ড যাচ্ছে কাজ করতে। অথচ তাদের এ খনিতে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। আমার মতে লোকে যখন বলছে তেভারশাল কোলিয়ারি ডুবন্ত জাহাজের মত ডুবছে আর তার মধ্যে কাজ করতে থাকা লোকগুলো ইঁদুর, তখন খনিটার পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় এ খনির চরম সুদিন গেছে। লোকে একথাও বলে। স্যার জিওফ্রে এতে প্রচুর টাকা লগ্নী করে প্রচুর লাভ করেন। কিন্তু আজ সবাই বলছে এ খনি থেকে মালিকরা কিছুই পাচ্ছে না। কিন্তু কেন এমন হয়? আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন ভাবতাম কোন কোলিয়ারি কোনদিন বন্ধ হবে না। চিরকাল এমনি করে চলবে। অথচ আমাদের চোখের সামনে কত কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে গেল। নিউ ইংল্যাণ্ড, কনউইচ প্রভৃতি কোলিয়ারি চিরদিনের মত নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। আজ সে সব কোলিয়ারি দেখলে মৃত্যুপুরী বলে মনে হয়। আজ সেই সব অচল খাদের মুখে যত গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। তেভারশাল খনি বন্ধ হয়ে

গেলে আমরা কি করব? জগৎটা সত্যিই কি মজার। কী অদ্ভুত। আপনি কখন কি হবে তা বলতে পারেন না।

মিসেস বোল্টনের কথাবার্তায় ক্লিফোর্ডের মনে এক নতুন আগ্রহ জাগে। খনি সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা নেই। তার বাবা যে টাকা লগ্নী করে গেছেন তা একেবারে নিরাপদ। তার থেকে লভ্যাংশ প্রতি বছর ঠিক আসবে। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা সে দেখতে চায় না। তার জগৎ হচ্ছে সাহিত্যের জগৎ। এই সাহিত্যের জগতে সে চায় আপন প্রতিষ্ঠা ও যশের প্রসার।

হঠাৎ ক্লিফোর্ডের একটা কথা মনে হলো। তার মনে হলো দুরকমের উন্নতি আছে মানুষের জীবনে—লৌকিক উন্নতি আর সত্যিকারের উন্নতি। সংসারে একদল লোক আছে কাজ করার জন্য আর একদল লোক আছে আনন্দ বা হাসিখুশি করার জন্য। সংসারে যারা কাজের লোক তাদের দরকার মত রসদ যোগানোই হলো বেশী কঠিন কাজ। ক্লিফোর্ড ভাবল সে নিজে সুখবাদী। আনন্দ পায় বলেই এতদিন খনির কাজকর্ম বা উন্নতির দিকে কোন খেয়াল রাখেনি।

ক্লিফোর্ডের আরও মনে হলো উন্নতির কুক্কুরীদেবীর দুরকমের ক্ষুধা আছে। জগতের দু শ্রেণীর লোক দেবীর দু ধরনের ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে। যারা শিল্পী, সাহিত্যিক তারা দেবীকে তাদের তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট করে আর যারা ব্যবসা করে তারা দেবীকে হাড়মাংস দিয়ে তৃপ্ত করে।

সত্যিই দু দল কুকুর উন্নতির সেই কুক্কুরীদেবীর পিছনে পিছনে ঘোরে আর তার কৃপা পাবার জন্য ঝগড়া করে। যারা গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা সে দেবীকে প্রীত করার চেষ্টা করে, আর একদল কুকুর দেবীকে তার আসল খাবার হাড় মাংস অর্থাৎ টাকা পয়সা দিয়ে তৃপ্ত করে। দ্বিতীয় দল আত্মপ্রচারে কিছুটা বিমুখ, কিন্তু লোভলালসার দিক থেকে আরো ভয়ঙ্কর। আপাতমার্জ্জিত প্রথম শ্রেণীর কুকুরগুলো সেই কুক্কুরীদেবীর কৃপালাভের জন্য নিজেদের মধ্যে অনবরত ঝগড়া-ঝাঁটি তর্জন গর্জন করতে থাকে। কিন্তু তাদের এই তর্জনগর্জন দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনপণ নীরব সংগ্রামের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ দেবীকে যারা হাড় মাংস এনে দেয় সেই দ্বিতীয় দলের কুকুররাই দেবীর কাছে অপরিহার্য এবং বেশী প্রিয়পাত্র।

কিন্তু মিসেস বোল্টনের প্রভাবে পড়ে শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে টাকা করে সেই কুক্কুরীদেবীর অন্তর জয় করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। জীবনে প্রথম এক নতুন সংগ্রামে প্রবেশ করতে চাইল। যাই হোক সে একটা প্রেরণা পেল জীবনে। মিসেস বোল্টন তাকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে চাইছে। কনি তা কোনদিন পারেনি। কনি তাকে সব সময় দূরে দূরে রাখত এবং তাকে শুধু নিজের সম্বন্ধে ও অন্তরজগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। মিসেস বোল্টন

তাকে বাইরের জগৎ ও পরিবেশ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন করে তোলে। অবশ্য অন্তরের দিক থেকে সে অনেকটা নরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাইরে তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

একদিন তার খনি সম্বন্ধে এমনই একটা আগ্রহ জেগে উঠল যে সে নিজে তা দেখতে গেল। একটা টবের মধ্যে বসে সে খাদের নিচে নামল। আবার টবে করেই তাকে কয়লা কাটার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। খাদের নিচে ম্যানেজার তাকে সব ঘুরিয়ে দেখাল টর্চ হাতে। ক্লিফোর্ড মুখে কম কথা বলল। কিন্তু সব কিছু দেখল। দেখে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। নতুন করে সবকিছু ভাবতে লাগল। খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

কয়লাখনি শিল্পসংক্রান্ত কারিগরি ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে পড়াশুনা শুরু করে দিল ক্লিফোর্ড। এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টও সব পড়ে ফেলল। খনি সম্বন্ধে আধুনিককালে যে সব পরীক্ষা-নীরিক্ষা হয়েছে তাও খুঁটিয়ে দেখল। জার্মানিতে লেখা কয়লার রাসায়নিক উৎপাদন সম্বন্ধে লেখা বইগুলোও পড়ল। এই সব পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে যে সব নতুন বিষয় জানতে পারল তা গোপন রাখা হলো। তা কাউকে কিছু বলল না। তবে এ বিষয়ে যতই পড়াশুনো করল ও খোঁজখবর নিল ততই বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড, আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের মাধ্যমে খনিশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। ক্লিফোর্ড আরও বুঝল, খনিশিল্পে যা উন্নতি হয়েছে তা শিল্প সাহিত্য বা আবেগধর্মী সৃষ্টির থেকে অনেক বড়। এই শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানবের কাজ করছে। দেবতারূপে যা তারা আবিষ্কার করছে, এক দানবীয় কর্মতৎপরতার সঙ্গে কাজে পরিণত করে তুলেছে সেই সব আবিষ্কারকে। এই সব ব্যাপারে মানুষ স্বচ্ছন্দে তার মানসিক বয়সকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য আবেগানুভূতির দিক থেকে মানুষ কিছুটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে।

তা হোক। মানুষ তার মন ও আবেগানুভূতির দিক থেকে নিচে নেমে যাক, ক্লিফোর্ড তা গ্রাহ্য করে না। ও সব চুলোয় যাক। ক্লিফোর্ড এখন একমাত্র খনিশিল্পের উন্নতি আর তেভারশালকে অধঃপতনের অতল গহ্বর হতে টেনে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী।

আজকাল সে দিনের পর দিন খাদের ভিতর নামছে। খনির কাজকর্ম তদারক করছে। এমন সব যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করছে তার খনির ম্যানেজার বা এঞ্জিনীয়াররা যার নামও শোনেনি। হ্যাঁ, একেই বলে ক্ষমতা। একেই বলে প্রভুত্ব। জীবনে আজ প্রথম এক প্রভুত্বচেতনা অনুভব করল ক্লিফোর্ড। সে অনুভব করল আজ তার দেহমনসম্বলিত ব্যক্তিত্বটিকে ঘিরে যে প্রভুত্বের স্রোত বয়ে চলেছে সেই প্রভুত্বের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে উঠেছে সমগ্র খনি অঞ্চলটি। আজ ক্লিফোর্ড বুঝতে পারল, আজ তার খনির শত শত লোকের উপর সেই প্রভুত্ব

প্রতিষ্ঠিত। আজ তারা সবাই তার অঙ্গুলিহেলনকে মেনে চলছে। তার মতে সব কাজকর্ম চলছে।

আজ যেন ক্লিফোর্ডের নবজন্ম হলো। আজ সে প্রথম জীবনের আস্বাদ লাভ করল। সে একদিন কনির নিরুত্তাপ সাহচর্যে একরকম মরে যাচ্ছিল, সচেতন সংবেদনশীল সত্তার এক হিমশীতল সংকীর্ণ সীমার আবর্তে আবর্তিত শিল্পীজীবনের নিঃসঙ্গতার মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে এতদিন মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল সে। আজ সে শিল্পীজীবন জাহান্নামে যাক। সে জীবন ঘুমিয়ে থাক। আজ তার মনে হলো ঐ অবহেলিত কয়লার খাদ থেকে এক নতুন প্রাণের প্রবাহ দুর্বার বেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সে প্রবাহকে বরণ করে নেবে সে। আজ মনে হচ্ছে, কোলিয়ারির দূষিত বাতাস অক্সিজেনের থেকে অনেক ভাল। কোলিয়ারি থেকে ছুটে আসা সেই বেগবান প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আজ সে পেয়েছে সৃষ্টিশীল কর্মোদ্দীপনা ও কর্মক্ষমতার এক বিরাট অবকাশ। আজ তার কেবলি মনে হচ্ছে সে একটা কিছু করছে, একটা কাজের মত কাজ করতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছে এক বিরল জয়ের গৌরব। এতদিন গল্প লিখে যে জয় যে গৌরব সে লাভ করেছে তা শুধু অর্থহীন এক নামপ্রচার মাত্র। আর তাতে হয়েছে শুধু তার কর্মশক্তির অহেতুক অপচয়। কিন্তু আজ সে সত্যিকারের জয়ের গৌরব লাভ করতে চলেছে।

প্রথমে সে ভেবেছিল বৈদ্যুতীকরণের মধ্যেই আছে সকল সমস্যার নিঃশেষিত সমাধান। কয়লাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে দাও। সব সমস্যার সমাধান হবে। তারপর এ বিষয়ে এক নতুন ধারণার উদ্ভব হয়। জার্মানরা এমন এক স্বয়ংচালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করে যা চালানোর জন্য কোন ফায়ারম্যানের দরকার হয় না। এই এঞ্জিন আবার এমন একরকম তেলে জ্বলে যা খুব কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েও খুব বেশী তাপ দেয় এবং অদ্ভুত অবস্থায় কাজ করতে পারে।

এত কম তেলে এত বেশী তাপ দিতে পারে—এটা প্রথম দেখে চমকে উঠেছিল ক্লিফোর্ড। সে দেখল শুধু বাতাস নয়, নিশ্চয় বাইরের জগতের কোন না কোন উদ্দীপনার জন্যই এমন হচ্ছে। এই নিয়ে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে। ঘটনাক্রমে সে এক কৃতী যুবককে সহকারী হিসাবে পেয়ে যায়। যুবকটি রসায়নবিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করে এবং তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এবার এক বিজয়গর্ব অনুভব করতে লাগল ক্লিফোর্ড। নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বিসহ একাকীত্বের অচলাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে অবশেষে। শিল্প সাহিত্য তাকে কখনো এভাবে বার করে আনতে পারেনি। বরং তার অবস্থা আরো খারাপ করে দেয়। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয়ে মিসেস বোল্টন তার পিছন থেকে কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে সেটা ঠিক বুঝতে পারে না ক্লিফোর্ড। কিন্তু সে যাই হোক, একটা জিনিস

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে যে, মিসেস বোল্টন যখন তার কাছে থাকে তার গলার স্বরটা বেশ নরম থাকে। কিছুটা নির্লজ্জও হয়ে ওঠে সে।

কনির কাছে কিছুটা শক্ত হয়ে ওঠে ক্লিফোর্ড। সে বুঝতে পারে আজকের এই জয় এই ক্ষমতালাভ প্রভৃতি সব কিছুর জন্য সে কনির কাছে ঋণী। তাই কনি যখন তাকে যেভাবে মৌখিক এক কৃত্রিম সম্মান দান করে সেও তখন তাকে ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা দান করে। তবে এটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, কনিকে সে ভয় করে। তার প্রতি একটা গোপন ভয় সব সময় অনুভব করে সে। তার মধ্যে যে নতুন একিলিস জেগে উঠেছে সে একিলিস যতই বলশালী ও প্রতিপত্তিশালী হোক তার একটা দুর্বল অনাবৃত গোড়ালি আছে এবং কনির মত এক নারী, সম্পর্কে যে তার স্ত্রী, এক অব্যর্থ আঘাতে ধরাশায়ী করে দিতে পারে তাকে চিরদিনের মত। কনি যতক্ষণ তার কাছে থাকত এক অর্ধদাস মনোভাবমূলক ভয়ের বশবর্তী হয়ে খুব বেশী রকমের ভদ্র হবার চেষ্টা করত তার কাছে। কনির সঙ্গে কথা বলতে তার কণ্ঠটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেত, হয়ে যেত অস্বাভাবিক। তাই কনির কাছে কোন কথাই বলত না সে।

একমাত্র শুধু মিসেস বোল্টনের কাছেই যখন থাকত ক্লিফোর্ড তখন সে নিজেকে প্রভু ভাবতে পারত। প্রভুত্বমূলক মনোভাবের পরিচয় দিত। তার গলার স্বরটা তখন বেশ সহজ ও দরাজ হয়ে ওঠে। মিসেস বোল্টনের গলার মতই তার কণ্ঠ হয়ে ওঠে অবাধ আর সোচ্চার। সে মিসেস বোল্টনকে তার দাড়ি কামাতে দেয়, তার গাটা দলে দিতে বলে। সে যেন একটা বাচ্চা ছেলে। যেন সে সত্যিই শিশু হয়ে উঠেছে।

অধ্যায় ১০

কনি আজকাল একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। আজকাল তাদের র‍্যাগবির বাড়িতে কোন লোকই আসে না। কারো সঙ্গে কথা বলতেও পায় না। আজকাল ক্লিফোর্ড আর তাকে চায় না কোন বিষয়ে। ক্লিফোর্ড এখন তার বন্ধুদের থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আজকাল ক্লিফোর্ডকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়। আজকাল সে রেডিও শুনতে ভালবাসে। অনেক খরচ করে সে একটা রেডিও বসিয়েছে। আজকাল সে এই দূর মিডল্যাণ্ডে বসে মাদ্রিদ ও ফ্রাঙ্কফুর্টের খবর শুনতে পায়।

আজকাল ক্লিফোর্ড ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাউডস্পীকার শোনে। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় কনি। ক্লিফোর্ড স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। তার মুখচোখ দেখে মনে হয় যেন সে তার

মনটা হারিয়ে ফেলেছে এবং সে অনির্বচনীয় একটা কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

সে কি সত্যিসত্যিই কিছু শুনছে? অথবা আসলে সে কিছুই শুনছে না। শুধু তার মনের ভিতর একটা জোর আলোড়ন চলছে। কনি তার কিছুই জানে না। সে তার ঘরে চলে যায় অথবা বাড়ি ছেড়ে বনের ভিতর চলে যায়। মাঝে মাঝে এক ভয় তাকে পেয়ে বসে। তার ভয় হয় সে পাগল হয়ে যাবে। সমগ্র সভ্য জগৎকেই সে ভয় করে।

কিন্তু এখন আবার এক নতুন ভয় দেখা দিয়েছে। আজকাল আবার ক্লিফোর্ড শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে নজর দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, শামুকের মত দেখতে যে প্রাণীর বাইরেটা শক্ত আর সেই শক্ত খোলস বা আবরণের অন্তরালে একটা নরম মাংসল পদার্থ লুকিয়ে আছে। কনি আজ সত্যিই বিপদে পড়েছে। সে আজ একেবারে বন্দী হয়ে পড়েছে। সে আজকাল একবারেই মুক্তি পায় না। তার কোন কাজ না থাকলেও ক্লিফোর্ড তাকে প্রায়ই ডাকে। তার খোঁজ করে প্রায়ই। ক্লিফোর্ডও আজকাল এক স্নায়বিক ভয়ে ভুগছে। ভাবছে কনি তাকে ছেড়ে চলে যাবে যে কোন সময়ে। ক্লিফোর্ডের জীবনের যে দিকটা নরম, যে দিকটা তার একান্ত ব্যক্তিগত এবং মানবিক আবেগানুভূতিতে ভরা, সে দিকটা ভয়ে ভয়ে কনির উপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে সে শিশুর মত বোকা। কনিকে র‍্যাগবিতেই তার স্ত্রী লেডি চ্যাটার্লি হিসাবে থাকতে হবে। তা না হলে কোন এক বিশাল প্রান্তরে পথহারা এক নির্বোধ লোকের মতই ব্যর্থ হয়ে যাবে সে।

তার উপর ক্লিফোর্ডের এই আশ্চর্যজনক নির্ভরতার কথাটা কনি বুঝতে পেরে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্লিফোর্ড তার খনির ম্যানেজার, বোর্ডের সদস্য, তরুণ বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা বলেছে তা সব শুনেছে। এই সব বাস্তব ব্যাপারে সে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে তা দেখে অবাক হয়ে গেছে কনি। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের চালনা করার ব্যাপারেও অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে সে। সে নিজেও আজ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন লৌহকঠিন এক ক্ষমতাশালী প্রভুতে পরিণত হয়েছে। কনির মনে হলো মিসেস বোল্টনের প্রভাবের ফলেই এই সব কিছু সম্ভব হয়েছে। ক্লিফোর্ডের জীবনের এক সংকটজনক মুহূর্তে মিসেস বোল্টনের আবির্ভাব হয় আর তার ফলেই ঘটেছে তার এই বিস্ময়কর পরিবর্তন।

কিন্তু এই ক্ষমতাশালী কঠোর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি যখন একা একা বসে তার প্রক্ষোভগত জীবনের কোন বিষয়ে ভাবতে থাকে তখন কিন্তু সে কেমন অন্য রকম হয়ে যায়। সে তখন কনিকে পুজো করে। কনি তার স্ত্রী এবং কোন বর্বর আদিম মানুষ যেমন ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোন রহস্যময় দেবতার পুজো করত ক্লিফোর্ডও তেমনি ভয়ে ভয়ে তার স্ত্রীর প্রাণহীন প্রতিমাটাকে পুজো করে চলে।

সে শুধু চায় কনি যেন কোনদিন তাকে ছেড়ে চলে না যায়। সে যেন তাকে এ বিষয়ে কথা দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয়।

একদিন কনি ক্লিফোর্ডকে বলল, আচ্ছা ক্লিফোর্ড তুমি কি সত্যিই একটা সন্তান চাও?

বনমধ্যবর্তী সেই কুঁড়েটার চাবিটা হাতে নেওয়ার পর এ কথাটা একদিন বলল কনি।

ক্লিফোর্ডের ম্লান চোখদুটোতে একটা অজানা আশঙ্কা ফুটে উঠল নিবিড়-ভাবে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, যদি এতে আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি না হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

কনি প্রশ্ন করল, কিসের ব্যবধান?

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান, তোমার আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যবধান। এ সন্তান যদি তাতে ব্যবধান সৃষ্টি করে তাহলে তাতে আমার ঘোর আপত্তি। যেমন আমার নিজেরও ত একটা সন্তান থাকতে পারত।

কনি তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রহিল। কনি তার বিস্ময়াহত দৃষ্টি ক্লিফোর্ডের উপর অনেকক্ষণ ধরে নিবদ্ধ করে রাখার জন্য ক্লিফোর্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অবশেষে কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে চাও না যে আমি একটা সন্তান লাভ করি?

ক্লিফোর্ড উত্তর করল, আমি তোমাকে আগেই বলেছি যদি এ সন্তান-প্রজননের ব্যাপার আমাদের ভালবাসার গায়ে কোনভাবে হাত না দেয় তাহলে এতে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। যদি তাতে হাত দেয় তাহলে আমি তার ঘোর বিরোধী।

কনি শুধু এক হিমশীতল ভয় আর ঘৃণায় স্তব্ধ ও নীরব হয়ে উঠল। ক্লিফোর্ড যা বলল তা একমাত্র কোন নির্বোধেই বলতে পারে। সে কি বলল, কি তার মানে তা সে নিজেই জানে না।

কনি কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে বলল, না, তোমার প্রতি আমার ভাব বা অনুভূতির কোন পরিবর্তন হবে না।

ক্লিফোর্ড বলল, এইটাই হলো কথা। তা যদি হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। একটা বাচ্চা সারা বাড়িময় ছুটে বেড়াবে—এটা দেখতে সত্যিই ভয়ঙ্করভাবে ভাল লাগবে। তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে—এইটা ভাবতেও ভাল লাগে। তখন তার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে, তার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু তার জন্য শত কষ্ট করলেও আমার তাতে কেন দুঃখ হবে না, কারণ তখন সব সময় একথাটা মনে রাখব এ সন্তান তোমার। তাই নয় কি প্রিয়তমা? আমি ভাবব এ সন্তান আমার। তা নয় ত কি? কারণ আমার না হলেও সে সন্তান ত তোমার। আমি কেউ নই। আমি নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে তোমার মধ্যে এক আমি বড় হয় বেঁচে থাকব। একটু ভেবে দেখতে গেলে দেখা যাবে

তুমি ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই। আমি তাই তোমার ভবিষ্যতের জন্যই জীবন ধারণ করব। আমার জীবন নিজের কাছে কিছুই না।

কনির মনে এই সব কথাগুলো ক্রমবর্ধমান একটা আতঙ্ক আর ঘৃণার সঙ্গে এসে গেল। বুঝল এটা হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর অর্ধসত্য যা মানুষের অস্তিত্বকে বিষাক্ত করে তোলে। কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ কখনো একথা বলতে পারে তার স্ত্রীকে? কিন্তু অনেক পুরুষই অনেক সময় এমন কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে পড়ে। যার মধ্যে আত্মসম্মানবোধের সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গও আছে এমন কোন লোক এমন করে তার স্ত্রীকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর সারাজীবনের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে?

তার উপর, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কনি শুনতে পেল ক্লিফোর্ড আবেগের সঙ্গে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কথা বলছে। উপরে সে একটা আবেগানুভূতিহীন নীরস ভাব দেখলেও তার কথাবার্তায় এমনই একটা প্রেমানুভূতির তরল আবেগ ফুটে উঠছিল যাতে মনে হচ্ছিল মিসেস বোল্টন তার অর্ধ-প্রণয়িনী, অর্ধ-সহধর্মিণী আর অর্ধ-বিমাতা। মিসেস বোল্টন তখন তাকে সান্ধ্যপোষাক পরাচ্ছিল, কারণ বাড়িতে কিছু ব্যবসায়ী অতিথি দেখা করতে এসেছিল ক্লিফোর্ডের সঙ্গে।

কনির এই সময় এক একবার মনে হত সে সত্যি সত্যিই মরে যাবে। তার মনে হচ্ছে একটা ভূতুড়ে ভয়ংকর মিথ্যা আর নির্বুদ্ধিতার বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতার চাপে নিষ্পেষিত হতে হতে মরে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডের আশ্চর্য ব্যবসাগত যোগ্যতা দেখে আর ব্যবসাগত সাফল্যকে দেবীজ্ঞানে উপাসনা করার কথা ঘোষণাটা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে কনি। সতত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে সে। আজ সে ক্লিফোর্ডকে স্পর্শ করে না আর ক্লিফোর্ডও তাকে স্পর্শ করে না। তাদের মধ্যে প্রায় আর কোন সম্পর্কই নেই। ক্লিফোর্ড কখনো তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে সস্নেহে ধরেনি। অথচ যার দেহটা স্পর্শ করে না তাকেই প্রতিমারূপে পূজা করার কথা ঘোষণা করে প্রকাশ্যে আর এই ঘোষণার কথা শুনে মনে আরও বেশী যন্ত্রণা পায় কনি। এ হচ্ছে ক্লিফোর্ডের দেহমনের এক সর্বাত্মক জড়তার এক নিষ্ঠুর পীড়ন। এক অভ্রান্ত উদাহরণ। কনির মনে হলো সে যদি তার মতের পরিবর্তন না করে তাহলে সে মরে যাবে।

সেদিন বনের ভিতর দিকে একা একা চলে গেল কনি। আজ কুঁড়ের কাছে সেই ফাঁকা জায়গাটায় না গিয়ে সে ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসল। বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে ভাবতে জলের ছলছল শব্দ শুনতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ সেখানে শিকার রক্ষক এসে হাজির হলো। কনিকে নমস্কার করে বলল, আমি ঘরটার একটা চাবি করিয়েছি ম্যাডাম।

কনি চমকে উঠে বলল, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

লোকটা বলল, ঘরটা কিন্তু তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই। আমি যতটা

পেরেছি পরিষ্কার করেছি।

কনি বলল, কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি কষ্ট করতে হবে না।

না, না, কোন কষ্ট নয়। আমি প্রায় এক সপ্তা হলো মুরগিগুলোতে তা দিচ্ছি। আপনি গেলে কোন ক্ষতি হবে না। তারা কোন ভয় পাবে না। আমাকে সেখানে দিনরাত থেকে তাদের উপর নজর দিতে হয়। আমি আপনার কোন ব্যাঘাত ঘটাব না।

কনি বলল, না, তুমি কোন ব্যাঘাতই করবে না। তুমি যদি তাই ভাব তাহলে আমি ওঘরে যাবই না।

এবার সে তার নীল চোখ তুলে তাকাল কনির দিকে। তার চোখে এক ধরনের মমতা ফুটে উঠল, তবু কেমন একটা দূর দূর ভাব। তবে আজ তাকে আগের থেকে আত্মস্থ ও সহজ বলে মনে হলো। লোকটা কাশছিল। কাশিতে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

কনি বলল, তোমার কাশি হয়েছে?

ও কিছু না, ঠাণ্ডা লেগেছে। কিছুদিন আগে আমার নিউমোনিয়া হয়। সেই থেকে ওই কাশিটা হয়েছে। এটা এমন কিছু না।

লোকটা কিন্তু কনির দূরে দূরে থাকতে লাগল। কোনক্রমেই কাছে এল না তার।

এর পর থেকে সকালে বা বিকালে প্রায় রোজ একবার করে সেই কুঁড়েটাতে যেতে লাগল কনি। কিন্তু যখনি যেত লোকটাকে দেখতে পেত না। সে যেন ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যেত তাকে। নিজের একাকীত্বকে সব সময় বজায় রেখে চলত।

ঘরের ভিতরটা কিন্তু সে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। আগুনের জায়গাটার কাছে একটা চেয়ার আর টেবিল রেখে দিয়েছে। আগুনের কাছে কিছু জ্বালানি কাঠ রেখে দিয়েছে। টুল, ফাঁদ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যথাসম্ভব সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সব কিছু কাজের পিছনে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সে।

সেই ফাঁকা জায়গাটায় পাখি থাকার জন্য কিছু গাছের ডাল আর খড় দিয়ে একটা কুঁড়ে তৈরি করেছে। একদিন কনি সেখানে গিয়ে দেখল বাদামী রঙের দুটো মুরগী ডিমে তা দিচ্ছে। তাদের নারীদেহের রক্তের উত্তাপে নিবিড় আর মাতৃত্বের অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে বসে আছে তারা। এ দৃশ্য দেখে কনির হৃদয়টা একেবারে ভেঙ্গে গেল। তার নিঃসঙ্গতার বেদনাটা তীব্র হয়ে উঠল আরো। নারীত্ব ও মাতৃত্বের যে গৌরবে গৌরবান্বিত মুরগীগুলো সে গৌরব তার নেই। তার হঠাৎ মনে হলো সে যেন নারী হয়েও সত্যিকারের নারী নয়, শুধু এক হিমশীতল ভয়ে প্রস্তরীভূত এক বস্তু মাত্র।

তারপর দেখতে দেখতে আরো মুরগী এসে তা দিতে লাগল। তিনটে

বাদামী, একটা কালো আর একটা ধূসর রঙের। সব মুরগীগুলোই একভাবে ডিমগুলোর চারদিকে ছড়িয়ে বসে আছে। নারীসুলভ এক গূঢ় প্রবৃত্তির তাড়নায় গায়েব পালকগুলোকে ফুলিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছে মুরগীগুলো। কনি তাদের কাছে গেলে তাদের উজ্জ্বল চোখ মেলে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল তারা। কনিকে কাছে আসতে দেখে ওরা ভয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

কনি ঘরের মধ্যে বিচালি পেল। তাই থেকে কিছু এনে মুরগীগুলোকে খেতে দিল কিন্তু তারা খাবে না। একটা মুরগী আবার কনির হাতে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিল। কনি তাতে ভয় পেয়ে গেলেও সে ওদের জল আর খাবার নিয়ে গেল। কিন্তু যে মুরগীটা তা দিচ্ছিল ডিমে, সে জল বা খাবার কিছুই খেল না। কিন্তু তাদের কিছু না কিছু দেবার ও খাওয়াবার জন্য ছটফট করছিল কনি। অবশেষে একটা মুরগী কিছুটা জল খেল একটা পাত্র থেকে।

এর পর থেকে রোজই মুরগীগুলোর কাছে আসতে লাগল কনি। সারা জগতের মধ্যে একমাত্র এই মুরগীগুলোই একটুখানি উত্তাপ দিত তার হিমশীতল অন্তরটাকে। ক্লিফোর্ডের কথা তার প্রতিবাদ কনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিমশীতল করে দিত। মিসেস বোল্টনের কথা ও বাড়িতে আসা ব্যবসাদারদের কথাতেও হাড়ে শীতের কাঁপন ধরে দেহের প্রতিটি অস্থি মজ্জায়। মাঝে মাঝে মাইকেলিসের কাছ থেকে যে সব চিঠি আসে সে সব চিঠি পড়েও হিম হিম হয়ে যায় সমস্ত শরীর। কনির মনে হলো এইভাবে চলতে থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু কনির সারা অঙ্গটা বরফের মত হিম হিম মনে হলেও বসন্ত এল সারা দেশ জুড়ে। কোথা থেকে অসংখ্য নীলকণ্ঠ পাখি এসে জুটল। বনটায় সবুজ বৃষ্টিজলের মতই কচি কিশলয়গুলো চকচক করতে লাগল গাছের ডালে ডালে। সারা বনভূমি জুড়ে সারা দেশ জুড়ে যখন এক মধুর উষ্ণতা ছড়িয়া বসন্ত এসেছে তখন কনির অন্তরটা শুধু নিবিড় নিঃসঙ্গতার সীমাহীন এক বেদনায় হিম হয়ে থাকবে, এটা সত্যিই কী ভয়ংকর ব্যাপার। সব কিছুকে বিস্বাদ ও নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল কনির। শুধু নারীদেহের এক মধুর উত্তাপে নিবিড় হয়ে ডিমের উপর তা দিতে থাকা মুরগীগুলোকে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হতে লাগল কনির।

সেদিন আকাশটা ছিল বড় উজ্জ্বল, সূর্যের আলোয় ভরা। বিকালের দিকে বনভূমির পথে বেরিয়ে পড়ল কনি। ভায়োলেট, প্রিমরোজ প্রভৃতি কত ফুল ফুটে আছে পথের দুপাশে। ডিমে তা দিতে থাকা সেই মুরগীগুলোর বাসাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কনি। দেখল তা দেওয়া ডিমগুলোর থেকে একটা ছানা বেরিয়ে এসেছে। ছানাটা তার মার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার মা ভয়ে ভয়ে চিৎকার করছে। ছানাটা ঘন বাদামী রঙের এবং মাঝে মাঝে কালো দাগ। কনির মনে হলো সারা বনভূমির মধ্যে সারা জগতের মধ্যে এই

মুহূর্তে এই ছোট্ট প্রাণীটাই একমাত্র এক অফুরন্ত প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর। এক জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেই প্রাণীটাকে ভাল করে দেখার জন্য নত হলো কনি। এক অদম্য আবেগে ফেটে পড়ল তার অন্তর। এক নতুন জীবন! সম্পূর্ণ নতুন, বিশুদ্ধ, উত্তপ্ত, নির্ভীক এক জীবন। এই নতুন প্রাণীটি কত ছোট, কিন্তু কত নির্ভীক। এমন কি যখন ছানাটা তার মার আবেদনে তার পালকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখনও সে একটুও ভয় পায়নি।

মার কোলে ঢোকা আর বার হওয়াটা তার কাছে যেন একটা খেলা, জীবন নিয়ে খেলা। তার মা যখন তার পালক দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় বা বাসার ভিতর ভরে রাখতে চায় ছানাটা তখন এমনি নির্ভীকভাবে এক প্রাণচঞ্চলতায় খেলায় মেতে ওঠে। তার মার কোলের ভিতর ঢুকেও শান্ত থাকে না ছানাটা। তার মার বাদামী সোনালী পালকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বিরাট বিশ্বটাকে দেখতে চায় বার বার।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল কনি। সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃসঙ্গ নারীজীবনের অব্যক্ত বেদনাটা আশ্চর্যভাবে তীব্র হয়ে উঠল। সে বেদনা অসহ্য হয়ে উঠছিল তার কাছে।

কনির তখন শুধু বনের মাঝে তাই ফাঁকা জায়গাটায় যাবার ইচ্ছা হয়। এ ছাড়া আর সব কিছুই এক ব্যথাহত স্বপ্নের মতই শূন্য ও জ্বালাময় মনে হয়। কিন্তু এক একদিন তার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও বনে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাড়ির গৃহিণী হিসাবে অনেক কাজ করার থাকে। অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। এই সব করতে করতে তার মনে হয় সে যেন পাগল হয়ে যাবে।

একদিন সন্ধ্যার আগে সব কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়ল কনি। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল সে যেন পালিয়ে যাচ্ছে কার ভয়ে। কে যেন তাকে ডাকবে পিছন থেকে। সূর্যটা তখনো একেবারে অস্ত যায়নি। শেষ অপরাহ্নের গোলাপী রশ্মিগুলো গাছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল বনস্থলীর উপর। কনি বনের ভিতর ঢুকে দেখল মাথার উপর সূর্যের আলোটা আরো কিছুক্ষণ থাকবে। দুপাশে ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল কনি।

অবশেষে প্রায় আচ্ছন্ন ও অর্ধচেতন অবস্থায় বনের মাঝখানে সেই ফাঁকা জায়গার উপর এসে পৌঁছল কনি। শিকার রক্ষক লোকটা তখন ছিল সেখানে। হাতগুটোন জামা পরে সে মুরগীদের খাঁচাগুলো গুটিয়ে নিচ্ছিল রাত্রির মত। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল তাদের। শুধু তিনটি সদ্যজাত ছানা তাদের মার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে খাঁচার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কনি সলজ্জ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ছানাগুলোকে দেখার জন্য আমি এলাম। কথা বলার সময় সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল কনি লোকটার দিকে। প্রশ্ন করল, আর আছে?

লোকটা বলল, মোট ছত্রিশটা। এমন কিছু খারাপ নয়।

লোকটাও ছানাগুলোকে আগ্রহের সঙ্গে দেখাচ্ছিল। তাদের খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছিল।

শেষ খাঁচাটার পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল কনি। ছানা তিনটে ঢুকে গেছে তাদের মার কোলে। তবু তাদের মার সোনালী পালকের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট মাথাটা নিয়ে মার নিরাপদ কোল থেকে বাইরের জগৎটাকে দেখার চেষ্টা করছিল।

কনি তার হাতটা বাড়িয়ে একটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আমি ওদের গায়ে ভালবেসে হাত দেব।

কিন্তু ছানাগুলোর মা তার হাতে ঠুকরে দিতেই সরে এল কনি। আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ওদের আঘাত করিনি, তবু ঠুকরে দিচ্ছে।

লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল। হঠাৎ সে কনির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে খাঁচার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিল। ছানাগুলোর মাটা তাকে ঠুকরে দিল, তবে কনির মত অত জোরে নয়। লোকটা তার পালকের উপর হাত বুলিয়ে খাঁচার ভিতর থেকে একটা ছানাকে বার করে এনে কনির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নিন ধরুন।

এক অপূর্ব অভিনব অভিজ্ঞতার পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল কনির সারা অঙ্গ। ছানাটাকে তার হাতের তালুর উপর নিয়ে অবাক বিস্ময়ে অফুরন্ত পুলকের সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল। কত ছোট্ট একটা প্রাণী। তার ভার-হীন দেহের মধ্যে কত নিঃশব্দ কম্পনে স্পন্দিত হচ্ছে অনুপ্রমাণ এক প্রাণ। কিন্তু এত ছোট হয়েও কত নির্ভীক। তার ছোট সুন্দর মাথাটা তুলে ছানাটা নির্ভয়ে মার দিকে তাকাচ্ছে। কনি আপন মনে বলে উঠল, চমৎকার!

লোকটাও বেশ আনন্দের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে দেখল কনির চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে নীরবে। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য খাঁচার দিকে সরে গেল। সহসা সে অনুভব করল যে জারজ উত্তেজনাটা এত দিন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল তার নিম্নাঙ্গের মধ্যে আজ হঠাৎ সে অশান্ত হয়ে জেগে উঠেছে। সেটাকে শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করল সে। কনির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তবু সে উত্তেজনার উত্তাপটা কোমর থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়ল তার জানু পর্যন্ত।

আবার কনির দিকে ফিরে দাঁড়াল সে তাকে দেখার জন্য। দেখল, কনি নতজানু হয়ে বসে ছানাটা খাঁচার ভিতর রাখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুরগীটির ভয়ে পারছে না। কনির চেহারাটার মধ্যে নিঃসঙ্গতার এক অব্যক্ত বেদনা প্রকট হয়ে উঠছিল এমনভাবে যে সমবেদনার একটা তীব্র জ্বালা লোকটার আন্তরযন্ত্রের গভীর হতে ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল তার বুকের দিকে।

এবার সে কনির কাছে এসে তার হাত থেকে ছানাটা নিয়ে খাঁচার মধ্যে ভরে দিল। এবার সে তার সেই উত্তেজনার আগুন তার পাছার মধ্যে অনুভব করল।

কনির পানে ভয়ে ভয়ে তাকাল লোকটা। দেখল কনি মুখটা ঘুরিয়ে কাঁদছে। তার যুগান্তব্যাপী নিঃসঙ্গতার বেদনার হিমশীতল পাথরটা যেন সহসা গলে জল হয়ে ঝরে পড়ছে তার দুচোখ থেকে। তা দেখে তার অন্তরটাও গলে গেল। সে তখন তার হাত বাড়িয়ে তার আঙুলগুলো কনির হাঁটুর উপর রাখল। নরম স্বরে বলল, আপনি কাঁদবেন না।

কনি তার মুখে হাত দিয়ে দেখল সত্যিই সে অনেকখানি কেঁদেছে। তার অন্তরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু কোন দিকে কোন খেয়াল নেই।

লোকটা তখন তার হাতটা এবার আলতোভাবে কনির ঘাড়ের উপর প্রথমে রাখল। তারপর আস্তে আস্তে তার পিঠের উপর এক অন্ধ সহানুভূতির অপ্রতিরোধ্য আবেগে হাতটা বুলিয়ে যেতে লাগল। পিঠ থেকে হাতটা তার ক্রমশই কনির পাছা আর পাঁজরের মাঝখানে নরম অংশটায় নেমে এল।

কনি তার রুমালটা বার করে মুখ মুছতে লাগল।

লোকটা সহজভাবে শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি ঐ ঘরটায় একবার যাবেন?

তারপর সে কনির হাত ধরে তুলে তার কাঁধের কাছে হাতটা রেখে তাকে কুঁড়েটার দিকে নিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। কনি ঘরের ভিতর না ঢোকা পর্যন্ত তাকে ধরে রইল সে। কনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে চেয়ার টেবিলটা সরিয়ে একটা বাক্স থেকে একটা কম্বল বার করে ঘরের মেঝের মধ্যে বিছিয়ে দিয়ে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

কনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার মুখপানে তাকিয়ে দেখল তার মুখটা কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। যেন সে এক তীব্র সংগ্রামে ব্যর্থ পরাজিত হয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে চলেছে নির্মম নিষ্করুণ নিয়তির কাছে।

এক অদ্ভুত আনুগত্যের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই কম্বলটার উপর শুয়ে পড়ল কনি। লোকটা তখন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠল ঘরখানা। সেই অন্ধকারে কনি অনুভব করল একটা অদৃশ্য হাত তার দেহটাকে স্পর্শ করার পর তার মুখটাতে হাত বোলাচ্ছে। সে হাতের স্পর্শের মধ্যে এক অনন্ত সান্ত্বনা আর আশ্বাস ঝরে পড়ছিল যেন। হঠাৎ কনি তার গালের উপর একটা চুম্বন অনুভব করল।

স্বপ্নপরিবৃত এক তন্দ্রার ঘোরে স্থির হয়ে শুয়ে রইল কনি। তারপর যখন সে অনুভব করল লোকটার হাতটা এক নগ্ন নির্লজ্জতায় তার পোষাকটা সরিয়ে দিচ্ছে তখন একটু কেঁপে উঠল সে। লোকটা এক নীরব নিরুচ্চার আনন্দের তরল উত্তেজনায় গলে গিয়ে কনির কোমরের পোষাকগুলো খুলে নামিয়ে তার পায়ের কাছে চাপিয়ে রাখল। তারপর তার যোনিটাকে চুম্বন করল। এর পর কনির নরম দেহটার মধ্যে তাকে প্রবেশ করতে হবে। দীর্ঘদিন পর নারী-দেহের মধ্যে প্রবেশ করাটা এক পরম আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হলো তার।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল কনি। যেন সে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে

আছে। তা থাক। এ ব্যাপারে তার কোন কাজ নেই, চেষ্টা বা তৎপরতার কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত কর্মতৎপরতা তার। সেই সব কিছু করছে। সেই তার শক্ত হাত দিয়ে কনির দেহটাকে জড়িয়ে আছে। কনির দেহের উপর তার দেহটাকে দ্রুত সঞ্চালিত করছে। তারপর সে-ই তার গর্ভদেশে বীর্যস্খলন করছে। এই সব কিছুই এক সুখনিদ্রার মধ্যে অভিভূত হয়ে এক সুখস্বপ্নের মত উপভোগ করল কনি। অবশেষে লোকটা যখন তার সব কাজ শেষ করে কনির বুকের উপর ঢলে পড়ল তখন ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তার।

সহসা নিজে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল কনি। এক অপার রহস্যময় বিস্ময়ের ঘোরে ভাবতে লাগল কনি, কেন, কেন? এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? কেন এই রতিক্রিয়া তার মনের উপর থেকে তার অন্তরের আকাশ থেকে এক যুগান্ত-সঞ্চিত মেঘভারকে অপসারিত করে দিল নিঃশেষে? আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেনই বা তার অন্তরের আকাশ জুড়ে শান্তির অমৃত ঝরে পড়তে লাগল? এসব কি সত্যি? এই মুহূর্তে যা ঘটে গেল তা কি সত্যি?

কনির আধুনিক যুক্তিবাদী মন কিন্তু তবু শান্তি পেল না। বার বার শুধু মনে হতে লাগল, এটা কি সত্যি? তবে এটাও সে বুঝল সে লোকটাকে দেহদান করেছে—এটা সত্যি। কিন্তু সে যদি লোকটাকে দেহদান না করে নিজের সতীত্বটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করত তাহলে সেটাই হত অর্থহীন কাজ। তার মনে হলো, সে যেন লক্ষ লক্ষ বছরের এক বৃদ্ধা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সে যেন অন্তহীন বোঝাভারের এক অবিচ্ছিন্ন বেদনার অভিজ্ঞতাকে বহন করে আসছে। লক্ষ বছরের সেই বোঝাভার আজ অপসারিত হলো।

লোকটা তার বুকের উপর আশ্চর্যভাবে স্থির হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কি ভাবছে সে? কি সে অনুভব করছে তা জানে না কনি। লোকটা তার কাছে অপরিচিত। সে তাকে চেনে না। তার মনের কথা জানে না। তা জানার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। লোকটা নিজে থেকে না উঠলে তার নিস্তব্ধতাকে ভাঙ্গবে না সে। তার হাত দিয়ে কনির গাটাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর শুয়ে আছে লোকটা। তার ঘামে ভেজা গাটা কনির গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। কনির মনে হয়, লোকটার এই দেহগত নিস্তব্ধতাটা এক অপার মানসিক শান্তিরই প্রতীক।

লোকটা যখন কনির বুক থেকে উঠে গেল তখন সে তার মনের আসল ভাবটা জানতে পারল। সে কনির পোষাকগুলো পা থেকে টেনে কোমরের কাছে এনে জড়িয়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। নিজের পোষাকটা ঠিক করে নিল। তারপর নীরবে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে চলে গেল।

কনি উঠে দেখল বাইরে ওক গাছের মাথার উপর একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোন আলো নেই। উঠে পোষাকটা ঠিক করে নিয়ে ঘরের বাইরে এল।

সমস্ত বনস্থলী নিবিড় আঁধারে ঢাকা। কিন্তু মাথার উপরে আকাশটা বেশ পরিষ্কার। লোকটা সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা ছায়ার মত কনির কাছে এগিয়ে এসে বলল, এবার তাহলে যাবেন ত?

কনি বলল, কোথায়?

লোকটা বলল, আমি আপনার সঙ্গে বাড়ির গেট পর্যন্ত যাব।

লোকটা ঘরটায় চাবি দিয়ে সব কিছু ঠিক করে চলে এল কনির কাছে।

কনির পাশে পথ হাঁটতে হাঁটতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দুঃখিত নন এ বিষয়ে?

কনি বলল, না না, মোটেই না। তুমি নও ত?

সে বলল, এর জন্য? না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লোকটা আবার বলল, কিন্তু তার পরের কথাটা?

কনি বলল, কি পরের কথা?

লোকটা বলল, কেন, স্যার ক্লিফোর্ড। তারপর সমাজের আর পাঁচজন লোক। কত সব জটিলতা।

কনি হতাশ হয়ে বলল, কিসের জটিলতা?

লোকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে বলল, এ সব ব্যাপারে এই সব জটিলতা সব সময়ই দেখা দেয়। আপনার ও আমার দুজনের পক্ষেই জটিলতা দেখা দেবে।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এজন্য দুঃখিত?

লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, একদিক দিয়ে কিছুটা দুঃখিত হয়েছি বৈকি। আমি ভেবেছিলাম সব কিছুর শেষ হয়ে গেছে জীবনে। কিন্তু আবার নতুন করে শুরু করতে হলো।

কি শুরু হলো?

জীবন।

কথাটার প্রতিধ্বনি করে কনি বলল, 'জীবন!' কথাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছিল যেন।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, জীবন। কোন পরিত্রাণ নেই। আপনি যদি এই জীবন থেকে দূরে সরে থাকেন তাহলে আপনাকে মরতে হবে। তাই আমাকে নতুন করে শুরু করতে হলো।

কনি এ দিকটা তলিয়ে দেখেনি। তবু···

কনি আনন্দের সঙ্গে বলল, একে বলে ভালবাসা।

লোকটা বলল, তা যাই হোক।

এবার ওরা অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল। অবশেষে ওরা গেটের কাছে এসে পৌঁছল।

কনি বলল, কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা করো না ত?

লোকটা বলল, না না। কথাটা বলেই সে কনিকে তার বুকে জোরে আবেগের সঙ্গে চেপে ধরল। বলল, না মোটেই না। আমার এতে ভালই হয়েছে। ভাল খুব ভাল হয়েছে। আপনার?

কনি বলল, হ্যাঁ, আমারও হয়েছে।

কনির এ কথাটা কিন্তু পুরো সত্যি নয়। কারণ সে ঘটনাটার ভালমন্দ দিকগুলো এখনো তলিয়ে দেখেনি।

লোকটা কনিকে চুম্বন করল। তার সে চুম্বনের স্পর্শে এক মেদুর উষ্ণতা ছিল। সে হেসে বলল, পৃথিবীতে আর যদি কোন লোক না থাকত।

একথায় কনি হাসল। ওরা পার্কের গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা গেটটা খুলে দিল। সে বলল, আমি আর যাব না। আপনি যান।

কনি বলল, না তোমাকে আসতে হবে না। সে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দুটো নিজের দু হাতের মধ্যে ধরে নিল লোকটা। কনি বলল, আমি আবার আসব ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই।

কনি পার্কের মধ্যে ঢুকে পা চালিয়ে চলতে লাগল।

লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কনিকে অন্ধকারের মধ্যে চলে যেতে দেখল। একটা তিক্ততার ভাব জেগেছিল মনে। কারণ এই কনিই সেই বন্ধনে আবার আবদ্ধ করল তাকে যে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল সে। যে নারীসঙ্গ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চেয়েছিল এই কনিই তাকে সঙ্গ দান করে তার সেই ইপ্সিত নিঃসঙ্গতাটাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিল। যে লোক সম্পূর্ণ একা থাকতে চায় তার একাকীত্বকে কেড়ে নিতে চলেছে সে।

বনের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল লোকটা। চারিদিক নীরব নিঝুম। একেবারে নিস্তব্ধ। আকাশে জ্যোতিহীন যে একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছিল, তাও ডুবে গেছে। বাইরে থেকে শুধু স্ট্যাক গেট, এঞ্জিন আর বড় রাস্তায় গাড়ি চলার শব্দ আসছিল তার কানে। আস্তে আস্তে টিলার চড়াইটাতে উঠে গেল লোকটা। উপর থেকে সে তেভারশাল খনির আর স্ট্যাক গেটের আলো দেখতে পেল ছোট বড়। শূন্য অন্ধকার দিগন্তের নীরব পটভূমিকায় গরম চুল্লীর মুখে গলন্ত লোহার এক সোনালী আগুনের আভা দেখা যাচ্ছিল। এই অন্ধকার রাত্রির মাঝেও কোন এক শয়তান যেন এক অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ঐ খনি আর কলকারখানায় সব কাজ করে চলেছে। খনিতে তখন এক শিফটের কাজ শেষ করে একদল লোক বেরিয়ে আসছে।

সেখান থেকে নেমে আবার বনের অন্ধকার আর নির্জনতার মাঝে প্রবেশ করল সে। কিন্তু তার মনে হলো অন্ধকার বনভূমির এই নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা অর্থহীন হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। কলকারখানার একটানা অশান্ত শব্দে সে

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কলকারখানার তীব্র আলো উপহাস করছে এ বনের অন্ধকারকে। সে বেশ বুঝতে পারল আজকাল কোন লোক চেষ্টা করলেও নির্জনে কোথাও একা থাকতে পারে না। সারা জগতের মধ্যে নির্জন তপোবন বলে কোন বস্তু নেই। আজ তাকে আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নারীর সংস্পর্শে আসতে হলো। তার সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হতে হলো। তার মানেই সে আবার দুঃখ আর সর্বনাশের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিল। কারণ সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছে এ সবের প্রকৃত অর্থ কি।

এটা কিন্তু কোন নারীর দোষ নয়, প্রেমের দোষ নয়, কাম বা যৌন ব্যাপারের দোষও নয়। দোষ যা কিছু তা হলো বৈদ্যুতিক আলোর আর যন্ত্র-দানবের গর্জনের। দোষ যা কিছু তা হলো এই যান্ত্রিক লোভ আর লোভী যান্ত্রিকতার বা যন্ত্রসভ্যতার। দোষ হচ্ছে ঐ আলো, ঐ গলন্ত লোহা, আর ঐ যানবাহনের শব্দের। এই সব মিলিয়ে যা কিছু যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না তা সব ধ্বংস করে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা সবাই শীঘ্রই এ বনটাকেও ধ্বংস করে ফেলবে। এ বনে তখন আর নীল ব্লুবেল ফুল ফুটবে না। গলন্ত লোহার স্রোতে পৃথিবীর সব সূক্ষ্ম ও সুকুমার বস্তু বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যে নারীর সঙ্গে একটু আগে দেহসংসর্গে মিলিত হয়েছিল তার কথাটা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখতে লাগল লোকটা। আহা বেচারা! হায়, পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ এক নারী। সে জানে না, সে সুন্দর। এই নিদারুণ নিষ্করুণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়েও কত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। তার মনে হলো মেয়েটি আজকালকার মেয়েদের মত অত কড়া বা শক্ত নয়। হায়াসিনথ্ ফুলের মতই অনেকটা নরম। আহা বেচারী মেয়েটির জন্য দুঃখ হয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চাপ মেয়েটাকে শেষ করে দেবে। এইভাবে সব সুকোমল বস্তুকেই ওরা শেষ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। মেয়েটির মনটা সত্যিই নরম। ওর মধ্যে ওর নারীসত্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা নরম অংশ আছে যা হায়াসিনথ্ ফুলের মত, যা আজকালকার আধুনিকা মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে ও ওর সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে মেয়েটাকে কিছুদিন রক্ষা করে যাবে। হ্যাঁ, কিছুদিনই বটে, কারণ যতদিন মানস চেতনাহীন লোহার জগৎ আর যান্ত্রিক লোভটা এনে তাকে ও ওকে দুজনকেই একে একে গ্রাস না করে ততদিনই ও তাকে রক্ষা করে যেতে পারবে।

তার বন্দুক আর কুকুরটাকে সঙ্গে করে সে তার বাসায় চলে গেল। ঘরের ভিতর আগুন আর বাতিটা জ্বালাল। তারপর রুটি, মাখন, কাঁচা পিঁয়াজ আর মদ দিয়ে নৈশভোজন সারল। ঘরের মধ্যে সে একেবারে একা। এই একাকীত্বই তার একান্ত প্রিয়, একান্ত কাম্য। তার ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে আগুনটা সমানে জ্বলে যাচ্ছিল। সাদা কাপড়পাতা টেবিলটার উপর বাতিটার আলোও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। অন্যদিন

আগুনের ধারে বসে একটা বই পড়ে সে। আজও ভারতবর্ষের উপর একখানা বই পড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। আর মন বসল না। আজ ধূমপানও করল না। শুধু হাতের নাগালের কাছে এক মগ মদ রেখে আগুনের পাশটায় বসে শুধু কনির কথা ভাবতে লাগল একমনে।

সত্যি কথা বলতে কি, যা ঘটে গেল তার জন্য সে দুঃখিত বেশ কিছুটা। দুঃখটা বিশেষ করে হয় কনির জন্য। এক অজানিত শঙ্কায় পীড়িত হচ্ছিল তার মনটা। কোন পাপচেতনা, অন্যায়বোধ বা বিবেকের দংশন অনুভব করছিল না সে। কারণ সে জানে, বিবেক মানেই একটা ভয়—হয় সমাজের ভয় না হয় আপন আত্মার ভয়। সে নিজেকে বা তার আত্মাকে ভয় করে না, তার একমাত্র ভয় এ ব্যাপারে শুধু সমাজকে। আপন অভিজ্ঞতা আর অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে জেনেছে সমাজ প্রধানত অপ্রকৃতিস্থ, বিকৃতমনা এবং অপকারী।

আবার সেই নারী। তার কথাই ভাবছিল সে। হায়, এই নারী যদি তার কাছে এই ঘরে থাকতে পেত। আর কেউ কোথাও যদি না থাকত। সমস্ত জনপদ ও জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা যদি দুজনে এক জায়গায় বাস করতে পারত। যৌন উত্তেজনার রূপ ধরে কামনার আবেগটা উদ্বেল হয়ে উঠল আবার তার মধ্যে। এক জীবন্ত পাখির মত উড়ু উড়ু হয়ে উঠল তার উত্থিত যৌনাঙ্গটা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই অবৈধ দেহ-সংসর্গের ব্যাপারটা বাইরে লোক সমাজে প্রকাশিত হয়ে পড়ার একটা ভয় পীড়িত করতে লাগল তার মনটাকে। যে ভয় ঐ বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকটিত, যন্ত্রের বিরামহীন গর্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সেই ভয়-ই এক বোঝা হয়ে চেপে ঝুলছে তার মনের উপর। কনি একজন বয়স্ক মহিলা হলেও তার কাছে যেন এক কুমারী তরুণী; এমনই এই তরুণী কুমারী, এক প্রথম পুরুষরূপে যার মধ্যে উপগত হয়েছে সে এবং যাকে সে আবার কাছে পেতে চায়।

আজ চার বছর ধরে সে কোন নারীর সংস্পর্শ হতে দূরে একা একা বাস করে আসছে। আজ চার বছর ধরে কোন কামনার আবেগ জাগেনি তার মধ্যে। দীর্ঘদিন পর নারীসংসর্গের ফলে আবার কামনা জাগল তার মধ্যে। সে কামনার তাড়নায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। বন্দুক আর কুকুরটা সঙ্গে করে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। একদিকে দুর্বার কামনার আবেগ আর অন্যদিকে নিষ্ঠুর সমাজের এক ভয়—এই দুইএর তাড়নায় সারা অন্ধকার বনময় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই অন্ধকার ভালবাসে সে। এই অন্ধকারে নিজেকে আবৃত রাখতে চায়। এই আদিম অন্ধকার তার অশান্ত কামনার অসংযত আবেগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তার উত্থিত যৌনাঙ্গের এক আদিম চঞ্চলতার যেন অন্ত নেই, তার বিক্ষুব্ধ নিম্নাঙ্গের বর্বর উত্তাপের যেন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু এই সব চঞ্চলতা আর উত্তাপকে

এই হিমশীতল নৈশ বনান্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখে দিতে চায় যেন। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সমাজে যদি এমন কিছু সহৃদয় মানুষ থাকত যাদের সঙ্গে মিলে মিশে ওরা ঐ বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গে ঐ যন্ত্রদানবগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম করে যেতে পারত, ওদের সেই যৌথ সংগ্রামের দ্বারা ওরা যদি জীবনের সজীবতা ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারত আর ওদের কামনার সম্পদের উপযুক্ত মূল্য দান করার জন্য এই সভ্যতাকে বাধ্য করতে পারত। কিন্তু সেরকম কোন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের জগতে দেখা যাচ্ছে সমাজের সব মানুষই এই অবাঞ্ছিত যন্ত্রসভ্যতার সব উপাদানকে বরণ করে নিচ্ছে এক পরম গৌরববোধের সঙ্গে। এক উন্মত্ত কৃত্রিম ও যান্ত্রিক লোভ আর প্রলোভিত এক যান্ত্রিকতার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে তারা জীবনের সব কিছু সুকুমার ও স্বাভাবিক সজীবতার ঐশ্বর্যকে পদদলিত করে যাচ্ছে।

এদিকে কনি তাড়াতাড়ি পার্কের ভিতর দিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছল। তার মনে তখন কোন চিন্তাই ছিল না। কোন অনুচিন্তন বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না তার মনে। এখন সে বাড়ি গিয়ে তার নৈশভোজন সারবে। যথাসময়ে সে নৈশ ভোজনে অংশ গ্রহণ করবে।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে সদর দরজা বন্ধ দেখেই বিরক্ত হয়ে উঠল কনি। দরজায় ঘণ্টা বাজাল। মিসেস বোল্টন দরজা খুলে দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি তাহলে এসেছেন! আমি ত ভাবছিলাম আপনি হারিয়ে গেছেন। স্যার ক্লিফোর্ড অবশ্য আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার মনে হয় নৈশভোজনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই না কি?

কনি বলল, তাই মনে হয়।

মিসেস বোল্টনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল।

মিসেস বোল্টন বলল, খাওয়ার ব্যাপারটা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেব? আপনি তাহলে পোষাক ছাড়ার সময় পাবেন।

তাহলে ভালই হয়।

ক্লিফোর্ড তখন মিস্টার লিনলের সঙ্গে কথা বলছিল। লিনলে ছিল তাদের সব কয়লাখনির জেনারেল ম্যানেজার। উত্তরের লোক, বয়স হয়েছে। তবে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তেমন খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাবলী সম্বন্ধেও তেমন কোন ধারণা নেই। যুদ্ধোত্তর কালে শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে যে সব উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। তবু লোকটাকে কনির মোটামুটি ভাল লাগে। তবে তার স্ত্রীর কথার কচকচি মোটেই ভাল লাগে না তার। তার স্ত্রী সঙ্গে না আসায় একরকম বেঁচে গেছে কনি।

নৈশভোজন পর্যন্ত রয়ে গেল লিনলে। কনি গৃহিণী। এ বাড়ির পুরুষ

অতিথিরা সকলেই কনির এ গৃহিণীপনা ভালবাসে। তার আচরণ শুধু শোভন, ভদ্র ও মার্জিত নয়, সকলের সুখ সুবিধার প্রতি সমান সচেতন। তার মুখের এক মেদুর প্রশান্তি, আয়ত নীল চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝাই যায় কি ভাবছে সে ঠিক এই মুহূর্তে। এই সময় কনির দ্বৈত নারীসত্তা কাজ করে। এক সুদক্ষ সংবেদনশীল গৃহিণীর ভূমিকায় নিখুঁতভাবে অভিনয় করে যায় কনি। কিন্তু স্বরূপতঃ সে গৃহিণীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তার আসল নারীসত্তার মাঝে সে গৃহিণীর কোন অস্তিত্ব নেই।

অতিথি চলে না যাওয়া পর্যন্ত নিচের তলাতেই রয়ে গেল কনি। উপরে তার শোবার ঘরে গেল না। তার নিজের কোন কথা ভাবতে পেল না। অতিথিদের জন্য এইভাবেই অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত কনি। এটাই তার স্বভাব।

কিন্তু তার ঘরের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে কিছু ভাবতেই পারল না নিজের কথা। সে বুঝতেই পারল না কি সে ভাববে। আসলে লোকটা কি ধরনের? সে কি সত্যি সত্যিই তাকে পছন্দ করে? তবে খুব একটা বেশী বলে মনে হয় না। তবে লোকটার মধ্যে একটা সরল মমতা আছে। নারী-দেহের প্রতি একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আছে যে আগ্রহের বশবর্তী হয়েই এক আশ্চর্য অশ্লীল নিবিড়তার সঙ্গে সে তার যোনিদেশকে অনাবৃত করে ফেলে তার সামনে। অবশ্য যদিও সে অন্য যে কোন নারীর সঙ্গে সঙ্গমের সময় এটা সে করত তবু এটা ভাল লেগেছে কনির। কনি তার কাছে সামান্য এক নির্বিশেষ নারীমাত্র; তাকে সে বিশেষভাবে দেখে নি।

তা না দেখুক, তবু লোকটার কামপ্রবৃত্তি প্রবল। আর সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ কিভাবে করতে হয় তা সে জানে। সেক্ষেত্রে একই সঙ্গে তার দেহ মন দুটোই এক অখণ্ড জৈব চেতনায় যেমন নিবিড় তেমনি তৎপর। এইটাই ভাল। কনির মধ্যে যে নারী আছে তার প্রতিই তার সমস্ত আগ্রহ এক নিবিড় উত্তাপে ফেটে পড়েছে। এর আগে কোন পুরুষ তার নারীসত্তার প্রতি এতখানি আগ্রহের উত্তাপে ফেটে পড়েনি। তারা সবাই এর আগে তার এই নারীসত্তার প্রতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখিয়ে এসেছে। তারা তার পদমর্যাদাকে সম্মান দেখিয়ে এসেছে। তারা লেডি চ্যাটার্লি বা কনস্ট্যান্স চ্যাটার্লিকে শ্রদ্ধা ও মমতা জানিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা কেউ তার যোনিদেশ ও জঠরের প্রতি এত মমতা, এত আগ্রহ দেখায়নি। সে বিশেষ মমতার সঙ্গে তার স্তন-যুগল মর্দন করেছে, তার পাছায় হাত বুলিয়েছে।

পরের দিন বিকালে আবার বনে গেল কনি। তখন ধূসর হয়ে উঠেছে শেষ অপরাহ্নের আলো। হিজল গাছের পাতাগুলো সবুজ পারদের মত দেখাচ্ছিল। কনির মনে হচ্ছিল সমস্ত গাছগুলোর মধ্যে তাদের কুঁড়িগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক নীরব প্রস্তুতি চলছিল। এই সব বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে যে সবুজ প্রাণশক্তির অদৃশ্য তরঙ্গ গুঁড়ির ভিতর থেকে তার প্রতিটি শাখায় ও পাতায়

প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল, কনি আজ সেই তরঙ্গ নিজের দেহের মধ্যেও অনুভব করল। তার মনে হচ্ছিল, রক্তের মত লাল একটা ঢেউ তার বুকের ভিতর থেকে উঠতে উঠতে সমস্ত আকাশকে প্লাবিত করে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার নীল শূন্যের সীমাহীন বিশালতায়।

বনের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পৌঁছল কনি। কিন্তু লোকটা সেখানে ছিল না। আজ অবশ্য সে তাকে পুরোপুরি প্রত্যাশা করেনি। ভেবেছিল সে হয়ত থাকবে না। কনি ঘরটার বাইরে বসে বসে দেখতে লাগল খাঁচার ভিতর মুরগীগুলো বসে আছে আর ছানাগুলো ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। একসময় সে কিছুই দেখছিল না। শুধু প্রতীক্ষা করে যাচ্ছিল। প্রত্যাশা করে যাচ্ছিল নীরবে। এইভাবে শুধু সময় কেটে যাচ্ছিল। স্বপ্নের মত এক চেতনাহীন দীর্ঘতায় প্রলম্বিত হচ্ছিল সময়টা। তবু সে এল না। এ সময় সে আসে না। তাকে এখন চলে যেতে হবে, কিন্তু যেতে গিয়েও যেতে পারছিল না। তাকে জোর করে উঠতে হলো। এখন চায়ের সময়, তাকে যেতে হবে।

কনি বাড়িতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। সে ক্লিফোর্ডের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ড বলল, আবার বৃষ্টি পড়ছে?

কনি তার টুপীটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। খুবই সামান্য।

নীরবে চা ঢালতে লাগল কনি। মুখে কোন কথা বলল না। এক অনমনীয় কাঠিন্যে স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সে। লোকটার আশায় সে আবার গিয়েছিল সেখানে। সে দেখতে চেয়েছিল ব্যাপারটা স্বপ্ন না সত্যি।

ক্লিফোর্ড বলল, আজ কিছুটা শোনাব তোমায়?

তার মুখপানে তাকাল কনি। সে কি কিছু বুঝতে পেরেছে? সে বলল, বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত লাগে আমার। আমি এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার যা খুশি। তবে কোনরকম অসুস্থবোধ করছ না ত?

না, শুধু কিছুটা ক্লান্ত। বসন্ত কাল এলে এমনি আমার হয়। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কিছু খেলবে?

না, থাক।

ক্লিফোর্ডের কণ্ঠের মধ্যে এক অদ্ভুত সন্তোষ ফুটে উঠল। কনি তা বেশ বুঝতে পারল। যাই হোক, সে উপরতলায় তার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে দূর বড় রাস্তা থেকে আসা মিহি গলায় লাউড স্পীকারে বলা কথার যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেল। বেগুনি রঙের তার একটা পুরনো চাদর টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিটা সাদা কুয়াশার এক অবগুণ্ঠনের মত জড়িয়ে ছিল

পৃথিবীটাকে। সে আবরণ সত্যিই কেমন রহস্যময়। কোন ঠাণ্ডা ছিল না তার মধ্যে। পার্কের ভিতর দিয়ে যাবার সময় গরম করছিল কনির।

সমগ্র বনভূমি নিস্তব্ধ নিঝুম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে সেখানে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির এক কুয়াশাস্থলভ আস্তরণ, স্ফুটনোন্মুখ প্রাণের উত্তাপে উত্তপ্ত একরাশ ডিম, অর্ধস্ফুট কুসুমকলির অবদমিত উচ্ছ্বাস, অর্ধবিকশিত ফুলের সুবাসিত হাসি—সব মিলিয়ে তীব্র করে তুলেছে যেন এই সান্ধ্য বনভূমির রহস্যময়তাকে। সমস্ত পোষাক খুলে অনাবৃত উলঙ্গ দেহে দাঁড়িয়ে আছে যেন বড় বড় গাছগুলো।

বনের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে গিয়ে কনি দেখল তখনও সেখানে সে আসেনি। মুরগীর ছানাগুলো তাদের মার কাছে ঢুকে গেছে প্রায় সব। শুধু দু একটা দুঃসাহসী ছানা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে খাঁচাটার আশপাশে।

সে তাহলে এখনো আসেনি। হয়ত ইচ্ছা করেই আসেনি। অথবা হয়ত কোন কাজে আটকে পড়েছে। কনি একবার ভাবল সে তার বাসায় গিয়ে দেখবে।

তবু সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। চাবি দিয়ে ঘরের তালাটা খুলল সে। ঘরখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে কম্বলের উপর শুয়েছিল সেটা ভাঁজকরা অবস্থায় এক জায়গায় রাখা আছে। যেখানে সে শুয়েছিল সেখানে চেয়ার টেবিলটা আবার রাখা হয়েছে।

দরজার কাছে একটা টুলের উপর বসে রইল কনি। চারদিক কী অদ্ভুত-ভাবে নিস্তব্ধ। সাদা কুয়াশার মত গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিকণাগুলো তেমনি নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল। তেমনি তরঙ্গহীনভাবে বয়ে যাচ্ছিল বাতাস। কোথাও কোন শব্দ নেই। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপক নিস্তব্ধতা ও নৈঃশব্দের মধ্যেও প্রাণ আছে। নিরুচ্চার নিরুচ্ছ্বাস এক প্রাণশক্তির নিঃশব্দ প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল আপাতনিষ্প্রাণ বনভূমির অন্তরালে। সেই অমিত অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে এক একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষের মত দাঁড়িয়ে ছিল বড় বড় গাছগুলো।

রাত্রি আরো ঘন হয়ে উঠছিল। তাকে এবার চলে যেতে হবে। ইচ্ছা করে সে নিশ্চয় এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে।

হঠাৎ সে এসে গেল সেই ফাঁকা জায়গাটায়। চামড়ার কালো জ্যাকেটটা ছিল তার গায়ে। বৃষ্টির জল পেয়ে সেটা চকচক করছিল। ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা একটু নত করে একটুখানি অভিবাদন জানিয়ে সে মুরগীদের খাঁচাটার কাছে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে রাখল।

অবশেষে সব কাজ সেরে সে কনির কাছে এল। কনি তখনো সেইভাবে সেই টুলটার উপর বসেছিল। সে এসে কনির সামনে দাঁড়াল। সে বলল, আপনি তাহলে এসেছেন?

কনি তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল, হ্যাঁ।

কনি টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ভিতরে আসবে তুমি?

লোকটা কনির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, আপনি এভাবে রোজ এলে লোকে যা তা বলবে না?

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, কেন, আমি ত বলেছিলাম আমি আসব। কেউ জানে না এসব ব্যাপার।

সে বলল, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে সব জানবে। তারপর কি হবে?

কনি কোন উত্তর খুঁজে পেল না। পরে বলল, কেন তারা জানবে?

সে বলল, এসব কথা লোকে ঠিক জানতে পারে।

কনির ঠোঁটদুটো একটু কেঁপে উঠল। সে আমতা আমতা করে বলল, যাই হোক, আমি না এসে পারি না।

লোকটা গলার স্বরটা নিচু করে বলল, আপনি যদি চান তাহলে ঠিক আসা বন্ধ করতে পারেন।

কনি বলল, না, আমি তা চাই না।

লোকটা বনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অবশেষে আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু লোকে যদি জানতে পারে? একবার ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন তখন কত ছোট আপনি হয়ে যাবেন? আপনার স্বামীর সামান্য একজন চাকর আমি।

তার নিস্পৃহ মুখটার পানে আবার তাকাল কনি। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আসলে তুমি আমাকে চাও না। তাই নয় কি?

লোকটা আবার সেই একই কথা বলল, একবার ভেবে দেখুন যদি লোকে জানতে পারে, যদি স্যার ক্লিফোর্ড জানতে পারে? যদি সবাই একথা বলাবলি করতে থাকে?

ঠিক আছে আমি তাহলে পালিয়ে যেতে পারব।

কোথায়?

যেখানে হোক। আমার টাকা আছে। আমার মা আমার জন্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড গচ্ছিত রেখে গেছে। ক্লিফোর্ড সে টাকা ছুঁতে পারবে না। আমি তা নিয়ে দূরে যেখানে হোক পালিয়ে যেতে পারি।

লোকটা বলল, কিন্তু আপনি নিশ্চয় চলে যেতে চান না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চাই। আমি কোন লোকনিন্দা গ্রাহ্য করি না।

আপনি বলছেন বটে, কিন্তু আপনাকে একদিন গ্রাহ্য করতে হবে। সবাইকে তা করতে হয়। আপনি মনে রাখবেন ম্যাডাম, আপনি সামান্য একজন শিকার রক্ষকের সঙ্গে প্রেম করছেন। তার মানে আমি ভদ্রলোক নই। আপনাকে একদিন লোকনিন্দা গ্রাহ্য করতেই হবে।

আমি করব না। আমার উপাধির সম্মান বা মর্যাদা আমি চাই না। আমি জানি লোকে যখন আমাকে লেডি বলে সম্বোধন করে তখন তাদের কণ্ঠের মধ্যে বিদ্রূপের ভাব ফুটে ওঠে। হ্যাঁ সত্যিই তাই। এমন কি তুমিও বিদ্রূপের সঙ্গে একথা উচ্চারণ করো।

আমি ?

এবার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কনির মুখপানে তাকাল লোকটা। বলল, আমি আপনাকে কখনো উপহাস করিনি।

সে দেখল কনির পানে তাকাতে গিয়ে সে যেন চোখে অন্ধকার দেখছে। সে বলল, এইভাবে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভয় হয় না ?

তার কণ্ঠে সতর্কতাসূচক এক অনুনয়ের ভাব ছিল।

কনি বলল, ভয় আমি কেন করব ? আমার কোন কিছু হারাবার ভয় নেই। তুমি যদি জানতে আমার কথা তাহলে বুঝতে কত খুশি আমি এতে হব। তুমি কি ভয় পেয়ে গেছ ?

সে বলল, হ্যাঁ আমি ভয় করি। সমাজের ভয়, লোকনিন্দার ভয়।

কনি বলল, কিন্তু আসল ভয়টা কিসের ?

সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, কত কি বাধা।

সহসা সে নত হয়ে কনির মুখে চুম্বন করল। তারপর বলল, না, আমিও কোন কিছু গ্রাহ্য করি না। আমরা যা করার করে যাব। চুলোয় যাক সব। তবে আপনি যেন আপনার কৃতকর্মের জন্য কোন অনুশোচনা না করেন পরে।

কনি বলল, আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিও না।

কনির গালে আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে আবার চুম্বন করল তাকে। বলল, তাহলে ঘরে যাই চলুন। আপনার চাদরটা খুলে ফেলুন।

এরপর সে বন্দুকটা ঝুলিয়ে রেখে তার জ্যাকেটটা খুলে কম্বলটা মেঝের উপর পেতে দিল। বলল, আমি আর একটা কম্বল এনেছি। দরকার হলে ঢাকা দেব।

কনি বলল, আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। সাড়ে সাতটায় রাতের খাওয়া হবে।

লোকটা তার হাতঘড়িটা দেখে বলল, ঠিক আছে।

এই বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা লণ্ঠনটা জ্বালল। বলল, একবার আমরা অনেকক্ষণ থাকব।

এরপর সে কনির দেহটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে তার পোষাকটা খুলে দিল। একটা পেটিকোট ছাড়া আর কিছুই রইল না কনির সারা দেহের মধ্যে। কনির কোমর আর পাছার উপর হাত বোলাতে বোলাতে সে বলল, এই জায়গাটা ছুঁতে কী মজা। তারপর মাথা নত করে কনির পেট আর ছুটো জানুর উপর তার গালটা ঘষতে লাগল। তার এই আনন্দ দেখে

আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। কনি বুঝতে পারল না, তার এই ঐ সব গোপনাঙ্গের মধ্যে লোকটা কী এমন সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে যা আনন্দের এমন এক গভীর আবেগ জাগাতে পারল তার মধ্যে। তার এই ধরনের শৃঙ্গারে কনির মধ্যেও কামনার আবেগ জেগে ওঠে। দুর্বার কামনার এই আবেগ যেখানে মরে যায় অথবা অনুপস্থিত থাকে কোন কারণে, যেখানে দুটি দেহের নিবিড় স্পর্শ ও ঘর্ষণজনিত উত্তাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক মধুর সৌন্দর্য দুর্বোধ্য ও অননুভূত রয়ে যায়। এ সৌন্দর্য যে কোন দৃশ্যমান সৌন্দর্যের থেকে গভীর। যতই সে তার গালটা কনির পেট জানু আর জঙ্ঘার উপর ঘষতে লাগল ততই এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কনির হাঁটু দুটো। তার অনাবৃত নিম্নাঙ্গের মধ্যে এক অদ্ভুত কম্পন অনুভব করছিল সে। লোকটার এই ধরনের শৃঙ্গারের আতিশয্যে সত্যিই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল কনি। এই ধরনের শৃঙ্গারের মধ্য দিয়ে তার নারীদেহের এক অতলান্তিক রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাইছে যেন সে। তবু কনি যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

অবশেষে লোকটি যখন কনির উপর উপগত হলো, একই সঙ্গে এক শ্রম ও তৃপ্তিসূচক অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তার দেহের রহস্যে ডুবে গেল, কনি তখনো কিন্তু কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল। তখনো সে একটা বিচ্ছিন্নতা, একটা ব্যবধান অনুভব করছিল লোকটার সঙ্গে। লোকটা তার সারা অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে থাকলেও সে একাত্ম হয়ে উঠতে পারছে না তার সঙ্গে। হয়ত এই নিবিড় দেহসংসর্গের অন্তরালে এক মানসিক বিচ্ছিন্নতাই সে চায়। এইটাই হয়ত তার বিধিনির্দিষ্ট। কনি এ ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে নিথর হয়ে শুয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে সব কিছু অনুভব করতে লাগল কনি। লোকটার দ্রুতগতি অঙ্গসঞ্চালন, তার যৌনাবেগের গভীরতা, বীর্যস্খলন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রবল বিকম্পন—আপন অঙ্গের মধ্যে একে একে সব অনুভব করল কনি। সহসা লোকটার অঙ্গসঞ্চালনের গতিটা মন্থর হয়ে যায়। সব পুরুষেরই তাই হয়। যে কোন রতিক্রিয়াকালে বীর্যস্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সব পুরুষেরই যৌন তৎপরতা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে। আর তখন তাদের সেই স্তিমিতপ্রায় তৎপরতা হাস্যাস্পদ মনে হয় কনির কাছে। তখন যে নারী সেই রতিক্রিয়ায় তাদের সঙ্গিনী হয় তার কাছে তাদের পাছার ক্লান্তস্তিমিত ওঠানামা আশ্চর্য রকমের হাস্যকর বলে মনে হয়। ঠিক এই সময় যে কোন নারীর কাছে যে কোন পুরুষ হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

কনি তবু কোনরূপ সক্রিয়তা দেখাল না। লোকটার যৌন তৎপরতা একেবারে শেষ হয়ে গেলেও কনি তার চরম তৃপ্তিলাভের জন্য কোনরূপ তৎপরতা দেখাল না। মাইকেলিসের সঙ্গে সঙ্গমকালে যা সাধারণতঃ সে করত। তার দুচোখ জলে ভরে এল এবং চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল।

লোকটাও কনির উপর স্থির হয় শুয়ে রইল। কনির দেহটাকে শক্ত করে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার নগ্ন পাগুলোকে নিজের পা দিয়ে চেপে সেগুলোকে গরম করার চেষ্টা করে শুয়ে রইল লোকটা।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল কনিকে, আপনার শীত লাগছে?

লোকটা কত কাছে রয়েছে কনির। দেহগত নিবিড়তার এক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাদের দুটি অঙ্গ। তবু কনি তার কাছ থেকে মনে মনে কত দূরে।

কনি উত্তর দিল, না, আমাকে এখনি চলে যেতে হবে।

লোকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কনিকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল। তারপর আবার তার উপর শান্তভাবে শুয়ে পড়ল। কনির চোখের জল সে দেখতে পায়নি। তার মানসিক ব্যবধানটা ধরতে পারেনি। সে ভেবেছিল কনি একাত্ম হয়ে আছে তার সঙ্গে। তার দেহটার মত তার মনটাকেও পেয়ে গেছে তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

কনি আবার বলল, আমাকে এবার যেতে হবে।

এবার সে উঠে পড়ল কনির বুক থেকে। তার জঙ্ঘাদুটোর মাঝখানে নরম জায়গাটায় একবার চুম্বন করল। তারপর তার পোষাকটা টেনে ঠিক করে দিল। এবার নিজে দাঁড়িয়ে কনির সামনেই পোষাকটা পরল।

অবশেষে সে কনিকে বলল, একবার আমার বাসায় আসুন।

কনির মুখপানে আন্তরিকতার এক উত্তাপ নিয়ে সহজভাবে তাকাল সে।

কনি তবু কোন কথা বলল না। কোন নড়াচড়া করল না। শুধু স্থির হয়ে তেমনি করে শুয়ে রইল। মনে মনে বলতে লাগল, ও আজও আমার কাছে বিদেশীমাত্র। একজন বিদেশী। লোকটার উপর কিছুটা রাগও হলো তার।

লোকটা এদিকে পোষাক পরে টুপী মাথায় দিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে কনিকে বলল, চলুন। কনির পানে তেমনি সহজ আন্তরিকতার ভঙ্গিতে তাকাল।

ধীরে ধীরে উঠে বসল কনি। তার যেতে ইচ্ছা করছিল না। আবার থাকতেও বিরক্তিবোধ হচ্ছিল।

লোকটা তাকে ধরে উঠিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল। বাইরে তখন ঘন ঘোর অন্ধকার। তার কুকুরটা দরজার বাইরে বসেছিল এতক্ষণ। তার প্রভুকে বার হতে দেখে খুশি হলো সে। বাইরে তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল।

লোকটা বলল, লণ্ঠনটা সঙ্গে নিই, এখন কেউ কোথাও নেই।

সে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে কনির আগে আগে সরু পথটা দিয়ে চলতে লাগল। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় শুধু পথের দুপাশের ভিজে ঘাস আর বড় বড় গাছগুলোর ভিজে কালো কালো গুঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। এ ছাড়া আর সব কিছুই

নিবিড় নিঃসীম অন্ধকার আর কুয়াশায় ভরা।

লোকটা আবার বলল, আমার বাসায় একদিন আসবেন।

কথাটার এই পুনরাবৃত্তি কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল কনির কানে। তাদের মধ্যে যখন এখনো কোন সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠেনি, তার কথা যখন কনি ঠিকমত বুঝতে পারে না তখন লোকটা বার বার তার বাসায় যেতে বলছে কেন? তাছাড়া সে কথাটা এমনভাবে বলছে যাতে মনে হচ্ছে সে যেন যে কোন এক নারীকে সম্বোধন করে বলছে, কনি নামে বিশেষ কোন নারীকে বলছে না কথাটা।

লোকটা বলল, এখন সোয়া সাতটা বাজে।

ওরা ততক্ষণে পার্কের গেটের কাছে উঁচু চড়াটার কাছে এসে পড়েছে। লোকটা বলল, এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে।

সে আলোটা নিবিয়ে দিল। হাত দিয়ে কনির গাটাকে জড়িয়ে ধরল আলতোভাবে।

আলোটা নিবিয়ে দিতেই ভীষণভাবে ঘন হয়ে উঠল চারদিকের অন্ধকারটা। সেই অন্ধকারের চাপে রহস্যময় ঠেকতে লাগল তাদের পায়ের তলার মাটিটা। কিন্তু লোকটা তাতে অভ্যস্ত। এই অন্ধকারে বনপথের মধ্য দিয়েই হেঁটে যাবে ও। কিন্তু কনির অসুবিধা হতো বলেই ও তাকে ইলেকট্রিক টর্চটা দিল। ও বলল, পার্কের ভিতর অন্ধকারটা অনেক পাতলা। তবু যদি ভয় লাগে তাই এই আলোটা রেখে দাও।

পার্কের ভিতরে সত্যিই অন্ধকারটা কম দেখাচ্ছিল। কারণ সেখানে তথাকথিত উন্নতির ভুতুড়ে আলোর কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে। সহসা লোকটা সবেগে কনিকে চেপে ধরল বুকের উপর। তার জামার ভিতর হাতটা চালিয়ে দিয়ে তার গরম গাটায় হাত বোলাতে লাগল। বলল, আপনার মত মেয়েকে স্পর্শ করার জন্য আমি মরতে পারি। আর এক মিনিট যদি আপনি অপেক্ষা করতেন।

লোকটা তাকে চাইছে। তাকে চাওয়ার জন্য তার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণের বেগ অনুভব করল কনি। তবু বলল, না, আমাকে যেতে হবে। আর দেরী করলে মোটেই চলবে না।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে 'ঠিক আছে' বলে কনিকে যেতে দিল। কনিও যাবার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু যেতে গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে মুখটা বাড়িয়ে বলল, আমাকে চুম্বন করো।

লোকটা হেঁট হয়ে কনির চোখের উপর একটা চুম্বন করল। কিন্তু সে তার মুখটা বাড়িয়ে দিল। লোকটা তখন তার মুখের উপর খুব আলতোভাবে একটা চুম্বন করল। কোন মেয়ের মুখে চুম্বন করতে সে চায় না। ঘৃণা বোধ হয় তার।

কনি এবার যাবার জন্য পিছন ফিরে বলল, আমি কাল আবার আসব। যদি পারি।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, বেশী দেরী করবেন না। এই বলে সেও পিছন ফিরে অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করল। কনি তাকে আর দেখতে পেল না।

কনি বলল, শুভরাত্রি।

লোকটাও উত্তর দিল, শুভরাত্রি ম্যাডাম।

কনি ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে বলল, ওকথা কেন বললে?

লোকটা সংশোধন করে বলল, ঠিক আছে শুভরাত্রি।

এবার অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেল কনি। বাড়ি পৌঁছে দেখল পাশের দিকের দরজাটা খোলা রয়েছে। সেইদিক দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল কনি। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজের মনে মনে বলল, আমাকে অবশ্যই স্নান করতে হবে। তবে আর দেরী করব না মোটেই। এটা সত্যিই বিরক্তিকর।

পরদিন আর বনে গেল না কনি। তার বদলে সে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আথওয়েট দিয়ে বেড়াতে গেল। ক্লিফোর্ড আজকাল প্রায়ই গাড়িতে করে বেড়াতে যায় এবং একজন শক্তিমান যুবককে ড্রাইভার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এই ড্রাইভার তাকে ধরে গাড়িতে উঠতে বা গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করতে পারে। আসলে ক্লিফোর্ড আজ তার ধর্মপিতা লেসলি উইন্টারকে দেখতে যাচ্ছিল। তিনি থাকেন আথওয়েটের অদূরে লিপলে হল নামে একটা জায়গায়। লেসলি উইন্টারের এখন বয়স হয়েছে। তিনি এখন কয়লাখনির ধনী মালিকদের অন্যতম। রাজা এডওয়ার্ডের আমলে উইন্টার প্রচুর উন্নতি করেন। একাধিকবার শিকার করতে গিয়ে রাজা এডওয়ার্ড লিপলে হলে ছিলেন। হলটা ছিল চমৎকার। চমৎকারভাবে সাজানো। লেসলি উইন্টার ছিলেন অবিবাহিত লোক। উইন্টার তাঁর বলার ভঙ্গিমার জন্য গর্ববোধ করেন। কিন্তু করলে কি হবে এই গোটা অঞ্চলটাই কোলিয়ারীতে ভরা। লেসলি উইন্টার ক্লিফোর্ডকে কিছুটা পছন্দ করলেও, তার ছবি প্রায়ই সচিত্র পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য তাকে শ্রদ্ধা করতেন না। উইন্টার ছিলেন রাজা এডওয়ার্ডের মত ও মনোভাবের লোক। তিনি সব সময় জীবনকে জীবন বলেই ভাবতেন এবং তাঁর মতে জীবনকে যারা উপভোগ করতে জানে বিচিত্রভাবে, তারাই মানুষ। লেসলি উইন্টার কনির প্রতি যথার্থ বীরের মত উদার ও সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, কনি মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু ক্লিফোর্ডের কাছে থেকে থেকে শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার জীবনটা। সে কোনদিন র‍্যাগবির কোন উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে পারবে না। তাঁর নিজেরও কোন উত্তরাধিকারী নেই।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। উইন্টার যদি একথা শোনে যে

ক্লিফোর্ডের সামান্য এক শিকার রক্ষক এসে তার সঙ্গে সহবাস করছে এবং তাকে তার বাসায় যেতে বলেছে তাহলে কি বলবেন উইন্টার? তিনি নিশ্চয় কনিকে ঘৃণা করবেন, তাকে হীন ভাববেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে যত সব আপাত-উদ্ধত শ্রমিকদের ঘৃণার চোখে দেখেন। কনি ঠিক অভিজাত সমাজের না হলেও তার অঙ্গলাবণ্যের মধ্যে একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। এটা নিয়তির দান। উইন্টার কনিকে 'প্রিয় বৎস' বলে ডাকত এবং কথায় কথায় তাকে অষ্টাদশ শতকের অভিজাত সমাজের মহিলাদের একটা ছবি তার সামনে ফুটিয়ে তুলত। এবং সেটা করা হত কনির অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কিন্তু কনি তখন ভাবছিল সেই লোকটার সঙ্গে তার সহবাসের কথা। লেসলি উইন্টার আর যাই হোক, তাকে এক স্বতন্ত্র মানুষ অর্থাৎ আর পাঁচজন থেকে পৃথক করে দেখে। তাকে আর পাঁচজন নারীর সঙ্গে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেখে না।

কনি সেদিন বা তার পরদিন বা তার পরদিনও বনে গেল না। লোকটা তাকে চাইছে, তাকে নিবিড়ভাবে কামনা করছে একথা যতই ভাবছিল ততই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু চতুর্থ দিন এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। দারুণভাবে অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন। তবু বনে গিয়ে তার সেই লোকটার কাছে তার নিয়াঙ্গটা খুলে দিতে মন উঠছিল না। বনে না গিয়ে কিভাবে সময় কাটাবে তা নিয়ে অনেক ভাবল সে। সে শেফিল্ড দিয়ে বেড়াতে যেতে পারে, কারো বাড়ি দিয়েও বেড়াতে যেতে পারে। কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হলো না তার। অবশেষে সে বেড়াতে বার হলো, কিন্তু বন দিয়ে নয় পার্কের উল্টো দিক দিয়ে পথটা ধরে মেয়ারহে দিয়ে বেড়াতে গেল। পার্কের অন্য দিকে লোহার গেটটা পার হয়ে চলে গেল কনি। কোন দিকে না তাকিয়ে একমনে এগিয়ে চলল। সে কি ভাবছে মনে তাই সে জানে না। পথের দুপাশের কোন বস্তুর প্রতি নজর ছিল না তার। সহসা একটা কুকুরের জোর চীৎকারে হুঁস হলো তার।

কনি দেখল, মেয়ারহে খামারে এসে পড়েছে সে। খামারটা শুরু হয়েছে ব্যাগবির সীমানাঘেরা বেড়াটার পাশ থেকে। খামারটা এত কাছে হলেও এদিকে বড় একটা আসে না কনি।

চিৎকার করতে থাকা বড় সাদা কুকুরটাকে কনি বলল, বেল, তুমি আমাকে ভুলে গেছ? তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?

কুকুরটা তেড়ে আসছিল কনিকে দেখে। কনি কুকুরকে ভয় করে। তার গলার শব্দ পেয়ে কুকুরটা সরে গিয়ে গর্জন করতে লাগল। কনি খামারটা পার হয়ে যেতে চাইছিল।

খামারবাড়ি থেকে মিসেস ফ্লিন্ট বেরিয়ে এল। মিসেস ফ্লিন্টের বয়সটা কনির মতই। আগে মাষ্টারি করত। কিন্তু কনির মনে হয় মেয়েটা একেবারে

অপদার্থ।

কনিকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল মিসেস ফ্লিণ্ট। বলল, ও, লেডি চ্যাটার্লি! বেল, বেল, তুই লেডি চ্যাটার্লিকে দেখে চীৎকার করছিস?

হাতে একটা সাদা কাপড় ছিল। তাই নিয়ে কুকুরটাকে তেড়ে গেল মিসেস ফ্লিণ্ট। তারপর কনির কাছে এল।

কনি বলল, ও আমাকে একদিন চিনত।

বেল ওকে সত্যিই চিনত। কারণ ফ্লিণ্টরা আগে চ্যাটার্লিদের প্রজা ছিল।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, নিশ্চয় চিনত। ও চেনে আপনাকে। তবে এমনি ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ও অনেক আগে দেখেছে আপনাকে। আশা করি আপনি ভালই আছেন?

কনি বলল, ধন্যবাদ। আমি ভালই আছি।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, আপনাকে আমরা সারা শীতটা দেখিনি। দয়া করে ভিতরে আসুন। আমাদের বাচ্চাটাকে দেখুন।

কনি কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিক আছে। মিনিট খানেকের জন্য যেতে পারি।

মিসেস ফ্লিণ্ট আগে ঘর পরিষ্কার করার জন্য ছুটে গেল বাড়ির ভিতরে। কনি ধীর গতিতে তার পিছু পিছু গেল। রান্না ঘরে কেটলিতে জল ফুটছিল।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, দয়া করে ভিতরে আসুন।

কনি গিয়ে দেখল বাচ্চাটা খুবই ছোট; তার বাবার মত মাথায় কটা বাদামী রঙের চুল। কনি দেখল বাচ্চাটা মেয়ে, কাঁথা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঘরের মধ্যে দশ বছরের একটা মেয়ে কনিকে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ছিল।

কনি বলল, বাঃ চমৎকার হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খুব ভাল মেয়ে হয়ে উঠবে।

মিসেস ফ্লিণ্ট বাচ্চাটাকে বলতে লাগল, জোসেফিন, দেখছ, কে তোমাকে দেখতে এসেছে—লেডি চ্যাটার্লি। তুমি জান লেডি চ্যাটার্লিকে?

মেয়েটার যখন জন্ম হয় তখন কনি ওদের একটা শাল আর খেলনার হাঁস দিয়েছিল।

তার মার কথা শুনে মেয়েটা কনির দিকে হাসিমুখে তাকাল।

কনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমার কাছে আসবে?

কনি তাকে দুহাত দিয়ে নিজের কোলে তুলে নিল। কচি ছেলে কোলে তুলে নিতে সত্যিই ভাল লাগে কনির। তার গাটা কত নরম, কেমন ঈষদুষ্ণ।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, আমি এক কাপ চা করছিলাম। লিউক বাজারে গেছে। খাবেন এক কাপ চা? আপনারা অবশ্য এ ধরনের চা খান না।

কনির খেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু অনুরোধে পড়ে খেল।

মিসেস ফ্লিণ্ট টেবিলটা ভাল করে পরিষ্কার করে ভাল কাপ বার করে যত্ন করে চা দিল কনিকে।

কনি বলল, তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

মিসেস ফ্লিণ্ট যখন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছিল কনি তখন ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। তার নরম ঈষদুষ্ণ গাটা টিপে অদ্ভুত এক জৈব আনন্দ লাভ করতে লাগল। এত ছোট্ট একটা প্রাণী, তবু কত নির্ভীক। অথচ বড় মানুষরা তার তুলনায় সব সময় কত ভীতু।

কনি এক কাপ কড়া চা, কিছু ভাল রুটি আর মাখন খেল। তার খাওয়া দেখে মিসেস ফ্লিণ্ট আনন্দের উত্তেজনায় এমনভাবে লাফাতে লাগল যাতে মনে হবে সে যেন এক বীর নাইট। খাবারের পর তারা দুজনে গল্প করতে লাগল।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, এ চা আপনাদের ভাল লাগবে না।

কনি বলল, সত্যি বলছি, বাড়ির চা থেকে কোন অংশে কম নয়।

কথাটা শুনে খুশি হলো মিসেস ফ্লিণ্ট। কনি এবার উঠে পড়ল। বলল, আমাকে এবার যেতে হবে। আমি কোথায় আমার স্বামী তা জানেন না। তিনি ভাববেন আমার জন্য।

মিসেস ফ্লিণ্ট হেসে বলল, আপনি এখানে এসেছেন একথা তিনি ভাবতেই পারবেন না।

কনি বাচ্চাটাকে বলল, 'বিদায় জোসেফিন!' এই বলে তাকে চুম্বন করল।

মিসেস ফ্লিণ্ট তালাবন্ধ দরজা খুলে দিতে চাইল। কিন্তু কনি বলল সে ওদের সামনের দিকের বাগানটার ভিতর দিয়ে যাবে। ছোট্ট বাগানটায় গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল কনির। কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে বাগানটাকে উজ্জ্বল করে। মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, কিছু ফুল নিয়ে যান।

মিসেস ফ্লিণ্ট কিছু ফুল তাকে দিতেই কনি বলে উঠল, থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, কোন দিকে যাবেন মনে করছেন?

কনি বলল, ওয়াবেনের গেট দিয়ে।

কিন্তু গেটটা বোধ হয় এখন তালাবন্ধ। আপনাকে উপর দিয়ে উঠে পার হতে হবে।

কনি বলল, আমি উঠতে পারব।

চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কিছুটা যাই।

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে একটা শূন্য প্রান্তরে এসে পড়ল। চারদিকে মানুষচলা পায়ের চাপে মাঠের ঘাস প্রায় সব উঠে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠটার আশেপাশে দু একটা গাছে ফিরে আসা পাখির দল তাদের একচ্ছত্র নৈশ আধিপত্যের কথা ঘোষণা করছিল কিচমিচ শব্দে। গরুর পাল ধীর গতিতে

বাড়ি ফিরছিল প্রান্তরটার উপর দিয়ে। একদল লোক একটা গরুকে তাকছিল।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, আজ গাই দোয়াতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওরা জানে লিউক হয়ত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন না হওয়া পর্যন্ত আসবে না।

ওরা দুজনে বেড়ার কাছে এসে পৌঁছল। বেড়ার ধার থেকে ফার গাছের বনটা ঘন হয়ে উঠেছে। মিসেস ফ্লিন্ট বলল, ঐটা শিকার রক্ষকের দুধের বোতল। আমরা এটা এখানে খালি রেখে যাই। ও একসময় এসে নিয়ে যায়।

কনি বলল, কখন আসে?

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, প্রায়দিন সকালে। ঠিক আছে চলি, বিদায় চ্যাটার্লি, দয়া করে আবার আসবেন। আপনি এলে খুব ভাল লাগে।

বেড়ার মাঝখানে গেটটা তালাবন্ধ থাকায় কনি বেড়াটা ডিঙ্গিয়ে পার হলো। ওপারে গিয়ে একটা সরু পথ ধরল সে। ওদিকে মিসেস ফ্লিন্ট তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

বনের এইদিকটা মোটেই ভাল লাগে না কনির। এদিকে বনটা দারুণ ঘন থাকায় এখানে তার মনে হয় শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। মনে হয় বনটা ভয়ঙ্কর। মিসেস ফ্লিন্টের বাচ্চা মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল কনি। তার মনে হলো মেয়েটার পা দুটো তার বাবার মত একটু বাঁকা হবে ধনুকের মত। সে যাই হোক, কচি ছেলের নরম তুলতুলে ঈষদুষ্ণ দেহটা কোলে তুলে নিতে বা বুকে ধরে টিপতে কত ভাল লাগে। এই জন্যই হয়ত মিসেস ফ্লিন্ট সন্তানগর্বে গরবিনী, আর এই জন্যই হয়ত সে মিসেস ফ্লিন্টকে ঈর্ষা না করে পারে না। যে সন্তান তার নেই এবং কোনদিন হবে না সেই সন্তানভাগ্যে মিসেস ফ্লিন্টকে ভাগ্যবতী দেখে একই সঙ্গে আনন্দ ও ঈর্ষা অনুভব না করে পারে না সে।

হঠাৎ সব চিন্তা ঝেরে ফেলে ভয়ে চিৎকার করে উঠল কনি। একটা মানুষ বনের মধ্যে তার পথের সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল লোকটা আর কেউ নয়, শিকার রক্ষক।

শিকার রক্ষকও কনিকে এখানে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠল। বলল, এখানে কি করে আসা হলো?

কনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি কেমন করে এলে?

আপনি কি কুঁড়েটায় গিয়েছিলেন?

না না, আমি মেয়ারহে গিয়েছিলাম।

তার অদ্ভুত সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল লোকটা, আপনি তাহলে কুঁড়েতে যাচ্ছেন ত?

কনি বলল, না না, আমি মেয়ারহেতে অনেকক্ষণ ছিলাম। আমি কোথায় আছি তা কেউ জানে না। আমাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

লোকটা মৃদু হেসে বলল, আমাকে এইভাবে ফাঁকি দিয়ে ?

কনি মুখটা লজ্জায় একটু নত করে বলল, না না, ঠিক তা নয়, শুধু—

সে বলল, তাছাড়া আর কি হতে পারে ?

লোকটা কনির খুব কাছে এসে তার কোমরে হাত রাখল। এমনভাবে সে কনির গা ঘেঁষে দাঁড়াল যে তার উত্থিত যৌনাঙ্গের জারজ উচ্ছ্বাসটা কনি বেশ অনুভব করতে পারল।

কনি বলল, এখন না। এই বলে কনি তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা জোর করে চেপে ধরে বলল, কেন না ? এখন মাত্র ছটা। আপনার যেতে সময় লাগবে মাত্র আধ ঘণ্টা। এখনও অনেক সময় আছে।

কনি বুঝতে পারল লোকটা দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কনির সমগ্র নারীসত্তাটা তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুদিকে যাচ্ছিল। একদিকে সে লোকটার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিল। কিন্তু আর একদিকে কোনরূপ বাধা দিতে না পেরে লোকটার কাছে বিলিয়ে দিতে চাইছিল নিজেকে অবাধে।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বলল, এখানে আসুন।

এই বলে সে কনির হাত ধরে কিছু কাঁটাগাছের পাশ দিয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল।

কনি একবার লোকটার দিকে তাকাল। দেখল, তার মুখটা কেমন কড়া হয়ে উঠেছে। কেমন যেন কামনায় কঠোর। সে মুখে ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। তবু কনি তার বুকের উপর কেমন যেন বোঝা অনুভব করল। সে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হলো।

কনিকে যে ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে গেল সেখানে কতকগুলো শুকনো গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল। এক জায়গায় তার থেকে দুটো ডাল ফেলে তার উপর নিজের কোট আর ওভারকোটটা পেতে তার উপর শুইয়ে দিল কনিকে। কনিকে ঠিকমত শুইয়ে দিয়ে তারপর তার নিম্নাঙ্গটা অনাবৃত করে দিল লোকটা। তার পর নিজের সামনের দিকটা অনাবৃত করল।

মুহূর্তমধ্যে লোকটার অনাবৃত দেহের নরম মাংসটা নিজের অঙ্গের মধ্যে অনুভব করল কনি। কনি আরও অনুভব করল লোকটার শক্তোত্থিত যৌনাঙ্গটা তার গর্ভদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রথমে নিশ্চল হয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর সজোরে অঙ্গ সঞ্চালন করতে লাগল লোকটা। এক সুনিবিড় রতিতৃপ্তির পুলকিত রোমাঞ্চের অসংখ্য ঢেউ খেলে গেল কনির সারা অঙ্গে। নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে পড়ে থাকলেও তার অজানিতেই তৃপ্তিসূচক এক শীৎকারধ্বনি বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে।

কিন্তু সে তৃপ্তি শুধু ক্ষণিকের জন্য। পুলকিত রোমাঞ্চের সে তরঙ্গের বেগ বড় ক্ষণভঙ্গুর। কনির মনে হলো, শিথিল হয়ে আসছে সেই যৌনাঙ্গের

সকল উচ্ছ্বসিত কাঠিন্য। তবু কনি তৎপর হলো না মোটেই। নিজের চরম তৃপ্তিলাভের জন্য একটুখানি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত সে। তৎপর হয়ে উঠতে পারত কিছুটা। কিন্তু কিছুই করল না কনি। শুধু এক তৎপরতাহীন নিষ্ক্রিয়তায় নীরবে শুয়ে থেকে সে তৃপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করে যেতে লাগল। অবশেষে কনি অনুভব করল লোকটা হয়ত উঠে পড়বে এখনি; চরম তৃপ্তি পাবার আগেই হতাশ হতে হবে কনিকে আর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি আসার দেরী নেই। আর এই কথাটা ভাবতে ও অনুভব করতেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা বেদনায় হিম হয়ে উঠল। তবু সে কিছুই করল না। একটুও তৎপর হল না। শুধু তার রসসিক্ত উন্মুক্ত গর্ভদ্বার তাকে চরম তৃপ্তিদানের জন্য নীরবে আহ্বান জানাতে লাগল লোকটার পুরুষাঙ্গটিকে। সে পুরুষাঙ্গটি যেন আবার নতুন উদ্যমে এক চরম রতিক্রিয়ায় মেতে উঠুক কনি এটা চায়। সহসা কনি লোকটাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল লোকটার শিথিল হয়ে আসা পুরুষাঙ্গটি ধীরে ধীরে আবার শক্ত হয়ে উঠছে তার মধ্যে। আবার সেই পুরুষাঙ্গটি এক উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত কাঠিন্যে এক ছন্দায়িত গতিশীলতায় সঞ্চালিত হতে লাগল তার জঠরাভ্যন্তরে। কনির জৈবচেতনার সব ফাঁক পূরণ করে দিয়ে, তার মনের মধ্যে মধুর সংবেদনের এক ঘূর্ণিচক্র সৃষ্টি করে, তার সমস্ত অনুভূতিকে নিঃশেষে বিগলিত করে তার গর্ভের গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে সঞ্চালিত হতে লাগল সেই জীবন্ত পুরুষাঙ্গটা। চুপচাপ শুয়ে রইল কনি। তার অস্তিত্বের গভীর হতে এক অব্যক্ত ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল অস্ফুটভাবে। যেন কোন সাধারণ শব্দ নয়, ধ্বনি নয়, নিথর নিস্পন্দ প্রাণহীন কোন রাত্রির গভীর হতে উঠে আসা এক নবজাত প্রাণের উল্লাস। এদিকে কনির গর্ভে লোকটার প্রাণবীর্য স্খলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন তার এক অশ্রুত ধ্বনি শুনতে পেল। বীর্য স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে লোকটা শিথিল হয়ে ঢলে পড়ল কনির বুকে আর কনি যে বাহুবন্ধনে লোকটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল সে বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। কনিও লোকটার মতই স্থির হয়ে পড়ে রইল। অবশেষে লোকটা হঠাৎ তার নগ্নতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সে উঠে পড়ল। কনি বুঝতে পারল তার বুকটা খালি আর শূন্য হয়ে পড়েছে। তার মনে হলো লোকটা যেন তার বুক জুড়ে যুগ যুগ ধরে শুয়ে থাকে, কোনদিন কখনো উঠে না যায়।

লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যিই উঠে গেল। কনিকে চুম্বন করে পোষাকটা তার উপর টেনে দিল। তারপর নিজে পোষাক পরল। কনি তবু উঠল না, যে গাছটার তলায় শুয়ে ছিল তার ডালপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কনি উঠতে পারছিল না। লোকটা পোষাক পরে চারদিকে তাকাল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় আরো স্তব্ধ হয়ে উঠেছে সমগ্র বনভূমি। শুধু লোকটার কুকুরটা থাবা গেড়ে বসে সব কিছু দেখছিল।

লোকটা কনির পাশে বসে তার একটা হাত ধরল। কনি কোন কথা বলল না। লোকটা বলল, কত লোকে এইভাবে চলে, তাদের কথা কেউ জানে না।

কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত কথাগুলো বলল। কনি তার এক ভাবময় বিষাদে ভরা মুখখানার পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

কিছু পরে কনি বলল, তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি খুশি ত?

লোকটা কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল, খুশি? হ্যাঁ তবে কিছু মনে করি না।

লোকটা চায় না এ বিষয়ে কনি কোন কথা বলুক। সে নীরবে নত হয়ে কনিকে আবার চুম্বন করল। কনির মনে হলো ও তাকে চিরকাল এইভাবে যেন চুম্বন করে যায়।

এবার উঠে বসল কনি। এক সরল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বলল, আচ্ছা প্রায় লোকই কি ভালবাসতে বাসতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?

বেশীর ভাগই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কথাটা না ভেবেই বলল সে। সে আবার নারীর সংসর্গে এসে পড়েছে, এ জন্য একটা ক্ষোভ ছিল তার কণ্ঠে।

কনি বলল, তুমি কি এইভাবে কোন মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছ?

লোকটা এ কথায় কৌতুক অনুভব করে বলল, আমি তা জানি না।

কনি জানত ও তাকে এসব কথা বলবে না। যে কথা ও বলতে চায় না সেকথা ও কিছুতেই বলবে না। কনি একবার তার মুখের দিকে তাকাল। তার প্রতি নিবিড় আসক্তির আবেগ তার পেটের ভিতর গিয়ে নাড়ীভুঁড়ী-গুলোকে জড়িয়ে ধরল। এ আবেগকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল কনি, কারণ এ আবেগের কাছে ধরা দেওয়া মানেই নিজের কাছে নিজেকে হারানো।

লোকটা তার কোট আর ওয়েস্টকোটটা পরে এগিয়ে চলল সেই পথটা দিয়ে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল বনস্থলীর উপর। লোকটা বলল, আমি আর আপনার সঙ্গে যাব না।

চোখে এক জ্বলন্ত তৃষ্ণা নিয়ে লোকটার পানে তাকাল কনি। লোকটার কুকুরটা তার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছিল। তার আর কিছু বলার নেই।

ধীর পায়ে বাড়ির পথে এগিয়ে চলল কনি। তার মনে হলো, একটা জ্বলন্ত গলন্ত প্রাণপ্রবাহ তার জঠরাভ্যন্তরে তার নাড়ীভুঁড়ীর মধ্যে দুরন্ত বেগে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তার পেটের মধ্যে এই নতুন প্রাণসত্তার জন্মের জন্য লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার। সারা পথ সে শুধু ভেবে যেতে লাগল লোকটার কথা। শ্রদ্ধাসিক্ত এক আসক্তির আঠায় মনটা সর্বক্ষণ জড়িয়ে আছে লোকটার প্রতি। সে অনুভব করল তার নিজের সমস্ত প্রাণমনও গলে গিয়ে যেন তার এই

জঠর আর নাড়ীভুঁড়ীর মধ্যে ঐ নতুন প্রাণসত্তার মত ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে অবিরাম এক চঞ্চল প্রবাহমানতায়। অন্যান্য সরলমনা মেয়েদের মত সেও যেন কেমন নরম হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল সহজলভ্যা। তার মনে হলো তার গর্ভের মাঝে সন্তান প্রবেশ করেছে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত তার গর্ভকোষের মধ্যে। এক নতুন প্রাণসত্তা সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে সে গর্ভকোষ। আজ সহসা তৃপ্ত হয়েছে যেন তার সুদীর্ঘ সঞ্চিত এক তৃপ্ত তৃষ্ণা।

আপন মনে ভাবল কনি, সত্যি সত্যিই এক সন্তানের জন্ম হত যদি আমার মধ্যে। একথা যতই ভাবতে লাগল সে ততই তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গলে যেতে লাগল। গলে জল হয়ে গেল যেন তার নারীসত্তার সমস্ত যুগান্ত-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত দৃঢ়তা। সহসা অদ্ভুত একটা কথা মনে হলো তার। যে কোন পুরুষের ঔরসেই গর্ভসঞ্চার হতে পারে যে কোন নারীর মধ্যে। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যখন কোন নারী তার একান্তবাঞ্ছিত ও আকাঙ্খিত পুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে তখন যে পুলকের রোমাঞ্চ ঢেউ খেলে যায় তার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা সত্যিই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তার জীবনে। সহসা এক আশ্চর্য পরিবর্তন তার মধ্যে লক্ষ্য করল কনি। সে বেশ বুঝতে পারল একটু আগে অর্থাৎ আজকের এই গোধূলিবেলার সহবাসের আগে সে যা ছিল এখন যেন সে আর তা নেই। যে নতুন প্রাণসত্তা লালিত হতে শুরু হয়েছে তার মধ্যে সেই প্রাণসত্তার এক বহুবাঞ্ছিত বোঝাভারের চাপে সে যেন ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে। প্রথম সৃষ্টির এক রক্ততরল অন্ধকারের যে অতলান্তিক গভীরে সব প্রাণ একদিন ঘুমিয়ে থাকে কনি যেন তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

এ কোন নতুন কামনার আবেগ বা প্রেমানুভূতি নয়, এ হচ্ছে এক শ্রদ্ধাসিক্ত ব্যাকুলতা যা এর আগে কখনো অনুভব করেনি কনি। এ ব্যাকুলতাকে ভয় করত কনি, কারণ আদিম যুগের বন্য নারীর মত ক্রীতদাসীর মত নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতে চায়নি সে, অবলুপ্ত করে দিতে চায়নি নিজের সত্তা আর তার স্বাতন্ত্র্যকে। সে কোন পুরুষের ক্রীতদাসী হবে না, কারো প্রতি ঐকান্তিক ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে সত্যিই ভয় করে সে। তবু এ ব্যাকুলতার বিরুদ্ধে এখনই কোন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে চায় না সে! তা ছাড়া সে ক্ষমতাও তার নেই। অবশ্য তার ইচ্ছাশক্তির মধ্যে এমন একটা শয়তানসুলভ প্রবণতা আছে যা দিয়ে তার পেট আর বুকের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকা সেই ব্যাকুলতার নরম উচ্ছ্বাসটাকে পিষে ফেলতে পারত। ইচ্ছা করলেই সে তা পারে। একটু চেষ্টা করলেই সে তার ইচ্ছার অধীনে মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারে তার সমস্ত কামনার আবেগকে।

তা এখন পারবে না সে। তার মানেই ব্যাকান্তে বা বেকানলের মত সে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে আওকাসের পিছু পিছু বনে বনে ঘুরে বেড়াবে। অথচ

এই আওকাস ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন এক বলিষ্ঠ লিঙ্গের ধারক। এক বিধি-নির্দিষ্ট কর্তব্য হিসাবে সেই লিঙ্গের দ্বারা নারীদেহের তোষণ করে যাওয়াই ছিল তার কাজ।

পুরনো কামনার যে নব জাগরণ ঘটল কনির মধ্যে তার আবেগে উত্তাপে উন্মত্ত হয়ে উঠল সে। তার কাছে মানুষটা হারিয়ে গেল, তার সব ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখন তার একমাত্র পরিচয় সে এক বলিষ্ঠ লিঙ্গের ধারক আর বাহক। তার কাজ ফুরিয়ে গেলেই তাকে সে খণ্ড বিখণ্ড করে উড়িয়ে দেবে, কোথায় নস্যাৎ করে দেবে। সে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক অমিত শক্তি অনুভব করল। এক ভয়ঙ্করী নারীশক্তি পুরুষকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে ক্রোধ আর কামনার উন্মত্ত অনলে। কিন্তু একথা ভাবতে গিয়ে বুকটা ভারী হয়ে উঠল তার। এটা সে চায় না। তার থেকে সেই ব্যাকুলতা, আসক্তির সেই নিবিড়তা অনেক ভাল। এ ব্যাকুলতা তার পরম সম্পদ। এ ব্যাকুলতা কত মেদুর, কত গভীর, কেমন অব্যক্ত। না না, তার চেয়ে সে তার নারীসত্তার সমস্ত দৃঢ়তা সমস্ত অনমনীয়তাকে সঁপে দেবে। এ দৃঢ়তার বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে। অনেক দুঃখ ভোগ করেছে সে এর জন্য।

এবার এক নতুন প্রাণরসে অভিস্নাত হবে সে। যে ব্যাকুলতা তার সমস্ত আন্তরযন্ত্রে ইন্দ্রজালের মত অশ্রুত ধ্বনিতে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সে ব্যাকুলতাকে সারা অঙ্গে জড়িয়ে তার আপন গর্ভের গভীরতার মধ্যে ডুবে যেতে চায় সে। এখন থেকে লোকটাকে এত ভয় করার কিছু নেই।

বাড়ি গিয়ে ক্লিফোর্ডকে বলল কনি, আমি মেয়ারহে দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং মিসেস ক্লিন্টের সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। ওদের বাচ্চাটাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। মেয়েটা দেখতে চমৎকার হয়েছে। মাথায় লাল মাকড়সার জালের মত চুল। মিস্টার ক্লিন্ট বাজারে গেছে তাই আমি আর মিসেস ক্লিন্ট দুজনে মিলে বাচ্চাটাকে নিয়ে চা খেলাম। আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা নিয়ে তুমি ভাবছিলে নাকি?

ক্লিফোর্ড বলল, ভাবছিলাম ঠিক, তবে আবার ভাবলাম তুমি নিশ্চয় কোথাও কারো বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে চা খাচ্ছ।

একটা চাপা ঈর্ষা ছিল ক্লিফোর্ডের কণ্ঠে। তার চর্মচক্ষের বাইরে এক বিশেষ চক্ষের দৃষ্টি কনিকে দেখে তার হাবভাবের মধ্যে যেন এক নূতনত্বের সন্ধান পেল। কিন্তু সে নূতনত্ব বড় দুর্বোধ্য ঠেকল তার কাছে। তবে এক মদির আবেশের রহস্যময় আবরণে ঢাকা সে নূতনত্বের একটামাত্র অর্থই করতে পেরেছে ক্লিফোর্ড। তা হলো সন্তান কামনা। তার সন্তান নেই এই দুঃখের দ্বারাই সবচেয়ে পীড়িত হয় কনি। তার সেই সন্তানের জন্যই হয়ত ব্যস্ত হয়ে

পড়েছে সে।

মিসেস বোল্টন তাকে বলল, আমি আপনাকে পার্কের ভিতর দিয়ে লোহার গেট দিয়ে যেতে দেখেছি। তাই ভাবছিলাম আপনি হয়ত পার্কে গেছেন।

ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হলো মেয়ারহের দিকে চলে গেলাম তার বদলে।

দুই নারীর দৃষ্টি মিলিত হলো। মিসেস বোল্টনের দৃষ্টি ধূসর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আর সন্ধানী; কনির সুন্দর নীল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মিসেস বোল্টন এ বিষয়ে নিশ্চিত যে কনির একজন প্রেমিক আছে। কিন্তু কে সেই প্রেমিক, কোথায় সে থাকে তা এখনো ধরতে পারেনি।

মিসেস বোল্টন বলল, খুব ভাল কথা, বাইরে গিয়ে এইভাবে মানুষের সঙ্গে মিশবেন। আমি স্যার ক্লিফোর্ডকে বলছিলাম ম্যাডাম যদি এইভাবে বাইরে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মেশেন তাহলে তাঁর শরীর মন ভাল হবে।

কনি বলল, হ্যাঁ ক্লিফোর্ড, বাচ্চাটাকে দেখে আমি সত্যই খুশি হয়েছি। ওর চুলগুলো কী সুন্দর, ঠিক লাল মাকড়সার জালের মত। ওর গালগুলো ফুলো ফুলো আর চোখগুলো নীল। বাচ্চাটা মেয়ে বলেই খুব সাহসী। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের থেকেও সাহসী আর নির্ভীক।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, ঠিক যেন ছোট মিসেস ফ্লিণ্ট।

কনি বলল, তুমি একবার দেখবে ক্লিফোর্ড? তোমার দেখার জন্য আমি ওদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি।

এক নিবিড় অস্বস্তির সঙ্গে কনির পানে তাকিয়ে ক্লিফোর্ড বলল, কে?

মিসেস ফ্লিণ্ট আর তার বাচ্চাটা। সোমবার।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তাদের নিয়ে তোমার ঘরে চা খাবে।

কনি বলল, কেন, বাচ্চাটাকে দেখতে চাও না তুমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখব, কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে চা খেতে পারব না।

ক্লিফোর্ডের পানে ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে কনি শুধু বলল, ওঃ। কনি যেন এত কাছে থেকেও ক্লিফোর্ডকে দেখতে পাচ্ছে না; ক্লিফোর্ডের পরিবর্তে দেখছে অন্য এক মানুষকে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি আপনার ঘরে ওদের নিয়ে আরাম করে চা খাবেন ম্যাডাম। আর মিসেস ফ্লিণ্টও স্যার ক্লিফোর্ডের থেকে আপনার কাছেই বেশী সহজ হয়ে চা খেতে পারবে।

কনি যে একজনকে ভালবাসে এ বিষয়ে নিশ্চিত মিসেস বোল্টন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেন তার সমগ্র অন্তরাত্মা। কিন্তু কে সেই লোক? হয়ত মিসেস ফ্লিণ্ট এ বিষয়ে তাকে কোন হদিশ দিতে পারে।

আজ সন্ধ্যায় কনি আর স্নান করবে না। লোকটার বাঞ্ছিত ও একান্তপ্রিয়

যে পৌরুষস্পর্শ তার দেহগাত্রে এখনো আঠার মত লেগে আছে, স্নান করলে সে স্পর্শ ধুয়ে যাবে মুছে। আজ সে স্পর্শ পবিত্র বলে মনে হলো তার।

আজ ক্লিফোর্ড কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। কনি একা থাকতে চাইছিল, কিন্তু ক্লিফোর্ড আজ তাকে খাওয়ার পর ছাড়বে না। কনি তার পানে তাকাল। আজ তার দৃষ্টির মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত এক নম্রতা ছিল।

তেমনি অস্বস্তির সঙ্গে ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল কনিকে, আজ কোন খেলা করবে অথবা আমি কোন বই পড়ে শোনাব? অথবা কি হবে বল।

কনি বলল, তুমি বরং কোন কিছু পড়।

কি পড়ব? কবিতা না গল্প রচনা, না নাটক?

তুমি বরং রেসিন পড়।

আগে আগে ফরাসী ভাষায় বড় সুন্দর করে চমৎকারভাবে রেসিন পড়ত ক্লিফোর্ড। কিন্তু আজ তার পড়ার মধ্যে আগেকার সেই উদ্যম নেই। আজ সে সব ভুলে পড়ার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে পারছে না। ক্লিফোর্ড যখন পড়ছিল কনি তখন সেলাই করতে লাগল। তারই পোষাকের কাপড় কেটে মিসেস ফ্লিণ্টের বাচ্চা মেয়েটার জন্য একটা ফ্রক তৈরি করছিল। ক্লিফোর্ড জোরে পড়ে গেলেও কনি একমনে সেলাই করে যাচ্ছিল। ক্লিফোর্ডের পড়ার কোন কথা তার কানে যাচ্ছিল না।

বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনির এক শব্দময় রেশের মত তার মধ্যে দগ্ধাবশিষ্ট কামাবেগের এক নতুন উত্তাপ অনুভব করল কনি।

আগে প্রথমে রেসিন সম্বন্ধে কিছু বলল ক্লিফোর্ড। কনি তার সব কথা বলা শেষ হলে সব কথা না শুনেও তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চমৎকার।

কনির উজ্জ্বল নীল চোখের পানে তাকিয়ে আবার ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। এক শান্তমেদুর স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে বসে বসে সেলাই করছিল কনি। ক্লিফোর্ডের মনে হলো এতখানি স্তব্ধ ও মেদুর এর আগে কখনো দেখায়নি কনিকে। তাকে দেখে এতখানি মুগ্ধ এর আগে কখনো হয়নি ক্লিফোর্ড। তার মোহ থেকে কোন মতেই আজ মুক্ত করতে পারল না সে। কনির দেহগাত্র হতে বিচ্ছুরিত এক অজানা গোপন গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে তার মন। তাই মন্ত্রমুগ্ধের মত সমানে পড়ে চলল সে। তার গলার গম্ভীর আওয়াজটাকে চিমনির মুখের কাছে প্রবাহিত বেগবান বাতাসের মতই মনে হচ্ছিল কনির। কনি শুধু তার কণ্ঠের আওয়াজটা শুনছিল, রেসিন সম্বন্ধে বলা একটা কথাও বুঝতে পারছিল না।

বসন্তের সবুজ গাছে গাছে ফুটে ওঠা ফুলের কুঁড়ির মত এক মেদুর সুবাসিত উল্লাসে ফুলে ফুলে উঠছিল কনি। যেদিকেই তাকাচ্ছিল সেইদিকেই সে যেন দেখতে পাচ্ছিল এক নামহীন নগ্ন পুরুষ এক জীবন্ত জননাঙ্গের উদ্ধত গৌরবে

গর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে দর্পিত পদভরে। শুধু বাইরের জগতে নয় তার দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় যেন সেই নামহীন পুরুষ আর তার ঔরসজাত সন্তানের এক রক্তনিবিড় অস্তিত্বকে অনুভব করল কনি।

কনির হঠাৎ মনে হলো তার যেন হাত পা নাক কান কিছুই নাই। মনে হলো সে হয়ে উঠেছে এক সুজটিল অরণ্য! ক্রমস্ফীয়মান অসংখ্য কুসুমের উচ্ছ্বাসে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে তার অন্তরাত্মা। অসংখ্য কামনার পাখি ঘুমিয়ে আছে যেন তার দেহের শাখাপ্রশাখায়।

ক্লিফোর্ড তবু পড়ে চলল। কণ্ঠের উত্থানপতনের জন্য কত রকমের বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল। সত্যিই ক্লিফোর্ডকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সত্যিই বড় অদ্ভুত। বইএর উপর ঝুঁকে পড়ে বই পড়ছে, কত ভদ্র ও সুসভ্য ও মার্জিত দেখাচ্ছে। তার কাঁধগুলো কত চওড়া অথচ তার সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য পা নেই। কী অদ্ভুত এক প্রাণী, পাখিদের মতই তীক্ষ্ণ ও অনমনীয় এক ইচ্ছাশক্তি আছে তার। কিন্তু কত হিমশীতল! একটুও উত্তাপ নেই তার মধ্যে। আসলে সে এমনই এক প্রাণী যার আত্মা বলে কোন জিনিস নেই, আছে শুধু অতিমাত্রায় সতর্ক ও সতত সচেতন এক হিমশীতল এষণা বা ইচ্ছাশক্তি।

ক্লিফোর্ডকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল কনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল তার মধ্যে অতি মেদুর উত্তপ্ত যে প্রাণ আজ সদ্য জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে, সে প্রাণ ক্লিফোর্ডের থেকে অনেক বেশী বলিষ্ঠ। সে সব ঘটনা তার অগোচরে ঘটে গেছে তার কিছুই জানে না সে।

পড়া শেষ হলো। কনি চমকে উঠল। ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকিয়ে আবার চমকে উঠল সে। দেখল ক্লিফোর্ড তার ম্লান চোখের এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে। এক স্পষ্ট ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে সে চোখের দৃষ্টিতে।

কনি তবু শান্ত নরম কণ্ঠে বলল, অশেষ ধন্যবাদ, তুমি কিন্তু রেসিন চমৎকারভাবে পাঠ করো।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি যতখানি তার প্রতি মনোযোগ দাও ততটাই তার পড়া চমৎকার লাগে। তুমি ওটা কি তৈরি করছ?

আমি একটা শিশুর পোষাক তৈরি করছি। মিসেস ফ্লিণ্টের বাচ্চার জন্য।

মুখটা ফিরিয়ে নিল ক্লিফোর্ড। শুধু সন্তান আর সন্তান। এইটাই তার একমাত্র দুশ্চিন্তা।

ক্লিফোর্ড উদাসীনভাবে বলল, রেসিনের মধ্যে যে যা চায় তা সব পায়। বিক্ষুব্ধ আবেগ আর অনুভূতির থেকে সাজানো সুসংবদ্ধ ও মার্জিত আবেগানুভূতি অনেক ভাল।

কনি তার দিকে বিস্ফারিত চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।

ক্লিফোর্ড আবার বলল, আধুনিক সভ্যতায় মানুষের বল্গাহীন অসংযত

আবেগ কুৎসিত কদর্য পথে ছুটে চলেছে। এখন সংযম দরকার।

কনি বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তার মনে হলো শূন্য দৃষ্টিতে রেডিওর দিকে মুখ করে বসে যে সব আবেগ-সর্বস্ব বাজে কথা শুনেছে তারই ফলে এই ধারণা হয়েছে তার। কনি বলল, লোকে আবেগ বা অনুভূতির কথা মুখে বলে, কিন্তু আসলে তারা কিছু অনুভব করে না। তাদের অনুভূতির মধ্যে কোন গভীরতা নেই। এই না থাকাটাই তাদের কাছে রোমান্টিক।

ক্লিফোর্ড বলল, সত্যিই ঠিক তাই।

আসল কথা, ক্লিফোর্ড আজ কেমন ক্লান্তি অনুভব করছে। আজকের সারা সন্ধ্যাটা কনির কাছে বই পড়ে কাটাতে গিয়ে অকারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। এর থেকে সে যদি কারিগরী বিদ্যার কোন বই পড়ে বা খনি-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে অথবা রেডিও শুনে সন্ধ্যাটা কাটাত তাহলে সে এমন করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত না। দেহমন এমন অকারণে ভারী হয়ে উঠত না।

মিসেস বোল্টন ক্লিফোর্ড আর কনির জন্য এক গ্লাস করে যবের গুঁড়ো মেশানো দুধ নিয়ে এল। ক্লিফোর্ডের এতে ঘুম ভাল হবে। আর কনি আরো মোটা হবে। রোজই আজকাল এটা ওরা খায়।

দুধের গ্লাসটা শেষ করে ট্রের উপর রেখে ট্রেটা নিয়ে উঠে পড়ল কনি। দরজার কাছে গিয়ে ক্লিফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, শুভরাত্রি ক্লিফোর্ড। রেসিন সুখস্বপ্নের মত তোমার নিদ্রাকে জড়িয়ে থাক।

রাত্রির মত বিদায় নেবার সময় ক্লিফোর্ডকে চুম্বন না করেই চলে গেল কনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্লিফোর্ড তার পানে একবার তাকাল। সারা সন্ধ্যেটা সে বই পড়ে তার সঙ্গে কাটিয়েছে। তবু সে যাবার সময় একবার চুম্বন করল না। যদিও এ চুম্বন নিছক একটা প্রথাগত ব্যাপার এবং এতে কোন আন্তরিকতা নেই, তবু সব দাম্পত্যজীবনই এই প্রথার উপর নির্ভরশীল। আসলে কনি হচ্ছে একজন বলশেভিক। তার গোটা মন আর প্রবৃত্তির কাঠামোটা একই ধাঁচে গড়া। এই কথা ভাবতে ভাবতে কনির চলে-যাওয়া পথটার দিকে রাগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল সে।

রাত্রিটা কিভাবে কাটাবে তা ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড। যখন তার হাতে কোন কাজ থাকে না, যখন সে কোন কিছু মন দিয়ে শোনেও না, যখন তার মনটা কোন কর্মোদ্যমে ভরে থাকে না, তখন স্নায়বিক দুর্বলতার একটা বিরাট জাল তার মনের গোটা কাঠামোটাকে ঢেকে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এক অকারণ উদ্বেগ আর আসন্ন শূন্যতার এক ভয়ঙ্কর আভাস গ্রাস করতে আসে তাকে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। তবে আবার ভাবল, যতই হোক কনি কিছুতেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে না। না, কিছুতেই যাবে না। আসল কথা ও উদাসীন। ও তার জন্য কত কি করেছে,

তার সারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তার কাছে। তবু ওর প্রতি সে কত নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। সে শুধু নিজের পথে চলতে চায়, নিজের স্বার্থ বুঝতে চায়। মেয়েটা শুধু তার স্বাধীন ইচ্ছাকে ভালবাসে। এ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না।

এখন আবার কনির মাথায় শুধু একটা চিন্তাই ঘুরছে। একটা ইচ্ছাকেই সে লালন করে চলেছে মনের নিভৃতে। তা হলো সন্তান। কিন্তু সে সন্তান হবে যেন একান্তভাবে তারই। তাতে ক্লিফোর্ডের কোন ভাগ থাকবে না, কোন অধিকার থাকবে না।

ক্লিফোর্ডের স্বাস্থ্যটা আগের থেকে ভাল হয়েছে। তার মুখে একটা লাল আভা দেখা দিয়েছে। তার কাঁধগুলো চওড়া এবং বলিষ্ঠ। তার গায়ে মাংস গজিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে সে। একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা হাঁ করে গ্রাস করতে আসছে যেন, আর সেই শূন্যতার বিশাল গহ্বরে তার সব প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছে। সব প্রাণশক্তি হারিয়ে মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে যেন মরে গেছে।

আর ঠিক তখনি তার আয়ত ম্লান চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি ফুটে ওঠে। নিষ্ঠুরতায় হিমশীতল সে দৃষ্টি, তথাপি কেমন যেন এক লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যের ভাব। তার দৃষ্টির শূন্যতায় আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠা এই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের ভাবটা দেখে মনে হয় সে যেন জীবনে হেরে গিয়েও জয়লাভ করতে চাইছে জীবনের উপর। সে যেন এই কথাটাই বলতে চাইছে, সে কামনার সব রহস্য জানে, সে দেবদূতদেরও হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সারারাত্রি ধরে ভয়টা তার কিছুতেই যায় না আর তাই সে ঘুমোতেও পারে না। চারদিক থেকে মৃত্যুর ভয়টা এমনভাবে ছুটে আসে যে সে সহ্য করতে পারে না। প্রতিটি রাতে তাই তার মনে হয় এই ভাবে প্রাণহীনভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

তবে সে কিন্তু মিসেস বোল্টনকে যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতে পারে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে এসেও পড়বে। সে তার ড্রেসিং গাউন পরে আর কুমারী মেয়েদের মত বাদামী চুলের বিনুনি ঝুলিয়ে এসে ঘরে ঢুকবে। তার সেই বাদামী চুলের বিনুনিতে এখন কিছু কিছু পাক ধরেছে। ঘরে এসে মিসেস বোল্টন হয় চা না হয় কফি করে। তারপর দাবা না হয় পিকেত খেলতে বসে। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলেও দাবা সে ভালই খেলে। তারপর মিসেস বোল্টন যখন বিছানার ধারে একটা চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলতে থাকে ক্লিফোর্ড তখন বাতিটা পাশে নিয়ে বই হাতে শুয়ে থাকে। সেই বাতিটা হতে বিচ্ছুরিত আলোর একটা উজ্জ্বল বৃত্ত রচিত হয় তাকে কেন্দ্র করে। আর সে তাতে ডুবে যেতে থাকে। তারই কাছে থেকে মিসেস বোল্টন ধীরে ধীরে চলে যায় এক গভীর ঘুমের রাজ্যে আর সে চলে যায় এক ভয়ের রাজ্যে। এইভাবে সারারাত

ধরে ওরা দুজনে খেলা করে যায়। আর মাঝে মাঝে দুজনে কফি আর বিস্কুট খায়। কিন্তু ওদের চারদিকে ঘনিয়ে থাকা নৈশ স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ওরা কেউ কোন কথা বলে না। তবু ওরা মনে মনে পরস্পরকে আপন ভেবে একটা নীরব নিরুচ্চার সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

আজ রাতে মিসেস বোল্টনের নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই কথাটা। তার মানে কিনা লেডি চ্যাটার্লির ভালবাসার মানুষটি কে হতে পারে। আর এই কথাটা ভাবতে গিয়ে অনেক আগে মরে যাওয়া তার স্বামী টেডের কথাটাও মনে পড়ে গেল। আজও তার মনে হয় টেড মরে নি। টেডের কথাটা মনে পড়লেই তার মালিকদের বিরুদ্ধে তার সেই পুরনো প্রতিহিংসার কথাটাও জেগে ওঠে নতুন করে। মনে হয় তারাই টেডকে মেরেছে। অবশ্য এ চিন্তাটা তার আবেগপ্রবণ মনের ক্রিয়াও হতে পারে। আসলে সে শূন্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী।

আধো ঘুম আর আধো জাগরণের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে তার টেডের কথা আর লেডি চ্যাটার্লির অজানা প্রেমিকের কথাটা এক করে মিশিয়ে ফেলল মিসেস বোল্টন। সঙ্গে সঙ্গে কনির মতই তার মনেও ক্লিফোর্ডের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা একসঙ্গে দুজনে পিকেট খেলছে। ছয় পেন্স বাজি রেখে জুয়া খেলছে। এ খেলায় মিসেস বোল্টন সাধারণতঃ হেরে গেলেও তাতে গৌরব আছে কারণ সে একজন ব্যারনের সঙ্গে খেলতে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এটাই যথেষ্ট। এতে ছয় পেনি হারলেও তার কোন ক্ষতি নেই।

তাস খেললেই তারা জুয়া খেলে। খেলতে খেলতে সব কিছু ভুলে যায় ক্লিফোর্ড। সাধারণত সব খেলাতেই সে জেতে। আজ রাতেও সে জিতছিল। তাই নেশা ধরে গিয়েছিল খেলায়। তাই সে ঘুমোল না। দেখতে দেখতে ভোর সাড়ে চারটে বেজে গেল। তারপর শুল ক্লিফোর্ড।

কনি এদিকে সারারাত গভীরভাবে ঘুমোল। কিন্তু শিকার রক্ষক সারারাত একেবারেই ঘুমোতে পারল না। সব কাজকর্ম সেরে মুরগীর খাঁচা সামলে নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর বাসায় ফিরে গিয়ে রাতের খাওয়া সারল। কিন্তু খাওয়ার পর বিছানায় না গিয়ে আগুনের পাশে বসে ভাবতে লাগল।

প্রথমে সে ভাবল তেভারশালে কাটানো ছেলেবেলার কথা, তারপর ভাবল তার পাঁচ ছ বছরের বিবাহিত জীবনের কথা। এই প্রসঙ্গে তার স্ত্রীর কথা ভাবতে গিয়ে মনটা তিক্ততায় ভরে উঠল। তার স্ত্রীর প্রকৃতিটাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো। তবে ১৯১৫ সালের বসন্তকালের পর থেকে তাকে আর দেখতে পায়নি সে। এখন তার স্ত্রী যেখানে থাকে সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র বিশ মাইলের বেশী হবে না। তবু দেখা হয় না। না হওয়াই ভাল। তাকে আজকাল আগের থেকে আরো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবনে তার মুখদর্শন

করতে চায় না সে।

এরপর লোকটা তার বিদেশে কাটানো সামরিক জীবনের কথা ভাবতে লাগল। এই সময় ভারত, মিশর এবং শেষে আবার ভারতেই ফিরে যায় সে। প্রথমে তাকে ঘোড়া নিয়ে থাকতে হত। তারপর সেই সদাশয় কর্ণেল যিনি তাকে খুব ভালবাসতেন, তাঁর দয়াতেই সে অফিসার হয়। লেফটন্যান্ট থেকে তার ক্যাপ্টেন হবারও সম্ভাবনা ছিল। তারপর নিউমোনিয়া রোগে সেই কর্ণেলের হঠাৎ মৃত্যুতে সব ওলট পালট হয়ে যায়। সে নিজে কোন রকমে বেঁচে যায়। তারপর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। আবার চাকরি করতে শুরু করে।

জীবনের সঙ্গে যেন আপোষ করে চলতে শুরু করে। সে এখানে চাকরি নেবার সময় ভাবে এই বনের আরণ্যক পরিবেশে নিরাপদে থাকতে পারবে সে। এখন আর শিকার হয় না; এখন শুধু তাকে পাখি আর মুরগীগুলো পুষতে হয়, পালন করতে হয়। আর তাকে বন্দুক নিয়ে শিকারের কোন কাজ করতে হবে না। আসলে সে যেন তার জীবন থেকেই দূরে পালিয়ে এসেছে। এইটাই যেন তার জন্মস্থান। তার মা অবশ্য এখনো আছে, কিন্তু তার জীবনে তার মার প্রভাব খুব একটা নেই। আজ তার জীবনে কোন আশা নেই, কামনা নেই, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আজ সে শুধু কোনরকমে তার দেহগত অস্তিত্বটা দিনের পর দিন বজায় রেখে চলেছে। সে জানে না সে নিজেকে নিয়ে কি করবে, কোন পথে চলবে।

অফিসার থাকাকালে অন্যান্য অফিসার ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে জীবনের সব উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে সে। তাদের ছেলে পরিবার আর জীবনযাত্রা প্রণালীর সব কিছু দেখে শুনে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের ব্যাপার দেখে সব উচ্চাশা ত্যাগ করে সে। একেবারে নিস্পৃহ হয়ে ওঠে জীবনে।

তাই কিছুদিনের জন্য অফিসার হিসাবে সমাজের এক উঁচুস্তরে ওঠার পর সব কিছু দেখে শুনে ভয় পেয়ে আবার সে তার আগেকার জীবনের নিচু স্তরে নেমে এসেছে। মাঝখানে যে কয় বছর সে বাইরে কাটায় তার মধ্যে জীবনের যত কিছু নোংরামি আর সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়েছে সে। জীবনে সদাচারণের গুরুত্ব কতখানি তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে। জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারে যত নজর না দেওয়া যায় ততই ভাল। তবে সে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন কপটতা নেই।

তার উপর আর একটা জিনিস ভাল লাগে না তার। তা হলো বেতন নিয়ে ঝগড়া। তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বেশ বুঝেছে বেতন নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন শেষ নেই, সীমা নেই। তাই সে বেতন নিয়ে কোন মাথাই ঘামায় না।

অবশ্য যারা গরীব যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের বেতন নিয়ে অনেক সময় বাধ্য হয়ে মাথা ঘামাতে হয়। কিন্তু অবস্থার তাড়নায় বেতন নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে টাকার চিন্তাটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয় তাদের জীবনে। আজ এই টাকার চিন্তাটা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্যান্সারের মতই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। আজ তাই ও টাকার কথা একেবারেই ভাবতে চায় না।

কিন্তু এর পরিণাম কি? জীবন থেকে টাকার কথাটা বাদ দিলে আর কি থাকে? কিছুই না।

তবু সে একা একা সব কিছু বাদ দিয়ে সব কিছুই ভুলে গিয়ে বেশ থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, তার এই নিঃসঙ্গ জীবনে, সীমাহীন একাকীত্বে সে সুখী, সে তৃপ্ত। কিন্তু একটা জিনিসের মানে সে বুঝতে পারছে না। প্রাতরাশের পর যে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেয়, মোটা মোটা শিকারী লোকগুলো তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। সব ব্যাপারটাই অর্থহীন। সারবত্তাহীন।

কোন কিছুই নিয়ে যখন সে মাথা ঘামায় না, কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না তখন এমন চিন্তা ভাবনারই বা প্রয়োজন কি? সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না এবং কোন কিছু ভাবত না সে যদি না এই নারী তার জীবনে এসে না জুটত। এই নারীর থেকে সে দশ বছরের বড়। অভিজ্ঞতার দিক থেকে সে তার থেকে যেন হাজার বছরের বড়। জীবনের বিচিত্র দিক ও সব সে দেখেছে। এই নারী ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে তার জীবনে। এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের সম্পর্ক গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠবে আরো এবং হয়ত একদিন তাদের একসঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে। ভালবাসার বাঁধন সহজে ছেঁড়া যায় না।

কিন্তু তারপর? তবে কি নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে তাকে? সে কি এই নারীকে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে? সে কি তবে এই নারীর পঙ্গু স্বামীর সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হবে? আবার তার যে স্ত্রী তাকে ঘৃণা করে সেই স্ত্রীর সঙ্গেও কি বিবাদ বাঁধাবে? আবার দুঃখ। যে দুঃখকে এড়িয়ে যেতে চায় জীবনে আবার সেই দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়া। এ ব্যাপারে যে তিক্ত ও কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাতে ও নিজে ও এই নারী দুজনেই আঘাত পাবে।

যদি তারা স্যার ক্লিফোর্ড ও তার নিজের স্ত্রীর কবল থেকে কোনরকমে মুক্তও হয় তাহলে কি করবে তারা শেষ পর্যন্ত? কি করবে কে জানে? যা কিছু হোক একটা কিছু করতে হবে। সে পুরুষ হয়ে একটা মেয়ে মানুষের টাকায় সারা জীবন কাটাতে পারে না। আর সে নিজে যা সামান্য মাইনে পায় তাতেও তাদের চলবে না।

আবার সেই সমাধানের অতীত এক সমস্যা। একটা মাত্র উপায় আছে

সে শুধু আমেরিকা চলে যাবার কথাটা ভেবে দেখতে পারে। সেখানে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

কিন্তু এভাবে বসে বিশ্রাম করতে পারল না, আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমোতেও পারল না। রাত্রি দুপুর পর্যন্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত এইভাবে বসে বসে ভাবার পর উঠে পড়ল সে। তারপর তার কোট আর বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তার কুকুরটাকে বলল, চলে আয় ল্যাস, আমরা বরং বাইরেই ভাল থাকব।

আকাশে সে রাতে অসংখ্য তারা ছিল, কিন্তু চাঁদ ছিল না। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল সে। এখানকার পথঘাট সব তার চেনা। অন্ধকারে পথ চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার। শুধু স্ট্যাক গেট কোলিয়ারির লোকদের দ্বারা খরগোসের জন্য পাতা ফাঁদগুলো পায়ে লাগছিল।

সারা বনটা একপাক ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। প্রায় পাঁচ মাইলের পথ। সেই টিলাটার উপরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একমাত্র কোলিয়ারির অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। কয়লাখনির সারবন্দী বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। সারা পৃথিবীটা এক নিরন্ধ্র অন্ধকারের তলায় গা ঢাকা দিয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার সে অন্ধকার সে ঘুম বার বার বিদ্ধ হচ্ছে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন আর লরীর শব্দে আর চুল্লীর জ্বলন্ত আগুনে। এ জগৎ হচ্ছে যত সব কয়লা, লোহা আর অন্তহীন লোভলালসার নিষ্ঠুর কাঠিন্যে ভরা আর সেই কাঠিন্যের আঘাতে নৈশ পৃথিবীর সব ঘুম সব শান্তি শান্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

দারুণ ঠাণ্ডা। লোকটা কাশছিল। হিমেল কনকনে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল টিলাটার উপর দিয়ে। সহসা কনির কথাটা জেগে উঠল তার মনে। আজ এই মুহূর্তে সে যদি সেই নারীর নরম দেহটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একটা কম্বলের মধ্যে দুজনে শুতে পারত তাহলে তার বিনিময়ে সে তার জীবনের সব কিছু দিতে পারত। সেই নারীকে যদি একবার সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে ঘুমোতে পারত তাহলে সে তার অতীতের সমস্ত লব্ধবস্তু ও অন্তহীন ভবিষ্যতের সমস্ত আনন্দের পশরা তুলে দিতে পারত, অকুণ্ঠভাবে ত্যাগ করতে পারত। তার মনে হলো সেই নারীর কাছে শোয়াটাই হলো তার সারা জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। একমাত্র কামনা।

সে তার বাসায় গিয়ে মেঝের উপর কম্বল ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু দারুণ শীত লাগছিল। তাই ঘুম এল না। তাছাড়া তার একাকীত্বটাকে তার জীবনের একটা বিরাট অপূর্ণতা এক বিরাট ত্রুটি বলে মনে হলো। মনে হলো একমাত্র সেই নারীর নিবিড় সঙ্গ, আর দেহগত সান্নিধ্যই দূর করে দিতে পারে তার নিঃসঙ্গতাজনিত সকল অপূর্ণতাকে।

উঠে পড়ে সে পার্ক গেটের দিকে এগিয়ে চলল প্রথমে। তারপর ধীর

গতিতে কনিদের বাড়ির দিকে। তখন রাত চারটে বাজে। তবু তখনো ফর্সা হয়নি। ভোর হয়নি। কিন্তু অন্ধকারে অভ্যস্ত বলে পথ চিনে এগিয়ে যাচ্ছিল স্বচ্ছন্দে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। কনিদের বাড়িটা চুম্বকের মত আকর্ষণ করছিল তাকে। আসলে সেই নারীর কাছে যেতে চাইছিল ও। এটা কোন সাধারণ কামনা বাসনা নয়, এটা তার নিঃসঙ্গতাজনিত এক অপূর্ণতাবোধ। যে অপূর্ণতা দূরীভূত করার জন্য এক নীরব নিরুচ্চার নারীদেহের নিবিড় আলিঙ্গন দরকার। ঐ বাড়ির কাছে গেলে হয়ত তাকে দেখতে পাবে সে। হয়ত সে তাকে কাছে পাবে। অথবা তার কাছে যাবার জন্য কোন পথ খুঁজে পাবে। যে প্রয়োজন অমোঘ, নিষ্ঠুরভাবে অপরিহার্য তাকে পরিতৃপ্ত করতেই হবে।

আর একটু এগিয়ে বাড়ির সামনে পাতলা হয়ে আসা ভোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বীচ গাছ দেখতে পেল। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা। শুধু স্যার ক্লিফোর্ডের নিচেরতলার ঘরটায় একটা আলো জ্বলছিল। কিন্তু কোথায় সেই নারী, কোন ঘরে থাকে সে? যে নারী অন্য এক প্রান্ত থেকে সুতো ধরে তাকে দুর্বার বেগে টানছে, নিষ্ঠুরভাবে টানছে সে নারী এ বাড়ির কোন ঘরে থাকে?

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাড়িটা এবার স্পষ্ট ও দৃশ্যগোচর হয়ে উঠেছে অনেকখানি। এবার সে নারীকে ঠিক দেখা যাবে। কুশলী চোরের মতই এক আশ্চর্য চাতুর্যে ও এক অবাধ নিষ্ঠায় নিবিড় হয়ে আছে।

তখনো দাঁড়িয়ে রইল সে সেইভাবে। দেখতে দেখতে চারদিক ফর্সা হয়ে উঠল। বাড়ির সব আলো নিবে গেল। কিন্তু সে দেখতে পায়নি এর মধ্যে মিসেস বোল্টন একবার ক্লিফোর্ডের ঘরের জানালার কালো সিল্কের পর্দাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে দেখেই ভিতরে চলে যায়। ক্লিফোর্ড তখনো বুঝতে পারেনি সকাল হয়েছে কিনা। সকাল হলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

ঘুম-জড়ানো চোখে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল মিসেস বোল্টন। ক্লিফোর্ডের কোন আদেশের প্রতীক্ষায় ছিল। সহসা একবার চোখ খুলে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকাতেই চমকে উঠল সে। প্রায় চীৎকার করে উঠল এক অপার বিস্ময়ের আতিশয্যে। কারণ একটা লোক আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে চোখদুটো খুলে আবার তাকাল মিসেস বোল্টন। হ্যাঁ, ঠিকই দেখছে লোকটাকে। কিন্তু পাছে স্যার ক্লিফোর্ড জেগে ওঠে তাই কোন শব্দ করল না।

প্রথমে লোকটা কে তা বুঝতে পারেনি মিসেস বোল্টন। কিন্তু ক্রমশই সকালের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতেই চিনতে পারল লোকটাকে। তার বন্দুক,

জামা সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। লোকটা অলিভার মেলর্স, শিকার রক্ষক। হ্যাঁ, সে-ই বটে, তার কুকুরটা ছায়ার মত লেপটে আছে তার সঙ্গে সব সময়।

কিন্তু এ সময় কি চায় লোকটা? সে কি বাড়ির কাউকে জাগাতে চায়? বাড়িটার উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ওখানে দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছে ও? যেন প্রেমাবেগ বিধুর কোন পথকুক্কুর কোন এক উত্তপ্ত মুহূর্তে তার কুক্কুরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

হা ভগবান! সহসা যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল মিসেস বোল্টনের মাথায়। মুহূর্তে বুঝে গেল সব ব্যাপারটা। ঐ লোকটাই অর্থাৎ শিকার রক্ষকই হলো লেডি চ্যাটার্লির প্রেমাস্পদ। হ্যাঁ হ্যাঁ ও-ই।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার এই প্রসঙ্গে। মিসেস বোল্টন অর্থাৎ আইভি বোল্টন নিজেও ঐ লোকটার সঙ্গে কিছুটা প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে ছিল। লোকটা তখন ষোল বছরের ছোকরা আর আইভি বোল্টনের বয়স ছাব্বিশ। বিধবা হবার পর ধাত্রী হবার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। তখন ঐ লোকটা প্রয়োজনীয় বইপত্র যুগিয়ে অনেক সাহায্য করে। তখন লোকটা ছিল দারুণ চতুর। শেফিল্ডের গ্রামার স্কুলে বৃত্তি পায় সে। সে ফরাসী ভাষা জানে। তার উপর সে কামারের কাজ শিখে ঘোড়ার ক্ষুরে পেরেক বসানোর কাজ করত। সে বলত সে ঘোড়া ভালবাসে বলেই এ কাজ করে সে। কিন্তু আসলে বাইরের জগতে বেরিয়ে গিয়ে আধুনিক সভ্যতা আর জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলেই সে এই কাজ বেছে নিয়েছিল।

তখন কিন্তু ছোকরাটা ভালই ছিল। অনেক উপকার করেছিল মিসেস বোল্টনের। একদিক দিয়ে সে স্যার ক্লিফোর্ডের মতই চতুর; পুরুষদের থেকে মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে সে চাতুর্যের পরিচয় দেয় বেশী।

নিজেকে ঘৃণ্য করে তোলার জন্যই সে যেন বিয়ে করে। অনেক লোক সব জেনেশুনেই এইভাবে বিয়ে করে নিজেদের ঘৃণ্য করে তোলে, কারণ কোন না কোন একটা বিষয়ে ক্ষুব্ধ থাকে তারা এবং এইভাবে তারা চাপা দিতে চায় এই ক্ষোভটাকে। সে যেন তার প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েই যুদ্ধে চলে যায়। তারপর সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক হয়ে ওঠে সে। কিন্তু আবার তেভারশালে ফিরে এসে সামান্য এক শিকার রক্ষকের কাজ নেয়। তার পুরনো জীবনেই ফিরে আসে। দেহাতী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু আইভি বোল্টন ভালভাবেই জানে সে ভদ্রলোকের মত কথা বলতে পারলেও তা বলে না। অনেক মানুষ সুযোগ ও সৌভাগ্য জীবনে লাভ করেও তা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না।

যাই হোক, এবার লেডি চ্যাটার্লির মত মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে। অবশ্য লেডি চ্যাটার্লিই প্রথম মেয়ে নয় তার জীবনে, তবু এ প্রেম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার জীবনে। কোথায় তেভারশালের বস্তীর এক সাধারণ ছেলে আর

কোথায় র‍্যাগবি হলের অভিজাত সমাজের বধূ লেডি চ্যাটার্লি। এ যেন অভিজাত চ্যাটার্লিপরিবারের গালের উপর চরম অপমানের এক চড়।

কিন্তু এদিকে দিন বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিকার রক্ষক লোকটার মধ্যে চৈতন্যোদয় হলো। তার কেবলি মনে হতে লাগল এটা ভাল হচ্ছে না। নিজেকে বার বার বলতে লাগল মনে মনে, তোমার সুদীর্ঘলালিত নিঃসঙ্গতা হতে মুক্ত হয়ে এক নতুন সঙ্গিনীর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার এই প্রয়াস এই প্রবণতা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এ সঙ্গিনী সারা জীবন জড়িয়ে থাকবে তার জীবনের সঙ্গে। তার থেকে মাঝে মাঝে তার সঙ্গলাভই ভাল। বরং তার এই নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বটাকেই সারাজীবন ধরে আঁকড়ে ধরে তাকে লালন করে যাওয়া উচিত। সেটাই হবে তার পক্ষে শ্রেয়। তবে সে সঙ্গিনী যদি নিজে থেকে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে সে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে তার কাছে উপ-যাচক হয়ে এগিয়ে আসা ঠিক হবে না।

রক্তনিবিড় যে কামনাটা দুর্বার বেগে তাকে টেনে এনেছিল সে কামনার সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। সে ইচ্ছা করেই ছিঁড়ে দিল সে সুতোটা, কারণ এটা উচিত তার পক্ষে। দুজনে মিলিত হতে হলে উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। এটা এক পক্ষের ব্যাপার নয়। সে যদি না আসে তাহলে ও নিজে থেকে তার কাছে এগিয়ে আসবে না, তার পিছনে ছুটে যাবে না।

ভাবতে ভাবতে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল ও। ওর স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতাকেই ওর জীবনের এক সহজ সত্য বলে মেনে নিল ও অন্তরের সঙ্গে। এইটাই ভাল। সে নারী যদি নিজে থেকে আসে ত আসবে। ও আর যাবে না তার কাছে।

মিসেসে বোল্টন দেখল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে লোকটা। তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে তার কুকুরটা। মনে মনে সে বলল, অবশ্য ও আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ নয়। সারা জীবন আমি শুধু ওর কথাই ভাবিনি, তবু টেডকে হারাবার পর ওকে ভালবেসে আমি সত্যিই সুখী হয়েছিলাম। ওকে আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড যদি এসব কথা জানতে পারে তাহলে কি বলবে?

ঘুমন্ত ক্লিফোর্ডের পানে একবার বিজয়গর্বে তাকাল মিসেস বোল্টন। কালো রেশমের পর্দাঢাকা জানালা হতে ধীরে ধীরে সরে এল সে।

অধ্যায় ১১

কনি সেদিন তাদের বাড়ির যত সব ছবি আর মূল্যবান আসাবাবপত্র রাখার ঘরে ঢুকে গোছাচ্ছিল ঘরটা। কিছু জিনিসপত্র বাছাই করছিল। স্যার

জিওফ্রের বাবা ছবি ভালবাসতেন এবং তিনি বেশ কিছু ভাল ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু জিওফ্রের মার আবার ঝোঁক ছিল দামী আসবাবপত্রের উপরে। স্যার জিওফ্রে নিজে ওক কাঠের বড় বড় সিন্দুক পছন্দ করতেন। এদিকে ক্লিফোর্ড আধুনিক চিত্রকলার ভক্ত বলে সে এ যুগের কিছু ভাল ছবি কিনে রেখেছে। কনি আবার পুরনো আমলের যত সব অদ্ভুত ছবি ভালবাসে।

ঘরের এককোণে একটা জায়গায় গোলাপকাঠের তৈরি এ বংশের পুরনো আমলের দোলনাটা কাপড়ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। ঢাকাটা খুলে কনি দোলনাটার পানে তাকিয়ে রইল। দোলনাটার কেমন যেন নিজস্ব একটা মোহ আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল কনি।

মিসেস বোল্টন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এটা খুবই দুঃখের কথা যে এ দোলনাটা আর কখনো ব্যবহার হবে না। অথচ দোলনাটা এতদিনের পুরনো হলেও এখনো ভাল আছে।

কনি সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে বলল, একদিন এর ব্যবহার হতেও পারে। আবার সন্তান হতে পারে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কি বলতে চান স্যার ক্লিফোর্ড ভবিষ্যতে সেরে উঠতে পারেন?

কনি বলল, না, আমি বর্তমানের কথাই বলছি। ক্লিফোর্ডের পেশীগত পক্ষাঘাত তার পুরুষত্বকে নষ্ট করতে পারেনি।

কনির এই ধারণাটা ক্লিফোর্ডই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে। সে একদিন তাকে কথায় কথায় বলে, এখনো আমার সন্তান হতে পারে। আমার পুরুষত্ব একেবারে নষ্ট হয়নি। আমার পাছা আর পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকলেও আমার প্রজনন ক্ষমতা যে কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে এবং আমি তখন সহজেই আমার প্রাণবীর্য কোন নারীদেহের গর্ভে সঞ্চারিত করে দিতে পারব।

ক্লিফোর্ড এটা সত্যিই অনুভব করে। সে যখন খনির ব্যাপারে প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে কাজকর্ম দেখাশোনা করছিল তখন তার মনে হচ্ছিল সে যেন তার যৌনক্ষমতাও ফিরে পেয়েছে। কনি প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে সে বুঝতে পারে ক্লিফোর্ডের একথার অন্তরালে একটা গভীর মানে লুকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড এই কথাই বলতে চাইছে কনি যে কোনভাবে সন্তান ধারণ করতে পারে এবং সে সন্তানের দায়িত্ব ও পিতৃত্ব সে মেনে নেবে। সে সন্তান তার ঔরসজাত না হয়েও হবে তার সন্তান।

কনির কথাটা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মিসেস বোল্টন। একথা বিশ্বাস করতে পারল না সে কোন মতে। তবে অবশ্য আজকাল ডাক্তাররা অনেক অসাধ্য সাধন করে।

মিসেস বোল্টন এবার মুখে বলল, সত্যিই ম্যাডাম, আমি আশা করি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার সন্তান হোক। তাহলে আপনার নিজের ও

সকলের পক্ষেই খুব ভাল হয়। র‍্যাগবির এই বাড়িতে সন্তান এলে সব কিছুই বদলে যাবে।

কনি বলল, তাই না কি ?

কনি এবার ষাট বছর আগেকার তিনখানা ছবি বেছে নিয়ে রেখে দিল আলাদা করে। শর্টল্যাণ্ডের ডিউকপত্নীকে পাঠাবে সে। তিনি আবার এইগুলো দাতব্য বাজারে কম দামে বিক্রি করবেন। ক্লিফোর্ড কিন্তু ডিউকপত্নীকে মোটেই দেখতে পারে না।

এদিকে মিসেস বোল্টন মনে মনে বলতে লাগল, হায় ম্যাডাম, তুমি অলিভার মেলর্সএর ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। হা ভগবান! তার মানে র‍্যাগবির দোলনায় আসবে তেভারশালের ছেলে। কী লজ্জার কথা!

পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে ষাট সত্তর বছর আগেকার তৈরি এক কালো কাঠের বড় একটা বাক্স পেল কনি। বাক্সের ঢাকনাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বই, কলম, দোয়াত, সেলাইএর জিনিসপত্র, ছুরি কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি নানারকমের জিনিস দেখতে পেল।

এ বাক্সটার কারুকার্য খুব সুন্দর হলেও চ্যাটার্লি পরিবারের উত্তরপুরুষরা এটা সেকেলে বলে ব্যবহার করতেন না। তাই এটা রুদ্ধ ঘরের এক কোণে পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

কিন্তু এই বাক্স দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল মিসেস বোল্টন। বলল, কি চমৎকার বাক্সটা! এর ভিতর দাড়ি কামানোর ব্রাশ আর তিনটে কী সুন্দর কাঁচি রয়েছে দেখুন। পয়সা দিলেও অমন জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে না।

কনি বলল, তাই নাকি ? তাহলে তুমি ওটা নাও।

না, না ম্যাডাম। একি বলছেন ?

কনি বলল, তুমি এটা না নিলে পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এটা এখানেই এইভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি তাহলে এটা ডিউকপত্নীকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তাঁকে ত আরো জিনিস পাঠানো হচ্ছে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

কনি হেসে বলল, এর জন্য তোমায় আর চেষ্টা করতে হবে না।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বোল্টন সেই বড় বাক্সটা তুলে নিয়ে কোনরকমে চলে গেল সেখান থেকে। তার একটু পরে ড্রাইভার বেটস্ মিসেস বোল্টনকে নিয়ে তার তেভারশাল গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিল। সেখানে পাড়ার মেয়েদের দেখাল বাক্সটা। তারা সবাই একবাক্যে প্রশংসা করল বাক্সটার। তারপরেই শুরু হলো লেডি চ্যাটার্লির সন্তান নিয়ে চাপা চর্চা আর যতসব জল্পনা কল্পনা।

কেমিস্টের স্ত্রী মিসেস উইল্ডন বলল, যাই হোক, সন্তান হলেও এ বিষয়ে

বিস্ময়ের আর অবধি থাকবে না।

মিসেস বোল্টন এ বিষয়ে নিশ্চিত যে লেডি চ্যাটার্লির যদি সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান হবে ক্লিফোর্ডেরই ঔরসজাত।

সেইদিনই কিছু পরে গাঁয়ের রেক্টর ক্লিফোর্ডের কাছে এসে বলল, র‍্যাগবির উত্তরাধিকারীর জন্য এবার কি তাহলে আমরা আশা করতে পারি? সবই দয়ালু ঈশ্বরের হাত।

কণ্ঠে একই সঙ্গে কিছু শ্লেষ আর বিশ্বাস ঢেলে ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি।

আজকাল সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে ক্লিফোর্ড, তার দ্বারা সন্তান উৎপাদন একদিন সম্ভব হবে।

একদিন বিকালে লেসলি উইণ্টার নামে একজন ভদ্রলোক বেড়াতে এল র‍্যাগবির বাড়িতে। লোকে তাঁকে স্কুয়ার উইণ্টার বলত। তিনি এসে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কোলিয়ারির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

ক্লিফোর্ডের ধারণা এই যে, তার কোলিয়ারিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তা গুণের দিক থেকে ভাল না হলেও সেগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে শক্ত করে এমন এক জ্বালানি কয়লায় রূপান্তরিত করা যায়, যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্বলবে।

লেসলি বললেন, কিন্তু সেই সব জ্বালানি কয়লা পোড়াবার এঞ্জিন পাবে কোথায়?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি নিজে সে এঞ্জিনের ব্যবস্থা করব। আমি নিজেই সে কয়লা পোড়াব। আমি তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব।

লেসলি বললেন, তা যদি হয় তাহলে তা চমৎকার হবে। আমার থেকে এবিষয়ে যদি কোন উপকার হয়, আমি যদি কোন প্রকারে কাজে লাগতে পারি তাহলে সানন্দে আমি তা করব। আমার এখন বয়স হয়েছে। আমার কোলিয়ারিগুলোও আমার মতই সেকেলে। আজ আমার ছেলে থাকলে সেও তোমার মতই নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা দিয়ে এই সব কোলিয়ারিকে নতুন করে ঢেলে সাজাত। সত্যিই চমৎকার তোমার পরিকল্পনা এবং আমি বলছি তুমি সফল হবেই। যাই হোক, আচ্ছা শুনছি নাকি র‍্যাগবিতে তোমার উত্তরাধিকারীর জন্ম হচ্ছে, এই সব কি সত্যি?

ক্লিফোর্ড পাল্টা প্রশ্ন করল, এ ধরনের গুজব রটেছে নাকি?

লেসলি বললেন, ফিলিংডেডের মার্শাল আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এ ছাড়া আর আমি কিছু বলতে পারব না। তবে যদি এ গুজব মিথ্যা বা ভিত্তিহীন হয় তাহলে কথাটা আমি আর কোথাও তুলব না।

ক্লিফোর্ড কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করলেও তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে। তবে আশা আছে এই পর্যন্ত বলতে পারি।

লেসলি উইণ্টার আবেগের সঙ্গে ক্লিফোর্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা

টেনে নিয়ে মর্দন করে বলল, এ আশার গুরুত্ব আমার কাছে কতখানি তা বুঝতে পারছ? এইভাবে তোমার বংশরক্ষা হলে তেভারশালের শ্রমিকরা যুগ যুগ ধরে তোমার খনিতেই কাজ করে যাবে।

বৃদ্ধ লেসলি সত্যিই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

পরদিন কনি একটা কাচের ফুলদানিতে কতকগুলো হলদে ফুল সাজিয়ে রাখছিল।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি, তুমি কি জান তুমি র‍্যাগবিকে এক উত্তরাধিকারী দান করতে চলেছ এই ধরনের গুজব রটেছে?

কনি ভয় পেয়ে গেল। ম্লান হয়ে গেল তার মুখখানা। তবু সে ফুলগুলো ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। পরে বলল, না। এটা কি তোমার ঠাট্টা না হিংসার কথা?

ক্লিফোর্ড একটু থেমে উত্তর করল, দুটোর কোনটাই নয়। এমনি আশা করছি। আশা করছি, এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য হয়।

কনি ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আমি আজ সকালে বাবার একখানি চিঠি পেয়েছি। ভেনিস থেকে স্যার আলেকজাণ্ডার কুপার তার ভিলাতে জুলাই আর আগস্ট এই দু মাস কাটাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাবা তা গ্রহণ করেছেন। বাবা এ বিষয়ে আমাকে সচেতন করে দিয়েছেন।

ক্লিফোর্ড বলল, জুলাই আর আগস্ট দু মাস?

কনি বলল, আমি অতদিন অবশ্য থাকব না। কিন্তু তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি বিদেশে যাব না।

কনি ফুলগুলো জানালার ধারে নিয়ে গেল। তারপর বলল, আমি গেলে তুমি কিছু মনে করবে না ত? তুমি জান এবারকার গ্রীষ্মটা ওখানে কাটানোর কথা আগেই হয়েছিল।

কতদিনের জন্য যাবে?

বোধহয় তিন সপ্তার জন্য।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর ক্লিফোর্ড বলল, আমি তিন সপ্তার জন্য তোমাকে অবশ্যই ছাড়তে পারি যদি তুমি কথা দাও তুমি আবার ফিরে আসবে।

কনি বলল, আমি ফিরে আসতেই চাই।

কথাটা জোর দিয়ে বলল কনি। সে কিন্তু আসলে ভাবছিল সেই লোকটার কথা।

ক্লিফোর্ড একথা বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করল কনি তারই জন্য ফিরে আসবে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটা আনন্দ অনুভব করল। বলল,

তাহলে সব ঠিক আছে। তুমি যেতে পার। তাই না কি ?

কনি বলল, আমিও তাই মনে করি।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তাহলে এই পরিবর্তনটা বেশ উপভোগ করবে ?

কনি তার অদ্ভুত নীল চোখ দুটো তুলে ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। তারপর বলল, আমি আবার ভেনিস দেখতে যাব, কোন এক নির্জন দ্বীপের সমুদ্রকূলে স্নান করব। তুমি জান আমি লিডোকে ঘৃণা করি। তার উপর আমার যতদূর মনে হয় আলেকজাণ্ডার কুপার আর লেডি কুপারকে আমার মোটেই পছন্দ হবে না। তবে হিলদা যদি আমার সঙ্গে যায় আর আমাদের একটা ডিঙ্গি নৌকো থাকে তাহলে চমৎকার হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কথাটা কনি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে বলল। সত্যিই সে এইভাবে সুখী করতে চেয়েছিল ক্লিফোর্ডকে।

ক্লিফোর্ড বলল, কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। ক্যালে বন্দরের ঘাটে ওণ্ড্য নর্দ প্রভৃতি জায়গায় আমার কি অবস্থা হবে ?

কি আর হবে ? যুদ্ধে আহত কত লোককে আমি চেয়ারে বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। তাছাড়া আমরা প্রায় সব রাস্তাই মোটরযোগে যাব।

তা সত্ত্বেও দুজন লোককে সঙ্গে নিতে হবে।

না, তার দরকার হবে না। হিলদা আর আমি দুজনেই আমরা সামলে নেব। তাছাড়া ওখানে ত একজন লোক থাকবেই।

তবু ঘাড় নাড়ল ক্লিফোর্ড। বলল, এ বছর নয় প্রিয়তমা, এ বছর নয়। পরের বছর চেষ্টা করব।

ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল কনি। পরের বছর! কে জানে কি হবে পরের বছর। ভেনিসে যাবার তার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবে সে যাচ্ছে কিছুটা সংযম সাধনার জন্য। এখানে থাকলে অসংযত কামনার ক্রমবর্ধমান তাড়নায় ক্রমশই লোকটার খপ্পরে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে। তাছাড়া সত্যি সত্যিই যদি তার গর্ভে সন্তান আসে তাহলে ভেনিস থেকে ঘুরে এলে ক্লিফোর্ড ভাববে ভেনিসে তার কোন প্রেমিক আছে এবং এ সন্তান তারই ঔরসজাত।

তখন মে মাস শুরু হয়ে গেছে। জুন মাসেই তাকে রওনা হতে হবে। এই সব যাওয়ার প্রস্তুতি মোটেই ভাল লাগে না কনির। এইভাবে সব সময়ই একজনের আবির্ভাবের জন্য একজনের জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। গাড়ির চাকা নয়, আসলে অদৃষ্টের চাকাই মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মে মাস পড়ে গেছে। তবু ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির বিরাম নেই। এই ধরনের আবহাওয়া ফসলের পক্ষে ভাল। কনিকে একবার তাদের আঞ্চলিক শহর আথওয়েটে যেতে হলো। ছোট শহর আথওয়েটে চ্যাটার্লি পরিবারের এখনো

বিরাট প্রতিপত্তি। কনি একাই গেল সেখানে। ফিল্ড গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

বসন্তের আগমনে সবুজ হয়ে উঠেছে চারদিক। তবু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে গাঁয়ের সমস্ত পথঘাট। একে কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। প্রায়ই বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছিল এক দূষিত বাষ্প ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

একের পর এক করে চড়াই পার হয়ে ছুটে চলল গাড়ি। পথের দুধারে শুধু কালো ইঁটের বাড়ি, মাঝে মাঝে মাটির বাড়িও আছে। কিন্তু কয়লার গুঁড়োয় সব ঘরবাড়ি ঢেকে যাওয়ায় কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আছে মুদিখানা, তরিতরকারি প্রভৃতির নানারকমের দোকান। প্রতিটি দোকানে পণ্যদ্রব্য সাজানো আছে। সব কুৎসিত লাগে চোখে। এর উপর আছে এক সিনেমা হল। সামনে নতুন ছবির ঘোষণা, 'নারীর প্রেম।' তারপর আছে চার্চ, স্কুল, খেলার মাঠ। একটা স্কুলে পাঁচটা মেয়েকে গান শেখানো হচ্ছিল। কিন্তু যখন গাড়ি থামিয়ে তাতে পেট্রোল ভরছিল তখন গাড়িতে বসে বসে সে গান শুনছিল কনি। কনির মনে হলো, এদের মধ্যে কোন প্রাণবন্ত সৃষ্টিশীল অনুভূতি নেই। এক যান্ত্রিক কৃত্রিমতা এদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। নিষ্প্রাণ করে রেখেছে।

উল্টো দিক থেকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কয়লাবোঝাই গাড়ি আসছিল। ড্রাইভার ফিল্ড সেটা কাটিয়ে চলে গেল। ডাকঘর, বাজার সব পার হলো একে একে। কয়েকজন পথচারী চ্যাটার্লিদের গাড়ি দেখে অভিবাদন জানাল। এই সব মিলিয়ে হচ্ছে তেভারশাল গাঁ। ইংল্যাণ্ডের এক গাঁ। শেক্সপীয়ারের ইংল্যাণ্ড। এ গাঁয়ে আসার পর থেকে কনি বুঝতে পারে আজকের এই ইংল্যাণ্ড এমন এক নতুন জাতের মানুষ সৃষ্টি করছে যারা অতিমাত্রায় অর্থ-সচেতন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর। কিন্তু স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টিশীল ভাব বা অনুভূতির দিক থেকে তারা অর্ধমৃত। এ সব দিক দিয়ে কিছুই ব্যক্ত করতে পারে না তারা। কোন বিষয়ে তাদের কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। কনি যখন দেখল লরীভর্তি শেফিল্ডের শ্রমিকরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে তখন তার গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল। তখন তার মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে এল, হা ভগবান! মানুষ মানুষের কি অবস্থা করেছে। লোকগুলোকে কেমন প্রাণহীন দেখাচ্ছে। ওদের নেতারা কি করছে ওদের নিয়ে? ওদের দ্বারা আর কোন কাজ হবে না।

আবার একটা ভয়ের ঢেউ খেলে গেল কনির মনে। এক ধূসর অসহায়তা-বোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। যে দেশে এই সব লোক শিল্পশ্রমিক আর যেখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তার চেনাজানা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মত, সে দেশের সত্যিই কোন আশা নেই। তবু সে সন্তান চাইছে, চাইছে ব্যাগবির এক উত্তরাধিকারী। ভয়ে কেঁপে উঠল কনি।

মেলর্স কিন্তু এই ধরনের সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, বেরিয়ে অবশ্য এসেছে, কিন্তু কনি যতখানি এসেছে ও এসেছে ঠিক ততখানি। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যেই বা তেমন মিল কোথায়? অন্তরঙ্গতা কোথায়? দুজনের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে শুধু ব্যবধান। অথচ এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ জুড়ে আছে এই সব মানুষ।

স্ট্যাক গেটের উঁচু জায়গাটায় গাড়ি উঠতে লাগল। তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাসে নতুন বসন্তের গন্ধ আর উজ্জ্বলতা ভেসে বেড়াচ্ছিল। এখানকার পথ উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো। এ পথ দক্ষিণে চলে গেছে একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে আর পুব দিকে গেছে ম্যানস্‌ফিল্ড আর নটিংহামের দিকে। কনি যাবে দক্ষিণে।

গাড়িটা যখন উপরে উঠছিল তখন কনি বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ঢালু জায়গার উপরে ডিউকদের ওয়ারটপ প্রাসাদের ছায়াচ্ছন্ন মাথাটা উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদটার নিচে চারদিকে গড়ে উঠেছে খনিশ্রমিকদের লালরঙের বাসাগুলো। তারও নিচে কয়লার একটা খাদ থেকে কালো ধোঁয়া আর সাদা বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। কনি ভাবল ঐ খাদ থেকে প্রতি বছর ডিউক আর অন্যান্য অংশীদারেরা হাজার হাজার পাউণ্ড পায়। পুরনো দিনের বিশাল প্রাসাদটার ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তকে আড়াল করে।

একটা মোড় ঘুরেই কনির গাড়িটা স্ট্যাক গেটের কাছে গিয়ে পড়ল। স্ট্যাক গেট হচ্ছে একটা নূতন বড় হোটেল যার সাদা আর লাল রঙের বাড়িটা ওর রাস্তা হতে দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সাধারণের পথ আর পথচারীদের সব সম্পর্ক হতে নিজেকে বাঁচিয়ে দূরে রেখে এক উদ্ধত অসামাজিক নির্জনতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল বাড়িটা। কিন্তু বাঁ দিকে তাকালেই দেখা যাবে সারবন্দী অজস্র আধুনিক ধাঁচের বাড়ি। প্রতিটা বাড়ির আশপাশে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা আর বাগান। সেটা পার হয়ে কিছু আধুনিক উন্নতমানের কয়লাখনি আর ওষুধের কারখানা দেখতে পাওয়া যায়।

এই হলো স্ট্যাক গেট। যুদ্ধের সময় নতুন করে তৈরি হয়। পুরনো স্ট্যাক গেটের বাড়িটা এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। তার আশেপাশে ছিল একটা পুরনো আমলের ছোট্ট কোলিয়ারি আর কালো ইঁটের কতকগুলো পুরনো ধরনের বাড়ি। তার মাঝে একটা চার্চসংলগ্ন কবরখানা। তখন হোটেলটা খনিশ্রমিকমের মদ খাবার আড্ডাখানা ছিল।

কনি যখন র‍্যাগবিতে প্রথম আসে তখন হোটেলের ঐ নতুন বাড়িটা হয় আর তার চারপাশের ঐ বাড়িগুলোও গড়ে ওঠে।

চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া গড়িয়ে যাওয়া ঢালু পথ বেয়ে গাড়ি উপরে উঠতে লাগল। একদিন এ অঞ্চল ছিল এক সম্ভ্রান্ত জায়গা; যতসব অভিজাত শ্রেণীর লোকদের বাস। সামনের দিগন্তটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল

চাদউইক প্রাসাদ। প্রাসাদ হিসাবে এলিজাবেথের যুগের এ এক প্রসিদ্ধ নিদর্শন। এ প্রাসাদের দেওয়ালের থেকে জানালাগুলোই বেশী চোখে পড়ে। সুদূর অতীতের এক নীরব নির্জন সাক্ষী হিসাবে একটা পার্কের উপর একা একা দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদটা। অতীত আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবেই এ প্রাসাদের অস্তিত্বকে আজও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত পথিককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ প্রাসাদ যেন এক নীরব ভাষাময়তায় বলছে, দেখ, অতীতে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কেমনভাবে বাস করতেন, কত সম্পদের তাঁরা অধিকারী ছিলেন।

এ সব অতীতের কথা। সে সব দিন কেটে গেছে। বর্তমান কাল তাঁরই নিচে শায়িত আজ। ভবিষ্যৎ কোথায় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। গাড়িটা এবার খনিশ্রমিকদের কালো কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে নিচু পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছিল আথওয়েটের দিকে। দিনটা কেমন ভিজে ভিজে থাকায় সারা আথওয়েটের আকাশ বাতাস জুড়ে জমে ছিল চাপ চাপ ধোঁয়া আর বাষ্পরাশি। আথওয়েট উপত্যকার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে ইস্পাতের এক মোটা রশ্মির মত রেলপথ চলে গেছে শেফিল্ড পর্যন্ত। অন্য দিকে তার কয়লাখনি আর ইস্পাত কারখানা সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর তার থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বার হচ্ছিল। এ ধোঁয়া, এ কয়লা, এ ইস্পাত মনটা বিষিয়ে দেয় কনির। এ সব দেখতে মোটেই ভাল লাগে না তার। আসলে আথওয়েট জায়গাটা এক বাজারে শহর। এ শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল হলো চ্যাটার্লি আর্মস্। আথওয়েটের লোকেরা র‍্যাগবি বলতে শুধু র‍্যাগবি প্রাসাদটাকে বোঝায় না, তারা জানে র‍্যাগবি হলো একটা গ্রাম-অঞ্চলের নাম। জানে তেভারশাল গ্রামের পাশেই আছে র‍্যাগবি হল। তার মানে র‍্যাগবি প্রাসাদ।

খনিশ্রমিকদের কালো কালো বাড়িগুলো ফুটপাথের উপর ক্ষুদ্রতায় ও বৈশিষ্ট্যহীনতায় সমান হয়ে সকলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। এ সব কুঁড়েগুলো প্রায় একশো বছরের পুরনো। বাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগেকার লম্বা গ্রাম্য পথটা আজ পরিণত হয়েছে প্রশস্ত শহুরে রাজপথে। এই সব দেখে আজ আগেকার সেই উদার উন্মুক্ত গ্রাম্য পথের কথা নিঃশেষে মুছে যায় মন থেকে যে গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে এক প্রাণহীন প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে সেই ভূতুড়ে প্রাসাদটা। এবার পথের একদিকে ধার ঘেঁষে চলে গেছে রেললাইন আর একদিকে গড়ে উঠেছে নানারকমের কলকারখানার বিশাল প্রাচীর। তাদের প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবে লোহার ঘর্ষণজনিত আওয়াজ শোনা যায় অনবরত আর মাল বোঝাই বড় বড় লরীগুলো মেদিনী কাঁপিয়ে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকে কলকারখানার মাঝে।

আবার ডান দিকে ঘুরতে হয় গাড়িটাকে। চার্চের পিছন দিয়ে গিয়ে ধরতে হয় শহরের আঁকাবাঁকা পথ। কিন্তু এ শহর এমনই প্রাচীন যে মনে হয় যেন দুই

শতাব্দী আগেকার এক রাজ্যে এসে পড়েছি সহসা পথ ভুলে। রাস্তার ধারে একটা পুলিশ হাত দেখিয়ে লরী পাশ করাচ্ছিল।

গাড়িতে করে পথে যেতে যেতে বর্তমান ইংল্যাণ্ডের ছবি দেখতে দেখতে দেশের অতীত ইতিহাসের কথা মনে পড়ল কনির। আজ কোন ইংল্যাণ্ডের ছবি দেখছে কনি? আজকের দিনের এ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাণী এলিজাবেথ বা রাণী এ্যানীর ইংল্যাণ্ডের কোন সম্পর্কই নেই। আজকের যুগে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও পুরনো আমলের বড় বড় প্রাসাদগুলো ছেড়ে শহর বাজারে গিয়ে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের আধুনিক উপকরণের খোঁজে প্রচুর টাকা খরচ করছে।

একেই বলে ইতিহাস। আজকের ইংল্যাণ্ড অতীতের ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিয়েছে ঠিক যেমন করে একদিন ভবিষ্যতের ইংল্যাণ্ড আজকের এই ইংল্যাণ্ডকে মুছে দেবে নিঃশেষে। আজকের যুগে যে সব খনি ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে তা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের হাতে অনেক ধনসম্পদ এনে দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরনো আভিজাত্যের প্রাচীন নিদর্শন তাদের স্থাপত্যকলা-মণ্ডিত বড় বড় প্রাসাদগুলোকে দিয়েছে একেবারে ধ্বংস করে। এমন কি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সেই কুটিরগুলোও আর নেই; তাদের জায়গায় গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের সারবন্দী কোয়ার্টার। কৃষিভিত্তিক ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিয়ে তার জায়গায় মাথা তুলে উঠেছে শিল্পভিত্তিক ইংল্যাণ্ড। কি, এ পরিবর্তন স্বতস্ফূর্ত হলে বলার কিছু ছিল না; আসলে এ পরিবর্তন যান্ত্রিক ও কৃত্রিম বলেই কনির তাতে আপত্তি।

কনি যে সম্প্রদায়ের মেয়ে সে সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ অলস বলে বর্তমান যুগে কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না নিজেদের। কনি তাই পুরনো ইংল্যাণ্ডকেই বেশী ভালবাসে। এটা বুঝতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছে কনির। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের আঘাত তাদের একান্ত প্রিয় পুরনো ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে একেবারে। শিপলের দিন ফুরিয়ে এসেছে। স্কুয়ার উইণ্টারের প্রিয় খনি শিপলে।

কনি একবার যাবার পথে শিপলের কাছে নামল। গেটটা খোলাই ছিল। সেইখানে একটু থেকে গাড়িটা নিয়ে লেসলি উইণ্টারের বাসভবনের সামনে চলে গেল। চমৎকার বাগান বাড়ির পাশে। এ বাড়ির শান্ত নির্জন পরিবেশ বড় মনোরম লাগে কনির। র‍্যাগবির থেকে এ জায়গাটা ভাল লাগে তার।

লেসলি উইণ্টার বাড়িতে একাই ছিলেন। তিনি বাড়িটাকে অতি যত্নে সাজিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোলিয়ারিগুলো তার সাজানো সুন্দর পার্কটার অনেকখানি গ্রাস করি এগিয়ে এসেছে। উনি বলেন খনি আর খনিশ্রমিকরা তাঁকে অনেক অর্থ দান করেছে। এইভাবে তাঁর সৌন্দর্যবোধ আপোষ করে তাঁর অর্থলিপ্সার সঙ্গে।

একবার প্রিন্স অফ ওয়েলস লেসলির কাছে বেড়াতে এলে লেসলি তাঁকে বলেছিল, যে কোলিয়ারি আমাদের আয়ের উৎস সেই কোলিয়ারির জন্য পার্কটা যায় ত থাক।

শুনে প্রিন্স অফ ওয়েলস বলেছিলেন, আমার বাড়ির উঠোনে যদি কয়লার খনি পাওয়া যায় ত খুবই ভাল হয়। আমি আমার বাড়ি ও বাগানের সমস্ত প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যের বিনিময়েও কয়লা খনিকে ভালবাসব।

কনির মনে হলো প্রিন্স অফ ওয়েলস তখন অর্থ ও ধনসম্পদের মধ্যে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন, শিল্পোন্নতির মধ্যে যে বিধাতার আশীর্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন তা অতিশয়োক্তি যাই হোক, এই যুবরাজই পরে রাজা হন। তারপর সে রাজা মারা যান। তাঁর জায়গায় এসেছেন নতুন রাজা।

কনি দেখল, এখন লেসলিদের পার্কটার চারধারে খনিশ্রমিকদের বস্তী গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে এক নতুন গ্রাম।

স্যার লেসলি উইন্টার ছিলেন এক সৈনিক। তিনি জীবনে লাভের জন্য সব ক্ষয়ক্ষতিও বীরের মতই সহ্য করতে পারেন এবং করেছেনও তাই। কিন্তু আজকাল তিনি খাওয়ার পর রাত্রে পার্কে আর বেড়াতে যান না।

লেসলি উইন্টার পার্ক দিয়ে বেড়াতে না গেলেও একথা ভেবে একটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন যে, এ খনি, এ শ্রমিকবস্তী, এ বাড়ি—এসব তাঁর। কিন্তু এই ব্যাপক অধিকারবোধের অন্তরালে লুকিয়েছিল ভীরু একটা শূন্যতাবোধ। তাঁর প্রায়ই মনে হত তাঁর এই খনি আর কলকারখানার একটা নিজস্ব জীবন আছে, একটা নিজস্ব ইচ্ছা আছে এবং এই সমন্বিত ইচ্ছার এক বর্বর ব্যাপকতা তাঁর মত এক ভদ্রলোকের অতি মার্জিত সৌখীন সুন্দর ইচ্ছাটাকে মুছে দিতে চাইছে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, সেই ইচ্ছার প্রবলতর ব্যাপকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কোন লাভ নেই। আসলে তিনি যেন হারিয়ে যেতে বসেছেন। অথচ তার বিরোধিতা করতে গেলে তাঁর জীবনটাই হয়ত চলে যেতে পারে।

পার্ক দিয়ে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন লেসলি। দিনরাত বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থাকতেন যেন তিনি। একদিন লেসলি এর আগে কনির সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলেন কথা বলতে বলতে কিন্তু হঠাৎ যখন একদল খনিশ্রমিক সেই দিকে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কারণ তারা ওঁদের কোন অভ্যর্থনাই জানাল না। কনির মনে হলো খনিশ্রমিকদের কাছে অস্বস্তি অনুভব করছেন লেসলি। একদল ব্যাধের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্তদৃষ্টি এক মৃগের মত মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অথচ এই খনিশ্রমিকরা ব্যক্তিগতভাবে কোন যে শত্রুভাব পোষণ করে চলে লেসলির প্রতি তা নয়; তবে তারা আশ্চর্যভাবে উদাসীন তাঁর প্রতি। কোন সম্মান দেখানো দূরের কথা, তারা তাঁকে হৃদয়হীনভাবে উপেক্ষা করে চলে। তারা যেন তাঁর অভিজাত

ও ঐশ্বর্যপুষ্ট অস্তিত্বের প্রতি অস্বাভাবিক রকমের ঈর্ষান্বিত। 'আমরা যার জন্য এত কষ্ট করে চলেছি সে কত সুখে আছে' এই ধরনের একটা ভাব।

লেসলিও একজন ভূতপূর্ব সৈনিক হিসাবে তাঁর ইংরেজসুলভ যুক্তিবাদী অন্তরের অন্তঃস্থলে বেশ বুঝতে পারেন তাঁর খনিশ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর অবস্থাগত এই অসাম্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা গলদ আছে। এই অসাম্যের প্রতি তাদের চাপা বিক্ষোভের ও ঈর্ষার ভাবটা ন্যায়সঙ্গত। তবু এটাও ঠিক যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোন দোষ নেই, দোষ যা কিছু তা সমাজব্যবস্থার এবং তিনি এক সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র এবং এইভাবেই তাঁকে টিকে থাকতে হবে।

মৃত্যু ছাড়া কোন গতি নেই। কনির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই হঠাৎ মৃত্যু হয় লেসলির। মৃত্যুকালে তাঁর উইলে তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ ক্লিফোর্ডকেও দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর পার্কটার সব গাছ কেটে তাঁর পুরনো আমলের বাড়িটা ভেঙ্গে কোলিয়ারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। একটা বছরের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। নতুন ইংল্যাণ্ডে এইভাবে পুরনো ইংল্যাণ্ডের একটা উপাদান এই শিপলে হল আর তার পার্ক বাগান সব গ্রাস করে নেয় নিঃশেষে। এরপর হয়ত একদিন র‍্যাগবি হলকেও গ্রাস করবে। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে কনি তা জানে না। জানতে চায় না, সে শুধু এক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত পুরুষের বলিষ্ঠ বুকের তলায় মুখ গুঁজে লুকিয়ে থাকতে চায় এই কালগত পরিবর্তনের সতত উত্তাল স্রোতোধারার মাঝে। এ স্রোতকে সব সময় আলগোছে এড়িয়ে চলতে চায় কনি। কী ভয়ঙ্কর করাল তার গতি।

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে দুপাশে খনিশ্রমিকদের দেখে তার কেবলি মনে হতে লাগল লোকগুলো কত শান্ত নিরীহ। কিন্তু বড় নিষ্প্রাণ। ওদের যেন কোন অস্তিত্বই নেই। ওরা ভাল, কিন্তু ওরা যেন এক একটা গোটা মানুষ নয়, মানসিক সত্তার অর্ধেক। কিন্তু ওদেরও সন্তান হয়। ওদের ঔরসজাত সন্তানকে নারীরা গর্ভে ধারণ করে। কথাটা মনে হতেই গাটা শিউরে ওঠে কনির। মনে মনে বলে উঠল, হা ভগবান, ওদের আবার সন্তান।

কিন্তু মেলর্স ত এদেরই একজনের সন্তান। তফাৎ শুধু চল্লিশটা বছরের। এই সব খনিশ্রমিকদের জীবনে কোন সৌন্দর্য নেই, তাদের মধ্যে কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই, জ্ঞান নেই। তারা শুধু খাদের ভিতর কাজ করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। বছরের পর বছর ধরে এইভাবে কাজ করতে করতে কয়লা আর লোহা তাদের দেহ-মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়েছে। কুৎসিত করে তুলেছে তাদের জীবনটাকে।

জীবন কত কুৎসিত হতে পারে তার একটা মূর্ত প্রতীক যেন তারা। তথাপি জীবন্ত। এই কুৎসিত জীবনের বোঝাকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে তারা। পৃথিবী গর্ভে কয়লা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের অস্তিত্বও থাকবে। কয়লা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর কাছে অনবরত থেকে থেকে এক অমানবিক ধাতুগন্ধ

সৌন্দর্য অবশ্য তারা লাভ করেছে। কিন্তু জলের মাছের মত পুরনো পচা কাঠের পোকার মত তাদের সৌন্দর্য একান্তভাবে বস্তুগত, তার মধ্যে কোন প্রাণ বা মনুষ্যত্ব নেই।

বাড়িতে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কনি। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কিছু আজেবাজে কথা বলতেও তার ভাল লাগছিল। সারা মিডল্যাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কয়লা আর লোহার এক ব্যাপক ভয়ের শিহরণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মত কাঁপিয়ে তুলতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

কনি বলল, বোল্টনের দোকানে নেমে চা খেতে হলো আমায়।

ক্লিফোর্ড বলল, উইল্টার তোমাকে চা দিত।

তা অবশ্য বটে, কিন্তু বোল্টনকে হতাশ করতে পারলাম না। মিস বোল্টনের মেজাজটা বেশ রোমান্টিক। তাছাড়া ওর চা করার মধ্যে ধর্মগত একটা নিষ্ঠা আর পবিত্র ভাব আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, আমার কথা কিছু বলছিল?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে আমাকে বলল, 'স্যার ক্লিফোর্ড কেমন আছেন?' আমার মনে হয় সে তোমাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে নার্স ক্যাডেলের থেকেও।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আমি খুব ভাল আছি, ঠিক ফোটা ফুলের মত।

হ্যাঁ, তাই বলেছি। আর তা শুনে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে এমনি একটা ভাব হলো তার। আমি তাকে বললাম, তেভারশালে এসে অবশ্যই যেন তোমাকে দেখতে আসে।

আমাকে দেখবে? কি জন্য?

কেন, হ্যাঁ তোমাকে ক্লিফোর্ড। সে তোমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে। তার প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। তার চোখে তোমার তুলনায় ক্যাপাজোসিয়ার সেণ্ট জর্জও কিছু নয়।

তোমার কি মনে হয় সে আসবে?

কনি বলল, তোমার কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখটা। মুহূর্তের জন্য তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আহা বেচারী! যে সব মেয়ে তাদের ভালবাসে শ্রদ্ধা করে পুরুষরা কেন যে তাদের ভালবাসে না?

ক্লিফোর্ড বলল, মেয়েরা বড় দেরী করে ভালবাসে। কিন্তু সে কি আসবে?

কনি বলল, সে আমাকে বলল, ম্যাডাম, আমার ত যেতে সাহসই হচ্ছে না।

ক্লিফোর্ড বলল, সাহস হচ্ছে না! কি অবান্তর কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সে আসবে না। তার চা-টা কেমন ছিল?

লিপটনের চা এবং বড় কড়া। কিন্তু ক্লিফোর্ড তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি তার কাছে রোমের গোলাপের মতই সুন্দর।

আমি তোষামোদে গলি না।

কনি বলল, সচিত্র কাগজে তোমার যে সব ছবি বেরিয়েছিল সেই ছবিগুলো মিসেস বোল্টন সযত্নে রেখে দিয়েছে এবং মনে হয় সে প্রতি রাতে তোমার জন্য প্রার্থনা করে। সত্যিই বড় আশ্চর্য লাগে।

কনি উপরতলায় পোষাক পাল্টাবার জন্য গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিফোর্ড কনিকে প্রশ্ন করল, বিয়ের বন্ধনের মধ্যে চিরন্তন একটা কিছু আছে এটা তুমি মনে কর না?

কনি ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড, আমার মনে হচ্ছে অনন্ত বা চিরন্তন বলতে তুমি বোঝাচ্ছ একটা ঢাকনা বা লম্বা শৃংখল যা মানুষ যতদূরেই যাক তাকে পিছনে ছুটে গিয়ে ধরবে।

কনির পানে বিরক্তির সঙ্গে তাকাল ক্লিফোর্ড। সে বলল, আমি বলতে চাইছি, তুমি নিশ্চয় কারো সঙ্গে প্রেম করতে ভেনিসে যাচ্ছ না?

কনি বলল, ভেনিসে প্রেম করার আশায় যাচ্ছি? না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি।

এমন এক অদ্ভুত ঘৃণার সঙ্গে কথাগুলো বলল কনি যে সে তার পানে তাকিয়ে ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করল ক্লিফোর্ড।

পরদিন সকালে উপরতলা থেকে নিচের তলায় নামতেই ক্লিফোর্ডের ঘরের বাইরে মেলর্স-এর কুকুরটাকে বসে থাকতে দেখল। কুকুরটা চাপা গলায় এক মৃদু গর্জন করছিল। কনি তার কাছে গিয়ে বলল, কি ফ্লসি, এখানে তুমি কি করছ?

এর পর কনি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল ক্লিফোর্ড তার বিছানায় বসে আছে আর তার পা তলার দিকে, মেলর্স দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডের হুকুমের কথা শুনছে। দরজাটা খোলা পেয়েই তার কুকুর ফ্লসি ভিতরে ঢুকে পড়ল। মেলর্স তাকে ইশারা করতেই সে ঘরের বাইরে চলে গেল আবার।

কনি ক্লিফোর্ডকে বলল, প্রাতঃ নমস্কার ক্লিফোর্ড। আমি জানতাম না তুমি ব্যস্ত আছ।

তারপর মেলর্সএর দিকে তাকিয়ে তাকেও প্রাতঃ নমস্কার জানাল। মেলর্স অস্পষ্টভাবে কি বলল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কামাবেগের শিহরণ খেলে গেল তার সারা অঙ্গে।

কনি আবার বলল, আমি কি তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি ক্লিফোর্ড?

ক্লিফোর্ড বলল, না, মোটেই না, আমার কাজটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি। দোতলায় গিয়ে জানালার ধারে বসে মেলর্সএর পথপানে তাকিয়ে রইল। মেলর্স তার স্বভাবসুলভ নীরব গাম্ভীর্যে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কনির মনে হলো মেলর্সএর চেহারাটার মধ্যে যেমন একটা উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ আর নিঃসঙ্গতার অহঙ্কার আছে তেমনি

তার সঙ্গে আছে এক হীনতাবোধ, এক দাসমনোবৃত্তির ভাব। আসলে সে ক্লিফোর্ডের চাকর। ক্যাসিয়াস বলেছিল, হে প্রিয় ব্রুটাস, আমরা যে হীন, আমরা যে ক্ষুদ্র তার জন্য গ্রহ নক্ষত্রদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, সে দোষ হলো আমাদের। কনি ভাবল, লোকটা কি সত্যিই নগণ্য এক চাকর? কিন্তু কনি সম্বন্ধে তার ধারণাটা কি?

সেদিন আকাশটা ছিল বেশ উজ্জ্বল। কনি তাদের বাগানে কাজ করছিল। মিসেস বোল্টন তাকে সাহায্য করছিল। এখন মিসেস বোল্টনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা মোটামুটি ভাল যাচ্ছিল। মানুষে মানুষে সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতির জোয়ারভাটার ব্যাপারটা এমনি করেই চলে।

ওরা কতকগুলো নরম শিকরওয়ালা চারাগাছ নরম মাটিতে বসাচ্ছিল। বসন্ত সকালের এক ঝলক মদির বাতাসে তার পেটের মধ্যে এক শিহরণ অনুভব করল কনি। মনে হলো বাতাসটা তার পেটের ভিতরে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে। ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে সে বাতাসে। হঠাৎ সে মিসেস বোল্টনকে প্রশ্ন করল, তোমার স্বামী অনেক দিন হলো মারা গেছে না?

মিসেস বোল্টন বলল, তেইশ বছর হলো। আজ হতে তেইশ বছর আগে তার মৃতদেহটা হঠাৎ একদিন ওরা বয়ে নিয়ে আসে আমাদের বাড়িতে।

কনি আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের দুজনের মধ্যে ত বেশ সুখ ছিল। তবে কেন সে মরতে গেল?

এ প্রশ্ন একজন নারীর প্রতি অন্য এক নারীর। মিসেস বোল্টন বলল, কি করে তা জানব ম্যাডাম? সে বড় গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ ছিল। সে কোন বিষয়ে কোন কারণে কারো কাছে মাথা নত করত না। এমনি করে শক্ত হতে গিয়ে অনেকেই ভেঙ্গে যায়। আসলে সে খনির ভিতর কাজ করতে যেতে চাইত না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তার বাবাই প্রথমে তার ছেলেবেলা থেকেই তাকে খনিতে কাজ করতে পাঠায়। ছোটবেলায় একবার খনিতে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না।

কনি বলল, কিন্তু সে কি বলত, এ কাজ করতে ঘৃণা হয় তার?

মিসেস বোল্টন বলল, কোন কিছুর প্রতি কোন ঘৃণার কথা মুখে বলত না সে। সে শুধু মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলত। সে একটার বেশী সন্তান চায়নি। কিন্তু তার মা তাকে রোজ রাতে আমার বিছানায় পাঠিয়ে দিত। সে আমাকে ছেড়ে খাদে যেতে চাইত না। আমি রোজ বুঝতে পারতাম যাবার সময় তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তার মৃতদেহটা দেখে মনে হচ্ছিল সে মুক্তি পেয়েছে, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। জীবনে যে মুক্তি সে কামনা করছিল আকুলভাবে জীবনের বিনিময়ে সে মুক্তি কিনে নিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে।

মিসেস বোল্টন কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। তার কান্না দেখে কনির চোখেও

জল এল। বলল, শোকের আঘাতটা তোমার বুকে খুব বেশী লাগে।

মিসেস বোণ্টন বলল, প্রথম প্রথম আমি বুঝতেই পারিনি। রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হত সে আসবে। আমার পাশে এসে শোবে। তার দেহের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে আমার দেহ। এইভাবে কোন নারীর রক্তের ভিতর কোন পুরুষ মিশে গেলে তাকে সে ছাড়তে পারে না, ভুলতে পারে না।

কনি বলল, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে দেহসম্পর্কটা যদি নিবিড় হয়। আচ্ছা, কিন্তু পুরুষ ছাড়া তার স্পর্শের কথাটা কতদিন মনে থাকে, কতদিন বেঁচে থাকে দেহহীন স্পর্শের তাপহীন স্মৃতিটা?

মিসেস বোণ্টন বলল, তার সন্তান তার কথাকে অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি তাকে ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার অনুভূতির মধ্যে তার স্পর্শ এমনভাবে বেঁচে আছে যে আমি তাকে ভুলতে পারিনি। যে সব মেয়েরা কোন পুরুষের দেহের স্পর্শের উত্তাপ তাদের রক্তে কখনো অনুভব করেনি তাদের দেখে দুঃখ হয় আমার, তাতে সে যত ধন ঐশ্বর্য বা পোষাক আশাকের অধিকারিণীই হোক না কেন। তবে আমি আমারটা নিয়েই থাকতে চাই। পরের কথায় বা ব্যাপারে কান দিয়ে বা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

অধ্যায় ১২

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পরেই বনে চলে গেল কনি। আকাশ থেকে অম্লানভাবে ঝরে পড়া উজ্জ্বল আলোয় ভেসে বেড়াচ্ছিল অজস্র ফুলের রং বেরঙের হাসি। প্রথম বসন্তে হলুদ ফুলের উজ্জ্বলতা সব চেয়ে বেশী।

সারা বনভূমি জুড়ে যেন অসংখ্য ফুল ফোটার এক বর্ণাঢ্য সমারোহ চলছিল। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মত কত দিনের অবরুদ্ধ অবদমিত প্রাণচঞ্চলতা শতধারায় ফেটে পড়তে চাইছিল।

বনের ভিতর সেই কুঁড়েটার কাছে গিয়ে কনি দেখল মেলর্স সেখানে নেই। চারদিক একেবারে শান্ত আর স্তব্ধ। বাদামী রঙের কতকগুলো মুরগীর ছানা চড়ে বেড়াচ্ছিল। কনি মেলর্সকে খুঁজছিল। তাই সে সোজা তার বাসায় চলে গেল।

বনের একদিকের প্রান্তভূমিতে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটা। তার পাশের বাগানে কত ড্যাফোডিল আর ডেইজি ফুল ফুটে ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে মেলর্সের কুকুর ফ্লসি এসে হাজির হলো ছুটতে ছুটতে। সে তার লেজ নাড়তে লাগল।

মেলর্স ভিতরে ছিল। সে উঠে দরজার কাছে এল। সে তখনো মুখে কি চিবোচ্ছিল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দরজার কাছে এল।

কনি বলল, ভিতরে আসতে পারি ?

হ্যাঁ, ভিতরে আসুন।

সূর্যের আলো ঘরের ভিতরটাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের উনোনে আগুন জ্বলছিল লাল হয়ে। ভেড়ার মাংসের চপের গন্ধ আসছিল। কেটলিতে জল ফুটছিল। টেবিলের উপর একটা ঝুড়িতে কিছু রুটি ছিল। টেবিলের উপর একটা পাত্রে কিছু আলু আর চপের কিছু অংশ ছিল। খাওয়ার টেবিলের উপর সাদা টেবিলক্লথ পাতা ছিল। মেলর্স দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে।

কনি বলল, তোমার দেরী হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও।

জানালার ধারে যেখানে সূর্যের আলো পড়েছিল সেখানে একটা কাঠের চেয়ারে বসল কনি।

মেলর্স টেবিলে বসে বলল, আমাকে আথওয়েট যেতে হয়েছিল।

সে তার খাওয়া আর শেষ করল না।

কনি বলল, নাও, খেয়ে নাও।

কিন্তু সে তার খাবার আর ছুঁল না। সে কনিকে বলল, আপনি কিছু খাবেন ? এক কাপ চা খাবেন ? কেটলিতে জল ফুটছে।

কনি বলল, তুমি যদি আমাকে চা করতে দাও তাহলে খাব। কনির মনে হলো মেলর্সকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মনে হলো ও হঠাৎ এসে পড়ায় সে বিরক্তিবোধ করছে।

মেলর্স তখন বলল, ঠিক আছে, ঐ দেখুন চায়ের পাত্র, চায়ের টিপট।

কনি চায়ের পাত্রটা নিয়ে গরম জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে জলটা ঘরের বাইরে ফেলে দিতে গেল। ঘরের বাইরেটা সত্যিই চমৎকার। এক নজর দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল কনি। ওক গাছে নতুন হলুদ রঙের পাতা বার হয়েছে। লাল ডেইজি ফুল ফুটে আছে বন আলো করে।

চারদিক শান্ত আর স্তব্ধ। সত্যিকারের সুন্দর বনভূমি বলতে যা বোঝায় তা হলো এই। ঘরের বাইরে দরজার কাছে একটা পাথরের বড় চাপ পড়ে ছিল পা রেখে ওঠানামার জন্য। কনির মনে হলো বাইরের খুব কম লোকই ঐ পাথরখণ্ডটার উপর পা দিয়েছে।

কনি বলল, কী চমৎকার জায়গাটা! কী সুন্দর একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে। এখানে সব কিছু জীবন্ত অথচ কত নীরব।

মেলর্স আবার খেতে শুরু করল। তবে খুব ধীরে এবং অনিচ্ছার সঙ্গে। কনি বেশ বুঝতে পারল লোকটার মধ্যে আগেকার আর সেই উদ্যম বা উৎসাহ নেই যৌন ব্যাপারে। কনি নীরবে চা করে দুটো কাপ টেবিলের উপর রাখল।

কনি জিজ্ঞাসা করল তাকে, তুমি চা খাবে ?

মেলর্স বলল, কাপবোর্ডে চিনি আছে। দুধ আছে একটা পাত্রে।

কনি বলল, তোমার প্লেটটা সরিয়ে নেব ?

মেলর্স রুটিতে মাখন লাগিয়ে খেতে খেতে বলল, আপনার ইচ্ছা হলে নিতে পারেন।

কনির পানে তাকিয়ে একটুখানি ক্ষীণ উপহাসের হাসি হাসল মেলর্স। কনি উঠে গিয়ে কাপবোর্ড থেকে একটুখানি দুধ এনে বলল, এ দুধ কোথা থেকে আন?

মেলর্স বলল, ফ্লিন্টরা দেয়। এক বোতল দুধ তারা সেই জায়গাটায় রেখে দেয় আপনার সঙ্গে যেখানে আমার দেখা হয়েছিল একদিন।

কিন্তু সত্যিই আজ তার কথা বা কাজের মধ্যে কোন উদ্যম বা উৎসাহ নেই। কনি চা ঢালতে লাগল। মেলর্স বলল, আমাকে দুধ দেবেন না।

কানে কোথা হতে একটা শব্দ আসতেই কান খাড়া করে মেলর্স বলল, জানালা দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমাদের।

কনি উত্তর করল, কেউ আসবে না এদিকে। তার কোন দরকার হবে না। দুঃখের বিষয় কেউ এদিকে আসবে না।

অবশ্য কেউ বড় একটা আসে না, হাজারে একটা এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তা জানার কোন উপায় নেই আগে থেকে। বোঝাই যাবে না।

কনি বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। ভারী ত এক কাপ চা খাচ্ছি।

মেলর্স বসে বসেই ফ্লসিকে ডেকে বলল, ফ্লসি, যাও ত কেউ ঢোকে কি না দেখে এস।

কুকুরটা চলে গেল। কনি মেলর্সকে জিজ্ঞাসা করল, আজ তোমার মনটা খারাপ মনে হচ্ছে।

সে তার নীল চোখের স্থির দৃষ্টি কনির উপর মেলে বলল, মনটা খারাপ? না ত। তবে দুজন অনধিকারপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে সমন করাবার জন্য আমায় থানায় যেতে হয়েছিল। আমার কোন লোককে ভাল লাগে না।

কথাগুলো নীরসভাবে কোন রকমে বলল মেলর্স। কনি লক্ষ্য করল তার কণ্ঠের মধ্যে রয়েছে ক্রোধের উত্তাপ।

কনি আবার তাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, তুমি কি তোমার এই কাজটাকে ঘৃণার চোখে দেখ?

শিকার রক্ষকের কাজ? না। আমি যদি একা থাকতে পাই তাহলে কাজটা তত খারাপ লাগে না। কিন্তু আমাকে প্রায়ই থানায় দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। অনেক লোকের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। নানারকম ঝামেলায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

কথাটা বলতে গিয়ে এক ক্ষীণ রসিকতার হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পার না?

আমি? হ্যাঁ পারি, যদি বৃত্তির টাকায় কোনরকমে চালাতে পারি। তাও

আমি ঠিক পারতাম। কিন্তু কাজ না করে আমি থাকতে পারব না। একটা কিছু কাজে আমার ব্যস্ত থাকা চাই। কিন্তু আমার মেজাজটা একটুতেই বিগড়ে যায় বলে আমি নিজের কাজ করত পারব না বেশী দিন। তাই অন্য কারো কাজ আমায় করতে হবে। তাই এখন এই কাজটা একরকম বেশই করে যাচ্ছি। একরকম ভালই আছি···বিশেষ করে সম্প্রতি কিছুকাল·····

কনির দিকে তাকিয়ে সে পরিহাসের ছলে হাসল।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেন তোমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়? তোমার মেজাজটা কি সব সময়ই খারাপ থাকে?

মেলর্স হেসে বলল, হ্যাঁ প্রায় ঠিক তাই। আমার খিটখিটে ভাবটাকে আমি ঠিক দমন করতে পারি না।

খিটখিটে ভাব? সে আবার কি?

খিটখিটে ভাব কাকে বলে তা জানেন না?

কনি চুপ করে রইল। ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছিল সে। সে দিকে কোন খেয়ালই নেই লোকটার।

কনি বলল, আমি পরের মাসে কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

মেলর্স বলল, কোথায়?

ভেনিস।

ভেনিস? স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে নিশ্চয়। কত দিনের জন্য?

কনি বলল, একমাস বা তার কিছু বেশী দিনের জন্য। ক্লিফোর্ড যাচ্ছে না।

মেলর্স জিজ্ঞাসা করল, উনি এখানে থাকবেন?

হ্যাঁ, এই অবস্থায় ও দেশভ্রমণে যেতে চায় না।

সহানুভূতির সঙ্গে মেলর্স বলল, হায় হতভাগ্য শয়তান!

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

কনি বলল, আমি চলে গেলে আমার কথা নিশ্চয় ভুলে যাবে না? যাবে কি?

কনির পানে চোখ তুলে স্থির আয়ত দৃষ্টিতে তাকাল মেলর্স। তারপর বলল, ভুলে যাব? আপনি জানেন লোকে এসব জিনিস ভোলে না। এসব জিনিস জোর করে মনে রাখতে হয় না।

কনি বলতে চাইছিল, 'তারপর?' কিন্তু বলল না তা। তার পরিবর্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি ক্লিফোর্ডকে বলেছি আমার সন্তান হতে পারে।

এবার মেলর্স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনির পানে তাকিয়ে বলল, তুমি বলেছ? উনি কি বললেন?

কনি বলল, উনি কিছু মনে করবেন না। সন্তানটি যদি ওঁর সন্তান বলে পরিচিত হয় তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই ওঁর।

মেলর্সএর পানে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না কনি। অনেকক্ষণ

চুপ করে থাকার পর মেলর্স কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমার নাম করনি ত ?

কনি উত্তর করল, না, তোমার নাম করিনি।

মেলর্স বলল, না। আমাকে উনি সে সন্তানের জন্মদাতা বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। তাহলে কোথা থেকে সে সন্তান পাবে তাঁকে বলেছ ?

কনি বলল, আমি তাকে বলেছি আমি ভেনিসে কারো প্রেমে পড়তে পারি।

মেলর্স ধীর কণ্ঠে বলল, তা পার। সেই জন্যই তুমি যাচ্ছ।

কনি মেলর্সএর মুখপানে নম্রভাবে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ার জন্য নয় কিন্তু।

মেলর্স বলল, প্রেমে পড়ার ভান।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল। মেলর্স জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। তার মুখে কিছু তিক্ততা আর কিছু উপহাসের একটা অদ্ভুত এক মিশ্র ভাবের হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি দেখে একটা ঘৃণার ভাব জাগল কনির মনে।

হঠাৎ মেলর্স জিজ্ঞাসা করল, যাতে ছেলে না হয় তার জন্য তুমি তাহলে সাবধান হওনি। আমি নিজেও হইনি।

কনি বলল, না, এসব কাজ আমি ঘৃণা করি।

তাহলে তুমি আমাকে সন্তানের জন্যই চেয়েছিলে ?

একটু চুপ করে থাকার পর কনির পানে তাকিয়ে ক্ষীণ সূক্ষ্ম এক হাসি হেসে মেলর্স কথাটা বলল।

কনি বলল, তা ঠিক নয়। সত্যিই তা নয়।

মেলর্স বলল, তাহলে কোনটা সত্যি ?

তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ছিল। কনি তার পানে তিরস্কারের একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে বলল, আমি তা জানি না।

মেলর্স জোর হেসে উঠে বলল, তাহলে আমি বোকার মত একাজ করেছি।

এরপর দুজনেই চুপ করে রইল। হিমশীতল এক অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল দুজনের মধ্যে।

মেলর্স অবশেষে বলল, ঠিক আছে, তোমাদের চাকর আমি, তুমি যা চাও তাই হবে। তুমি যদি সন্তান পাও আর স্যার ক্লিফোর্ড যদি সে সন্তান বরণ করে নেয় তাহলে আমার তাতে ক্ষতি কিসের ? তাছাড়া এতে আমার এক সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ হবে।

তার মুখের কোণে একফালি চাপা হাসি ফুটে উঠল। বলল, তুমি আমাকে যেমন প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছ তেমনি আগেও অনেকে তাই করেছে। তবে এটা ঠিক যে এবারকার অভিজ্ঞতায় আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি। অবশ্য এতে গৌরব বা মর্যাদাবোধের কিছু নেই।

মুখটা চেপে গাটা এলিয়ে দিল সে।

কনি অনুনয়ের সুরে বলল, প্রয়োজনের খাতিরে আমি তোমায় ব্যবহার করিনি।

মেলর্স বলল, ম্যাডামের ভৃত্য আমি।

কনি বলল, না তোমার দেহটাকে আমার ভাল লেগেছিল।

মেলর্স হাসল। হেসে বলল, তাই নাকি? তাহলে আমাদের দুজনের ত ঐ একই অবস্থা। তোমার দেহটাকে আমারও ভাল লাগে।

এবার কনির পানে অদ্ভুতভাবে তাকাল মেলর্স। চাপা গলায় বলল, এখন একবার উপরে যাবে?

কনি ভারী গলায় বলল, না, এখন নয়, এখানে নয়।

কথাটা বলে ফেললেও মেলর্স যদি জোর করত তাহলে কনি বাধা দিতে পারত না। কারণ মেলর্সএর গায়ের জোরে ও পেরে উঠতে পারত না।

মেলর্স মুখটা অন্য দিকে তাকিয়ে তাকে যেন ভুলে যাবার চেষ্টা করল।

কনি বলল, আমি কখনো নিজে থেকে তোমার দেহ স্পর্শ করিনি। তুমি আগে স্পর্শ করেছ, তারপর আমি করেছি।

কনির পানে তাকিয়ে আবার এক মদির হাসি হাসল। বলল, এখন একবার?

কনি বলল, না না, এখানে না, সেই কুঁড়েটায়। কিছু মনে করবে না ত?

মেলর্স বলল, আমি ত তোমার দেহ সব সময় স্পর্শ করি না।

কনি বলল, যখনি তুমি আমার কথা মনে করো তখনি মনে মনে আমার দেহটা স্পর্শ করা হয়।

মেলর্স তখন জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমার কথা মনে করলে বা তোমায় স্পর্শ করলে তোমার ভাল লাগে?

কনি বলল, হ্যাঁ, তোমার লাগে?

মেলর্স বলল, আমার? লাগে মানে? একথা জিজ্ঞাসা করতে হয়? তুমি নিজেই বুঝতে পারছ এ কথার উত্তর কি হতে পারে।

কনি উঠে দাঁড়িয়ে টুপীটা হাতে নিয়ে বলল, আমাকে অবশ্যই এখন যেতে হবে।

মেলর্স শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যাবে?

কনির ইচ্ছা হচ্ছিল মেলর্স তার দেহটা জড়িয়ে ধরুক, তাকে থাকতে বলুক।

কিন্তু সে কিছুই করল না। শুধু ভদ্র ও শান্তভাবে স্থির হয়ে রইল

কনি বলল, তুমি আমাকে চা খাইয়েছ এজন্য ধন্যবাদ।

আমার চায়ের পাত্রটা স্পর্শ করার জন্য আমিও ম্যাডামকে ধন্যবাদ দিতে পারি।

কনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পথ ধরল। মুখে একফালি ক্ষীণ হাসি নিয়ে

তার চলার পানে তাকিয়ে রইল মেলর্স। ফ্লসি তার লেজটা তুলে তার সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে এল। কনি ধীর গতিতে বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। সে বেশ বুঝতে পারল যেতে যেতে লোকটা তার পিছনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুখে এক দুর্বোধ্য হাসির ক্ষীণ রেখা নিয়ে।

একই সঙ্গে বুকে একরাশ অব্যক্ত বিষাদ আর বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলে কনি। সে তাকে প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছে, তার মুখ থেকে এ কথাটা শুনে দুঃখ পেয়েছে সে মনে। কথাটা অবশ্য ঠিক। তবু একথা বলা তার উচিত হয়নি। একদিকে তার উপর একটা রাগ আর অন্যদিকে তাকে বুঝিয়ে ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করার একটা ইচ্ছা—এই দুই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল সে।

মনে অস্বস্তি আর রাগ গিয়ে কোন রকমে চা খাওয়া সেরেই উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেল সে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। সে বসে থাকতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তাকে কিছু একটা করতে হবে। সে আবার সেই কুঁড়েটাতে যাবে সে থাক বা না থাক।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি। মনে কিছুটা রাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে বনের পথ ধরল। সেই পরিষ্কার জায়গাটায় গিয়ে দেখল লোকটা খাঁচা থেকে মুরগী বার করছে। মুরগীগুলোর সঙ্গে আছে অসংখ্য ছোট ছোট বাচ্চা।

সোজা মেলর্সএর কাছে গিয়ে কনি বলল, দেখছ, আমি আবার এসেছি।

মেলর্স কণ্ঠে কৌতুকের ভাব মিশিয়ে বলল, তাইত দেখছি।

কনি বলল, মুরগীগুলো বার করছ?

হ্যাঁ, মুরগীগুলো এমনভাবে ডিমগুলোর উপর বসে তাতে তা দিচ্ছে যে ওদের খাবার কথাও ভুলে গেছে।

কনি দেখল সত্যিই মুরগীমাতাগুলোর কী অসাধারণ নিষ্ঠা তাদের ডিমগুলোর উপর। তারা শুধু নিজের নয় অপরের ডিমগুলোতেও তা দিয়ে ডিমের উপর লেপ্টে বসে আছে। কিছুক্ষণ নীরবে তা দেখতে লাগল কনি।

মেলর্স এক সময় জিজ্ঞাসা করল, কী, আমরা ঘরটার মধ্যে যাব?

কনি অবিশ্বাসের সুরে বলল, তুমি আমাকে চাও?

যদি তুমি ঘরে এস।

কনি চুপ করে রইল। মেলর্স বলল, এস তাহলে।

তার সঙ্গে ঘরটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল কনি। মেলর্স ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠল ঘরখানা। আগের মত লণ্ঠনের আলোটা জ্বালল। তারপর কনিকে বলল, তোমার নিম্নাঙ্গের পোষাকগুলো খুলেছ?

কনি বলল, হ্যাঁ, খুলেছি।

আমিও তাহলে খুলে ফেলছি।

মেলর্স কম্বলটা মেঝের উপর পাতল। কনি তার মাথার টুপীটা খুলে মাথার চুলটা হাত দিয়ে সরিয়ে বসল তার উপর। মেলর্সও বসে তার জুতো ও পোষাক খুলতে লাগল।

মেলর্স বলল, এবার শুয়ে পড়।

সে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর কনি নীরবে তার কথামত শুয়ে পড়ল। মেলর্স শুয়ে পড়ে ওদের দুজনের উপর একটা কম্বল টেনে দিল। তারপর কনির জামা সরিয়ে তার বুকটা খুলে ফেলল। এক লঘু শৃঙ্গারের ভঙ্গিতে তার স্তনাগ্রভাগদুটো মুখ দিয়ে চেপে ধরল। কনির পেটের উপর মুখটা ঘষতে ঘষতে বারবার বলতে লাগল মেলর্স, বড় সুন্দর, বড় চমৎকার।

কনিও এবার মেলর্সএর জামাপরা গাটা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার শক্ত পেশীবহুল নগ্ন গাটার কথা ভেবে ভয় পেয়ে উঠল কনি।

মেলর্স যখন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কী সুন্দর' তখন কনির মধ্যে তার অন্তরাত্মার গভীরটা কেঁপে উঠল, এক অব্যক্ত প্রতিবাদে কঠিন হয়ে উঠল। লোকটা তার দেহটা যতই পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল ততই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল তার মনের ভিতরটা। শত তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও তার কামাবেগ তার মনের এই বিচ্ছিন্নতাকে জয় করতে পারল না। সে স্থির হয়ে জড়বস্তুর মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল আর মেলর্সএর দেহটা এক তীব্র সক্রিয়তার সঞ্চালিত হতে লাগল তার উপর। এই সঞ্চালনকালে তার ধনুকের মত বাঁকা পিঠটা দেখে হাসি পাচ্ছিল কনির। আবার তার যোনিগর্ভ হতে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে আসার জন্য তার জননাঙ্গের যে উত্তপ্ত প্রয়াস সেটাও সমান হাস্যাস্পদ। কনির সহসা মনে হলো হাস্যাস্পদ হলেও এই উত্তেজিত দেহ-সঞ্চালন, এই লালারসসিক্ত পুরুষাঙ্গের ক্ষণকালীন উচ্ছ্বাসই হলো প্রেম। ভালবাসা বলে যদি কোন জিনিস থাকে তবে তার সকল রহস্য নিহিত আছে এর মধ্যে। এই তুচ্ছ, অসহায় ক্ষণোচ্ছ্বাসসর্বস্ব পুরুষাঙ্গই হচ্ছে স্বর্গীয় প্রেম। অথচ আধুনিককালের বুদ্ধিজীবীরা এই রতিক্রিয়ার এই ব্যাপারটাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা এই কাজটাকেই ঘৃণা করে। কোন কবি বলেছেন, ঈশ্বরের রসিকতাবোধ আছে। তিনি মানুষকে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে এমন এক অন্ধ কামাবেগ সঞ্চারিত করেছেন যা পরিতৃপ্ত করার জন্য তাকে রতিসুখসারসম্বলিত এই বিশেষ ভঙ্গিমায় একবার করে বসতেই হবে। মানুষ এই সঙ্গমের কাজটাকে মুখে ঘৃণা করলেও এর থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না নিজেকে কিছুতেই।

কনির দেহটা লোকটার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও তার মনটা দূরে সরে গিয়েছিল। সে স্থির ও অনড়ভাবে শুয়ে থাকলেও তার মন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিল। লোকটার কুৎসিত দেহের স্পর্শ আর তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছিল সে। যেন দেহগত পূর্ণতা লাভ

করতে পারেনি লোকটা। অন্য সব লোকের মতই সে কোন নারীদেহের সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া থাকতে পারে না। আর অপূর্ণ বলেই কুৎসিত তার দেহটা।

কাজটা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির হয়ে শুয়ে রইল কনির বুকের উপর। নীরব নিশ্চল হয়ে রইল একেবারে। কনির মনে হলো লোকটা তার গায়ের উপর শুয়ে থাকলেও আসলে সে অনেক দূরে চলে গেছে। এমন কি তার চেতনার দিগন্ত থেকে অনেক অনেক দূরে এক অন্তহীন প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিস্পন্দ হয়ে আছে যেন। কনির সমস্ত অন্তরটা কেঁদে উঠল। সে অনুভব করল লোকটা চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে। ভাটাপড়া অপস্রিয়মান জলস্রোতের মত সে চলে যাচ্ছে আর ও নিজে পরিত্যক্ত এক পাথরখণ্ডের মত নির্জন উপকূল-ভাগে পড়ে আছে। লোকটার দেহটাই শুধু কনির দেহটাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না ; তার সমগ্র অন্তরাত্মাটাও যেন সেই সঙ্গে চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে।

কনি তার দ্বৈত চেতনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কাঁদতে লাগল। কিন্তু লোকটা তা দেখল না। সেদিকে কোন নজর দিল না। ফলে তার কান্নাটা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে তাকে জোর কাঁপাতে লাগল।

লোকটা বলল, তুমি যখন এখানে আসনা তখন খুব খারাপ লাগে।

কনি আরো জোরে কেঁদে উঠল।

লোকটা বলল, কি হলো তোমার। এতে কান্নার কি আছে? এ সব ব্যাপার ত আর রোজ হয় না, হয় কখনো কেমনে।

কনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না।

তার অন্তরটা সত্যিই যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

কনির বুকের উপর হাত দিয়ে লোকটা তখনো শুয়ে ছিল তার উপর কিন্তু কনি লোকটার উপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল।

লোকটার কথায় কিছুটা সান্ত্বনা ছিল। তবু সে কাঁদতে লাগল জোরে।

মেলর্স বলল, না না, কাঁদবে না। এর ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে।

কনি তবু ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, তবু পারছি না। এটা ভয়ঙ্কর লাগছে আমার কাছে।

একই সঙ্গে তিক্ততা ও রসিকতা মিলিয়ে মেলর্স হাসল। হেসে বলল, তুমি যাই ভাব না কেন, এটা মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। এই ভালবাসার চিন্তা থেকে তুমি সহজেই মুক্ত করতে পার নিজেকে। সব মানুষ ত সমান না। সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে না।

কনির বুক থেকে এবার হাতটা সরিয়ে নিল মেলর্স। তার স্পর্শ থেকে এবার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলো কনি। সঙ্গে সঙ্গে এক বিকৃত অর্থহীন তৃপ্তি পেল। লোকটার দেহাতী ভাষা তার ভাল লাগছিল না। তার উপর লোকটা এখনই উঠে দাঁড়িয়ে তারই সামনে পোষাক পরবে। মাইকেলিস তবু

তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াত। কিন্তু ওর শালীনতাবোধ নেই। ওর নগ্ন মূর্তি দেখে কে কি ভাবছে সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই।

তথাপি লোকটা যখন সত্যি সত্যিই কনির পাশ থেকে উঠে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ তাকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরল কনি। কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, চলে যেও না, আমাকে ফেলে চলে যেও না, রাগ করো না আমার উপর। আমাকে জড়িয়ে ধর, আমাকে জোরে জড়িয়ে ধর।

এক অন্ধ উন্মত্ততার সঙ্গে কথাগুলো বলল কনি। কিন্তু কি বলল তা সে নিজেই জানে না। এক অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছিল যেন কনির উপর আর সেই শক্তি দিয়ে মেলর্সকে জড়িয়ে ধরল কনি। আসলে যে প্রতিরোধবাসনা, যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ তার মধ্যে তার থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল সে। কিন্তু সে বাসনা সে প্রবণতা এমনই প্রবল যে তার থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পেল না।

মেলর্স আবার দুহাত দিয়ে কনিকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর টেনে নিল তাকে। তার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে খুব ছোট দেখাচ্ছিল কনিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিরোধবাসনাটা দূর হয়ে গেল অন্তর থেকে। আর তার সমগ্র সত্তাটা গলে গিয়ে যেন সহসা শান্তির সমুদ্র হয়ে উঠল। মেলর্সএর তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে কনির দেহটা যখন গলে নরম হয়ে গেল আশ্চর্যভাবে তখন তার খুব ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহের মেদুর মর্মভেদী কমনীয়তার প্রতি শান্ত অথচ নিবিড় এক কামনার অসহনীয় উত্তাপে তীব্র দেহের প্রতিটি শিরার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল যেন। সেই অদম্য অথচ শান্ত কামনার এক মেদুর তাড়নায় মেলর্স তার হাতটা কনির পাছায় বোলাতে লাগল। ক্রমে হাতটা তার তলপেটের উপর দিয়ে যোনিদেশ পর্যন্ত চলে গেল। কনির মনে হলো লোকটা যেন কামনার এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে সহসা। জ্বলন্ত হলেও সে কামনা বড় স্নিগ্ধস্পর্শী, তার ছোঁয়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না নিজের মধ্যে। নিঃশেষে গলে গেল তার সমগ্র নারীসত্তা।

এদিকে আবার জেগে উঠেছে লোকটার রতিক্লান্ত ও অবনতমুখী পুরুষাঙ্গটা। তার কঠিন আঘাতের আশ্চর্য শক্তি দেখে মৃত্যুভয়ে ভীত কোন প্রাণীর মত কেঁপে উঠতে শুরু করেছে কনির সর্বাঙ্গ। নিজেকে নিঃশেষে উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে দিল সে লোকটার কাছে। তবে মনে মনে বলল তার এই অকুণ্ঠ উন্মোচনে ও নিঃশেষিত সমর্পণে যেন খুব বেশী নির্মম না হয় লোকটা।

কিন্তু তার পুরুষাঙ্গটা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। বড় ভয়ঙ্করভাবে নিষ্ঠুর। তার মধ্যে তার অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশের দুর্দমনীয় দৃঢ়তায় কনির মনে হলো যেন একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ভেদ করল তার দেহটাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বড় শান্তি পেল কনি। সৃষ্টির আদিতে যে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি ঢেকে রেখেছিল শিশু

বিশ্বকে সেই আদিম প্রশান্তির এক প্রাণবন্যা ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার বুকের মধ্যে। সে বন্যার উত্তাল ব্যাপ্তি আর সচঞ্চল প্রসারতায় নিজের সব কিছু ভাসিয়ে দিল কনি নিঃশেষে। কোন কিছুই ধরে রাখল না নিজের মধ্যে।

কনির মনে হলো তার গোটা সত্তাটা যেন সহসা এক সমুদ্র হয়ে উঠেছে। এক অন্ধকার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে তার বুকের মাঝে। শুধু অসংখ্য উত্তাল তরঙ্গমালার সর্পিল খেলা ছাড়া আর কিছু নেই তার মধ্যে। তার মনে হলো, তার সেই অতল অন্ধকার সমুদ্রের তল খোঁজার জন্য ক্রমশই সে তার মধ্যে নেমে চলেছে। সে যতই নামছে ততই সে সমুদ্রটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, ততই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে তার অতলান্তিক গভীরতা। তারপর অবশেষে এক প্রবল আলোড়ন আর কম্পনের মধ্য দিয়ে সে যখন সত্যি সত্যিই তার তল খুঁজে পেল, সে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে শায়িত সত্তার অদৃশ্য প্রান্তভূমিটিকে স্পর্শ করল তখন সে স্পর্শের বিরল অনুভূতির অতলে কনি নিজেও তলিয়ে গেল। সে আর নিজের মধ্যে নিজে রইল না। এ অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব, এ পুলক অননুভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে যেন নবজন্ম লাভ করল। সত্যিকারের নারী হয়ে উঠল।

কী সুন্দর! কী সুন্দর! যতই স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল রতিক্রিয়ার সমস্ত তৎপরতা, যতই কমে আসতে লাগল আবেগের প্রচণ্ডতা ততই আরও ভাল লাগল তার। কনি তখন তার দেহের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে মনের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সেই অচেনা অজানা লোকটার দেহটাকে জড়িয়ে ধরল, এক প্রচণ্ড প্রমত্ততার পর তার যোনিগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা শিথিল হয়ে যাওয়া তার পুরুষাঙ্গটাকেও জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হলো কনির। কত সুন্দর এই সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন নরম মাংসপিণ্ডটি কনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র শূন্যতা ক্ষতির এক বেদনা অনুভব করল সে। সে তার প্রাণের সব ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিল যেন এই গোপন পুরুষাঙ্গটির উপর।

এক সুকোমল কুসুমকোরকের মত এই পুরুষাঙ্গটির গোপন সৌন্দর্যের প্রতি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল কনি। এক অব্যক্ত বিস্ময়ের অস্ফুট একটা ধ্বনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল তার নারীমনের গভীর থেকে। বহু রমণক্ষম এই বস্তুটি কত প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েও কত দুর্বল, কত শিথিল, কত সংকুচিত হয়েও কত প্রসারণপটু।

অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল কনি, কী সুন্দর, সত্যিই কি সুন্দর।

কিন্তু মেলর্স কিছুই বলল না। শুধু তার বুকের উপর নীরবে শুয়ে থেকে তার মুখটাকে চুম্বন করল। সদ্যজাত এক প্রাণীর মত তার কণ্ঠ থেকে বিস্ময়বিমিশ্রিত আনন্দের এক অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল।

এবার লোকটার কথা ভাবতে গিয়ে বড় অদ্ভুত মনে হলো তাকে। লোকটাকে সে ভাল করে না চিনলেও তার পুরুষত্বের এক আশ্চর্য স্পর্শ আজ

তার সর্ব অঙ্গের প্রতিটি জীবকোষে অনুভব করেছে। এখনো তার গায়ে জড়িয়ে আছে তার হাতদুটো। এখনো ভয় করছে। ভয় করছে তার সেই ছোট্ট পুরুষাঙ্গটাকে যা সহসা এক প্রচণ্ড পৌরুষে ফেটে পড়ে আঘাতে আঘাতে এক তীব্র আলোড়ন তোলে তার দেহাভ্যন্তরে গিয়ে।

কনি এবার তার হাতদুটো লোকটার পিঠ থেকে নামিয়ে তার পুরুষাঙ্গটাকে স্পর্শ করল। এই উত্তপ্ত ও প্রাণবন্ত বস্তুটাকে স্পর্শ করার মধ্যে যে এমন অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে কনি তা আগে বুঝতে পারেনি। অথচ আগে এই বস্তুটাকেই কত ঘৃণা করেছে সে। জীবনের মধ্যে এ যেন আর এক জীবন। কী মনোরম আর প্রাণবন্ত সৌন্দর্য। দুটো উরুর মাঝখানে ও পুরুষাঙ্গটার দুপাশে গোলাকার অণ্ডকোষদুটোকেও হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কনি। কত নরম অথচ ভারী। সকল সৌন্দর্যের উৎসস্বরূপ সকল প্রাণের অপার রহস্য যেন ভরে আছে ছোট্ট এই গোলাকার বস্তুদুটোর মধ্যে।

সহসা ভয়ে আবার দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। লোকটা কোন কথা বলছে না, শুধু তাকে নিবিড় হতে নিবিড়তরভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। তার এই নিবিড়তা দেখে ভয় পেয়ে গেল কনি আবার। কনিও তাকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। সহসা অনুভব করল কনি লোকটার স্থির হয়ে থাকা দেহের আপাতস্তব্ধতার অন্তরালে তার পুরুষাঙ্গটা আবার জেগে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অন্তরটা ভয়ে গলে গেল।

ঠিক এই সময় কনির সমস্ত সত্তাটা এমন নরম ও অশক্ত হয়ে পড়ল যে কোন চেতনা তাকে ধারণ করতে পারল না। তার মধ্যে যেন কোন চেতনা নেই। তার সমগ্র অন্তরাত্মা চেতনাহীনভাবেই কাঁপতে লাগল। কিন্তু সে মোটেই বুঝতে পারল না কেন সে কাঁপছে। কিন্তু সে যাই হোক, তার বড় ভাল লাগছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল এ কম্পন পুলকের রোমাঞ্চ। এ কম্পন এ রোমাঞ্চ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল তা সে বলতে পারবে না। শুধু জানল কিছুক্ষণ পরেই ও স্থির হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল লোকটা। অপরিমেয়ভাবে গভীর এক নীরবতায় ও স্তব্ধতায় বিলীন হয়ে গেল ওরা দুজনেই।

যখন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে চেতনাটা জাগল কনির মধ্যে তখন সে মরীয়া হয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। মুখ থেকে তার আপনা হতে বেরিয়ে এল, 'হে আমার প্রিয়তম, আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি আমি তোমায়।' লোকটাও নীরবে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার বুকের মধ্যে নিঃশেষে হারিয়ে গেল কনি।

লোকটাও কনিকে চুম্বন করে বলল, তুমি আমার, আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

কনি চুপি চুপি বলল, তুমি আমাকে ভালবাস ত?

লোকটা দেহাতী ভাষায় বলল, তুমি তা ভালই জান।

কনি বলল, তুমি স্পষ্ট করে তা বল।

সে বলল, সত্যিই আমি তা অনুভব করি।

ভালবাসার দিক থেকে সত্যিই লোকটা বড় শান্ত, বড় আত্মস্থ, কনির মত আবেগের কোন উচ্ছ্বাস নেই তার মধ্যে। কনি শুধু ওর প্রতি তার ভালবাসার পরিমাণটাকে মাপতে চাইছিল।

কনি আবার চুপি চুপি বলল, তুমি আমাকে ভালবাস, আরো ভালবাস।

মেলর্স শুধু নীরবে কনির গায়ের উপর হাত বোলাতে লাগল। কনি যেন সুন্দর সুগন্ধি একটা ফুল। তার মধ্যে কনির মত যেন কোন অশান্ত কামনার কোন কম্পন নেই, কোন চঞ্চলতা নেই। কনি যেন এক অবুঝ আবেগের বশবর্তী হয়ে তার ভালবাসাটাকে হাতের মুঠোয় ধরতে চাইছিল।

কনি আবার বলল, সারাজীবন তুমি আমায় ভালবেসে যাবে।

তা শুনে লোকটা অন্য মনে বলল, হ্যাঁ।

কনির মনে হলো তার এ প্রশ্ন তার মনটাকে যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে।

লোকটা অবশেষে বলল, এবার আমরা উঠব নাকি?

কিন্তু কনি বুঝতে পারল লোকটার কান বাইরের জগতের শব্দ শোনার জন্য খাড়া হয়ে উঠেছে।

লোকটা বলল, অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

তার কণ্ঠে কনি কাজের চাপের আভাস পেল। বুঝল এবার সে উঠে যাবে। কনি তাকে চুম্বন করল বিদায়ের ভঙ্গিতে।

মেলর্স এবার পোষাক পরতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের আলোটা সরিয়ে নিল। পোষাক পরতে পরতে কনির পানে বিস্ফারিত চোখে তাকাতে লাগল। হঠাৎ কনির মনে হলো, লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় লোকটার মুখচোখ, মাথার চুল সব অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন সুন্দর সে কখনো দেখেনি আগে। কনির মনে হলো, কেমন যেন রহস্যময় দূর-দূর ভাব সব সময়ের জন্য ঘিরে আছে লোকটাকে। তাদের দুজনের মধ্যে বিরাজ করছে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন দূরত্বের এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। সে যেন কোনদিনই পরিপূর্ণভাবে পাবে না লোকটাকে।

এদিকে কনি যখন সেই কম্বলটার উপর উলঙ্গ হয়ে পিঠটা বাঁকিয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিল তখন তার নরম দেহটার দিকে তাকাতেই তাকে খুব সুন্দর দেখাল মেলর্সের চোখে। সেও হঠাৎ বলে উঠল, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি এবং এ ভালবাসার জন্য তোমার জন্য আমি যে কোন কাজ করতে পারি, যে কোন জায়গায় যেতে পারি।

কনির অন্তরটা লাফাচ্ছিল। সে বলল, তুমি আমাকে সত্যিই পছন্দ করো?

সে বলল, আমি তোমাকে সত্যিই এত ভালবাসি যে তোমার জন্য যে কোন কাজ করতে পারি।

এবার বসে কনির নগ্ন নরম পাঁজরের উপর গাল ও মুখটা ঘষতে লাগল লোকটা।

কনি বলল, তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না?

লোকটা বলল, একথা জিজ্ঞাসা করো না।

কনি বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি একথা বিশ্বাস করো?

সে বলল, তুমি আমাকে প্রথম আজ ভালবাসলে এখন। এইমাত্র। এর আগে কখনো ভালবাসনি আমায়। তবে জানি না কখন কি ঘটবে, ওরা এসব জানতে পারবে?

কনি বলল, ওসব কথা বলো না। আর তুমি কখনই একথা মনে করো না যে আমি তোমাকে প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছি।

তার মানে?

তার মানে সন্তানের জন্য।

মেলর্স মোজা পরতে পরতে বলল, আমার সন্তান যে কেউ ধারণ করতে পারে।

কনি বলল, না, একথা বলো না।

কনির পানে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে মেলর্স বলল, ঠিক আছে।

কনি তখনো শুয়েছিল। ধীরে ধীরে দরজা খুলল মেলর্স। তখন কালো হয়ে উঠেছে নীল আকাশখানা। দরজা খুলে বাইরে গেল মেলর্স মুরগীগুলোকে ঘরে ঢুকিয়ে রাখার জন্য। কনি তখনো তেমনি শুয়ে শুয়ে মানবজীবন ও সত্তার এক পরম বিস্ময়ের কথা ভাবতে লাগল।

কাজ সেরে মেলর্স যখন ফিরে এল ঘরের মধ্যে তখনো শুয়ে ছিল কনি। মেলর্স তার পাশে একটা টুলের উপর বসল। তারপর কনির পানে চোখ তুলে তার দুটো হাঁটুর মাঝখানে হাত রেখে বলল, একদিন রাতে তুমি আমার বাসায় চলে এস। রাতে সেখানেই থাকবে আমার কাছে।

রসিকতার সুরে ওর দেহাতী কথাটার অনুকরণ করে কনি বলল, থাকব?

মেলর্স হাসল। বলল, হ্যাঁ থাকবে। আমার কাছে শোবে, ঘুমোবে। এখন আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে। কখন আসবে?

কনি বলল, কখন আসব?

মেলর্স বলল, না, তুমি আসতেই পারবে না। কখন আসছ তাহলে?

কনি বলল, প্রায় রবিবার।

মেলর্স হেসে প্রতিবাদের সুরে বলল, না। তুমি আসতে পার না।

কনি বলল, কেন পারি না?

কনি ওর কথা নকল করায় মেলর্স হেসে উঠল। বলল, তুমি খুব ভাল মেয়ে।

কনিও হেসে বলল, ভাল মানে?

মেলর্স বলল, ভাল মানে জান না? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করার সময়

তোমার কাছ থেকে যা পাই। আবার আমার কাছ থেকে তুমি যা পাও

কনি উপহাসের ভঙ্গিতে বলল, তোমার ভাল মানে তাহলে যৌন মিলন ?

মেলর্স বলল, না যৌন মিলন পশুদেরও হয়। তুমি তার থেকে বড় নিশ্চয় এবং সেইখানেই তোমার নারী জীবনের আসল সৌন্দর্য।

কথা বলতে বলতে টুলের উপর কনির মুখে হাত বোলাচ্ছিল মেলর্স। কনি এবার উঠে মেলর্স-এর কপালে চুম্বন করল। মেলর্স তখন চোখদুটো তুলে কনির পানে তাকিয়েছিল। তার চোখগুলো বেশ কালো নরম আর অনির্বচনীয়ভাবে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কনি বলল, তাই নাকি ? আমি খুব ভাল ? তুমি আমার কথা মনে করো ?

মেলর্স কোন কথা না বলে কনিকে চুম্বন করল। তারপর বলল, তুমি যাবে এবার ? তোমাকে বিদায় দিই।

এই বলে মেলর্স কনির পায়ে হাত বোলাতে লাগল। তার সে স্পর্শের মধ্যে তখন কোন কামনার উত্তাপ ছিল না, শুধু এক শান্তনিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল।

অবশেষে কনি যখন গোধূলিবেলায় বাড়ি পৌঁছল তখন স্বপ্নের মত মনে হলো তার সমস্ত পৃথিবীটাকে। পার্কের গাছগুলোকে মনে হলো জোয়ারের জলে প্লাবিত কোন সমুদ্রবন্দরে নোঙর করা জাহাজ আর তাদের বাড়ির কাছে বন্ধুর জমির উৎরাইটা এক জীবন্ত উত্তাল ঢেউ।

অধ্যায় ১৩

রবিবার দিন ক্লিফোর্ড বনে যেতে চাইল সেদিন সকালটা ছিল বড় সুন্দর। সাদা সাদা পিয়ার ফুল ফুটেছে সারা বনভূমি জুড়ে।

যখন ফোটা ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে বসন্তের পৃথিবী তখন ক্লিফোর্ডকে একটা চেয়ার থেকে উঠিয়ে অন্য এক চেয়ারে ধরে বসিয়ে দিতে হচ্ছে। এটা সত্যিই নিষ্করুণ নিয়তির এক নিষ্ঠুর বিধান। কিন্তু ক্লিফোর্ড তার জন্য কিছু মনে করে না। বরং তার এই পঙ্গুত্বের জন্য এক ধরনের গর্ববোধ করে। এখনো কনিকে তার পা দুটো ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে দিতে হয়। কনি কাছে না থাকলে মিসেস বোল্টন বা ফিল্ডকে তা করতে হয়।

কনি উঁচু জায়গাটায় অপেক্ষা করছিল। ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা ধীর গতিতে উঁচু পথটায় উঠতে লাগল। অবশেষে চেয়ারটা কনির কাছে এলে ক্লিফোর্ড বলল, স্যার ক্লিফোর্ড তার তেজী ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে উঠছে।

কনি হেসে বলল, কিন্তু অতি কষ্টে।

ক্লিফোর্ড একবার থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে র‍্যাগবির প্রাসাদটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, কই র‍্যাগবি আমাকে দেখে দুঃখে চোখের পাতা

ফেলছে না। ফেলবেই বা কেন। আমি দেহের দিক থেকে পঙ্গু হলেও মানুষের মনের কৃতিত্বের চূড়ার উপর উঠে চলেছি। আর এই উৎক্রমণ যে কোন ঘোড়াকে হার মানিয়ে দেবে।

কনি বলল, আমারও তাই মনে হয়। একদিন প্লেটোর যে সব আত্মারা দু ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে স্বর্গে যেত আজ তারা ফোর্ড গাড়িতে করে যাবে।

ফোর্ড কি, রোলস রয়েস বল। প্লেটো নিজেও একজন অভিজাত সমাজের লোক ছিলেন।

কনি বলল, ঠিক। প্লেটো তাঁর আমলে ভাবতেই পারেননি, সাদা বা কালো ঘোড়ায় টানা গাড়ির কোন প্রয়োজন হবে ভবিষ্যতে। চাই এঞ্জিন, বাষ্পযান।

ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ, এঞ্জিন আর গ্যাস সব কাজ করবে। আমার মনে হয় আগামী বছরে পুরনো জায়গাটার কিছু মেরামৎ করা যাবে। আমার যতদূর মনে হয় হাজার পাউণ্ড খরচ হবে।

কনি বলল, খুব ভাল হবে। তবে যদি আর ধর্মঘট না হয়।

ক্লিফোর্ড বলল, আবার ধর্মঘটের প্রয়োজন কি তা বুঝি না। শুধু সমগ্র-ভাবে শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। এর পরিণাম কি হবে? নিশ্চয় রাতপেঁচারা এর মাধ্যমে কোন কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে।

কনি বলল, তারা শিল্পের ক্ষতিটার কথা ভাবছে না।

কনি বলল, বোধহয় শিল্পের ক্ষতির ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করে না ওরা।

ক্লিফোর্ড বলল, মেয়েছেলের মত কথা বলো না। এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের পেট ভরায় ঠিক, কিন্তু তাদের পকেটে টাকার যোগান দিতে পারছে না।

ক্লিফোর্ড কথাগুলো এমনভাবে বলল যাতে বেশ বোঝা গেল একথায় মিসেস বোল্টনের প্রভাব আছে।

কনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি একদিন বলনি যে তুমি একজন রক্ষণশীল নৈরাশ্যবাদী।

ক্লিফোর্ড সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলে? আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো এই যে লোকে যা খুশি বলতে বা করতে পারে, যা খুশি অনুভব করতেও পারে। কিন্তু সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। জীবনের কাঠামোটা ঠিক বজায় রাখতে হবে।

কনি নীরবে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডিমের উপরকার খোলাটা ঠিক থাকলেই ডিমটা চিরদিন ভাল থাকবে।

ক্লিফোর্ড বলল, মানুষ আর ডিম এক জিনিস নয়।

আজকের উজ্জ্বল সকালে ক্লিফোর্ডকে খুব হাসিখুশিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

পার্কের আকাশে চিল উড়ে বেড়াচ্ছিল। দূরের খাদ থেকে ধোঁয়া উঠছিল। সব কিছুই আগের মত ঠিক আছে। তর্ক করার কোন ইচ্ছা ছিল না কনির কিন্তু ক্লিফোর্ডের সঙ্গে চলে যেতেও ইচ্ছা করছিল না। সে অনিচ্ছার সঙ্গে ক্লিফোর্ডের চেয়ারের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল।

ক্লিফোর্ড একসময় বলল, না, ঠিকমত যদি কাজকর্ম দেখাশোনা করা হয় তাহলে আর ধর্মঘট হবে না।

কেন হবে না?

কারণ তখন ধর্মঘট করাটা অসম্ভব করে তোলা হবে যতটা সম্ভব।

কনি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু শ্রমিকরা কি তোমায় ছাড়বে?

ক্লিফোর্ড বলল, সেকথা আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করব না। আমরা শুধু তাদের মঙ্গলের জন্য আর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য ধর্মঘট যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে যাব।

কনি বলল, তোমার মঙ্গলের জন্যও নিশ্চয়?

স্বাভাবিকভাবেই সকলের মঙ্গলের জন্য। তবে আমার থেকে এতে তাদের মঙ্গল হবে বেশী। কারণ খনি ছাড়াই আমার চলে যেতে পারে। কিন্তু তারা পারবে না। খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তারা খেতে পাবে না। আমার অন্য সংস্থান আছে।

ওরা যেতে যেতে একবার খনিসংলগ্ন উপত্যকা আর তেভারশাল গাঁয়ের কয়লার ধুলো ঢাকা কালো কালো বাড়িগুলোর পানে তাকাল। মনে হচ্ছিল সারবন্দী কালো কালো বাড়িগুলো একটা সাপের মত পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে এঁকে বেঁকে। বাদামী রঙের চার্চটা থেকে ঘণ্টাধ্বনি এসে আজ রবিবার একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

কনি বলল, কিন্তু ওরা তোমার শর্ত মেনে নেবে?

কিন্তু প্রিয়তমা, তাদের তা মানতেই হবে।

কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে কি কোন আপোষ মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়?

নিশ্চয় সম্ভব। যখন তারা বুঝবে শিল্প ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে তখন তা অবশ্যই সম্ভব।

কনি বলল, কিন্তু এই শিল্পের উপর তোমার মালিকানা কি একান্তই দরকার?

দরকার হয়ত খুব নেই। তবু যেহেতু মালিকানাটা রয়েছে তখন তা রক্ষা করতেই হবে। যীশু ও সেণ্ট ফ্রান্সিসের কাল থেকে সম্পত্তির অধিকার এক পবিত্র ধর্মীয় ব্যাপার বলে গণ্য হয়ে আসছে। তোমার যা কিছু আছে তা গরীবদের বিলিয়ে দেওয়াই সমস্যার সমাধান নয়। তা না করে তোমার যে সম্পত্তি আছে তা এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলবে যাতে শিল্পের উন্নতি হয় এবং গরীবরা কাজ পায়। এইভাবে গরীবদের খাওয়া পরা দান করতে পারা

যায়। গরীবদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে শিল্পের কোন উন্নতি হবে না আর গরীবরাও না খেতে পেয়ে মরবে। তাদের দারিদ্র্য আরো বেড়ে যাবে।

কিন্তু ধনী গরীবের মধ্যে অসাম্যটা কিভাবে কমবে?

ওটা হচ্ছে ভাগ্য। জুপিটার গ্রহ নেপচুন গ্রহের থেকে বড় কেন? এই রকম অনেক বস্তুর গঠনপ্রকৃতিকে তুমি বদলাতে পার না।

কনি বলল, কিন্তু এই হিংসা ঈর্ষা আর অসন্তোষ কখন প্রথম শুরু হয়?

শুরু যখন হয় হোক, এগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করো। এগুলোর অবসান ঘটাও। প্রতিষ্ঠান থাকলেই কেউ না কেউ মালিক হবেই

কনি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মালিক কে হবে?

যারা সম্পত্তির মালিক এবং যারা কলকারখানা বা শিল্প চালায়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। কনি হঠাৎ বলল, তারা কিন্তু খারাপ মালিক।

তুমি তাহলে বলে দাও তারা কেমন হবে বা হওয়া উচিত।

কনি বলল, তারা তাদের মালিকানাটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

ক্লিফোর্ড বলল, তারা বরং খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলে। তুমি তোমার লেডি' উপাধিটাকে তেমন গুরুত্ব দাও না

কনি বলল, এটা আমাকে আক্রমণ করা। আমি সত্যিই ওসব উপাধি চাই না।

ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা সহসা থামিয়ে কনির মুখপানে তাকাল। বলল তাহলে দেখ, কে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে এখন? তাদের মালিকানার দায়-দায়িত্ব কেন তার ঘাড়ে নিতে চাইছে না?

কনি বলল, আমি মালিকানা বা ওসব উপাধি চাই না।

ক্লিফোর্ড বলল, ওটা এমনিই। তোমার ভাগ্যে এ মালিকানা আছে এবং অবশ্যই বজায় রেখে চলা উচিত সারা জীবন ধরে। কারা খনিশ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী সব জিনিসের ব্যবস্থা করেছে? কারা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, গান বাজনা প্রভৃতি সব কিছুর উপকরণ দান করেছে? একমাত্র র‍্যাগবি আর শিপলের মালিকরাই তা দিয়েছে এবং তা চিরদিন দিয়ে যাবে। এইখানেই তোমার দায়িত্বের কথা আসছে।

একথার অর্থ বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কনি।

কনি বলল, আমি অবশ্য কিছু দেব। কিন্তু একটা কথা আমি তার আগে বলতে চাই। শ্রমিকরা তোমাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে ফেলেছে। তার বিনিময়ে তোমরা কিছু টাকা দাও। তাদের শ্রম থেকে তোমরা প্রচুর লাভ করো। তোমরা তাদের জীবনের সব সুষমা ও মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছ। তার বিনিময়ে তাদের একটু আন্তরিক সহানুভূতিও জানাও না। তোমরা শুধু তাদের মনে শিল্পগত একটা সমস্যার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছ।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি কি করব? আমার কাছে ওদের আসতে বল।

কনি বলল, কেন তেভারশাল গাঁটাকে এমন কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর দেখায়? তাদের জীবন কেন এত হতাশায় ভরা?

ওরা তেভারশাল গাঁকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে। এখানে তারা তাদের স্বাধীনতারই পরিচয় দিয়েছে। তারা তাদের নিজের হাতে গড়া তথাকথিত সুন্দর গাঁয়ে সুন্দর জীবন যাপন করে। আমি তাদের জন্য তাদের জীবন যাপন করতে পারি না। সকলেই আপন আপন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

কনি বলল, তারা কিন্তু তোমার জন্যই কাজ করে। তোমার কয়লাখনিতেই তাদের জীবন কাটছে।

মোটেই না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। তাদের মধ্যে একজনকেও বাধ্য করা হয়নি আমার কাজ করার জন্য।

কনি বলল, তাদের জীবন শিল্পসর্বস্ব হয়ে উঠেছে একেবারে। তারা সব আশা হারিয়ে ফেলেছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। এটা কথার কথা মাত্র। তুমি ওদের মধ্যে একটা হতাশাগ্রস্ত লোককেও খুঁজে পাবে না।

কথাটা সত্যি তা কনিও জানে। কনির কালো-নীল চোখগুলো জ্বলছিল। এক প্রতিবাদী আবেগের উত্তাপে লাল হয়ে উঠেছিল তার গালগুলো। তার মধ্যে হতাশার কোন বিষাদ ছিল না। সে পথের দুপাশের ঘাস আর গাঁদা ফুলগুলোর পানে একবার তাকিয়ে ভাবল, কেন সে অকারণে ক্লিফোর্ডের প্রতি এক রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে দোষী ভাবছে সব ব্যাপারে। একথা ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল, কোন কারণ খুঁজে পেল না সে। অথচ সে ক্লিফোর্ডকে একথাটা অর্থাৎ রাগের কথা বলতে পারল না। সে তাকে বলতে পারল না তার দোষটা কোথায়। তবু কনি বলল, ওরা যে তোমায় ঘৃণা করে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, না, করে না। তোমার ভ্রান্তিটাকে ওদের উপর আরোপ করো না। ভুলে যেওনা, ওরা মানুষ নয় জন্তু। তুমি এটা বুঝতে পারছ, এর আগে কখনো বোঝনি। সাধারণ জনগণ চিরকালই এক থাকে এবং থাকবে। নীরোর ক্রীতদাসরা আর আজকের খনিশ্রমিক বা ফোর্ডের মোটর কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নীরোর খনিশ্রমিক আর ক্ষেতমজুরদের মধ্যেও কোন পার্থক্য ছিল না। জনগণের প্রকৃতি সব যুগে এক ও অপরিবর্তিত রয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানের এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকশিক্ষা হচ্ছে সার্কাস খেলার প্রশিক্ষণের এক অর্থহীন বিকল্প ছাড়া আর কিছু না। এই শিক্ষার দ্বারা জনগণের মনকে বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কথা বলার সময় ক্লিফোর্ড যখন এইভাবে আবেগে

উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তা দেখে ভয় পেয়ে যায় কনি। আর কথার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সত্য আছে ঠিক, কিন্তু সে সত্য সর্বধ্বংসী, সর্ববাতী।

কনির মুখখানাকে নীরব আর সহসা ম্লান হয়ে যেতে দেখে চেয়ারটা আবার চালাতে শুরু করল ক্লিফোর্ড। আর কেউ কোন কথা বলল না। এইভাবে নীরবে গেটের কাছ পর্যন্ত যাবার পর সে থামল। কনি গেটটা খুলে দিল।

ক্লিফোর্ড বলল, জনগণ চিরকালই শাসিত হয়ে আসছে এবং চিরকালই তারা শাসিত হয়ে যাবে। এখন যেটা দরকার তা হলো তরবারির পরিবর্তে চাবুক। জনগণ নিজেদের নিজেকে শাসন করবে একথা বলা ভণ্ডামি আর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি তাদের শাসন করতে পার?

হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি। আমার মন বা ইচ্ছাশক্তি পঙ্গু হয়ে পড়েনি। আমি ত আর পা দিয়ে শাসন করব না। আমি ঠিক শাসন করে যেতে পারব যতদিন বাঁচব। তারপর তুমি আমাকে পুত্রসন্তান দান করবে। আমার পর সে শাসন করে যাবে।

কনি বলল, কিন্তু সে ত আর তোমার সন্তান হবে না। তার মধ্যে তোমাদের শাসকশ্রেণীর রক্ত থাকবে না। হয়ত থাকবে না।

কে তার পিতা, কার রক্ত তার গায়ে থাকবে তা আমি জানতে চাই না। তার পিতা যেই হোক সে স্বাস্থ্যবান আর সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এক লোক হলেই হলো। আমাকে যে কোন এক স্বাস্থ্যবান ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সন্তান দাও, আমি তাকে চ্যাটার্লি পরিবারের এক সুযোগ্য বংশধরে পরিণত করে তুলব। কে আমাদের জন্ম দিল সেটা বড় কথা নয়, ভাগ্য আমাদের কোথায় কোন পরিবেশে স্থাপন করল সেটাই হলো বড় কথা। যে কোন সন্তানকে শাসকশ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করো, সে ঠিক শাসক হয়েই গড়ে উঠবে। আবার কোন শাসকশ্রেণীর বা রাজা বা ডিউকের সন্তানকে সাধারণ মানুষের মাঝখানে রেখে লালন পালন করো সে অবশ্যই সাধারণ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবেশের কি অপরিহার্য ও ভয়ঙ্কর চাপ!

কনি বলল, তাহলে এক জাতি, এক রক্ত এসব কথার কোন মূল্য নেই। সাধারণ মানুষ কি এক জাতি নয়, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও কি কোন রক্ত নেই?

না বৎসে, ওসব কথা এক রোমান্টিক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিজাত সম্প্রদায় হলো নিয়তির এক অংশ আর জনগণ নিয়তির আর একটা অংশ। ব্যক্তিমানুষের কোন স্থান নেই। নিয়তির ক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে লালিত পালিত হয়। কারো আভিজাত্যের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী নয়। নিয়তির ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে সমগ্রভাবে যে অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকসমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তিমানুষ তারই অংশ।

তাহলে আমাদের মধ্যে সাধারণ মানবিক কোন যোগসূত্র নেই ?

সেটা তুমি যেভাবে নাও। পেট ভরাবার জন্য আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয়। কিন্তু সৃজনধর্মী ও প্রশাসনগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারা যায়। কাজকর্মগত যোগ্যতা আর বৈশিষ্ট্য দেখেই ব্যক্তিমানুষকে চেনা যায়।

কনি ক্লিফোর্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাবে না ?

ক্লিফোর্ড আবার চেয়ারটা চালাতে লাগল। তার যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। এবার এক শূন্যতাবোধ আর ঔদাসিন্যের মধ্যে ঢলে পড়ল। কনির এটা মোটেই ভাল লাগে না। বনের মাঝে যেতে যেতে কোন তর্ক করতে চায় না কনি।

ওদের সামনে দুদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের সারি। পথটা উপরে উঠে গেছে। পথের দুদিকে নানারকমের ফুল ফুটে আছে রং বেরঙের। কনি চেয়ারটার পিছু পিছু যাচ্ছিল। চেয়ারটার চাকাগুলোর পানে তাকিয়ে ছিল সে।

ক্লিফোর্ড এক সময় বলল, তুমি ঠিকই বল, ফুলগুলো সত্যিই সুন্দর। ইংল্যাণ্ডের বসন্তের মত এত সুন্দর বসন্ত আর কোথাও নেই।

কথাটা শুনে কনির মনে হলো ক্লিফোর্ড যেন বলতে চায় ইংল্যাণ্ডে বসন্তের এই সমারোহ পার্লামেণ্টের ব্যবস্থাপনায় হয়। কেন আয়ারল্যাণ্ড বা ইহুদীদের দেশের বসন্ত সুন্দর হবে না ? ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা যখন অবশেষে সেই গাছকাটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল তখন এক ঝলক উদার আলো এসে পড়ল ওদের সামনে। নীল, নীলচে, বাদামী ফুলগুলো সূর্যের আলোয় চকচকে উজ্জ্বল হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গোদ্যানের সেই আদিম কুটিলতায় ভরা কিলবিলে শয়তানী সাপের আদিমাতা ঈভের কানে কানে নূতন কোন নিষিদ্ধ কথা বলতে চাইছে।

একটা চড়াই পার হয়ে ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছল। সমস্ত বনভূমি জুড়ে গাছপালা ফুল ফলের মধ্যে একটা কমনীয় স্নিগ্ধতা বিরাজ করছিল। সমস্ত ম্লানিমা আর কাঠিন্য ঝেড়ে ফেলে সুন্দর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে সবকিছু। এমন কি বলিষ্ঠদেহী ওক গাছগুলোতেও নতুন বাদামী রঙের কচি পাতা গজিয়ে উঠেছে, ঠিক যেন আলোয় মেলে ধরা বাদুড়ের ডানা। কনি ভাবতে লাগল রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর কত নূতন হয়ে ওঠে পৃথিবী ; কিন্তু মানুষগুলো কেন অমনি নতুন হয়ে ওঠে না, কেন তাদের কোন ধরনের আমূল পরিবর্তন হয় না ? মানুষগুলো চিরদিন তেমনি পুরনো রয়ে যায় একভাবে।

উপরে উঠে চেয়ারটাকে থামাল ক্লিফোর্ড। থামিয়ে নিচের দিকে তাকাল। দেখল অসংখ্য ব্লুবেল ফুল থেকে বিচ্ছুরিত তপ্ত এক নীলাভ দীপ্তি সমস্ত ঢালু পাহাড়ী পথটাকে ছেয়ে আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, এ রংটা সত্যিই খুব চমৎকার।

কনি অন্যমনস্কভাবে বলল, সত্যিই তাই।

ক্লিফোর্ড বলল, আমরা কি আরো এগিয়ে যাব?

কনি বলল, কিন্তু চেয়ারটা কি আর উপরে উঠবে?

চেষ্টা করব। ঝুঁকি না নিলে চেষ্টা না করলে কিছুই লাভ হবে না।

চেয়ারটা ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। নীল ছায়াস্নিগ্ধ ফুলে ঘেরা চওড়া উঁচু পথটা দিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে চলল গাড়িটা। টুইডের জামা আর পুরনো ধরনের কালো টুপী মাথায় দিয়ে প্রসন্ন মুখে শান্তভাবে বসেছিল ক্লিফোর্ড। তার চলমান চেয়ারটাকে সম্বোধন করে কনির বলতে ইচ্ছা করছিল, হে চক্রবিশিষ্ট অতিপ্রাক্তন অর্ণবপোত, মানবসভ্যতার কোন প্রত্যন্ত সীমায় শেষবারের মত উপনীত হতে চাও তুমি? হে ক্যাপ্টেন, বল, আমাদের যাত্রা কি শেষ হয়েছে?

অবশেষে তারা সেই কুঁড়েটার কাছে এসে পড়ল। কিন্তু ঘরের মধ্যে যাবার পথটা খুবই সংকীর্ণ, চেয়ারটা তাতে ঢুকবে না। তাই সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরল। কনি পিছন থেকে ছোট্ট একটা শীষ দেওয়ার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল শিকার রক্ষক মেলর্স। কনিকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে ঢালু পথ বেয়ে। কুকুরটা তার পিছু পিছু আসছে। কাছে এসে সে কনিকে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড কি আমার বাসায় যাচ্ছেন?

কনি বলল, না, ও যাবে ঝর্ণাটায়।

তাহলে আমি তাঁর সামনে আর যাব না। কিন্তু আজ রাত্রে আসবে। আমি পার্ক গেটের কাছে রাত দশটার সময় অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

কনি বলল, হ্যাঁ, আসব।

ক্লিফোর্ড হর্ন বাজিয়ে ডাকছিল। ওরা সে শব্দ শুনতে পেল। তা শুনে মুখটা বিকৃত করল মেলর্স। সে পিছন থেকে কনির মুখে উপরের দিকটায় হাত দিয়ে চাপ দিল। কনি তার পানে তাকিয়ে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ক্লিফোর্ডের ডাকে সাড়া দিতে লাগল। উপর থেকে তা দেখতে লাগল মেলর্স।

কনি দেখল ক্লিফোর্ড প্রায় ঝর্ণাটার ধারে গিয়ে পড়েছে। কনিকে দেখে সে বলল, যাক গাড়িটা ঠিকমত কাজ করে এসেছে।

ভূতের মত লম্বা লম্বা বার্চ গাছের ধূসর ছাই রঙের পাতাগুলোর পানে তাকাল একবার কনি। লোকে বলে এইখানে ছিল রবিন হুডের আড্ডা। দেখল শুভ্র ফেনপুঞ্জমণ্ডিত ঝর্ণার জলধারাগুলো নিরন্তর কলহাস্যে সব সময় ফেটে পড়লেও জায়গাটা এক নীরব বিষাদে ঢাকা।

ক্লিফোর্ড বলল, ঝর্ণার জল তুমি খাবে?

কনি বলল, তুমি খাবে?

কনি গাছের ডালে ঝোলানো একটা এনামেলের মগ নিয়ে তাতে জল ভরে

ক্লিফোর্ডকে দিল। ক্লিফোর্ড জলপান করার পর সে নিজে মগে জল ভরে নিজে খেল। পরে বলল, কী ঠাণ্ডা!

ক্লিফোর্ড বলল, তবু ভাল।

কনি বলল, তোমার ভাল লেগেছে?

কনি যেন কান পেতে কি শুনছিল। কোথায় যেন একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক ঠক শব্দ করছিল। তারপর গাছের ডালপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ শুনতে পেল। তারপর উপরে তাকিয়ে দেখল সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে।

কনি বলল, মেঘ।

ক্লিফোর্ড বলল, সাদা সাদা মেষশাবক যেন।

একটা বিশাল মেঘচ্ছায়া আচ্ছন্ন করে ফেলল জায়গাটাকে। একটা ছুঁচো ঝর্ণার ওপার থেকে সাঁতরে এপারের কূলে এসে উঠল। ক্লিফোর্ড বলল, দেখতে কি কুৎসিত দেখ, ওটাকে মেরে ফেলা উচিত।

কনি বলল, ওটাকে বক্তৃতামঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত যাজকের মত দেখাচ্ছে।

কনি কতকগুলো শুকনো গাছের ডাল আর ঘাস নিয়ে এসে বলল, এগুলোর গন্ধ থেকে গত শতাব্দীর সেই সব রোমান্টিক মেয়েদের কথা মনে পড়ছে যারা কিছুটা এধার ওধার করলেও মোটের উপর ঠিক পথেই চলত।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, বৃষ্টি হবে কি না ভাবছি।

বৃষ্টি? কেন? তুমি চাও নাকি?

এবার তারা ফেরার পথ ধরল। ঢালু পথ দিয়ে ক্লিফোর্ড সাবধানে তার চেয়ারটা চালাতে লাগল। পথটার শেষে কালো পাথরভরা একটা নিচু জায়গায় এসে আবার ডান দিকে মোড় ঘুরে আবার একটা ঢালু পথ ধরল। সে পথে অনেক ব্লুবেল ফুল ফুটে ছিল। তারপর আবার একটা চড়াই।

পথটা এবার খাড়াই। চেয়ারটাকে সম্বোধন করে ক্লিফোর্ড বলল, এবার বুড়ো মেয়ে, দেখি কি করো। চেয়ারটা যেন উঠতে চাইছিল না। যেন উঠতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

কনি বলল, একটা কাজ করো। হর্ণটা বাজাও। যদি শিকার রক্ষক মেলর্স থাকে তাহলে সে এসে ঠেলবে। আর আমিও তখন ঠেলব।

ক্লিফোর্ড চেয়ারটা থামিয়ে বলল, কিছুটা ওকে বিশ্রাম দেওয়া যাক। একটা পাথর এনে চাকাটায় ঠেকা দাও, যাতে গড়িয়ে না যায়।

কনি একটা পাথরের টুকরো এনে পিছনের চাকাদুটোয় ঠেকা দিল।

কিছু পরে ক্লিফোর্ড আবার চালাতে শুরু করল চেয়ারটা। চেয়ারটা কিন্তু রুগ্ন দুর্বল মানুষের মত অতি কষ্টে উঠছিল, এবং অনিচ্ছাসূচক শব্দ করছিল।

কনি বলল, আমি পিছন থেকে ঠেলব?

ক্লিফোর্ড রেগে বলল, না, ঠেলতে হবে না। যদি ঠেলতেই হয় তাহলে

এটার দরকার কি ? চাকার তলায় আবার একটা পাথর দাও।

কিছুক্ষণ থামার পর আবার যাত্রা শুরু করল ক্লিফোর্ড। কিন্তু আগে যতটা চলছিল তাও চলল না।

কনি বলল, হয় আমাকে ঠেলতে দাও অথবা হর্ণ বাজিয়ে ওকে ডাক।

ক্লিফোর্ড বলল, একটু থাম।

সে আবার একবার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের থেকে তাতে খারাপ ফল ফলল।

কনি বলল, যদি আমাকে ঠেলতে না দাও তাহলে হর্ণটা বাজাও।

জাহান্নামে যাক। একটু থাম।

কনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লিফোর্ড আবার মরীয়া হয়ে চেষ্টা করল।

কনি বলল, তুমি এতে শুধু উদ্যমের অপচয় ঘটাবে এবং যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে ফেলবে ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড দারুণ রেগে গিয়ে বলল, আমি যদি একবার চেয়ারটা থেকে বার হয়ে দেখতে পেতাম যন্ত্রটা কোথায় খারাপ হলো।

এই বলে হঠাৎ হর্ণটা বাজিয়ে দিল ক্লিফোর্ড। বলল, অন্ততঃ মেলর্স এসে দেখুক কোথায় খারাপ হলো।

আকাশে তখন মেঘ জমছিল। সেই মেঘলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছিল।

মেলর্স অল্প সময়ের মধ্যেই এসে গেল। আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে। এসেই অভিবাদন জানাল ওদের।

ক্লিফোর্ড তাকে জিজ্ঞাসা করল, গাড়ির এঞ্জিন সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান আছে ?

মেলর্স বলল, আমি ঠিক জানি না। খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

ক্লিফোর্ড বলল, তাই ত মনে হয়।

মেলর্স তখন ঝুঁকে পড়ে এঞ্জিনটার পানে তাকাল। তারপর বলল, এই সব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে তেল আছে ত ?

ক্লিফোর্ড বলল, ভাল করে দেখ, কোন কিছু ভেঙ্গে গেছে কি না।

লোকটা বন্দুকটা আগেই একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আবার সে কোটটা গা থেকে খুলে পাশে ফেলে দিল। তার কুকুরটা পাহারাদারের মত তার কাছে বসে রইল। সে তার আঙ্গুল দিয়ে তৈলাক্ত এঞ্জিনটা পরীক্ষা করতে লাগল নেড়েচেড়ে। তার রবিবারের কাচা ধবধবে জামাটার উপর তেলের দাগ লেগে যাওয়ায় মনে মনে রেগে গেল মেলর্স। সে দেখে শুনে বলল, কোন কিছু ভাঙ্গেনি।

এই বলে টুপীটা মাথার সামনে থেকে সরিয়ে কপালটায় হাতটা বুলিয়ে দিল।

ক্লিফোর্ড বলল, নিচেকার রডগুলো ঠিক আছে কি না দেখেছ ?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের এঞ্জিনটার তলায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। তারপর আঙুল দিয়ে এঞ্জিনটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কনি তা দেখে ভাবতে লাগল একটা মানুষ এই বিরাট পৃথিবীর মাটিতে শুয়ে পড়লে তাকে কত ক্ষীণ কত ছোট আর অসহায় দেখায়।

মেলর্স বলল, আমি যতদূর দেখছি সব ঠিক আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

উঠে কোলিয়ারি শ্রমিকের মত বসে মেলর্স বলল, আমারও মনে হচ্ছে আমি কিছু করতে পারব না। কিছু ভেঙেছে নাকি তা বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লিফোর্ড আবার এঞ্জিনটা চালাবার চেষ্টা করল। গীয়ারে হাত দিল। কিন্তু তা নড়ল না।

মেলর্স বলল, একটু জোরে চাপ দিন।

ক্লিফোর্ড তার এই পরামর্শে রেগে গেল। তবু সে তার কথামতই জোরে চাপ দিল। এঞ্জিনটা একবার গর্জন করে আপাততঃ চলতে শুরু করল।

মেলর্স বলল, মনে হচ্ছে এবার চলবে।

কিন্তু একটু চলেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল চেয়ারটা।

চেয়ারটার পিছনে গিয়ে মেলর্স বলল, আমি একটু ঠেললে এটা চলবে।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে বলল, সরে যাও। ওটা আপনা থেকেই চলবে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড, তুমি দেখছ চেয়ারটার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়। কেন তুমি এমন গোঁড়ামি করছ?

ক্লিফোর্ড রাগে লাল হয়ে উঠল। সে আবার গীয়ার ধরে টান দিল। চেয়ারটা শব্দ করে কয়েক গজ এগিয়ে একদল ব্লুবেল ফুলের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেলর্স বলল, এ আর পারবে না। এর সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

ক্লিফোর্ড বলল, এর আগে এ এখানে এসেছে। ঠিকমত চলেছে।

মেলর্স বলল, এবার ও চলবে না।

ক্লিফোর্ড একথার কোন উত্তর করল না। সে আবার এঞ্জিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু যন্ত্রটা শুধু যেন এক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদে গর্জন করতে লাগল। আর তার সেই যান্ত্রিক শব্দে সমস্ত বনভূমি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ক্লিফোর্ড আবার গীয়ার ধরে টান দিল।

মেলর্স বলল, আপনি ওটা ভেঙে ফেলবেন একেবারে।

চেয়ারটা কাৎ হয়ে পথের ধারে একটা খালে পড়ে যাচ্ছিল।

কনি ছুটে এল। ক্লিফোর্ডের নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু মেলর্স চেয়ারটা খালে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলেছিল তার রডটা। আবার একবার চেষ্টা করে চেয়ারটা কিছুটা ঠিক করে তার উপর চেপে বসল। মেলর্স পিছন থেকে ঠেলতে লাগল।

ক্লিফোর্ড বলল, দেখছ, চেয়ারটা এবার ভালই কাজ করছে।

সে বিজয়গর্বে তার কাঁধের কাছটা তাকাতেই মেলর্সএর মুখটা দেখতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ওকে ঠেলবে?

তা না হলে চলবে না।

ছেড়ে দাও। আমি ত তোমায় ঠেলতে বলিনি।

তাহলে ওটা চলবে না।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে উঠল, ওকে একা চলতে দাও।

এ কথায় মেলর্স টানা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার কোট আর গাছে ঝুলিয়ে রাখা বন্দুকটা আনতে গেল। চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চেয়ারের মধ্যে বন্দী অবস্থায় বসে রইল ক্লিফোর্ড। এক তীব্র বিরক্তিতে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার। যতবারই চেষ্টা করল এঞ্জিনটা চালাবার জন্য, ততবারই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যেতে লাগল শুধু। চেয়ারটা কিছুতেই আর যাবে না। অবশেষে চেয়ারটার মধ্যে রাগে ও বিরক্তিতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ক্লিফোর্ড।

কনি পথের ধারে এক জায়গায় বসে রইল। দেখল কতকগুলো ব্লুবেল ফুল চেয়ারটার চাপে পিষ্ট হয়ে পড়ে আছে। একটু আগে বলা ক্লিফোর্ডের কতকগুলো কথা একে একে ছিন্নভিন্নভাবে মনে পড়ল কনির। ক্লিফোর্ড আসার সময় পথে বলেছিল, 'ইংলণ্ডের বসন্ত বড় চমৎকার।' আর একবার বলেছিল, 'শাসকশ্রেণীর বংশধর হিসাবে আমার কাজ আমাকে করে যেতে হবে। আর একসময় বলেছিল, 'এখন আমাদের দরকার তরোয়াল ছেড়ে চাবুক ধরা।'

মেলর্স তার কোট আর বন্দুক নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তার কুকুর ফ্লসি তার পিছু পিছু যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্লিফোর্ড আবার তাকে ডেকে এঞ্জিনটা দেখতে বলল। যদি কিছু করা যায়। কনির এঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না সে এক জায়গায় উদাসীনভাবে বসে রইল। মেলর্স আবার শুয়ে পড়ল চেয়ারটার তলায়। কনি ভাবল একেই বলে শাসকশ্রেণী আর শ্রমিক-শ্রেণী।

মেলর্স উঠে দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডকে শান্তভাবে বলল, এবার দেখুন।

ক্লিফোর্ড চেষ্টা করতেই চেয়ারটা একটু একটু করে চলতে লাগল। মেলর্স পিছন থেকে ঠেলতে লাগল। অর্ধেক চেয়ারটার এঞ্জিনের নিজস্ব শক্তি আর অর্ধেক মেলর্সএর শক্তিতে চলতে লাগল চেয়ারটা।

ক্লিফোর্ড তা দেখে আবার রেগে গেল। চিৎকার করে বলল, তুমি সরে যাবে কি না?

সঙ্গে সঙ্গে মেলর্স হাতটা ছেড়ে দিল। ক্লিফোর্ড বলল, তুমি ঠেললে আমি কি করে বুঝব গাড়িটা চলছে কি না।

মেলর্স বন্দুকটা নিয়ে কোটটা পরতে লাগল।

চেয়ারটা ধীরে ধীরে পিছনে গড়াতে লাগল। কনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ক্লিফোর্ড, তোমার ব্রেক।

কনি আর মেলর্স চেয়ারটাকে ধরে ফেলল। চেয়ারটা দাঁড়িয়ে গেল। সবাই চুপ। ক্লিফোর্ড একসময় বলল, এটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমি সকলের দয়ার উপর নির্ভর করছি।

কেউ তার কথার কোন উত্তর দিল না। মেলর্স কাঁধের উপর তার বন্দুকটা ঝোলাচ্ছিল। একমাত্র এক অপার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ছাড়া আর কোন ভাব তার মুখের উপর ফুটে ছিল না। তার কুকুর ফ্লসি তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ারটার দিকে সংশয় আর অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়েছিল। কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে ক্লিফোর্ড তার স্বরটা নরম করে বলল, আমার মনে হয় ওকে ঠেলতে হবে।

মেলর্স কোন কথা বলল না। সে শূন্য দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যাতে মনে হলো সে কিছু শোনেনি। কনি তার দিকে উদ্বেগের সঙ্গে তাকাল। ক্লিফোর্ডও তার পানে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি কি এটাকে ঠেলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে মেলর্স? আমার ত মনে হয় আমি তোমাকে অন্যায় কিছু বলিনি।

মেলর্স বলল, না, অন্যায় কিছু বলেননি। আপনি কি চান আমি এটা ঠেলব?

যদি তুমি কিছু মনে না করো।

লোকটা এগিয়ে গেল চেয়ারটার দিকে। কিন্তু এবার মেলর্স তাকে ঠেলে চালাতে পারে না। ব্রেকের ভিতরটায় কি যেন জমে আছে। ক্লিফোর্ড আর একটা কথাও বলল না। মেলর্স চেয়ারটা পিছন থেকে তুলে ধরে পা দিয়ে চাকাগুলো ঠেলে দিল। ক্লিফোর্ড চেয়ারের একটা ধার ধরে ছিল। কিন্তু চেয়ারটা নড়ল না। বসে রইল এক জায়গায়। মেলর্স একাই জোরে ঠেলতে লাগল। ক্লিফোর্ডের ভার সহ্য করতে না পেরে হাঁপাচ্ছিল সে।

কনি বলল, না, ওভাবে ঠেলতে যেও না।

মেলর্স বলল, আপনি ঐদিকে গিয়ে চাকাটা একবার ধরুন।

কনি রেগে গিয়ে বলল, না, তুমি ওভাবে তুলতে যেও না। এতে তোমার দারুণ কষ্ট হবে।

কিন্তু মেলর্স কনির মুখপানে তাকিয়ে ইশারা করতেই কনি এসে চাকাটা ঠেলতে লাগল আর মেলর্স চেয়ারটা তুলে ধরল। এবার চলতে লাগল চেয়ারটা। ক্লিফোর্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ঈশ্বর দয়া করেছেন।

গাড়ির ব্রেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু গাড়িটা এবার ঠিক চলতে লাগল।

মেলর্স এক সময় চেয়ারের চাকায় একটা পাথর আটকে দিয়ে পথের ধারে একবার বসল। কনি দেখল তার জানুর উপর রাখা হাতগুলো কাঁপছে।

কনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি কোথাও আঘাত লেগেছে?

। বিরক্তির সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, না না।

মৃত্যুশীতল এক স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল চারদিকে। ক্লিফোর্ড অনুতপ্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এমন কি মেলর্সএর কুকুরটা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে মেঘ জমে উঠেছে।

অবশেষে তার রুমালটায় নাকটা ঝেড়ে সে বলল, নিউমোনিয়াতে আমার অনেকখানি শক্তি চলে গেছে!

কেউ কোন কথা বলল না। কনি শুধু ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড সমেত চেয়ারটা ধরে তুলতে কতখানি শক্তির দরকার হয়েছে। লোকটার সত্যিই দারুণ কষ্ট হয়েছে। তার দেহের সব হাড় ভেঙ্গে যায়নি এই খুব।

মেলর্স উঠে আবার কোটটা তুলে নিয়ে চেয়ারটা ধরে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড, আপনি প্রস্তুত?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি প্রস্তুত, তুমি প্রস্তুত হলেই হলো।

এবার একটু নত হয়ে তার দেহের সমস্ত ভার ও শক্তি দিয়ে ঠেলতে লাগল চেয়ারটাকে। কনি দেখল আগের থেকে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ক্লিফোর্ড ভারী লোক আর তার উপর পাহাড়ী পথটা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কনি মেলর্সএর কাছে গিয়ে বলল, আমিও ঠেলব।

কনি তার নারীমনের সমস্ত বিক্ষুব্ধ ক্রোধাবেগ ঢেলে দিয়ে চেয়ারটাকে ঠেলতে লাগল। চেয়ারটা আগের থেকে দ্রুত চলতে লাগল। ক্লিফোর্ড তা দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার ঠেলার কি দরকার আছে?

কনি বলল, একশোবার আছে। তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি? যখন যন্ত্রটা ভাল ছিল তখন যদি সেটাকে কাজ করতে দিতে? ইচ্ছা করে সেটাকে ভেঙ্গে দিলে।

কনি ঠেলতে ঠেলতে একটু ঢিলে দিল। কারণ কাজটা সত্যিই কঠিন। আশ্চর্যভাবে কঠিন।

চোখে মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে মেলর্স কনিকে বলল, আরো আস্তে ঠেল।

কনি তার পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল, তুমি ঠিক জান তোমার দেহে কোন আঘাত লাগেনি?

মেলর্স মাথা নাড়ল নীরবে। তার ছোট ছোট রোদখাওয়া তামাটে হাতগুলোর পানে তাকাল কনি। এই হাতগুলোই একদিন তাকে কত আদর

করেছে, এক উত্তপ্ত শৃঙ্গারের কাজে মেতে উঠেছে। তখন কিন্তু ভাল করে হাতগুলোকে দেখেনি সে। লোকটার মতই হাতগুলো কেমন যেন শান্ত, এক অন্তর্নিহিত স্তব্ধতায় মগ্ন অনড়। হাতগুলো মনে হলো তার থেকে যেন অনেক দূরে, এত দূরে আছে যে সে তা ধরতে পারবে না। আর সেই জন্যই হাতগুলোকে এই মুহূর্তে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল কনির। লোকটা যেন তার কাছ থেকেও অনেক দূরে আছে, তাকে কোনদিন সে ধরতে পারবে না বলেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা সহসা এক অবুঝ উন্মত্ততায় লোকটার দিকে প্রধাবিত হতে লাগল। মেলর্স তার বাঁ হাত দিয়ে ঠেলছিল চেয়ারটাকে আর তার ডান হাতটা দিয়ে কনির সাদা ধবধবে কোমরটা জড়িয়ে ধরে ছিল আদরের ভঙ্গিতে। কনির স্পর্শে সহসা লোকটার দেহের সমস্ত শক্তি পিঠে ও পাছায় এসে যেন কেন্দ্রীভূত হলো। কনি একবার নত হয়ে মেলর্সের হাতটা চুম্বন করল। ক্লিফোর্ডের মুখটা ও ঘাড়টা তখন সামনের দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল।

পাহাড়টার উপরে উঠে ওরা একটু থামল। থেমে বিশ্রাম করতে লাগল। কনি খুশি হলো। মাঝে মাঝে মনে মনে একটা অদ্ভুত কথা ভাবল, স্বপ্ন দেখল যেন কনি। মনে হল এই দুই পুরুষের মধ্যে যদি কোনভাবে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদি তার স্বামী আর তার সন্তানের পিতা এক সৌহার্দ্যের বন্ধনে মিলিত হয় তাহলে খুব ভাল হয়। আজ কনি বুঝতে পারল তার এ চিন্তা এ স্বপ্ন কত অলীক কত অর্থহীন। এই দুই পুরুষের মধ্যে মিলন কোনদিনই সম্ভব নয়। জল আর আগুনের মতই পরস্পরবিরুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন এই দুই পুরুষ। ওরা যেন একে অন্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আজ কনি প্রথম বুঝতে পারল ঘৃণা কত অদ্ভুত সূক্ষ্ম জিনিস। এ ঘৃণা কত সূক্ষ্ম কত গভীর। বুঝতে পারল আজ প্রথম সে সচেতনভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করছে। মনে হচ্ছে তার সেই নিবিড় ও প্রাণবন্ত ঘৃণার দ্বারা সে তাকে জগৎ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে? শুধু তাই নয়, আজ যে ওর সচেতন মনের ভিত্তির উপর আপন আত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করার কথাটা স্বীকার করতে পারছে, বলতে পারছে আমি তাকে ঘৃণা করছি, আমি তার সঙ্গে বাস করতে পারব না—এতে সে একটা মুক্তির আনন্দ আর প্রাণপ্রাচুর্যের আস্বাদ অনুভব করছে।

সমতল রাস্তার উপর মেলর্স একাই চেয়ারটা ঠেলতে পারছিল। ক্লিফোর্ড কনির সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল। এই সব কিছু সত্ত্বেও সে যে আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে এটা যেন সে দেখাতে চায়। প্রথমে ক্লিফোর্ড বলল ঈভা পিসির কথা যিনি এখন দিয়েপ্পেতে থাকেন। তারপর বলল স্যার ম্যালকমের কথা। স্যার ম্যালকম চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন কনি ক্লিফোর্ডের সঙ্গে একটা গাড়িতে করে যাবে না হিলদার সঙ্গে ট্রেনে ভেনিসে যাবে।

কনি বলল, আমি ট্রেনে যাব। ধুলোভরা দীর্ঘ পথ গাড়িতে করে আমি যেতে চাই না। অবশ্য হিলদা কি চায় সেটা দেখতে হবে।

ক্লিফোর্ড বলল, সে চাইবে তোমাকে সঙ্গে করে তার গাড়ি চালিয়ে যেতে।

কনি বলল, হয়ত তাই হবে—এখন এখানে চেয়ারটা ঠেলার ব্যাপারে আমাকেও সাহায্য করতে হবে। চেয়ারটা কত ভারী সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

কনি চেয়ারের পিছনে গিয়ে মেলর্সের পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে লাগল। কে তাদের দেখছে না দেখছে তা সে গ্রাহ্য করল না।

ক্লিফোর্ড বলল, কেন ফিল্ডের জন্য আমায় অপেক্ষা করতে দিচ্ছ না? তার শক্তি আরো বেশী। এ কাজে সে আরো বেশী যোগ্য।

কনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এত কাছে যখন এসে গেছি।

মুখে যাই বলুক কনি ওরা দুজনেই চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রায়ই মাথার ঘাম মুছছিল। অবশেষে উঁচু জায়গাটায় এসে পৌঁছল। ওদের কষ্ট হচ্ছিল ঠিক, কিন্তু এই কাজের মধ্য দিয়ে ওরা দুজনে পরস্পরের কাছে আগের থেকে আরো বেশী করে যেন এসে পড়েছিল।

বাড়ির দরজার কাছে এসে ক্লিফোর্ড বলল, যথেষ্ট ধন্যবাদ মেলর্স। আমাকে চেয়ারের এঞ্জিনটা পাল্টাতে হবে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবে? এখন খাবার সময় হয়ে গেছে।

মেলর্স বলল, ধন্যবাদ স্যার ক্লিফোর্ড, আজ রবিবার, আমি আমার মার কাছে খেতে যাচ্ছিলাম।

তোমার যা খুশি।

মেলর্স কাঁধে কোটটা ঝুলিয়ে ওদের অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। কনি এক প্রচণ্ড রাগ বুকে চেপে উপরতলায় উঠে গেল।

লাঞ্চ খাবার সময় কনি তার মনের অনুভূতি চেপে রাখতে পারল না। সে বলল, কেন তুমি এমন জঘন্যভাবে অবিবেচক ক্লিফোর্ড।

কার সম্বন্ধে?

আমি শিকার রক্ষকের কথা বলছি। এই যদি তোমাদের শাসকশ্রেণীর আচরণবিধি হয় তাহলে আমি তোমাদের জন্য দুঃখিত।

কেন?

একটা লোক যে কিছুদিন আগে রোগ থেকে উঠেছে, যে খুব একটা সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারেনি। আমি যদি তোমার চাকর হতাম তাহলে তোমাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করতাম। অন্য লোক না আসা পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম।

আমি তা বিশ্বাস করি।

সে যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী হয়ে চেয়ারে বসে থাকত আর তোমার মত

সে যদি এই ধরনের ব্যবহার করত তোমার সঙ্গে তাহলে তুমি কি করতে ?

হে আমার দয়াবতী, তুমি যেভাবে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বকে গুলিয়ে ফেলছ তা তোমার কিন্তু মোটেই ভাল রুচির পরিচয় নয়।

আর তোমার সাধারণ সহানুভূতির অভাব রুচিবোধের এক অকল্পনীয় অভাব। তুমি ও তোমাদের শাসকশ্রেণীর এটাই হলো স্বভাব।

এতে কি লাভ ? আমার শিকার রক্ষকের জন্য এই অহেতুক আবেগের অপচয় আমি পছন্দ করি না। এটা আমি আমার দয়াবতী স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিলাম।

কনি বলল, সে যেন তোমার মত মানুষ নয়।

আমার শিকার রক্ষককে আমি সপ্তায় দু পাউণ্ড করে মাইনে দিই এবং তাকে থাকার জন্য একটা বাড়ি দিয়েছি।

তাকে মাইনে দাও ? কিসের জন্য ?

' তার কাজের জন্য।

আমি বলব এ টাকা তুমি রেখে দাও। দিতে হবে না।

সেও হয়ত কাজ ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু যে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ পেয়ে গেছে তা ছাড়তে চায় না।

কনি বলল, তুমি নাকি শাসন করো। যাও বড়াই করো না। তুমি শাসন করো না, শুধু টাকা চেন তুমি। শুধু ধনসম্পদ ভোগ করে যেতে চাও তুমি। তোমার শাসন মানে ত একটা গরীব লোককে অনাহারের ভয় দেখিয়ে সপ্তায় দু পাউণ্ড দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া। ইহুদীর মত কুশীদজীবী ঘৃণ্য জীবের মত শুধু টাকা চেন তুমি।

তুমি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পার লেডি চ্যাটার্লি।

আমি বেশ বলতে পারি বনের মাঝে তুমিও বক্তৃতা কম দাওনি। তোমার সে বক্তৃতায় আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। তোমার থেকে দশগুণ মনুষ্যত্ব আছে আমার বাবার। জানলে ভদ্র মহাশয়।

ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস বোল্টনকে ডাকল। সে রেগে ছিল।

ভয়ঙ্কর রাগ নিয়ে কনি তার নিজের ঘরে চলে গেল। মনে মনে বলতে লাগল টাকা দিয়ে লোক কেনে ও। আমাকে ও কেনেনি ; সুতরাং ওর কাছে আমার থাকার কোন অর্থ হয় না। ভদ্রলোক না, একটা মরা মাছ। একটা সেলুলয়েডের আত্মা। তারা মানুষকে ভালভাবে গ্রহণ করতেই পারে না। একটা সেলুলয়েডের যতটুকু অনুভূতি থাকে তার বেশী অনুভূতি ওদের নেই।

রাতের মত তার মনস্থির করে ফেলল কনি। ক্লিফোর্ডের কথা ঝেড়ে ফেলল সব মন থেকে। কনি ভেবে দেখল সে ক্লিফোর্ডকে আসলে ঘৃণা করতে চায়নি। আসলে সে শুধু তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে চায়নি। সে শুধু চেয়েছিল ক্লিফোর্ড যেন তার জীবনের

কোন কিছু জানতে না পারে।

রাতের খাওয়ার সময় শান্তভাবে নিচে নেমে গেল কনি। একটা হলুদ রঙের জামা পরে ক্লিফোর্ড একটা ফরাসী বই পড়ছিল।

ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল, তুমি প্রুস্ত পড়েছ?

আমি পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ক্লিফোর্ড বলল, সত্যিই ওঁর লেখা অসাধারণ।

তা হয়ত বটে, কিন্তু আমার ভাল লাগে না মোটেই। একটা কেতাদুরস্ত ভাব। ওর কোন অনুভূতি বলে জিনিস নেই। অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু আসল অনুভূতি নেই। ওঁর আত্মপ্রচার আর বড়াই দেখে আমি বিরক্ত। আমি এই ধরনের মনোভাব পছন্দ করি না।

তবে কি তুমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেগানুভূতিকে পছন্দ করো?

তা হয়ত বটে। কিন্তু কোন লেখার মধ্যে আত্মপ্রচারের উগ্রতা না থাকলে তার থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

আমি কিন্তু প্রুস্তের সূক্ষ্মতা আর অভিজাত ধরনের নৈরাজ্য পছন্দ করি।

কিন্তু তা তোমাকে সত্যি সত্যিই নির্জীব করে তুলবে।

এটা আমার দয়াবতী স্ত্রীর কথা মনে হচ্ছে।

ওরা আবার তর্ক করতে লাগল। কনি এ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পারল না। ক্লিফোর্ড তার সামনে একটা নির্জীব কঙ্কালের মত বসেছিল। কিন্তু কনির মনে হলো, ক্লিফোর্ডের কঙ্কালের হাড়গুলো তাকে এক নিষ্ঠুর বাহুবেষ্টনী দিয়ে জড়িয়ে ধরছে এবং সেই চাপে তার বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডও মরীয়া হয়ে তর্কযুদ্ধে মেতে উঠল।

কনি তার শোবার ঘরে গিয়ে সকাল সকাল বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু সাড়ে নটা বাজতেই উঠে পড়ল। বাইরে গিয়ে দেখল বাড়ির মধ্যে কোথাও কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখল বাড়ির মধ্যে কোথাও কোন শব্দ নেই। ড্রেসিং গাউন পরে নিচের তলায় নেমে গিয়ে দেখল, ক্লিফোর্ড আর মিসেস বোল্টন তাস খেলছে। ওরা রাত দুপুর পর্যন্ত এইভাবে খেলে যাবে।

আবার নিজের ঘরে ফিরে এল কনি। পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন ছেড়ে টেনিস খেলার পোষাক আর হাল্কা কোট পরে তৈরি হয়ে নিল সে। এখন যাবার সময় অথবা সকালে ফেরার সময় কারো সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে বলবে একটু বেড়াতে গিয়েছিল বন দিয়ে। সকালে প্রাতরাশের আগেই ফিরে আসবে। একমাত্র বিপদের কথা হলো যদি রাত্রিবেলায় কেউ তার ঘরে যায়। কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

বেটস্ তখনো বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করেনি। সে রাত্রি দশটা বাজলে বাড়ির দরজা বন্ধ করে। আবার সকাল সাতটা বাজলে খোলে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কনি। আকাশে ছিল আধখানা

চাঁদ। তার স্বল্প আলোয় বনভূমির পথ চিনে এগিয়ে যেতে লাগল সে। বনান্ধকারের পটভূমিকায় এই স্বল্প চাঁদের আলোয় তার ধূসর কোটটা দেখে কেউ চিনতে পারবে না। পার্কটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে বেটসের কাছে এল। মেলর্সকে কথা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে পারার জন্য কোন পুলকিত রোমাঞ্চ জাগছিল না কনির মনে। বরং তার অন্তরে ছিল এক বিদ্রোহের জ্বালা; প্রতিবাদের এক আগ্নেয় আবেগ।

অধ্যায় ১৪

কনি পার্ক গেটের কাছে পৌঁছতেই গেটের খিল খোলার শব্দ শুনতে পেল। মেলর্স আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বনের অন্ধকারে। দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল তাকে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে মেলর্স প্রশ্ন করল, তুমি আগে থেকে এসে ভালই করেছ। সব ঠিক আছে ত?

সব ঠিক আছে।

কনি ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গেটটা বন্ধ করে দিল মেলর্স। টর্চের এক ঝলক আলোতে কনি দেখল পথের দুপাশের ফুলগাছগুলো বনভূমির নির্জন অন্ধকারে নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে মাঝখানে একটুখানি ব্যবধান রেখে নীরবে পথ চলতে লাগল।

কনি জিজ্ঞাসা করল, আজ সকালে চেয়ার ঠেলতে গিয়ে তোমার লাগেনি, তুমি ঠিক বলছ?

না, না, লাগেনি।

এর আগে যখন তোমার নিউমোনিয়া হয় তখন তোমার দেহের কি ক্ষতি হয়?

এমন কিছু না। শুধু হৃৎপিণ্ডটা একটু দুর্বল হয় আর ফুসফুসটা একটু শক্ত হয়ে ওঠে।

কনি বলল, তোমার দেহের দিক থেকে অত্যধিক চাপ দিয়ে কোন কাজ করা বা কোন কিছু চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নিশ্চয় তোমার পক্ষে।

হ্যাঁ, প্রায়ই তা করা চলবে না।

কনি এবার এক বিক্ষুব্ধ নীরবতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে লাগল। অবশেষে কনি বলল, তুমি ক্লিফোর্ডকে তখন ঘৃণা করছিলে?

তাকে ঘৃণা করব? না। তার মত অনেক লোক আমি দেখেছি যারা এইভাবে আমার মাথাটা এমন করে গুলিয়ে দেয় যে আমি তাদের ঘৃণা করার কোন শক্তিই খুঁজে পাই না। আমি ওদের মত লোকদের গ্রাহ্য করি না।

তাই কিছু মনে করিনি।

কাদের মত মানুষ?

আমার থেকে তুমি বেশী ভাল করে তা জান। অভিজাত সমাজের এক ধরনের যুবক যারা মেয়ের মত থাকে বলে বীচিহীন মানুষ।

বীচিহীন মানুষ মানে?

কনি কথাটার মানে নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

মেলর্স বলল, যে লোকের মস্তিষ্ক নেই, হৃদয় নেই, একেবারে বোকা, যার কোন মনুষ্যত্ব নেই তাকেই আমরা বীচিহীন লোক বলি। ক্লিফোর্ড যেন পোষা জন্তুর মত।

কিছুক্ষণ ভেবে কনি বলল, ক্লিফোর্ড কি পোষা জন্তুর মত?

ওদের জাতের সবাই ওই রকম।

আর তুমি কি মনে করো তুমি পোষমানা জন্তুর মত নয়?

হয়ত কিছুটা, কিন্তু পুরোটা নয়।

সহসা কনি দূরে হলদে আলো দেখতে পেল। বলল, একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

মেলর্স বলল, আমি সব সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আলো জ্বেলে আসি।

কনি এবার মেলর্সের পাশে গিয়ে পথ চলতে লাগল। কিন্তু তার গাটাকে ছুঁল না। সে তার সঙ্গে কোথায় কেন যাচ্ছে তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

মেলর্স ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। কনির মনে হলো সে যেন একটা কারাগারে ঢুকছে। উনোনের লাল আগুনে কেটলিতে জল ফুটছিল। টেবিলের উপর কয়েকটা কাপ ডিস সাজানো ছিল।

আগুনের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসল কনি। প্যানট্রি থেকে কিছু রুটি মাখন মাংস প্রভৃতি খাবার নিয়ে এল মেলর্স। কনি গা থেকে কোট খুলে রাখতেই মেলর্স সেটা দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখল। তারপর বলল, কোকো না কফি কি খাবে?

কনি বলল, আমি কিছুই খাব না। তুমি খাও।

না, আমার কিছু খাবার ইচ্ছা নেই, আমি এখন কুকুরটাকে খাওয়াব।

একটা বাদামী পাত্রের মধ্যে কুকুরের খাবারটা ঢেলে দিল মেলর্স। কুকুরটাকে বলল, তোমার রাতের খাবার।

কিন্তু কুকুরটাকে যত্ন করে খেতে দিলেও কুকুরটা মেলর্সের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। খেল না। তা দেখে মেলর্স তাকে বলল, খাচ্ছ না কেন? কি ত্রুটি হলো? ঘরে একজন মেয়েলোক রয়েছে? তা থাক, নাও খেয়ে নাও।

কুকুরটা তবু না খাওয়ায় তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল সে। তখন

কুকুরটা খেতে লাগল।

কনি বলল, তুমি কুকুর ভালবাস ?

মেলর্স বলল, না, খুব একটা নয়। ওরা বড় পোষমানা আর পরিবর্তনশীল।

এই বলে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল মেলর্স। কনি আগুনের পাশ থেকে সরে এল। দেওয়ালের উপর এক নবদম্পতির ছবি ছিল। কনি সেই দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তোমার ছবি ?

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, বিয়ের পর এ ছবিটা তোলা হয়। আমার তখন বয়স একুশ।

তুমি এ ছবিটা ভালবাস ?

না, আমি পছন্দ করি না, কারণ ওই মেয়েটা আমার উপর চাপ দিয়ে বিয়েটা করায়।

মেলর্স আবার জুতো খোলায় মন দিল। কনি বলল, তুমি এটা যদি পছন্দ না করো তবে কেন এটা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছ ? তোমার স্ত্রী বোধহয় এটা চায় ?

মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে কনির দিকে তাকাল মেলর্স। বলল, আমার স্ত্রী যা নেবার সব নিয়ে গেছে সঙ্গে। শুধু এটাই ফেলে গেছে।

তবে কেন তুমি এটা রেখে দিয়েছ ? নিছক আবেগের বশে বা ভারপ্রবণতার ঝোঁকে ?

না, আমি ওটার দিকে কোনদিন তাকাই না। এমনি আছে।

তবে ওটা পুড়িয়ে ফেল না কেন ?

বাদামী রঙের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বড় করা ছবিটার পানে তাকাল মেলর্স। ছবিটাতে আছে এক দাড়িকামানো চকচকে মুখওয়ালা এক তরুণ যুবক যার মুখখানা বেশ কচিকচি আর সাটিনের ব্লাউজপরা এক নির্ভীক উজ্জ্বল প্রকৃতির যুবতী।

মেলর্স বলল, কথাটা মন্দ নয়।

পা থেকে জুতোটা খুলে একজোড়া চটি পরল মেলর্স। তারপর একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ফটোটা টেনে নামিয়ে এনে তারপর বলল, এটাকে এখন দেওয়ালের উপর ঝুলিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না।

একটা হাতুরী নিয়ে তা দিয়ে ঠুকে ফটোর ফ্রেমটা থেকে ছবির কাগজটা বার করে আনল। কনি সেটা দেখল। ও নিজেও দেখল। কনির মনে হলো মেয়েটাকে দেখতে এমন কিছু খারাপ নয়, বরং তার চেহারার মধ্যে একটা আবেদন আছে। এদিকে কাঠের ফ্রেমটা হাতুরি দিয়ে ভেঙ্গে ফ্রেমটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল আগুনে। পরে বলল, আগামীকাল বাকিগুলো আগুনে পোড়াব।

আবার তার জায়গায় এসে বসল মেলর্স। কনি বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে

ভালবাসতে ?

ভালবাসা ? তুমি স্যার ক্লিফোর্ডকে ভালবাস ?

সেকথায় না গিয়ে বা না দমে কনি বলল, কিন্তু তুমি ত তাকে গুরুত্ব দিতে।

মেলর্স বলল, গুরুত্ব !

কনি বলল, তুমি এখনো তাকে গুরুত্ব দাও।

চোখদুটো বিস্ফারিত করে মেলর্স বলল, না আমি এখন তার কথা ভাবি-ই না।

কিন্তু কেন ?

মেলর্স শুধু তার ঘাড় নাড়ল।

কনি বলল, কিন্তু তুমি বিবাহ বিচ্ছেদ করো না কেন ? তা না হলে একদিন না একদিন সে আসবেই।

কনির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেলর্স। বলল, সে আমার এক মাইলের মধ্যে আসবে না। আমি তাকে যত ঘৃণা করি তার থেকে সে আমায় বেশী ঘৃণা করে।

তুমি দেখবে সে ঠিক ফিরে আসবে।

না, আর সে আসবে না। সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যাবে।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হবেই। আইনগতভাবে ত বিচ্ছেদ হয়নি তোমাদের ?

না, তা হয়নি।

তাহলে সে আসবে আর তোমাকে গ্রহণ করতে হবে তাকে।

কনির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল মেলর্স। তারপর বলল, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। আমি এখানে ফিরে এসে বোকামি করেছি। তুমি ঠিক বলেছ। আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব এবং মুক্ত হব। কিন্তু আমি আদালত, বিচারক ও রাজকর্মচারিদের মৃত্যুর মতই ঘৃণা করি। তবু আমাকে তা সহ্য করতেই হবে এবং বিবাহবিচ্ছেদ করবই।

কনি দেখল তার মুখের চোয়ালটা শক্ত হয়ে আছে। সে বলল, আমার মনে হয় আমি এখন এক কাপ চা খেতে পারি।

মুখের চোয়ালটা শক্ত করেই চা করতে গেল মেলর্স।

খাবার টেবিলে বসে কনি তাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে ? সে তোমার থেকে অনেক সাধারণ স্তরের। মিসেস বোল্টন আমাকে তার কথা সব বলেছে। তুমি কেন তাকে বিয়ে করেছিলে সে তা আজও বুঝতে পারেনি।

মেলর্স কনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে সব কথা বলব। আমার জীবনে প্রথম যখন এক মেয়ে আসে তখন আমার বয়স মাত্র

ষোল। সে ছিল এক স্কুলশিক্ষকের মেয়ে, সত্যিকারের সুশ্রী, সুন্দরী। তখন আমি ছিলাম সবেমাত্র শেফিল্ডের গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে আসা এক চটপটে ছেলে। কিছু ফরাসী আর জার্মান জানি। মেয়েটা ছিল রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন। সে চাইত আমি বড় হই, সে সাধারণত্বকে ঘৃণা করত। সে আমাকে কবিতা লেখা ও পড়ায় প্রেরণা দিত। সে আমাকে মানুষ করে তুলতে চাইল। আমি কবিতা পড়তাম, অনেক কিছু চিন্তা করতাম, কিন্তু সব সময় একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার অবস্থাটা তখন ছিল ঠিক একটা জ্বলন্ত বাড়ির মত। তখন আমি বাটার্লে অফিসের এক কেরাণী। রোগা-রোগা চেহারা, সাদা ফ্যাকাসে মুখ। তখন আমি অবসর সময়ে অনেক কিছু পড়তাম। পড়তে পড়তে নানারকমের অস্বচ্ছ অস্পষ্ট চিন্তা ধূমায়িত হয়ে উঠত আমার মনে। শুধু পড়তাম না, নানা বিষয়ে অনেককিছু আলোচনা করতাম। আমরা ছিলাম সেকালের সবচেয়ে সাহিত্যানুরাগী প্রেমিক প্রেমিকা। আমি তার আবেগে উত্তপ্ত ও বিচলিত হয়ে তার সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠতাম। কিন্তু সে ছিল আগুন, আমি শুধু অগ্নি-অনুগামিনী ধোঁয়ার মত তাকে অনুসরণ করে যেতাম। সে আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কিন্তু ঘাসে ঢাকা সাপের মত তার সঙ্গে আমার এই দেহাতীত প্রেমসম্পর্কের অন্তরালে এক দুর্জয় কামপ্রবৃত্তি এক অবদমিত গর্জনে ফুলে ফুলে উঠত। কিন্তু তার মোটেই এ প্রবৃত্তি ছিল না। যেখানে থাকার কথা সেখানে এ প্রবৃত্তি ছিল না। আমি দিন দিন রোগা আর খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠতে লাগলাম। একবার আমি তাকে বললাম আমার কামনার কথা। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে কোন কামনা ছিল না। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু সে শুধু তার ভালবাসার কথা বলত, চুম্বন আর আদর করত। শুধু এই কারণেই সে আমায় চাইত, কিন্তু তাকে আমার মোটেই ভাল লাগত না। আমি চাইতাম অন্য ধাতের মেয়ে। তাই আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি নিষ্ঠুর-ভাবে তাকে ত্যাগ করলাম। এরপর আর একটি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমার। সে ছিল এক শিক্ষিকা। সে ছিল আমার থেকে বয়সে বড়। সে আমাকে রোজ জড়িয়ে ধরত, আদর করত; কিন্তু আমি যদি তাকে জোর করে চেপে ধরে যৌনক্রিয়ার কথা বলতাম তাহলে সে রেগে যেত, দাঁত কড়মড় করতে করতে আমাকে তীব্র ঘৃণার পরিচয় দিত। সুতরাং তার সঙ্গেও আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি চাইতাম এমন এক নারী যার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিল থাকবে।

তারপর এল বার্থা কাউটস্। ওরা আমাদের বাড়ির কাছেই বাস করত। তাই আমি ওদের ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম। বার্থা একটু বড় হয়েই বার্মিংহামে এক মহিলার বাড়িতে কাজ নিয়ে চলে যায়। পরে ও নাকি এক

হোটেলে কাজ নেয়। তারপর আমার বয়স যখন একুশ তখন ও ফিরে আসে। ওর দেহে তখন টগবগ করছে পূর্ণ যৌবনের প্রাচুর্য। সেই যৌবনপুষ্ট দেহ থেকে ফেটে বার হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক মদির আবেদন। ফোটা ফুলের মত এক অপূর্ব সৌন্দর্য ওর সারা অঙ্গে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি তখন বাটালে কোম্পানিতে কেরাণীর কাজ করতাম। তার সঙ্গে তেভারশালে কামারের কাজও করতাম। ঘোড়ার ক্ষুরে লোহা পরানোর কাজটা আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। আমার বাবা যখন এই কাজ করত তখন আমি ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। এ কাজ আমার ভাল লাগত কারণ অনেক রকমের ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পেতাম। আমি কিন্তু তখনো বই পড়তাম। আর ঘোড়ার ক্ষুরে লোহা লাগাবার কাজও করতাম। আমাদের একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। তার নাম দিয়েছিলাম লর্ড ডাকফুট। আমার বাবা মৃত্যুকালে তিনশো পাউণ্ড আমাকে দিয়েছিল, তাই দিয়ে আমি বার্থাকে গ্রহণ করলাম। সে ছিল অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। আমি নিজেও সাধারণ হতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে বিয়ে করলাম। মেয়েটা খারাপ ছিল না। এর আগে যে সব মেয়েরা এসেছিল তারা কেউ আমাকে এমন করে চায়নি। তারা শুধু নিজেদের ভালবাসাটাকেই বড় করে দেখত। কিন্তু বার্থার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার অদ্ভুত মিল। সে চাইত আমি তার দেহটা ভোগ করি, তার সঙ্গে রমণ করি। কিন্তু এজন্য আমি তার খুব বশংবদ হয়ে থাকি এটা সে চাইত না। মাঝে মাঝে আমি সকালবেলায় তার বিছানায় প্রাতরাশ নিয়ে গিয়ে দিতাম তাকে। এর জন্য ভীষণ রেগে যেত সে। আমাকে ঘৃণা করত। তার আর একটা দোষ ছিল। আমি খেটেখুটে কাজ থেকে বাসায় ফিরলে সে আমায় নিজের হাতে খেতে দিত না। আমি যদি এর জন্য কিছু বলতাম, তাহলে সে দারুণ রেগে যেত। হাতের কাছে যা পেত ছুঁড়ে দিত আমাকে লক্ষ্য করে। আমিও অবশ্য তখন হাতের কাছে যা পেতাম তাই ছুঁড়ে মারতাম। একদিন সে আমাকে একটা কাপ ছুঁড়ে মারে। আমি তখন তার ঘাড়টা ধরে এমনভাবে চাপ দিলাম যাতে জীবন বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। তার ব্যবহারটা ছিল বড় দুর্বিনীত। আমি যখন তাকে চাইতাম, আমি যখন তার দেহভোগের জন্য চেপে ধরতাম তখন সে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে সরিয়ে দিত। আবার যখন আমি যৌন ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতাম তখন সে আমাকে সাপের কুণ্ডলীর মত জড়িয়ে ধরত। তারপর আমি যখন সঙ্গম শুরু করতাম, আমার কাজ হয়ে গেলেও সে আমাকে ছাড়তে চাইত না। অনেকক্ষণ পর আমাকে পীড়িত ও ক্লান্ত করে যখন ছাড়ত তখন এক পুলকের আবেগে শীৎকার ধ্বনি করে উঠত। মুখে বলত, চমৎকার। কিন্তু সে আমার অস্বস্তির কথাটা একবারও ভেবে দেখত না। আমাদের সেই যৌনক্রিয়ায় আমি যে অংশ গ্রহণ করতাম তাতে সে যেন কোন তৃপ্তির

অনুভূতি লাভ করত না, সে যেন শুধু তার নিজের চেষ্টা ও তৎপরতা থেকে তার সব তৃপ্তি লাভ করত। মাঝে মাঝে সে এক অন্ধ উন্মত্ত আবেগে তার ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়ে আমাকে চেপে ধরত, আমার যেখানে সেখানে কামড়ে ধরত। সে ছিল এমনই উগ্রকামা যে এই সব বিকৃত উপায়ে সে তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। আমি আর তাকে সহ্য করতে পারলাম না। আমরা আলাদা ঘরে শুতে লাগলাম। কিন্তু তবু সে তার দরকার মত আমার ঘরে চলে আসত।

আমাদের সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে কোনরকমে চলতে লাগল। সে আমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত এবং আবার এই ঘৃণার সঙ্গেই সে গর্ভ ধারণ করেছিল। সন্তানের জন্মের পরেই আমি যুদ্ধে চলে যাই। যুদ্ধের পর যখন শুনি সে স্ট্যাকগেট অঞ্চলে অন্য একটা লোকের সঙ্গে জুটেছে তখন আমি এখানে ফিরে আসি।

কথাটা শেষ করল সে এইখানে। তার মুখখানা ম্লান হয়ে উঠল।

কনি জিজ্ঞাসা করল, ও লোকটা কেমন ?

মেলর্স বলল, ছেলেমানুষের মত বোকা। লোকটাকে সে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। ওরা দুজনেই মদ খায়।

কনি বলল, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মেয়েটা যদি ফিরে আসে।

হা ভগবান! তা ত বটে। তার মানে আমাকে আবার দূরে পালিয়ে যেতে হবে।

এরপর দুজনেই নীরব হয়ে রইল। ঘরের ভিতর জ্বলতে থাকা আগুনে পুড়ে পুড়ে কাঠগুলো ছাই হয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে কনি বলল, তুমি যদি এমন মেয়ে পাও যে তোমাকে চায়, তাহলে তুমি খুশি হও।

এর আগে যে সব মেয়ে আমার জীবনে এসেছে তাদের কাছ থেকে যে সুখ পেয়েছি তার থেকে বেশী সুখ পাব। পদ্মগন্ধী সেই বিষকন্যা আর বাকি মেয়েরা ?

বাকি কারা ?

বাকির ত আর শেষ নেই। তবে আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি শুধু বলেছি। আমার যতদূর মনে হয় বেশীর ভাগ মেয়েই একজন পুরুষকে চায় না। কিন্তু যৌন ব্যাপারটা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পুরুষকে হাতে রাখার জন্য যেটুকু যে নক্রিয়ার দরকার ওরা শুধু সেইটুকুই করতে চায়। পুরনো আমলের মেয়েরা সন্ধ্যকালে চুপচাপ নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকবে তোমার তলায়, শুয়ে থাকবে মরার মত। তুমি যা খুশি করো। তারা কিছু মনে করে না এ ব্যাপারে এবং মোটামুটি পুরুষদের মেনে নেয়! পুরুষরাও এটা মেনে নেয়। আসলে কিন্তু তারা এটা চায় না। আমি কিন্তু এটা ঘৃণা করি। কিন্তু যারা

ধূর্ত ধরনের মেয়ে তারা মুখে এই ঘৃণার কথাটা প্রকাশ করে না। তারা উপরে দেখাতে থাকে তারা উগ্রকামা এবং পুলকের রোমাঞ্চ জাগে তাদের দেহে। কিন্তু এসব তাদের ছলনার কথা। তারা সব কিন্তু ভালবাসে; কিন্তু যা সত্যি স্বাভাবিক তাকে ভালবাসে না। আমার স্ত্রীর মত এক ধরনের মেয়ে আছে যারা যৌন ব্যাপারে সমস্ত কর্মতৎপরতা নিজেরাই দেখাতে চায়; সব তৃপ্তিটুকু নিজেরাই পেতে চায়। আর এক ধরনের মেয়ে আছে যারা যৌন ক্রিয়াকালে মরার মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। আর এক ধরনের শয়তান প্রকৃতির রমণী আছে যারা রমণকালে পুরুষদের রমণক্রিয়া শুরু করার কিছু পরেই তারা বিপরীত রতিতে পুরুষদের উপরে চেপে পুরুষদের উপর অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সমকামী পুরুষদের মতই ওরা ভয়ঙ্কর।

কনি বলল, ওদের তুমি দেখতে পার না?

মেলর্স বলল, ওদের মত মেয়ের সঙ্গে সঙ্গমকালে মনে হয় আমি ওদের খুন করে ফেলি।

তুমি কি মনে করো এই ধরনের মেয়েরা সমকামী পুরুষদের থেকেও খারাপ?

হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। কারণ এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গমকালে আমার মনে হয় আর কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করব না।

ভ্রূদুটোকে কুঞ্চিত করে গম্ভীর হয়ে উঠল মেলর্স।

আমি যখন তোমার সংস্পর্শে এলাম তখন তুমি দুঃখিত হয়েছিলে?

আমি একই সঙ্গে দুঃখিত ও আনন্দিত হই।

এখন তোমার মনের অবস্থা কি?

বাইরের দিক থেকে আমি দুঃখিত। কারণ এই সম্পর্ক থেকে ভবিষ্যতে যে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে তার কথা ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না আমি।

কিন্তু মাঝে মাঝে আবার রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে এবং আমি তখন উল্লসিত না হয়ে পারি না। জীবনে সত্যিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম আমি। ভাবতাম পৃথিবীতে কোন ভাল মেয়ে নেই যার সঙ্গে কোন পুরুষ এক সহজ স্বাভাবিক প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

কনি বলল, এখন তুমি খুশি ত?

হ্যাঁ আমি খুশি। বিশেষ করে যখন আমি অন্য সব মেয়েদের কথা ভুলে যাই, যখন তাদের ভুলতে পারি না তখন টেবিলের তলায় লুকিয়ে মরি।

কনি বুঝতে না পেরে বলল, টেবিলের তলায় মানে?

মানে বুঝতে পারছ না? মানে সন্তান।

কনি বলল, এত বিভিন্ন নারীর সংসর্গে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

হ্যাঁ, তুমি দেখ, আমি কখনো নিজেকে বোকা বানাতে পারিনি যা অনেক পুরুষই করে। এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বোকা বানিয়ে মিথ্যাকে মেনে

নেয়। কিছু না পেয়েও বলে সব পেয়েছে। কিন্তু আমি আমার আকাঙ্খিত বস্তুকে না পেয়ে বলতে পারিনি তা পেয়ে গেছি।

এখন কি সে বস্তু পেয়ে গেছ ?

মনে হয় পেয়ে গেছি।

তবে তোমাকে এমন ম্লান ও বিষণ্ণ দেখায় কেন ?

পুরনো স্মৃতির চাপ আর হয়ত নিজের প্রতি এক ভয়ের জন্য।

কনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আচ্ছা, নরনারীর এ সম্পর্কটার কি জীবনে এমন কোন প্রয়োজন আছে ?

আমার মতে আছে। নরনারীর সম্পর্ক যদি ঠিক হয়, যদি ঠিক পথে চলে তাহলে এ সম্পর্ক হচ্ছে জীবনের সর্বপ্রধান প্রাণবস্তু।

কিন্তু জীবনে যদি সে সম্পর্কের আস্বাদ কখনো না পেতে ?

তাহলে কোনরকমে তা ছাড়াই জীবনটা কাটাতে হত।

কনি কিছুটা ভেবে নিয়ে বলল, আচ্ছা, নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুমি ঠিক পথে, ন্যায় পথে চলে এসেছ ?

না, মোটেই না। আমি আমার স্ত্রীকে তার ইচ্ছামত চলতে দিয়েছিলাম। আমার দোষ হচ্ছে সেইখানে। আমি আমার ব্যক্তিত্বকে ও পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিনি তার উপর। ফলে সে অবাধে খারাপ হয়ে যায়। আর আমি কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কনি তার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার রক্ত যখন উচ্ছলিত হয়ে ওঠে দেহের মধ্যে তখন তুমি তোমার দেহকে বিশ্বাস করো ?

না, আর সেইখানেই যত গোলমাল। সেই জন্যই আমার মনে এত অবিশ্বাস।

কনি বলল, থাক তোমার মনে অবিশ্বাস।

কুকুরটা মেঝের উপর পাতা মাদুরের উপর বসে অস্বস্তিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল। আগুনে পোড়া কাঠের ছাই বেড়ে যাচ্ছিল বলে আগুনটা স্তিমিত হয়ে আসছিল।

কনি বলল, তুমি আমি দুজনেই দুই ভগ্ন সৈনিক।

মেলর্স হেসে বলল, তুমিও ভগ্ন সৈনিক ? এইখানেই আমাদের মিল।

কনি বলল, হ্যাঁ, সত্যিই আমার ভয় হয়।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ।

সে উঠে কনির ও নিজের জুতোগুলো আগুনের পাশে রেখে শুকোতে দিল। সকালবেলায় ওগুলোকে রং মাখাবে। তারপর ওদের সেই বিয়ের ফটোর পোড়া কাঠ আর কাগজের বোর্ডের ছবিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে মেলর্স বলল, এই ছাইগুলোও নোংরা। হঠাৎ উঠে তার কুকুরটা নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর মেলর্স ফিরে এলে কনি বলল, আমিও বাইরে যাব একবার।

ঘর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল কনি। মাথার উপর আকাশভরা তারা। ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। বনেতে তখন দারুণ ঠাণ্ডা। কনির পায়ের জুতোগুলো ভিজে ভিজে মনে হচ্ছিল। সকলের কাছ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল তার।

দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাসাটায় ফিরে এল কনি। এসে দেখল, আগুনের ধারে বসে আছে মেলর্স। আগুনটায় কিছু কাঠ ফেলে দিয়ে আবার কিছু কাঠ আনল। জ্বলন্ত কাঠের আগুনের আঁচে ওরা আরাম অনুভব করছিল। তাদের মুখ ও বুকগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

মেলর্স চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ তার কাছে সরে গিয়ে তার একটা হাত ধরল কনি। বলল, কিছু মনে করো না।

সামান্য একটুখানি ক্ষীণ হাসি হেসে মেলর্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কনি আরও কাছে গিয়ে মেলর্সের কোলের ভিতর ঢুকে পড়ল। বলল, তুমি ওদের কথা একেবারে ভুলে যাও।

জ্বলন্ত আগুনের আরামঘন মিষ্টি উত্তাপের সঙ্গে কনির নরম দেহের স্পর্শটা আরও ভাল লাগছিল মেলর্সের। সে কনিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল। আবার উত্তাল হয়ে উঠল তার দেহের রক্ত। সে রক্তের মধ্যে আবার ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার হঠাৎ ফিরে আসা জারজ শক্তি।

কনি বলল, যে সব মেয়ে তোমার জীবনে এসেছিল তারা হয়ত তোমায় ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। হয়ত তাদের দোষ নেই।

আমি তা জানি। আমি সব কিছু জেনেও মেরুদণ্ড ভাঙ্গা সাপের মত হয়েছিলাম।

কনি এবার তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল। ঠিক এই মুহূর্তেই সে সঙ্গম শুরু করতে চায়নি। তবু কোন এক অজ্ঞাত অব্যক্ত শক্তি ঠেলে দিতে লাগল সেই পথে, যৌনসংসর্গের এক অন্ধকার পঙ্কিলতার মাঝে।

কনি বলল, কিন্তু এখন ত তুমি আর মেরুদণ্ড ভাঙ্গা সাপ নও।

আমি জানি না আমি কি। আমার মনে হয় আমাদের সামনে দুর্দিন আসছে।

কনি তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, না না, ওকথা বলো না। কেন, কেন তুমি একথা বলছ ?

এক বিষাদঘন শঙ্কার ছায়ায় মুখখানা কালো করে মেলর্স বলল, দুর্দিনের কালো মেঘ নেমে আসছে আমাদের সকলের উপর।

না না, ওকথা বলো না।

মেলর্স চুপ করে রইল। কনি সত্যি সত্যিই নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝেও হতাশা আর বিষাদের এক কুটিল শূন্যতা স্পষ্ট অনুভব করল। মেলর্সের দেহের স্পর্শে ও তা অনুভব করল। এ শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারল কনি।

এ শূন্যতা হলো এক ধরনের মৃত্যু, সকল কামনা সকল প্রেমের মৃত্যু এ হতাশা হচ্ছে সেই অনীহার অদৃশ্য অন্ধকার গুহাদেশ যা সব পুরুষের মনের মধ্যেই থাকে এবং যার মধ্যে একদিন সব পুরুষের পুরুষত্বই সব তেজ ও তাপ হারিয়ে এক সীমাহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে।

কনি ভয়ে ভয়ে বলল, যৌন ব্যাপারে তুমি একেবারে নিস্পৃহ। তোমার কথা শুনে তাই মনে হয়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এর আগে যে সব যৌনসংসর্গ করেছ তাতে শুধু তুমি তোমার নিজের আনন্দ আর তৃপ্তিটাকেই বড় করে দেখেছ।

এক কুণ্ঠিত প্রতিবাদের সুর ছিল কনির কণ্ঠে।

মেলর্স বলল, ঠিক তা নয়। আমি নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ চেয়েছি ঠিক, কিন্তু তা আমি ঠিক পাইনি। কারণ কোন নারীর সঙ্গে সহবাস করে আমি ততখানি তৃপ্তি বা আনন্দ পাই সে আমার থেকে যতখানি তৃপ্তি বা আনন্দ পায়। আমার মনে তা কখনো ঘটেনি। সহবাসের আনন্দ নরনারীর যৌথ অনুভূতির ব্যাপার।

কনি বলল, কিন্তু তুমি ত কোন নারীর কথা বিশ্বাস করনি। তুমি আমার কথাও বিশ্বাস করো না।

কোন নারীকে বিশ্বাস করার অর্থ কি তা জানি না।

এইটাই তোমার দোষ।

কনি তখন মেলর্সের কোলের মধ্যে কুঁচকে ঢুকে ছিল। কিন্তু মেলর্সের মন সেখানে ছিল না। কনির কোন কথাই তার মনের চেতনাকে নিবিড় করে তুলতে পারছিল না তার দেহের মধ্যে।

কনি বলল, তুমি কিসে বিশ্বাস করো?

আমি তা জানি না।

কনি বলল, অন্য সব লোকের মত তুমি কিছুই জান না।

প্রথমে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মেলর্স বলল, হ্যাঁ, আমি সত্যিই একটা জিনিসে বিশ্বাস করি। আমি চাই আন্তরিকতার উত্তাপ। আমি এই আন্তরিকতার উত্তাপ নিয়ে কোন নারীর সঙ্গে সঙ্গম বা সহবাস করতে ভালবাসি আর সঙ্গে সঙ্গে চাই নারীরাও অনুরূপ আন্তরিকতার উত্তাপে আমাকে গ্রহণ করবে। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আন্তরিকতার উত্তাপ-হীন যে সঙ্গম তা হিমশীতল মৃত্যুর মতই অবাঞ্ছনীয়। তা নির্বুদ্ধিতারই সামিল।

কনি বলল, তুমি ত কখনো বিনা আন্তরিকতায় আমার সঙ্গে সঙ্গম করনি।

আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করতেই চাই না। আমার অন্তঃকরণ এখন ঠাণ্ডা আলুর মতই পড়ে আছে।

কনি তাকে চুম্বন করে বলল, এইবার আমাদের কাজ শুরু করো।

মেলর্স বলল, আমরা একটুখানি আন্তরিকতার কাঙাল। কিন্তু মেয়েরা এটা চায় না। এমন কি তুমিও চাও না। তুমি চাও এক বলিষ্ঠ পুরুষের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী রমণ; কিন্তু সে রমণ হবে আন্তরিকতাহীন। আমার প্রতি কোথায় তোমার ভালবাসা বা মমতা? বিড়াল যেমন কুকুরকে সন্দেহের চোখে দেখে তুমিও তেমনি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখ। আমার মনে হয় মমতা আন্তরিকতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিতে হলেও দুজনের পারস্পরিক সহযোগিতার দরকার হয়। তুমি সঙ্গম ভালবাস ঠিক, চাও এক চরম পুলকানুভূতির এক বিরল অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা শুধু তোমার আত্মসুখ চরিতার্থ করার জন্য। তোমার আত্মসুখ এবং নিজের প্রতি গুরুত্ববোধ যে কোন পুরুষের থেকে পঞ্চাশ গুণ বেশী।

কনি বলল, একথা আমিও তোমায় বলতে পারি। তোমার কাছেও তোমার আত্মসুখই বড় কথা।

মেলর্স উঠতে উঠতে বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের দূরে থাকা ভাল পরস্পরের। আন্তরিকতাহীন সঙ্গম করার থেকে মরা ভাল।

কনি তার কোল থেকে উঠে পড়তেই মেলর্স উঠে দাঁড়াল।

কনি বলল, তুমি কি মনে করো আমিও এই ধরনের সঙ্গম চাই?

মেলর্স বলল, আশা করি তুমি তা চাইবে না। তবু তুমি আমার বিছানাটাতে শোওগে। আমি এইখানেই শোব।

কনি দেখল মেলর্সের মুখখানা ম্লান। ভ্রূদুটো কুঞ্চিত। তাকে দেখে মনে হলো কুমেরুর মতই হিমশীতল আর সুদূরবর্তী।

কনি বলল, সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি যেতে পারছি না।

না, এখন পৌনে একটা বাজে। বিছানায় যাও।

কনি বলল, না, আমি কিছুতেই যাব না।

মেলর্স বলল, তাহলে আমি বাইরে বেরিয়ে যাব।

সে জুতো পরতে লাগল। কনি তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কনি বলল, থাম, থাম, আগে বল কি হয়েছে আমাদের মধ্যে?

মেলর্স কোন উত্তর করল না। জুতোয় ফিতে পরাচ্ছিল সে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কনি দাঁড়িয়েছিল। তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। সেই ঝাপসা চোখের অস্বচ্ছ অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে মেলর্সের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। কনি বুঝতে পারল না কেন সে তাকিয়ে আছে, এ দৃষ্টির উৎস কোথায়। শুধু মনে হলো যেন এক অপরিজ্ঞাত শূন্যতার অন্তহীন গভীরতা হতে উৎসারিত হচ্ছে এ দৃষ্টি। সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির সীমাহীন কুয়াশায় সমস্ত জগৎ যেন ঢেকে গেছে। আর কিছুই দেখতে পায় না, আর কিছুই জানতে চায় না সে।

নীরবে চোখ তুলে কনিকে দেখল মেলর্স। দেখল বিস্ফারিত চোখের

কুয়াশাভরা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে কনি। আপন চিন্তার অর্থহীন শূন্যতার অতলে হারিয়ে গেছে সে। তার মধ্যে সে যেন আর নেই। সহসা একটা দমকা হাওয়ায় মাথাটা ঘুরে গেল মেলর্সের। একটা পায়ে জুতো পরা অবস্থাতেই সে কনিকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল। তার জামার তলায় হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার তলপেটের তলায় নরম উত্তপ্ত জায়গাটা বারবার স্পর্শ করতে লাগল। আদরের ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, আমার সোনা মেয়ে, আমি তোমায় ভালবাসি।

কনি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, থাম, আবেগে বিচলিত হয়ো না। আগে বল সত্যিই তুমি আমাকে চাও কি না, সত্যিই সঙ্গম চাও কি না।

সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল মেলর্সের দেহের সমস্ত চঞ্চলতা। সে স্থির হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, হ্যাঁ চাই। চল আমরা মিলিত হই।

কনি তার চোখে জল নিয়ে বলল, সত্যি বলছ ?

হ্যাঁ সত্যি বলছি।

তার নিচে শুয়ে থাকা কনির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে হাসল সে। সে হাসিতে কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে ছিল এক প্রচ্ছন্ন তিক্ততা।

এদিকে কনি তখন নীরবে কাঁদছিল। কনিকে জড়িয়ে ধরে মেলর্স শুয়ে ছিল তখনো। একটা কম্বল জড়িয়ে মেঝের উপর শুয়েছিল তারা। তাই তাদের দুজনের সমান কষ্ট হচ্ছিল। ওরা আর দেরি না করে বিছানায় চলে গেল তাড়াতাড়ি। রাত্রির হিম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। মেঝের উপর রমণকালে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দুজনেই। তাই ওরা বিছানায় গিয়ে দুজনে শুতেই ঘুমিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওরা বাকি রাতটুকু একভাবে গভীরভাবে ঘুমোল। ওদের ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সকালের রোদ উঠে গেছে। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

মেলর্স প্রথমে উঠে পড়ল। উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে তুলে আলোর পানে তাকাল। কান খাড়া করে ব্ল্যাকবোর্ড আর থ্রাস পাখির গান শুনল। তখন সকাল সাড়ে পাঁচটা, তার ওঠার সময়। মেলর্স দেখল আজকের সকালটা বেশ উজ্জ্বল। গত রাতে গভীরভাবে ঘুমিয়েছে সে। জীবনে এমন দিন এর আগে আর কখনো আসেনি, যেন এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। তার শয্যা-সঙ্গিনী সেই নারী এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুমন্ত দেহটাকে বড় স্নিগ্ধ ও মনোরম দেখাচ্ছে। সে দেহের উপর হাতটা পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল কনির। ঘুম ভাঙ্গতেই এক পরম বিস্ময়ে চোখ তুলে মেলর্সের মুখপানে তাকাল কনি। তাকিয়ে হেসে ফেলল আপন অজানিতে।

কনি বলল, তুমি উঠে পড়েছ ?

কনির চোখপানে তাকিয়ে মেলর্সও হেসে ফেলল। কনিকে চুম্বন করল।

সহসা উঠে বসল কনি। বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, দেখ দেখি, কোথায় আমি আছি। কেমন আশ্চর্য লাগছে!

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল কনি। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল একটা চেয়ার আর একটা ছোট সাদা বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই। এই বিছানাটাতেই শুয়ে আছে সে।

কনি আবার বলল, আমরা কোথায় শুয়ে আছি ভাবতেও কেমন লাগছে। মেলর্স আবার শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়ে দেখছিল কনিকে। পাতলা নাইট গাউনে ঢাকা কনির বুকটার উপর হাত বোলাচ্ছিল। তাদের দুজনকেই এক মধুর উত্তাপে ও আবেগে বড় সজীব ও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কনি সহসা বলে উঠল, আমি এটা সরিয়ে ফেলতে চাই।

এই বলে সে তার বুকের উপর থেকে কাপড়টা তুলে ফেলল। তার ঘাড় বুক পেট সব এক নগ্ন শুভ্রতায় প্রকটিত হয়ে উঠল। তার সোনারবরণ ঈষৎ শিথিল স্তন দুটো ঘণ্টার মত ঝুলছিল। সেগুলো হাত দিয়ে বোলাতে ভাল লাগছিল মেলর্সের।

কনি সহসা বলল, তুমিও তোমার পায়জামা খুলে ফেল।

কনির কথামত তার সমস্ত জামা ও পায়জামা খুলে একেবারে নগ্নদেহ হয়ে গেল মেলর্স। দুধের মত সাদা তার নগ্ন দেহটাকে দেখতে কনির বড় ভাল লাগছিল। তার মনে পড়ছিল একদিন স্নানরত মেলর্সের দেহটাকে এমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার দেহসৌন্দর্য এক অনিবারণীয় তীক্ষ্ণতায় তার মর্মকে স্পর্শ করছিল যেন।

সহসা বিছানা থেকে উলঙ্গ অবস্থাতেই উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল মেলর্স। কনি তার নগ্ন পৃষ্ঠদেশটা দেখতে লাগল। পিঠটা সাদা এবং সুন্দর। পাছার কাছটা পুরুষদেহসুলভ এক কৃষ্ণাভ বর্ণে দীপ্ত। ঘাড়ের পিছনটাও বেশ শক্ত।

কনির মনে হলো, মেলর্সের দেহের ভিতরে ও বাইরে একই সঙ্গে এক পুরুষালি বলিষ্ঠতা ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে এক দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। মেলর্সের দিকে দুহাত বাড়িয়ে কনি বলল, তুমি সত্যিই সুন্দর, তুমি আমার কাছে চলে এস, অনেক কাছে এস।

কিন্তু তার লিঙ্গোত্থিত প্রকটতায় লজ্জা পাচ্ছিল মেলর্স। কনির দিকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছিল সে। তাই মেঝে থেকে তার শার্টটা তুলে কোমরের কাছে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

কনি বিছানার উপর বসে তেমনি হাত দুটো বাড়িয়ে বলল, না, ঢাকা দিও না। উলঙ্গ হয়েই এস, আমাকে দুচোখ ভরে দেখতে দাও।

কনির কথামত জামাটা ফেলে দিয়ে কনির সামনে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে নগ্ন

দেহে দাঁড়াল মেলর্স। পর্দাখোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক সোনার মত আলো এসে তার তলপেট আর বাদামী কেশগুচ্ছপরিবৃত পূর্ণোত্থিত কৃষ্ণাভ পুরুষাঙ্গের উপর পড়ল। একই সঙ্গে ভয় আর আনন্দের মিশ্রিত বিস্ময়ে চমকে উঠল কনি।

কনি বলল, কী আশ্চর্য দেখ। কেমন আশ্চর্যভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে দেখ। কত বড় কৃষ্ণবর্ণ আর আত্মপ্রত্যয়ের আতিশয্যে কত স্পর্ধিত।

তার দেহের নিচে উত্থিত পুরুষাঙ্গের পানে একবার তাকিয়ে হাসল মেলর্স। সে দেখল তার বুকের মাঝখানে যে চুল আছে তা কালো, তার মাথার চুলও কালো, কিন্তু তার তলপেটের নিচে যে চুল রয়েছে তার রংটা কেমন যেন সোনালী আর লালে মেশা। তাম্রবর্ণ মেঘসদৃশ সেই কেশগুচ্ছের মাঝে এক কৃষ্ণাভ বলিষ্ঠতায় উত্তুঙ্গ লিঙ্গটিকে বড় বেশী প্রকট দেখাচ্ছিল।

শান্ত নরম কণ্ঠে কনি বলল, দেখ দেখ কত উদ্ধত কত দর্পিত। এক অপরিসীম প্রভুত্ববোধে কেমন স্ফীত। এবার আমি বুঝতে পেরেছি পুরুষরা কেন এত অহঙ্কারী হয়। তবে ও কিন্তু সত্যিই সুন্দর। ও যেন আর এক সত্তা। এক মানুষের মাঝে আর এক মানুষ। ভয়ঙ্কর হলেও সুন্দর। এক অজানিত আশঙ্কায় ও আনন্দের উত্তেজনায় তার নিচের দিকের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল কনি।

মেলর্স তার পুরুষাঙ্গটাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, কী ছোকরা, তোমার খবর কি জন টমাস? তুমি কিন্তু আমার থেকে সাহসী, স্বল্পভাষী।

তোমাকে লেডি জেন চাইছে, সে তোমাকে ভালবাসে। তোমার মাথাটাকে সে আদর করে। কি চাও তুমি? বলে দাও লেডি জেনকে, বলে দাও তুমি তার যৌনাঙ্গটি চাও।

কনি বলল, ওকে তুমি বকো না।

এই বলে বিছানার উপর হাঁটু গেরে বসে মেলর্সের সামনের দিক থেকে তার পাছাটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। এমনভাবে যাতে তার উত্থিত লিঙ্গের মন্দমধুর কঠিনতাটা তার বুকের উপর ঝুলন্ত স্তনদুটোকে ঘা দিতে পারে, যাতে তার সেই লিঙ্গাগ্রভাগনিঃসৃত লালারসে তার স্তনযুগল সিক্ত হতে পারে।

মেলর্স ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

ওদের সঙ্গমের কাজ শেষ হয়ে গেলে ওদের দেহদুটো যখন স্থির হয়ে গেল একেবারে তখন কনি মেলর্সের নিম্নাঙ্গে হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গটির আর এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে লাগল।

কনি বলল, দেখ দেখ, এখন কত ছোট, কত নরম, যেন সকল জীবনের সকল প্রাণের এক স্ফুটনোন্মুখ ফুল।

মেলর্সের পুরুষাঙ্গটি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবার বলতে লাগল, দেখ দেখ, কত সুন্দর। ওকে যেন তুমি অপমান করো না। ও শুধু তোমার

নয়, ও আমারও। এখন ও কত সুন্দর কত নির্দোষ দেখ! যেন কিছুই জানে না।

মেলর্স হাসল। হেসে বলল, যে বস্তু আমাদের দ্বৈত প্রেমের দুরন্ত পশুটাকে ঠিকমত শাসনের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে সে বস্তুকে ধন্যবাদ, তা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়।

কনি বলল, নিশ্চয়। ও যখন এত ছোট আর নরম তখনো আমি বেশ অনুভব করছি আমার সমগ্র অন্তরাত্মাটা ওর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। কত সুন্দর! তোমার এ জায়গার চুলগুলো আলাদা।

মেলর্স বলল, ওটা হচ্ছে জন টমাসের চুল, আমার নয়।

কনি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেন্ট টমাস, সেন্ট টমাস। এই বলে মেলর্সের পুরুষাঙ্গটাকে আদরের সঙ্গে চুম্বন করল। ছোট নরম লিঙ্গটা তখন আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করেছে।

মেলর্স পা ছড়িয়ে শুয়ে বলল, ও সত্যিই আমার থেকে আলাদা। আমার মনের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। এক এক সময় আমি খুঁজে পাই না ওকে নিয়ে আমি কি করব। ওর যেন নিজস্ব এক ইচ্ছাশক্তি আছে। ওকে খুশি করা সত্যিই মুস্কিল। তবু ওকে আমি মারতেও কখনো পারব না।

কনি বলল, পুরুষরা ওকে যে ভয় করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও সত্যিই ভয়ঙ্কর।

মেলর্সের দেহটা আবার কেঁপে উঠল। সে কাঁপন জড়িয়ে পড়ল সব শিরা উপশিরায়। তার জৈব চেতনার সমস্ত প্রবাহ এক দুরন্ত আবেগে ছুটে গিয়ে একটি বিশেষ জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে লাগল।

মেলর্স দেখল তার পুরুষাঙ্গটি আবার উত্থিত ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তার ইচ্ছা না থাকলেও তার এই উদ্ধত উত্থানের কাছে সে অসহায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত করার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

তার সেই উদ্ধত মাথাটা দেখে সত্যিই বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেল কনি।

মেলর্স বলল, এই নাও, ওকে গ্রহণ করো। ও তোমার।

কনির দেহটা একবার কেঁপে উঠল। এক কম্পিত বিহ্বলতায় তলিয়ে যেতে লাগল কনি। তবু সেই উত্থিত উদ্ধত পুরুষাঙ্গটি তার সমস্ত মৃদুর কঠিনতা নিয়ে তার যোনিদেশের গভীরে যখন প্রবেশ করল তখন এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় পুলকের এক তীক্ষ্ণ প্রবাহ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার দেহ-মনের উপরে। সে প্রবাহের মধ্যে যে এক প্রাণবন্ত উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল তার আঘাতে কনির সমস্ত সত্তাটা গলে গেল মুহূর্তে। কনির মনে হলো সে যেন ভেসে যাচ্ছে। অন্ধ অজানা এক আনন্দের মহাসমুদ্রের প্রান্তসীমার দিকেও যেন দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে।

মেলর্স শুয়ে শুয়ে স্ট্যাকগেটের কয়লাখনি থেকে আসা আওয়াজ শুনতে

পেল। ও আওয়াজ ও শুনতে চায় না। শুনতে চায় না বলেই সে যেন তার গোটা মুখটা কনির নরম বুকের মধ্যে গুঁজে কানদুটোও ঢেকে রাখতে চাইল।

সে শব্দ কনিও যেন শুনতে চায় না। বাইরের জগতের কোন শব্দই শুনতে চায় না তারা। কোন দৃশ্য দেখতে চায় না। কনি নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল একভাবে। কোন এক অজানিত তরঙ্গের অভিঘাতে বারবার বিধৌত হয়ে বৃষ্টিস্নাত আকাশের মতই আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তার আত্মা।

মেলর্স এবার ধীরে ধীরে বলল, এবার তোমার ওঠা উচিত। তাই নয় কি?

কনি জিজ্ঞাসা করল, সময় এখন কত?

এখন সাতটা বাজে প্রায়।

তাহলে আমাকে উঠতেই হবে।

উঠতে বিরক্তিবোধ করছিল কনি। যে প্রয়োজনের নির্মম তাড়না, বাইরের জগতের যে অবাঞ্ছিত অনুশাসন তার এই বনান্তরালবর্তী নির্জন সহবাস আর সুখের জগৎ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার উপর রাগ হলো তার।

সহসা মেলর্স উঠে বসে বাইরে তাকাল। কনিও উঠে বসল, তুমি আমাকে ভালবাস ত?

মেলর্স বলল, একথার উত্তর তুমি জান। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ?

কনি বলল, আমি চাই তুমি চিরদিন আমাকে রেখে দেবে তোমার কাছে। আমাকে এখান থেকে কোনদিন কোথাও যেতে দেবে না।

কেমন যেন এক তরল অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে উঠল মেলর্সের চোখদুটো। সে বলল, কখন? এখনি?

কনি বলল, এখনি তোমার অন্তরে আমাকে ভরে রেখে দাও। আমি শীঘ্রই তোমার কাছে চলে আসব তোমার সঙ্গে চিরদিনের মত বাস করার জন্য।

বিছানার উপর নগ্ন দেহে বসে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল মেলর্স।

কনি বলল, তুমি কি এটা চাও না?

অন্যমনস্কভাবে মেলর্স বলল, হ্যাঁ।

মেলর্স বলল, ওকথা আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করো না। পরে যখন খুশি জিজ্ঞাসা করো। এখন শুধু আমাকে তোমার এই সঙ্গসুখ উপভোগ করতে দাও প্রাণ ভরে। কোন নারী যখন প্রাণ খুলে অকুণ্ঠভাবে তার দেহ আমাদের ভোগ করতে দেয় তখন তাকে সত্যিই খুব ভাল লাগে। তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা দেহটাকেই বড় ভাল লাগছে আমার। এখন আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে রয়েছে শুধু তোমার কথা। এখন আমাকে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না। তার অন্য সময় আছে।

মেলর্স তখনো বিছানার উপর উলঙ্গ হয়ে বসেছিল। সে ধীরে ধীরে তার

একটা হাত শায়িতা কনির যোনিদেশ ও তার আশপাশের উদ্গত বাদামী রঙের চুলগুলোর উপর হাত বোলাতে লাগল। তার নগ্ন দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক জৈব চেতনা আর অনুভূতির তরঙ্গ খেলে গেলেও তার মুখখানা যেন বুদ্ধের মতই জমাট বেঁধে ছিল এক নিষ্কাম স্তব্ধতায়। কনির গায়ে হাত দিয়ে সেইভাবে বসে রইল মেলর্স।

আরো কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ে তার জামা আর পায়জামা খুঁজে পরতে লাগল মেলর্স। তাকিয়ে দেখল কনি তখনো নগ্ন দেহে শুয়ে আছে বিছানায়। কিন্তু আর সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে গেল সে। কনি দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

কনি তখনো শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। লোকটার সাহচর্য আর বাহুবন্ধনের মায়া কাটিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া মুস্কিল তার পক্ষে। কিন্তু ওদিকে মেলর্স যেতে যেতে বলল, সাড়ে সাতটা বাজে।

কনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। একবার তাকিয়ে দেখল ঘরখানার মধ্যে বিশেষ কোন আসবাবপত্র নেই। কিন্তু মেঝেটা চমৎকারভাবে পরিষ্কার করে সাজানো গোছানো। কনি আরো দেখল জানালার কাছে একটা তাকে কিছু বই রয়েছে। কিছু বই তার কেনা আর কিছু বই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের। কনি উঁকি মেরে দেখল বইগুলো বিভিন্ন বিষয়ের। তার মধ্যে আছে বলশেভিক রাশিয়ার উপর লেখা বই। ভ্রমণকাহিনী, এ্যাটম ও ইলেকট্রনের উপর বিজ্ঞান-বিষয়ক বই, আর আছে পৃথিবীর গঠন আর ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কিত বই। মোট কথা লোকটা বই পড়ে। পড়াশুনো করে।

জানালা দিয়ে সূর্যের এক ঝলক আলো এসে কনির নগ্ন দেহের উপর পড়ল। কনি জানালা দিয়ে বাইরে দেখল মেলর্সের কুকুর ফ্লসি ঘোরাফেরা করছে। এই সোনালী সকালটা কত চমৎকার। কত উজ্জ্বল। পাখিরা মনের সুখে গান গাইছে গাছে গাছে। চারদিকের বাতাসে ফোটা ফুলের গন্ধ। কনির বার বার মনে হতে লাগল সে যদি এখানে এক সবুজ শান্তি আর নির্জনতা দিয়ে ঘেরা এই বনভূমির মধ্যে একটা ঘর বেঁধে থাকতে পারত তার মনের মানুষের সঙ্গে। ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখল মেলর্স হাত মুখ ধুয়ে চা করার কাজে ব্যস্ত। কনিকে দেখে সে বলল, চা খাবে?

কনি বলল, না, আমাকে একটা চিরুণী দাও।

আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়িয়ে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হলো কনি।

তাকে এখন যেতে হবে সেই ভয়ঙ্কর জগতে, লোহার স্তূপ আর কয়লার ধোঁয়ায় ঘেরা যে জগৎ তার জন্য প্রতীক্ষা করছে এক নিষ্ঠুর প্রত্যাশায়।

সামনের বাগানটায় কিছুক্ষণ ফুল দেখল কনি। কত রকমের ফুল, কত রঙের বাহার, কত উজ্জ্বলতা।

কনি মেলর্সকে বলল, বাকি সমস্ত জগৎটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমি তোমার

সঙ্গে এখানে বাস করতে আসব। নতুন জীবন গড়ে তুলব।

মেলর্স বলল, সে জগৎ উড়ে যাবে না।

শিশিরভেজা বনপথ দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল তারা। এ জগৎ তাদের নিজস্ব জগৎ। এ পথের প্রতিটি অণু তাদের ভালবাসার আশ্বাসে গড়া।

র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে মন চাইছিল না কনির। তবু যেতে হবে। সে মেলর্সকে বলল, আমি খুব শীগগির চলে আসব তোমার কাছে। একসঙ্গে থাকব দুজনে।

কোন উত্তর না দিয়ে একটুখানি হাসল শুধু মেলর্স। তার মুখের ক্ষীণ হাসি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল মুখের মাঝে।

বাড়ি ফিরে দেখল কেউ কিছু জানতে পারেনি তার কথা। বাড়িতে পা দিয়েই সোজা নিজের ঘরে চলে গেল কনি।

অধ্যায় ১৫

সেদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে হিলদার একটা চিঠি পেল কনি। হিলদা লিখেছে, বাবা এই সপ্তায় লণ্ডনে যাচ্ছেন। আমি ১৭ই জুন বৃহস্পতিবার তোমার ওখানে যাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে যাতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি। র‍্যাগবিটা বড় বাজে জায়গা; ওখানে আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি আগের দিন রেটফোর্ডে কোলম্যানদের কাছে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার লাঞ্চের সময় তোমার কাছে যাব। আমরা বিকালে চা খাবার সময় রওনা হয়ে রাতটা প্রাণভারে কাটাব। র‍্যাগবিতে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটানোর কোন অর্থ হয় না। সে যদি তোমার যাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ না করে তাহলে আমাদের উপস্থিতিতে সে মোটেই আনন্দ পাবে না।

তাকে আবার দাবার ছকের উপর বসানো হচ্ছে।

কনির যাওয়াটা সত্যিই পছন্দ করছিল না ক্লিফোর্ড। কারণ তার ধারণা কনির অনুপস্থিতিতে কেমন যেন অসহায়বোধ করবে সে। কনি বাড়িতে থাকলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে সে আর তখন সব কাজ নিশ্চিন্ত মনে সহজে করে যেতে পারে। এখন সে প্রায়ই খাদে গিয়ে সবচেয়ে কম খরচে বেশী কয়লা তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। কয়লা তোলা আর তা বিক্রি করাই হলো তার কাজ। আজকাল আবার তার মাথায় নতুন নতুন চিন্তা আসছে শিল্পের উন্নতির জন্য। সে ভাবছে তার খনিতে উৎপন্ন কয়লা বিক্রি না করে সেই কয়লা দিয়ে অন্য এক শিল্প গড়ে তুলতে।

কনির মনে হয় এ হচ্ছে এক নেশা, এক উন্মত্ততা। এ কাজে একমাত্র

কাজ-পাগল লোকরাই সফল হতে পারে। কনির মনে হয় শিল্পের ব্যাপারে ক্লিফোর্ডের এই সব প্রেরণা আর কর্মতৎপরতা উন্মত্ততারই লক্ষণ।

এ ব্যাপারে সব কথা কনিকে বলত ক্লিফোর্ড এবং কনিও তা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে যেত এবং অবাধে সব কথা বলতে দিত ক্লিফোর্ডকে। নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বলত ক্লিফোর্ড। কিন্তু কিছুক্ষণ একটানা কথা বলার পর সহসা সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে ক্লিফোর্ডের আর তখন সে শূন্য মনে কনির মুখপানে তাকিয়ে থাকে। তখন তার সব পরিকল্পনা মুখ থেকে মনের গভীরে চলে গিয়ে স্বপ্ন হয়ে ভাসতে থাকে যেন।

প্রতিটি রাতে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে সেই খেলাটা খেলে যায় ক্লিফোর্ড। খেলাটা এক ধরনের জুয়া। জুয়া খেলতে খেলতে কেমন যেন সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চেতনাশূন্য হয়ে পড়ে। এক অর্থহীন শূন্যতাসর্বস্ব উন্মত্ততা আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমস্ত মনোভূমিটাকে। কনি তার এই শোচনীয় অবস্থাটা দেখে সহ্য করতে পারে না। সে বিছানায় শুতে যাবার পরেও রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত মিসেস বোল্টনের সঙ্গে জুয়া খেলে যায় ক্লিফোর্ড। এ বিষয়ে রোজ রাতে এক আশ্চর্য ধরনের আসক্তির পরিচয় দেয় সে। এ বিষয়ে মিসেস বোল্টনের উৎসাহও কম নয়। সে রোজ হেরে যায়। যতই হারতে থাকে ততই তার খেলার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

একদিন মিসেস বোল্টন বলে, আমি গত রাত্রে কুড়ি শিলিং হেরে গেছি।

কনি জিজ্ঞাসা করে, ক্লিফোর্ড তোমার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল ?

মিসেস বোল্টন বলে, কেন চাইবেন না, ঋণ ত ?

কনি প্রতিবাদ করেছিল। সে এ ব্যাপারে দুজনেরই উপর রেগে যায়। ফলে ক্লিফোর্ড বোল্টনের মাইনে বছরে একশো পাউণ্ড বাড়িয়ে দেয়। সেই টাকাতে মিসেস বোল্টন নিশ্চিন্তে জুয়া খেলে যেতে পারে। তবে কনির প্রায়ই মনে হত ক্লিফোর্ডকে যেন ম্লান আর নির্জীব দেখাচ্ছে।

অবশেষে একদিন ক্লিফোর্ডকে বলল কনি, আমি সতের তারিখে চলে যাচ্ছি।

ক্লিফোর্ড বলল, সতেরই ? কবে ফিরবে ?

খুব বেশী দেরী হলে ২০শে জুলাই।

কনির পানে এবার অদ্ভুতভাবে তাকাল ক্লিফোর্ড। সে দৃষ্টির মধ্যে শিশু-সুলভ এক অস্পষ্টতার সঙ্গে বৃদ্ধসুলভ এক চাতুর্যের ভাব ছিল।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি নিশ্চয় আমাকে হতাশ করবে না ?

তার মানে ?

তুমি যখন এখান থেকে চলে যাবে তখন তুমি ফিরে আসবে একথা মনে করতে পারব ত ?

আমি যে ফিরে আসব এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ঠিক আছে, আমি নিশ্চিত হলাম। ২০শে জুলাই।

তবু কনির দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকাল ক্লিফোর্ড।

তবু ক্লিফোর্ড সত্যি সত্যিই চাইছিল কনি থাক। সত্যিই সে এ বিষয়ে এক আশ্চর্য কামনাকে পোষণ করে। সে চায় কনি বেড়াতে যাক এবং সন্তান সম্ভবা হয়ে আসুক। আবার সঙ্গে সঙ্গে কনির যাওয়ার কথা শুনে শঙ্কিতও হয়ে উঠেছিল মনে মনে।

এদিকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের উত্তেজনায় সারা অঙ্গ কাঁপছে কনির। ক্লিফোর্ডকে ছেড়ে এই বাড়ির সীমানা ছেড়ে দূরে যাওয়ার এই প্রথম সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে যেন সে। এক অধীর আগ্রহে এক উষ্ণ উত্তেজনা বুকে নিয়ে সেই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে কনি।

একদিন কনি তার বাইরে যাবার কথাটা মেলর্সকে বলল।

কনি বলল, ফিরে আসার পর আমি ক্লিফোর্ডকে বলব, আমি আর তার কাছে থাকব না, তাকে ছেড়ে চলে যাব আমি। তখন তুমি আর আমি বাইরে চলে যাব। ওরা জানবে না আমার সন্তানের জনক তুমি। আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাব। আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া। ঠিক ত?

নিজের পরিকল্পনাটার কথা ভেবে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এক গোপন পুলকের আবেগে।

মেলর্স বলল, তুমি কখনো কোন উপনিবেশে যাওনি ত?

না, তুমি গেছ?

আমি ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা আর মিশর গিয়েছি।

কেন, আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে পারি ত?

মেলর্স ধীরে ধীরে বলল, হ্যাঁ, পারি।

কনি বলল, তুমি কি তা চাও না?

আমি কোন বিষয়েই কোন গুরুত্ব দিই না। আমি কি করি তা নিজেই জানি না।

এতে তুমি সুখী নও? কেন নও? আমরা ত গরীব হয়ে যাব না? আমার বাৎসরিক আয় ছশো পাউণ্ড। আমি চিঠি লিখে সব জেনে নিয়েছি। এটা অবশ্য খুব একটা বড় সম্পদ নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাই যথেষ্ট। তাই নয় কি?

আমার কাছে এক বিরাট সম্পদ।

সত্যিই কী চমৎকার হবে!

কিন্তু আমাকে ও তোমাকে তার আগে বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে। কোন নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে তা করতেই হবে।

অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে।

আবার কনি কথাটা তুলল মেলর্সের কাছে। ওরা বনের মধ্যে সেই কুঁড়ে-ঘরটায় দুজনে ছিল। তখন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল।

কনি বলল, যখন তুমি লেফটন্যান্ট ও অফিসার ছিলে তখন তুমি সুখী হও নি? তখন তুমি ভদ্র জীবন যাপন করতে?

সুখী? হ্যাঁ, আমি আমার কর্ণেলকে ভালবাসতাম।

তুমি তাকে ভালবাসতে?

হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবাসতাম।

সে তোমাকে ভালবাসত?

হ্যাঁ, একদিক দিয়ে তিনি আমাকে ভালবাসতেন।

তাঁর সম্বন্ধে আমাকে সব কথা বল।

কি বলব তাঁর কথা? তিনি সাধারণ মানুষ থেকে উন্নতি করে বড় হন। তিনি সৈন্যদের ভালবাসতেন। বিয়ে করেননি জীবনে। তিনি আমার থেকে ছিলেন কুড়ি বছরের বড়। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বুদ্ধিমান এবং আবেগপ্রবণ। অফিসার হিসাবে তিনি ছিলেন কুশলী। আমি যতদিন তাঁর কাছে ছিলাম এবং তাঁর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত চলতাম। আমি তাঁর উপরে সঁপে দিয়েছিলাম নিজের জীবনকে।

তিনি মারা গেলে নিশ্চয়ই তোমার খুব দুঃখ হয়?

আমি নিজেও মরার মত হয়ে পড়েছিলাম। যখন আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম তখন আমার মনে হলো আমার দেহমন আমার জীবনের অর্ধাংশ আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরে জানলাম সবারই এই রকম হয়। সকলকেই মরতে হবে।

কনি বসে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে কোথায় বজ্রপাত হলো। ওদের মনে হচ্ছিল বন্যাপীড়িত কোন ছোট্ট একটা জাহাজের উপর চেপে আছে ওরা মাঝ সমুদ্রে।

কনি বলল, জীবনের পিছনে কত কথা, কত ঘটনা রয়েছে।

তাই নাকি? আমারও তাই মনে হয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মরে গিয়েছি। এর আগে একবার কি দুবার মৃত্যু হয়েছে আমার। তবু আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি এখনো।

ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল কনি। পরে বলল, তোমার কর্ণেলের মৃত্যুর পরেও তুমি যখন অফিসার ছিলে তখন তুমি কেমন ছিলে?

মেলর্স হেসে বলল, না, ওরা অন্য এক ধরনের মানুষ। কর্ণেল বলত, ইংরেজ মধ্যবিত্তরা বড় অল্পতে খুশি। আসলে ওরা নিজেরা মেয়েদের মত, ভীরু প্রকৃতির। তবু ওরা দেখাতে চায় ওরা যা কিছু করছে, যে পথে যাচ্ছে তা ঠিক। আমার এইখানেই আপত্তি, এই জন্যই রাগ হয়!

ওর কথা শুনে হাসল কনি। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে।

কনি বলল, সেই জন্যই তিনি কি ইংরেজ মধ্যবিত্তদের ঘৃণা করতেন?

না, উনি শুধু অপছন্দ করতেন।

কনি বলল, শ্রমিক আর সাধারণ মানুষদেরও তাই মনে করতেন ?

মেলর্স বলল, সব সব। মোটরগাড়ি, সিনেমা আর উড়োজাহাজ ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা আর বলবে না। এক একটা যুগ যাচ্ছে আর ওদের বংশধারা অবনতির এক এক ধাপ নীচে নেমে যাচ্ছে। ওরা সবাই এক ধরনের বলশেভিক হয়ে উঠেছে। ওরা মানবিক গুণগুলোকে ধ্বংস করে যান্ত্রিক বস্তু ও উপাদানগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছে। ওরা সবাই পাগলের মত টাকার পিছনে ছুটে চলেছে। ওরা সবাই এক ধরনের। ওরা টাকা দিয়েই নারী পুরুষ সব কিনতে চায়।

মেলর্স তার সেই কুঁড়ে ঘরটায় বসেছিল। তার মুখে ছিল একটা তীব্র শ্লেষের ভাব। তার মুখটা কনির সামনে নিবদ্ধ থাকলেও তার কানটা পিছনের দিকে খাড়া হয়ে ছিল। বনভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের দিকে তাকিয়ে কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল।

কনি বলল, এর কি কোনদিন শেষ হবে না ?

হ্যাঁ হবে। যে সব সত্যিকারের মানুষ অবশিষ্ট আছে আজও তারা যেদিন সমূলে বিনষ্ট হবে সেইদিন এর অবসান হবে। তার আগে নয়। তখন যত সব পাগলের দল, সাদা, কালো, হলদে, লাল এ যুগের সব মানুষ নিজেরা মারামারি করে মরবে।

কনি বলল, তুমি কি বলতে চাও ওরা একে অন্যকে মারবে ?

হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একশো বছরের মধ্যে এই দ্বীপে দশ হাজার লোকও থাকবে না। এমন কি দশজনও না।

হ্যাঁ চমৎকারই বটে। একটা গোটা জাতের সব লোক ধ্বংস হয়ে যাবে আর তার জায়গায় অন্য কোন জাত গড়ে না ওঠা পর্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করতে থাকবে সারা দেশে একথা ভাবতেও কেমন লাগে। যদি এইভাবে সব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সরকার, শিল্পপতি, শ্রমিক সবাই পাগলের মত অন্তর্দৃষ্টি-গুলোকে ধ্বংস করে ফেলে তাহলে একটা গোটা জাতই ধ্বংস হয়ে যাবে, কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখ। বিষাক্ত সাপগুলো যেন নিজেদের গিলে খাবে। তখন এই র‍্যাগবিতে শুধু যত সব ভয়ঙ্কর বন্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে, আর তেভারশালের খনি বস্তীতে ভারবাহী ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াবে—কোথাও কোন মানুষ থাকবে না।

কনি হাসতে লাগল। তবে সে হাসিটা কেমন সকরুণ। বলল, তারা সবাই বলশেভিক বলে তুমি খুশি। তারা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তুমি খুশি।

হ্যাঁ আমি খুশি। কারণ আমি চেষ্টা করেও ওদের এই অধঃপতন রোধ করতে পারতাম না।

কনি বলল, তবে তুমি কেন এত তিক্ততা অনুভব করছ ওদের কথায় ?

না, আমি ওদের নিয়ে মাথা ঘামাই না। যদি আমার মোরগ মুরগী সব ঠিক থাকে তাহলে কোন দিকে কান দিই না আমি।

কনি বলল, যদি তোমার সন্তান হয় ?

মাথাটা নিচু হয়ে গেল মেলর্সের। সে বলল, পৃথিবীতে সন্তানের জন্ম দেয়া অন্যায় কাজ বলে মনে করি।

কনি অনুনয়ের সুরে বলল, ওকথা বলো না। আমি এক সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি মনে হচ্ছে। বল, তুমি খুশি হবে।

মেলর্সের হাতের উপর হাতটা রেখেছিল কনি। মেলর্স বলল, আমার নিজের কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। তোমাকে শুধু খুশি করার জন্যই সন্তান চাইতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় সেই সন্তানের প্রতি এটা হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

কনি বেশ আঘাত পেল। বলল, একথা যদি মনে ভাব তাহলে তুমি মোটেই আমাকে চাও না।

মেলর্স চুপ করে রইল। তার মুখখানা রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। বাইরে শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল।

কনি বলল, এটা তোমার সত্যি কথা নয়।

তার মনে হলো সে ভেনিস যাচ্ছে বলেই রেগে গেছে মেলর্স। আর সেই জন্যই সে রেগে আছে তার উপর। তাই সে একথা বলছে। একথা মনে করে কিছুটা সান্ত্বনা পেল কনি।

এরপর সে মেলর্সের গায়ের জামাটা সরিয়ে তার পেটটা অনাবৃত করে দিল। তারপর সেই অনাবৃত পেটটার উপর তার গালটা ঘষতে লাগল। তার পাছাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

মেলর্সের পেটের মধ্যে মুখটা গুঁজে কনি বারবার এক কাতর আবেদনে বলতে লাগল, বল, বল তুমি সন্তান চাও।

অনেকক্ষণ পরে এবার কথা বলল মেলর্স। কনির মনে হলো মেলর্সের দেহের মধ্যে তার চেতনার পরিবর্তন ঘটছে। এক গোপন অব্যক্ত আরাম উপভোগ করছে সে।

মেলর্স বলল, কেন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। যেন কখনো বলো না টাকা চাই। কখনো বলো না। টাকার পিছনে ছুটি না বলেই আমাদের এখন অভাব অভিযোগ অল্প। টাকার খুব একটা প্রয়োজন নেই। কিন্তু সন্তান হলে আমাদের অভাব আর চাহিদা বেড়ে যাবে।

কনি তখনো তার গালটা আলতোভাবে মেলর্সের পেটের উপর ঘষছিল। তার লিঙ্গসংলগ্ন অণ্ডকোষ দুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার লিঙ্গের কিছুটা উত্তেজনা সে প্রত্যক্ষ করলেও লিঙ্গটা উত্থিত বা শক্ত হলো না।

বাইরে তখন বৃষ্টির বেগটা বেড়েছে।

মেলর্স বলে চলল, আমরা যেন টাকার জন্য না বাঁচি। টাকা ছাড়া জীবনের অন্য একটা মান যেন খুঁজে পাই। বর্তমানে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য আর মালিকদের জন্য টাকা রোজগারের জন্য জীবনপাত করে চলেছি। একে একে এটা বন্ধ করতে হবে। আমাদের শিল্পশ্রমিক হিসাবে জীবনযাপন বন্ধ করতে হবে। মালিকদের লাভের জন্য এই আত্মঘাতী শ্রম বন্ধ করতে হবে। কিছু টাকা অবশ্যই আমাদের রোজগার করতে হবে। সেটা আলাদা কথা। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

মেলর্স একবার থামল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার বলতে লাগল, আমি তাদের বলব দুটো উদাহরণ দিয়ে। বলব, দেখ জো-র দিকে তাকিয়ে। সে কত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। তাকে কত সুন্দর ও সজীব দেখাচ্ছে। আর দেখ জোবাকে। তার শ্রমক্লান্ত দেহটাকে কত কুৎসিত দেখাচ্ছে। বলব, দেখ, একবার নিজেদের দিকে তাকাও। বল, এত খেটে এই আত্মঘাতী শ্রমের দ্বারা তোমরা নিজেদের কি করেছ, কি উন্নতি করেছ? শুধু নিজেদের ক্ষতি করেছ। নিজেদের জীবনটাকে মাটি করেছ। এত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। জামাকাপড় সরিয়ে ভাল করে তোমাদের দেহটার দিকে একবার তাকাও। তোমরাও সজীব সুন্দর হয়ে উঠতে পার, অথচ তোমাদের কুৎসিত দেখাচ্ছে কত। তোমরা অর্ধমৃত হয়ে পড়েছ। পুরুষরা যদি লাল জামা পরে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় চলাফেরা করে তাহলে মেয়েরাও দেখবে কেমন সুন্দর ও আনন্দোচ্ছল হয়ে ঘোরাফেরা করবে। কনির এই পুরনো তেভারশাল গাঁ ভেঙ্গে দিয়ে তার জায়গায় নতুন বড় বড় বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক নগরী। বেশী সন্তানের জন্ম দেওয়া চলবে না, কারণ জগতে লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে।

আমি তাদের কাছে কোন ধর্মকথা প্রচার করব না। শুধু বলব, নিজেদের দিকে তাকাও। শুধু টাকার পিছনে ছুটে বেড়িও না। গোটা তেভারশাল গাঁটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কারণ এ গাঁ যখন গড়ে ওঠে তখন এখানকার মানুষগুলো টাকার পিছনে ছুটত। বলব, তোমাদের মেয়েদের দিকে তাকাও একবার। ওরা তোমাদের দিকে তাকায় না, তোমাদের গ্রাহ্য করে না আর তোমরাও ওদের দিকে তাকাও না, ওদের গ্রাহ্য করো না। কারণ তোমরা অনবরত টাকার জন্য খেটে চলেছ, কারণ তোমাদের কোন দিকে তাকাবার সময় নেই। তোমরা এখন ভালভাবে কথাবার্তা বলতে বা বাঁচার মত বাঁচতে পার না। তোমাদের দেখে জীবন্ত মানুষ বলে মনেই হয় না। একবার নিজেদের দিকে তাকাও।

মেলর্স এবার চুপ করল। তার কথাগুলোর অর্ধেক শুনল কনি। সে

তখন মেলর্সের তলপেটের নিচে নিম্নাঙ্গের চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আসার সময় বনপথে যে সব 'ভুলো না আমায়' ফুলগুলো তুলে এনেছিল সেই ফুলগুলো মেলর্সের নিম্নাঙ্গের সেই চুলগুলোর উপর চাপিয়ে দিল।

কনি বলল, তোমার সারা দেহে চার রকমের চুল আছে। মাথায় ঝুকে, মোচে, আর এইখানে। কিন্তু লাল আর সোনালীতে মেশা এই চুলগুলো সব চেয়ে সুন্দর।

মেলর্স একবার তার নিম্নাঙ্গের দিকে তাকিয়ে ফুলগুলো দেখে বলল, ফুলগুলো কোথায় দিয়েছ। ফুল দেবার বেশ জায়গা বটে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভাবলে ?

কনি তার দিকে নীরবে তাকাল। পরে বলল, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে আমার ভয় লাগে।

ওদের ঘরের বাইরে পৃথিবীটা তখন স্তব্ধ ও হিমশীতল হয়ে উঠেছে একেবারে। কনি আবার বলল, যখন ভাবি আজকের জগৎটা আপন পাশবিক আচরণের দ্বারা নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে এনেছে তখনি আমার মনে হয় উপনিবেশগুলো বেশী দূরে নেই। চাঁদের রাজ্যও দূরে নেই। চাঁদে গেলেও সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীকে কত কুৎসিত দেখাবে। এই কয়েকশো বছর ধরে মানবজাতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মানুষের সব মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের শ্রমিককীটে পরিণত করা হয়েছে। তারা আসল জীবন যাপন করছে না, করছে নকল জীবন যাপন। আমি যদি পারতাম পৃথিবী থেকে সব যন্ত্রপাতি তুলে ফেলে দিতাম। এই ভয়ঙ্কর শিল্পযুগের অবসান ঘটাতাম নিঃশেষে। কিন্তু যেহেতু আমি বা কেউ তা পারে না সেইহেতু আমি নিজেই ভালভাবে শান্তির সঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করব। যদি একজন মনের মত মানুষ পাই তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু তা পাব কি না জানি না।

মুহুর্মুহু বজ্রগর্জনটা কমলেও বৃষ্টি আবার জোর করে এল। আবার বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ঝড়টাও আবার শুরু হলো। কনি বুঝতে পারল এক নিবিড় হতাশা মেলর্সের মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে একেবারে। কনির কিন্তু বেশ খুশি খুশি লাগছিল। সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে বলে মেলর্সের মনটা ভাল নেই, তাই তার মনটা এক নিবিড় হতাশার মধ্যে ঢলে পড়েছে আর সেই হতাশার বশে এত কথা আপন মনে বলে গেল। এ জন্য কনির খুব ভাল লাগছিল। তার আসন্ন অভাব আর বিচ্ছেদ আপন অন্তরে অনুভব করে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে মেলর্স এজন্য একটা জয়ের গর্ব অনুভব করছিল সে।

একবার দরজাটা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল কনি। বাইরে তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কনির মনে হলো তার সামনে যেন বিরাট এক ইস্পাতের খড়্গ টাঙানো রয়েছে। সহসা কি মনে হলো মোজা জামা সব খুলে

ফেলল কনি। তারপর উলঙ্গ হয়ে উন্মাদের মত ঘর থেকে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল সে। তার ঈষৎ শিথিল স্তনগুলো জন্তুদের স্তনের মতই এক অনাবৃত উদারতায় তার বুকের উপর ঝুলতে লাগল। বহুদিন আগে ড্রেথডেনে থাকা-কালে শেখা নাচের ভঙ্গিতে এক ছন্দায়িত পদক্ষেপে দু হাত বাড়িয়ে বনের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগল কনি বৃষ্টির মাঝে। বনের ধূসর অথচ সবুজাভ পটভূমিকায় হাতীর দাঁতের মত শুভ্রধবল তার গাত্রত্বকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বৃষ্টির রূপালি ধারাগুলো চকচক করছিল তার গায়ের উপর। মাঝে মাঝে একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাথাটা মাটির দিকে নুইয়ে দিচ্ছিল যখন তখন তার পাছা দুটো শুধু দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স।

এই সব দেখে হাসতে লাগল মেলর্স। হাসতে হাসতে সেও হঠাৎ জামা প্যান্ট সব খুলে ফেলল। তারপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মাঝে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর ফ্লসিও একটা লাফ দিয়ে তার সামনে নেমে পড়ল মুখে একটা শব্দ করে। কনির চুলগুলো বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ভিজে মাথার সঙ্গে লেপটে লেগে গিয়েছিল। তার গোল মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়ে মেলর্সকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নীল চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক দারুণ উত্তেজনায় ছুটতে লাগল সে। কুঁড়ের সামনের জায়গাটা ছেড়ে ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেল। চারদিকের গাছের ভিজে ডালপালাগুলো গায়ে লাগছিল তার। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটতে লাগল কনি। মেলর্সও ছুটছিল তার পিছু পিছু। কিন্তু সে এমন জোরে ছুটছিল যে তার গোল মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স।

অবশেষে এক চড়াইএর কাছে গিয়ে কনিকে ধরে ফেলল মেলর্স। সঙ্গে সঙ্গে হাতদুটোকে বাড়িয়ে কনির কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে সজোরে টেনে নিল নিজের বুকের উপর। তার নরম সুন্দর স্তনদুটো দুহাতে নিয়ে চাপ দিতে লাগল। কনির নারীদেহের নরম ভিজে মাংস স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগুনের মত গলিয়ে দিল মেলর্সকে। সে সঙ্গে সঙ্গে কনিকে পথের উপর ফেলে দিয়ে পশুর মত তার উপর উপগত হয়ে সঙ্গম করল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

মুখের উপর থেকে বৃষ্টির জল মুছে উঠে পড়ল মেলর্স। কনিকে বলল, চলে এস।

ওরা বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে ছুটতে সেই কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মেলর্স তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে যখন দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিল তখন তার পানে তাকিয়ে দেখছিল কনি। কনিও ছুটছিল, কিন্তু মেলর্সের মত অত জোরে নয়। সে মাঝে মাঝে পথের উপর নেমে কতকগুলো ফুল তুলে নিল।

কনি সেই কুঁড়ে ঘরটার মাঝে এসে দেখল মেলর্স এরই মধ্যে আগুন জ্বেলে ফেলেছে ঘরের মধ্যে। কনির বুকটা চলার তালে তালে দুলছিল। তার মাথার চুল মাথার সঙ্গে লেপটে লেগে ছিল। তার বৃষ্টিভেজা মুখ গা চকচক

করছিল। তাকে এক ভিন্ন প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল যেন।

মেলর্স একটা পুরনো চাদর বার করে কনির গাটা মুছিয়ে দিতে লাগল আর কনি ছোট শিশুর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে নিজের গাটা মুছল। কনিও তখন সেই চাদরের একটা অংশ নিয়ে তার মাথার চুলগুলো মুছতে লাগল।

মেলর্স বলল, একই তোয়ালেতে আমরা মুছছি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে।

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, না, এটা তোয়ালে নয়, এটা চাদর।

মেলর্স একটা কম্বল বার করল। দুজনেই সেই কম্বলটা গায়ে ঢাকা দিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে বসল। কনি আগুনের দিকে মুখ করে বসল। তার পাশে বসল মেলর্স।

হঠাৎ কনি কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে মাটির উনোনটার কাছে সরে গেল। তখনো ওদের দেহ ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কনির নগ্ন দেহের বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থানের সন্ধিস্থানগুলো দেখতে লাগল মেলর্স। সে কনির পাছাটায় হাত বোলাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সে তার হাতটা কনির নরম গোপনাঙ্গের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিল।

কনির পাছাটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, অন্য সব মেয়ের থেকে তোমার পাছাটা বড় নরম বড় সুন্দর। ক্রমে পাছার গোলাকার তলদেশ দুটোয় হাতটা বোলাবার সময় কিসের যেন এক আগ্নেয় আকর্ষণ তার হাতটাকে টেনে নিল। মেলর্স তখন তার সেই হাতের আঙুলের অগ্রভাগটা কনির যোনিদেশের মধ্যবর্তী অংশটায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিল। বলল, আমি এইরকম নারীই চাই। তুমিই হচ্ছ যথার্থ নারী। যে সব নারী দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে পুরুষকে শান্তি দিতে পারে না নেই সব নারীকে আমি দেখতে পারি না।

কনি আশ্চর্য হয়ে হেসে উঠল।

মেলর্স বলে চলল, তুমি হচ্ছ সত্যিকারের নারী। তোমার যোনিদেশ সত্যিকারের নারীর যোনিদেশের মত সুন্দর। নিজের রূপে নিজেই গর্বিত সে। ও কখনো লজ্জা পায় না; সমস্ত লজ্জাভয় হতে মুক্ত।

মেলর্স তার হাতটা কনির গোপনাঙ্গের উপর আরও জোরে চাপ দিতে লাগল। বলল, সত্যিই এটা আমার বড় ভাল লাগে। তোমার এই সুন্দর যোনিদেশের উপর হাত বোলাতে বোলাতে আমার মনে হয়, আমি আবার বাঁচব। নতুনভাবে জীবন শুরু করব, এই যন্ত্রসভ্যতার যতই বিস্তার হোক না কেন।

কনি এবার হঠাৎ ঘুরে মেলর্সের কোলের উপর উঠে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে চুম্বন করো।

কনি বুঝতে পারল তাদের আসন্ন বিচ্ছেদ এক বিষাদের ছায়া ফেলেছে

তাদের দুজনেরই মনে।

মেলর্সের বুকের উপর মুখ রেখে তার জানুর উপর বসল কনি। তার হাতীর দাঁতের মত চকচকে সাদা পাগুলো আড়াআড়িভাবে ঝোলানো ছিল। মাথাটা নিচু করে মেলর্স কনির দেহের গ্রন্থিগুলো একবার দেখে নিয়ে অবশেষে তার দুই শুভ্র উরুদেশের মাঝখানে নরম বাদামী চুলগুলোর পানে তাকিয়ে রইল। জ্বলন্ত আগুনের আলোয় এই সব দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স। সহসা সে পিছন ফিরে টেবিলের উপর থেকে কিছু বৃষ্টিভেজা ফুল তুলে নিল।

মেলর্স বলল, কোন ঘরের ভিতর ঢুকলে ফুল আর বেঁচে থাকে না। ফুলের কোন ঘর নেই। বাইরের আলো হাওয়াতেই ওরা ভাল থাকে।

কনি বলল, এমনকি একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যেও না।

কিন্তু 'ভুলো না আমায়' ফুল নিয়ে মেলর্স কনির যোনিদেশ আর তার চারপাশের চুলের উপর রেখে দিল। বলল, এই সব ফুলের এটাই হচ্ছে আসল জায়গা।

কনি তার যোনিদেশে বাদামী চুলের উপর দুধের মত সাদা ফুলগুলোর পানে একবার তাকাল। বলল, ভাল দেখতে লাগছে না?

মেলর্স উত্তর করল, জীবনের মতই সুন্দর।

সে একটা ফুল নিয়ে সেইখানে চুলের মাঝে গেঁথে দিল। তারপর বলল, এই একটা জায়গায় অন্ততঃ তুমি আমায় ভুলবে না।

কনি কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে মেলর্সের মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমি চলে যাচ্ছি, এতে তুমি কিছু মনে করছ?

মেলর্সের ঘন ভ্রূর নিচে চোখের দৃষ্টি দেখে তার মনের ভাব কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টিটা শূন্য মনে হচ্ছিল। অবশেষে সে বলল, তোমার যা ইচ্ছা যায় করতে পার।

পরিষ্কার সহজ ইংরিজিতে কথাটা বলল মেলর্স।

মেলর্সের দেহটা জড়িয়ে ধরে কনি বলল, কিন্তু তুমি না চাইলে আমি কিছুতেই যাব না।

এবার দুজনেই চুপ করে বসে রইল। সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে মেলর্স কিছু কাঠ ফেলে দিল আগুনে। সেই আগুনের শিখায় তার নীরব ও উদাস মুখখানা আলোকিত করে তুলল। কিন্তু মেলর্স কোন কথা বলল না।

কনি বলল, আমি শুধু ভাবছিলাম ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে এটাই হবে সবচেয়ে ভাল পন্থা। আমি সন্তান চাই। তাছাড়া এই সন্তান আমাকে একটা সুযোগ দেবে।

কেন, তারা যাতে কিছু মিথ্যা কথা ভাবতে পারে তার একটা সুযোগ করে দেবে?

তুমি কি চাও তারা এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কথাটা জানতে পারুক?

ওরা কি ভাবুক বা জানুক তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কিন্তু আমি করি, আমি চাই না আমি যতদিন র‍্যাগবিতে থাকব ওরা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখুক। আমি এখান থেকে চলে গেলে ওরা যা ভাবে ভাবুক।

মেলর্স চুপ করে রইল।

কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড চায় তুমি তার কাছে আবার ফিরে এস।

হ্যাঁ, আমিও তাই চাই।

কথাটা বলে চুপ করে রইল কনি। দুজনেরই মুখে কথা নেই।

মেলর্স বলল, র‍্যাগবিতেই কি তুমি সন্তান প্রসব করবে?

তার গলাটা জড়িয়ে ধরে কনি বলল, তুমি যদি আমাকে কোথাও নিয়ে না যাও তাহলে আমি তাই করব।

আমি তোমায় কোথায় নিয়ে যাব?

যে কোন জায়গায়। র‍্যাগবি থেকে দূরে যে কোন জায়গায়।

কখন?

কেন, আমি ফিরে এলে।

মেলর্স বলল, তুমি যদি র‍্যাগবি থেকে চলে যেতেই চাও তাহলে আবার ফিরে আসবে কেন?

আমাকে ফিরে আসতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই। তার উপর আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই।

তোমার স্বামীর শিকার রক্ষকের কাছে?

কনি বলল, এতে কিছু যায় আসে বলে আমি মনে করি না।

কর না? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মেলর্স বলল, তুমি তাহলে কখন চিরদিনের মত চলে যেতে চাও এখান থেকে?

এখন তা আমি বলতে পারব না। আগে আমি ভেনিস থেকে ফিরে আসি। তারপর আমরা দুজনে মিলে সব ঠিক করব।

কেমনভাবে ঠিক করবে?

আমি ক্লিফোর্ডকে সব বলব। তাকে সব বলতে হবে।

তাকে বলবে?

মেলর্স চুপ করে রইল। কনি তার গলাটা তেমনি জড়িয়ে ধরে বলল, ব্যাপারটা আমার কাছে এমন কিছু কঠিন করে তুলো না।

কি কঠিন?

আমাকে প্রথমে ভেনিসে গিয়ে সব কিছু ঠিক করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাকে বাধা দিও না।

একফালি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে। সে বলল, আমি কোন বাধাই দিতে চাই না। আমি শুধু ভেবে দেখতে চাই ভবিষ্যতে তুমি কি

করবে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ঠিকমত নিজেকেই চিনতে পারনি। তুমি দূরে চলে যেতে চাও। 'আমি তোমাকে দোষ দিতে চাই না। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি আছে। তুমি র‍্যাগবির রাণী হয়ে থাকতে চাও। আমার ত আর র‍্যাগবি নেই। তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। তুমি ত জান তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না। তোমার সঙ্গে ঘর করতে আমার তাই তত আগ্রহ নেই। তোমার অধীনস্থ হয়ে থাকতে চাই না আমি। এটাকে ভেবে দেখতে হবে আমায়।

কনির মনে হলো মেলর্স তাকে শিক্ষা দিতে চাইছে।

কনি বলল, কিন্তু তুমি আমাকে চাও ত? চাও না?

আমাকে কি তুমি চাও?

তুমি জান আমি তোমাকে চাই। তার পরিচয় তুমি স্পষ্ট পেয়েছ।

মেলর্স বলল, আমাকে কখন ঠিক তুমি চাও?

তুমি জান আমি ভেনিস থেকে ফিরে এসে সব কিছু ঠিক করব। এখন আমি কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন আমাকে শান্ত ও সুস্থ হতে দাও।

ঠিক আছে, শান্ত ও সুস্থ হও।

কনি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো ত?

সম্পূর্ণরূপে।

কনির কিন্তু মনে হলো মেলর্সের কণ্ঠে কিছুটা উপহাসের সুর রয়েছে।

কনি বলল, আমাকে তাহলে খুলে বল ভেনিসে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে কি না।

শান্ত ও কিছুটা বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে মেলর্স বলল, হ্যাঁ, এতে তোমার যে ভাল হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কনি বলল, জান ত, আগামী বৃহস্পতিবার?

হ্যাঁ জানি।

কনি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি ফিরে এলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারব।

নিশ্চয়।

দুজনের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতার জমাট ব্যবধান বিরাজ করতে লাগল।

মেলর্স বলল, আমার বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য উকীলের কাছে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠল কনি। বলল, গিয়েছিলে? কি বলল উকীল?

বলল, আরো অনেক আগে তা করা উচিত ছিল। এখন কিছুটা বেগ পেতে হবে। তবে আমি আগে সেনাবিভাগে কাজ করতাম বলে বিশেষ কষ্ট হবে না।

তোমার স্ত্রীকে জানাতে হবে ত?

তাকে ও যার কাছে সে আছে সেই লোকটাকে নোটিশ দেওয়া হবে, সেই লোকটা হবে সহ-বিবাদী।

কনি বলল, এসব ব্যাপারগুলো কেমন ঘৃণ্য আর জঘন্য দেখ।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমাকেও তাই করতে হবে।

মেলর্স বলল, বিবাহবিচ্ছেদের পরে আমাকে ছয় থেকে আট মাস আদর্শ সংযত জীবন যাপন করতে হবে। তবে তুমি ভেনিসে গেলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ আমার সামনে তখন কোন প্রলোভন থাকবে না।

কনি তার মুখটা মেলর্সের বুকে ঘষতে ঘষতে বলল, আমি প্রলোভন? তুমি আমাকে তাই ভাব বলে আমি খুশি। এ নিয়ে আর কিছু ভাবতে হবে না। তুমি ভাবলেই আমার ভয় লাগে। আমি চলে গেলে যত খুশি ভেবো। তখন আমরা দুজনেই ভাবতে পারব প্রচুর। আমি যাবার আগে আর এক রাত্রি তোমার বাসায় আসব। তোমার কাছে থাকব। আমি বৃহস্পতিবার রাত্রিতেই আসব।

কিন্তু ঐ রাত্রিতেই ত তোমার বোন আসবে। তোমার কাছে থাকবে।

হ্যাঁ, কিন্তু সে বলেছে রাত্রিশেষে সকালে রওনা হব। রাত্রিতে সে অন্য এক জায়গায় থাকবে আর আমি থাকব তোমার কাছে।

কিন্তু তোমার বোন তাহলে জানতে পারবে ত?

হ্যাঁ, আমি তাকে বলব। আমি আগেই কিছুটা তাকে এ বিষয়ে বলেছি। তাকে সব কিছু বলব। সে আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। সে সব বোঝে; বড় সহানুভূতিশীল।

মেলর্স কনির পরিকল্পনার কথাটা ভাবতে লাগল। বলল, তুমি তাহলে ঐ দিন সকালবেলায় র‍্যাগবি ছেড়ে চলে যাবে? মনে হচ্ছে যেন তুমি লণ্ডন যাচ্ছ। কোন পথে যাবে?

নটিংহাম আর গ্রান্থাম হয়ে।

মেলর্স বলল, কিন্তু আসার সময় তোমার বোন যেখানে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে সেখান থেকে তোমাকে এখানে হেঁটে অথবা গাড়িতে করে আসতে হবে। এতে ঝুঁকি আছে, আমার ভয় করছে।

কনি বলল, না, হিলদা আমাকে দিয়ে যাবে গাড়িতে করে।

লোকে যদি তোমাকে দেখে ফেলে।

আমি চোখে কালো চশমা পরব আর মাথায় একটা ওড়না দেব।

মেলর্স কিছুটা ভেবে বলল, ঠিক আছে। তুমি যা করছিলে তাই করো। আশা মিটিয়ে নিজেকে খুশি করো।

এ তুমিও খুশি ত?

হ্যাঁ, আমি খুশি। লোহা তপ্ত হলে ঠিক সময়েই আমি ঘা মারি।

কনি বলল, জান আমি কি ভাবছিলাম। কথাটা হঠাৎ মাথায় এল আমার।

তুমি হচ্ছ জ্বলন্ত পেস্টন্ এর নাইট।

আর তুমি? তুমি রেড হট মর্টারের লেডি?

হ্যাঁ, তুমি স্যার পেস্টন্ আর আমি লেডি মর্টার।

ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার নাইট। ছিলাম জন টমাস, হলাম স্যার জন। আর তুমি হলে লেডি জেন।

কনি দুটো পেয়ালা রঙের ফুল মেলর্সের লিঙ্গের উপর চুলের মাঝে আটকে দিল।

কনি বলল, চমৎকার মানিয়েছে স্যার জন।

তার সে দুটো ফুল মেলর্সের বুকের বাদামী চুলের মধ্যেও আটকে দিল। মেলর্সের বুকটাকে চুম্বন করে সে বলল, আমাকে তুমি ভুলবে না। এই 'ভুলো না আমায়' ফুল দিয়ে আমার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখলাম।

মেলর্স জোর হেসে উঠতেই ফুলগুলো ঝরে পড়ল তার বুক থেকে।

মেলর্স বলল, থাম।

হঠাৎ উঠে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেলর্স। দরজা খুলতেই চমকে উঠল ফ্লসি। কুকুরটা বাইরেই পাহারায় ছিল। মেলর্স বলল, আমি।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টিভেজা বনভূমির একটা সোঁদা গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছিল চারদিকের নিস্তব্ধতা। সন্ধ্যার ছটায় ঘন হয়ে উঠেছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল মেলর্স। তার চলায়মান সাদা উলঙ্গ মূর্তিটাকে এক প্রেতাত্মা বলে মনে হলো তার।

মেলর্স না বলে কোথায় চলে গেলে মনটা মুষড়ে পড়ল কনির। সে উঠে দরজার কাছে কোমরে কম্বলটা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে বৃষ্টিস্নাত স্তব্ধ বনভূমির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু অল্প কিছু পরেই ফিরে এল মেলর্স। কনি দেখল তার হাতে অনেক ফুল। কনি তাকে দেখে চিনতে পারছিল না। কাছে এসে সে কনির পানে তাকাল। কিন্তু কনি তার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল না।

মেলর্স তার হাতের একরাশ ফুল আর ওকপাতা কনির বুকে, নাভিকুণ্ডলিতে আর যোনিদেশের চুলে আটকে দিয়ে বলল, এইবার তোমাকে চমৎকার মানাচ্ছে। এইবার লেডি জেন বিবাহিত হলো স্যার জন টমাসের সঙ্গে।

তারপর সে নিজের দেহের ঐ সব জায়গার ফুলগুলো তুলে নিল।

কনি তার পানে আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

মেলর্স বলল, তুমি হলে জন টমাস মার্টিন লেডি জেন। তোমার আগেকার নাম কনস্ট্যান্স চুলোয় যাক।

এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাতটা বাড়াল মেলর্স। সে হাঁচল। হাঁচতেই তার গা থেকে সব ফুল ঝরে গেল।

হতবুদ্ধির মত মেলর্স কনির পানে তাকাল। কনি বলল, তুমি কি বলতে

যাচ্ছিলে বল।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম বলত?

সে কি বলতে চাইছিল তা সে ভুলে গেছে। আসলে সে বলতে চাইছিল কনির সারা ভবিষ্যৎ জীবনের অন্তহীন হতাশার কথা। একথা বিভিন্নভাবে আগে অনেকবার বলেছে সে, তবু একথা বলা তার আর শেষ হয় না। কনি যাই বলুক তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত হতে পারে না সে।

বৃষ্টির পর হলুদ সূর্যের এক ফালি রশ্মি পড়েছে গাছগুলোর উপর।

মেলর্স বলল, সূর্য আর সময়। সময়ের মত পাখা মেলে এত দ্রুত আর কোন জিনিস উড়তে পারে না।

মেলর্স তার জামাটা হাত বাড়িয়ে ধরল। তারপর কনিকে লক্ষ্য করে বলল, জন টমাসকে শুভরাত্রি বল।

এই বলে তার পুরুষাঙ্গটার দিকে একবার তাকাল মেলর্স। জন এখন জেনির বাহুবন্ধনের মধ্যে নিরাপদে আছে। আগুনের আঁচ এখনো লাগেনি তার গায়ে।

এবার ফ্লানেলের শার্টটা তার মাথায় লাগাল মেলর্স। তার সঙ্গে বলল, পুরুষদের পক্ষে জামা পরা অর্থাৎ জামার মধ্যে মাথাটা এইভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার। এই জন্য আমি বুকখোলা আমেরিকান শার্ট পছন্দ করি। কনি দাঁড়িয়ে তার পানে তাকিয়ে রইল। জামার পর প্যান্ট পরল মেলর্স। তারপর কোমরের কাছে বোতামটা আঁটল।

মেলর্স কনির যোনিদেশের দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, একবার জেনের দিকে তাকাও। ফুলে ফুলে ঢাকা। বল জেনি, আগামী বছর কে তোমার উপর ফুলের অঞ্জলি দেবে, আমি না অন্য কেউ? 'বিদায় হে ব্লুবেল ফুল।' এ সেই যুদ্ধের দিনের প্রথম দিকের কথা। এই গানটা আমি ঘৃণা করি। এই বলে বসে মোজা পরতে লাগল মেলর্স। কনি তখনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বসে বসে কনির তলপেটের তলায় ঢালু জায়গাটায় হাত দিয়ে বলল, কী সুন্দর তুমি লেডি জেন, হয়ত ভেনিসে তুমি এমন আর একজনকে পাবে যে তোমার চুলের উপর দেবে যুঁই ফুলের অঞ্জলি। আর তোমার নাভিকুণ্ডলিতে দেবে ডালিম ফুল। হায় বেচারী লেডি জেন!

কনি প্রতিবাদের সুরে বলল, ওসব কথা আর বলো না। ওসব কথা বলা মানেই আমাকে আঘাত দেওয়া।

মেলর্স মাথাটা নিচু করে তাদের দেহাতী ভাষায় বলতে লাগল, হয়ত আমি তোমাকে আঘাত করছি। আঘাত করছি তোমাকে। আমি আর একথা বলব না। কিন্তু তুমি ভুলে যেওনা, তুমি এই সঙ্গে তোমার ইংল্যাণ্ডের বাড়িতে যাচ্ছ। কত সুন্দর সে জায়গা। যাই হোক, হে লেডি জেন, হে স্যার জন, তোমাদের জাগার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ফুলের গয়না পরে

আছ। হে যোনিদেশসংলগ্ন কেশগুচ্ছ, আমি তোমাদের পুষ্পালঙ্কারের দুঃসহ পীড়ন থেকে মুক্ত করব।

এই কথা বলে সে সেই সিক্ত কেশগুচ্ছকে চুম্বন করল। তারপর তার স্তনযুগল, নাভিদেশ ও আবার যোনিদেশের উপরিস্থিত কেশদামকে চুম্বন করল।

তারপর কনির যোনিদেশের উপর থেকে সব ফুলপাতা সরিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বলল, এবার তুমি মুক্ত হলে লেডি জেন। এবার তুমি পোষাক পরো। এবার লেডি জেন তার বাড়ি ফিরে বিলম্বিত ভোজসভায় যোগদান করবে।

কনি বুঝতে পারল না মেলর্সের এই সব দেহাতী ভাষায় বলা এত কথার উত্তরে কি সে বলবে। তাই কোন কথা না বলে সে পোষাক পরল নীরবে। তারপর সেই ঘৃণ্য অবাঞ্ছিত র‍্যাগবির বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

মেলর্স কিছুটা এগিয়ে দিল কনিকে। ওরা যখন চড়াইটার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন ব্যস্ত হয়ে মিসেস বোল্টন ওদের কাছে এল। বলল, ও ম্যাডাম, আমরা ত ভেবে অস্থির। ভাবছিলাম কিছু হলো নাকি।

কনি উত্তর করল, না, কিছু হয়নি।

মিসেস বোল্টন মেলর্সের দিকে তাকাল। ভালবাসার স্নিগ্ধ আশ্বাসে সজীব তার মুখখানাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সে মুখের মধ্যে ছিল কিছুটা হাসির সঙ্গে কিছুটা উপহাস মিশে। সব দুর্ঘটনাকে উপহাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেয় সে।

মেলর্স বলল, সান্ধ্য নমস্কার, মিসেস বোল্টন, আশাকরি এবার তোমাদের ম্যাডাম ভালভাবেই যেতে পারবেন।

এই বলে সে ওদের অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

অধ্যায় ১৬

বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলো প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হলো কনি। ঝড়টা শুরু হবার আগেই সেদিন ক্লিফোর্ড চা খেতে চায়ের টেবিলে এসে হাজির হয়। এসে কনির খোঁজ করে। কোথায় কনি? কেউ জানে না কোথায় গেছে। তবে মিসেস বোল্টন শুধু আভাস দিল হয়ত বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে গেছে। বন দিয়ে বেড়াতে গেছে শুনেই ঘৃণায় নাকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ক্লিফোর্ডের। কিছুক্ষণের জন্য এক স্নায়বিক উত্তেজনায় অশান্ত হয়ে ওঠে সে। প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠতে লাগল আর প্রতিটি বজ্রগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেহটা কুঁকড়ে উঠতে লাগল তার।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল সে ভয়ে ভয়ে যেন এক মহাপ্লাবনে আজই ধ্বংস হয়ে যাবে সমগ্র পৃথিবী। ক্রমশই ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল সে।

মিসেস বোল্টন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। সে প্রায়ই বলছিল, উনি কুঁড়েটায় আশ্রয় নেবেন বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত।

আপনি কিছু ভাববেন না। উনি ভালই আছেন।

ক্লিফোর্ড তখন বলেছিল, এমন ভীষণ ঝড়ের মধ্যে তার বনে থাকাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তার বনে যাওয়াটাই আমার পছন্দ হয় না। দু ঘণ্টার উপর হলো সে গেছে। সে কখন বাড়ি থেকে বার হয়?

আপনি চা খেতে আসার অল্প কিছু আগে।

কিন্তু আমি তাকে পার্কে দেখিনি। কোথায় গেল সে? কি হলো তার?

কিছুই হয় নি। বৃষ্টি থেমে গেলেই তিনি ফিরে আসবেন। আপনি দেখবেন। একমাত্র বৃষ্টির জন্যই তিনি আটকে পড়েছেন।

কিন্তু বৃষ্টি থামলেও কনি এল না। বৃষ্টি থামার পরেও কত সময় কেটে গেল। মেঘমুক্ত আকাশে আবার সূর্য উঠে শেষবারের মত তার হলুদ রশ্মি ছড়িয়ে দিল। তবু তার কোন চিহ্ন নেই। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে। নৈশভোজনের প্রথম ঘণ্টা বেজে গেল।

অধৈর্য হয়ে ক্লিফোর্ড বলল, এটা কিন্তু ভাল না। আমি ফিল্ড আর বেটস্‌কে পাঠাচ্ছি তার খোঁজ করার জন্য।

মিসেস বোল্টন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না, তার দরকার হবে না। ও কাজ করবেন না। ওরা ভাববে আত্মহত্যা বা অন্য কোন গুরুতর একটা ব্যাপার। এ বিষয়ে কোন কথা ছড়াবেন না। তার চেয়ে আমি একবার কুঁড়েটাতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি। দেখি সেখানে আছে কি না। আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করবই।

অবশেষে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ক্লিফোর্ড তাকে যেতে দিল। মিসেস বোল্টন কিছুটা যেতেই কনিকে দেখতে পেল। মেলর্সকে ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে একা একা বাড়ির দিকে পা পা করে হাঁটতে লাগল কনি।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি আপনার খোঁজ করতে এলাম বলে কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। স্যার ক্লিফোর্ড এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন হয় বিদ্যুৎপিষ্ট অথবা গাছ চাপা পড়ে আপনি মারা গেছেন। তাই উনি ফিল্ড আর বেটস্‌কে পাঠাচ্ছিলেন। তখন আমি ভাবলাম চাকর বাকরদের মধ্যে এ ব্যাপারটা না ছড়িয়ে আমি বরং দেখে আসি।

কথাগুলো ব্যস্তভাবে বলে ফেলে কনির মুখপানে তাকাল মিসেস বোল্টন। দেখল এক মদির স্বপ্নালুতা আর রতিতৃপ্তির এক তরল তৈলাক্ত মসৃণতা সমস্ত মুখখানাতে ছেয়ে আছে তার। সঙ্গে সঙ্গে সে এই সব কথা বলার জন্য তার

প্রতি একটা অসন্তোষের ভাবও ফুটে উঠেছে।

কনি আপন মনে রাগের সঙ্গে বলতে লাগল, ক্লিফোর্ড বোকার মত কেন যে এত চেঁচামিচি হৈচৈ করল ?

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি জানেন পুরুষরা সব ওই রকম। একটুতেই কেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি শান্ত হয়ে উঠবেন।

মনে মনে ভীষণভাবে রেগে উঠল কনি। তার মনে হলো মিসেস বোল্টন নিশ্চয় তার গোপন কথা সব জানে। নিশ্চয় সে সব জেনে ফেলেছে।

সহসা পথের উপর যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল কনি। শক্ত হয়ে বলল, আমার পিছনে লোক লাগিয়ে আমাকে অনুসরণ করা হবে, আমার উপর নজর রাখা হবে এটা সত্যিই ভয়ঙ্করভাবে এক অসহ্য ব্যাপার।

ও কথা বলবেন না ম্যাডাম। আমি না বললে উনি নিশ্চয় দুজন লোককে পাঠাতেন। তারা সোজা কুঁড়েটায় চলে যেত। আমি জানি না কোথায় কুঁড়েটা।

কথার মধ্যে যে ইংগিত ছিল তা বুঝতে পেরে রাগে মুখখানা কালো হয়ে উঠল কনির। কিন্তু ক্রোধের আবেগ সত্ত্বেও সে কোন মিথ্যা কথা বলল না। শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই এই মিথ্যা কথাটা সে বলল না। কনি মিসেস বোল্টনের মুখপানে তাকাল। মিসেস বোল্টন তখন লজ্জানত অবস্থায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু বিশেষ করে বোল্টনের নারীমনের মধ্যে এক গোপন সহানুভূতি খুঁজে পেল।

কনি বলল, ঠিক আছে। যা হয়েছে হতে দাও। আমি কিছু গ্রাহ্য করি না।

আপনার কোন দোষ নেই ম্যাডাম। আপনি কুঁড়েটায় ঝড়ের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন শুধু। এটা কিছুই না।

তারা দুজনে একসাথে বাড়ি ফিরল। প্রচণ্ড রাগে আগুন হয়ে কনি সোজা চলে গেল ক্লিফোর্ডের কাছে। ক্লিফোর্ড তখন চোখগুলো বড় বড় করে ম্লান মুখে বসে ছিল।

কনি জোর গলায় ফেটে পড়ল, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমার পিছনে চাকর পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।

ক্লিফোর্ডও রাগের সঙ্গে বলল, হা ভগবান! কোথায় গিয়েছিলে মেয়ে? তুমি এই ধরনের প্রকাণ্ড ঝড়ের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোথায় ছিলে? বনে গিয়ে ছাই পাঁস কি করো তুমি? বৃষ্টি থামবার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। জান এখন ক'টা বাজে? তুমি যে লোককে পাগল করে দেবে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কি করছিলে?

কনি মাথা থেকে টান দিয়ে টুপীটা খুলে মাথার চুলগুলোকে নাড়া দিয়ে

বলল, যদি আমি তোমাকে তা না বলি ?

কোন কথা বলল না ক্লিফোর্ড। শুধু মিটমিট করে কনির পানে তাকাল। ফ্যাকাসে চোখগুলো তার হলুদ হয়ে উঠল। কনির সঙ্গে এই ধরনের রাগা-রাগির ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

সহসা এক স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করল কনি। তার মনে হলো সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। গলার স্বরটা নরম করে কনি বলল, যে কেউ ভাববে আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা কেউ জানে না। আমি বৃষ্টির সময় কুঁড়েটাতে ছিলাম। দারুণ ঠাণ্ডায় আমি ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলেছিলাম। সেখানে বসে একটু আরাম করছিলাম এই পর্যন্ত।

কথাগুলো সহজভাবে বলল কনি। ভাবল ক্লিফোর্ডকে বেশী বিব্রত করে কি লাভ ? ক্লিফোর্ড সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল কনির পানে। সে বলল, একবার তোমার চুলের পানে তাকাও, তোমার চেহারাটার পানে তাকাও ত দেখি।

কনি শান্তভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি পোষাক পরেই বৃষ্টিতে কিছুটা ভিজেছিলাম।

ক্লিফোর্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কনির মুখের দিকে। বলল, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছ।

কেন ? এক পশলা বৃষ্টিতে একবার ভেজার জন্য ?

তাহলে কেমন করে সে বৃষ্টির জল শুকোলে তোমার পোষাক থেকে ?

কেন, পুরনো একটা তোয়ালে আর আগুন।

হতবুদ্ধি ও অবাক হয়ে কনির পানে তাকাল ক্লিফোর্ড। তারপর বলল, কেউ এসেছিল মনে হচ্ছে।

কে আবার আসবে ?

কে ? যে কেউ আসতে পারে ? মেলর্স আসতে পারে। ও ত সন্ধ্যের সময় আসে।

হ্যাঁ, ও বৃষ্টি থেমে গেলে পরে আসে। পাখিদের খাওয়াতে এসেছিল। বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো বলেছিল। মিসেস বোল্টন পাশের ঘরে থেকে সব কিছু শুনছিল। শুনে কনির তারিফ করছিল মনে মনে। সত্যিই কত সহজে ব্যাপারটা সামলে নিল তার ম্যাডাম।

ধরে নাও তুমি যখন সব পোষাক খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে ভিজছিলে তখন সে এসে পড়েছিল।

আমার মনে হয় সে ঝড়ের সময় জীবনের ভয়ে কুঁড়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ক্লিফোর্ড তবু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কনির দিকে। সে তার অবচেতন মনে কি ভাবছিল তা সে নিজেই জানত না। ব্যাপারটাতে সে এতদূর আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল যে সে তার চেতনার উপরিপৃষ্ঠে কোন একটা স্পষ্ট ধারণা খাড়া

করতে পারছিল না এ বিষয়ে। তার চেতন অবচেতন মিলে মনের গোটা শূন্য কাঠামোটার মাঝে অন্য কিছু না পেয়ে কনির কথাটাকেই মেনে নিল। কনির প্রশংসা করল। তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছিল না। কনির লজ্জারক্ত মুখখানাকে সত্যি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। রতিতৃপ্তির এক তৈলাক্ত মসৃণতা ফুটে উঠেছিল তার মুখে। তার উজ্জ্বল গাত্রত্বকে।

পরে ক্লিফোর্ড বলল, তবে তোমার যদি সর্দি না হয় তাহলে তোমাকে ভাগ্যবান বলব।

কনি উত্তর করল সঙ্গে সঙ্গে, আমার সর্দি করেনি।

কনি তখন ভাবছিল সেই লোকটার কথা, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে যে লোকটা সেই ঘরের মধ্যে তাকে বলেছিল, অন্য সব মেয়ের থেকে তোমার যোনিদেশটা সবচেয়ে সুন্দর। কনির মনে হচ্ছিল একথাটা সে ক্লিফোর্ডকে বলে, স্পষ্ট ভাষায় বলে। যাই হোক, সে নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে এক রোষসংক্ষুব্ধ রাণীর মত এক নীরব গাম্ভীর্যে তার উপরতলার ঘরের মধ্যে চলে গেল। পোষাকটা পাল্টাতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় কনিকে খুশি করার জন্য তার সঙ্গে খুব ভাল আর মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল ক্লিফোর্ড। একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক একখানা বই থেকে সে একটা অংশ পড়ে শোনাতে লাগল কনিকে। সম্প্রতি ধর্ম সম্পর্কে একটা বিকৃত বোধ গড়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে। এ যুগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন সে। আসলে সে নিজের ভবিষ্যতের জন্যই শঙ্কিত। আসলে সেই শঙ্কার বিষাদকৃষ্ণ ছায়াটা এযুগের ভবিষ্যতের উপর ফেলে দেখে মাত্র। সন্ধ্যার সময় কোন একটা বই নিয়ে কনির সঙ্গে কথা বলা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। এই আলোচনার মাধ্যমে কেমন যেন এক রাসায়নিক ক্রিয়া সঞ্চারিত হয় তাদের মনের মধ্যে।

একটা বইএর খোঁজ করতে করতে ক্লিফোর্ড বলল, এ বিষয়ে তুমি কি মনে করো? আরো কিছু বিবর্তনের পর দেখা যাবে আর তোমাকে বৃষ্টিতে ভিজে গা শীতল করতে হবে না। আসল কথাটা হলো এই, আজকের বিশ্বে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি। একদিকে দেখছি বিশ্বজীবনের পার্থিব ক্ষয় যত বেড়ে যাচ্ছে তার আত্মিক উন্নতি তত বেড়ে যাচ্ছে।

কনি সব কথা মন দিয়ে শুনল। সে আশা করছিল ক্লিফোর্ড আরো কিছু বলবে। কনি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল ক্লিফোর্ডের দিকে। বলল, তার আত্মিক উন্নতি যদি হয় তাহলে আত্মা উপরে ওঠার সময় তার শূন্য জায়গায় কি রেখে যাচ্ছে?

ক্লিফোর্ড বলল, উন্নতি বলতে আমি এখানে অপচয়ের বিপরীতটাকে বোঝাতে চাইছি। আমি বলছি মানুষের কথা।

কনি বলল, কিন্তু তুমি অপচয় কোনটাকে বলছ? আমি ত দেখছি তুমি

আগের থেকে আরো মোটা হয়েছ। আমিও কিছু অপচয় করছি না। তুমি কি মনে করো পৃথিবীটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আগের থেকে? স্বর্গের আদি পিতা আদম আদি মাতা ঈভকে যে আপেল ফল দান করে, আজকের আপেলের থেকে তা কি বড় ছিল?

ক্লিফোর্ড বলল, জগতে পরিবর্তনটা এমন সূক্ষ্মভাবে হচ্ছে যে তা কারো চোখে পড়ছে না, এত ধীরে ধীরে হচ্ছে যে কাল গণনার হিসাবে তা ধরা পড়ছে না।

কনি মন দিয়ে শুনে বলল, এটা হচ্ছে বোঝার ভুল। আত্মার এক বিপুল অহঙ্কার। পৃথিবী পার্থিব সব দিকে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সব মানুষ পার্থিব দিক থেকে হার মানছে আর আত্মার দিক থেকে উন্নতি লাভ করছে এটা মনে করা অহঙ্কারের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। এ এক ধরনের বেয়াদপি।

ক্লিফোর্ড বলল, চুপ করে মন দিয়ে শোন। বড় বড় মনীষীদের কথায় বা কাজে বাধা দিও না। বর্তমান অবস্থা শুরু হয়েছে সুদূর অতীতে এবং সুদূর ভবিষ্যতে তা প্রসারিত। এই অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই অকল্পনীয়-ভাবে সুদূর। এই পার্থিব অবস্থার ঊর্ধ্বে আছে কিছু নির্বিশেষ চিন্তা আর কল্পনা আর সৃষ্টিশীলতার জগৎ যা কিছুটা মানুষ আর কিছুটা সকল অবস্থার স্রষ্টা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক্লিফোর্ডের কথা শেষ হলো। কনি চুপচাপ বসে সব কিছু শুনল। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না সে সব কথা, ঘৃণা জাগছিল।

কনি বলল, আজকের মানুষ আত্মার দিক থেকেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। আজকের জগতের এই শোচনীয় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঈশ্বরকে আবার জড়াতে চাইছ কেন? এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্লিফোর্ড বলল, এর মধ্যে অনেক কিছু মিশিয়ে আছে। তবে আজকের বিশ্ব যে পার্থিব দিক থেকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মিক দিক থেকে উন্নতি বা অগ্রগতি লাভ করছে একথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে।

কনি বলল, তুমি তাই মনে করো নাকি? তোমার আত্মাকে উপরে উঠতে দাও। যতক্ষণ আমি এই শক্ত মাটির উপর আমার দেহগত অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব ততক্ষণ তোমার আত্মার উপরে ওঠায় আমার কোন আপত্তি নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি কি তোমার দেহগত অস্তিত্বটাকে ভালবাস?

হ্যাঁ, ভালবাসি।

কনির মনে তখন একটা কথা বারবার অনুরণিত হয়ে উঠছিল, কত সুন্দর, কত সুন্দর নারীর এই যোনিদেশ।

ক্লিফোর্ড বলল, এ ভালবাসাটা কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার কারণ দেহটা মানুষের একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আমার মনে হয়, মেয়েরা

মনের স্বাস্থ্য বা অস্তিত্বের মধ্যে কোন পরম আনন্দ খুঁজে পায় না।

ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে কনি বলল, পরম আনন্দ? তোমাদের মনের স্বাস্থ্য থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাকে বলছ পরম আনন্দ? না, ধন্যবাদ। মন নয়, আমাকে শুধু আমার দেহ আর দেহের আনন্দ নিয়ে থাকতে দাও। এ দেহের প্রতিটি জীবকোষ যখন এক প্রাণচঞ্চলতায় মাতাল হয়ে ওঠে, এ দেহের সমস্ত জৈবিকতা যখন জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় ওতপ্রোতভাবে, তখন আমি আমার দেহের স্বাস্থ্যকে মনের স্বাস্থ্যের থেকে অনেক বড় বলে মনে করি। কিন্তু তোমাদের অনেকেরই মন জড়দেহের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তার বাইরে তাদের কোন পৃথক সত্তা নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, দেহসর্বস্ব বা দেহভিত্তিক জীবনের কথা বলছ? সে জীবন একান্তভাবে পশুদের জীবন।

কনি বলল, তবু এ জীবন তোমাদের মৃতদেহের মত জড় মনগুলোর থেকে অনেক ভাল। মানুষের দেহ দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সত্যিকারের জীবনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানুষের এই দেহ প্রথম প্রাচীন গ্রীকদের প্রেরণা দেয়। পরে প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলের হাতে সে দেহের মৃত্যু ঘটে। যুক্তি-বুদ্ধির নীরস জালে জর্জরিত হয়ে সে দেহ তার প্রাণ হারায়। সে প্রাণের যেটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল তাকে যীশু একেবারে শেষ করেন। কিন্তু আজ আমার দীর্ঘকাল পর এ দেহ সত্যিকারের জীবনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সমাধি-গহ্বর থেকে পুনরভ্যুত্থান ঘটছে তার। এই বিশাল সুন্দর বিশ্বের মাঝে এই নবজাগ্রত দেহের জীবন দেখবে কত সুন্দর দেখায়, দেখবে কত অফুরাণ প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর।

আমার মনে হয় প্রিয়তমা, তুমি সে জীবন না আসতেই বরণ করে নিয়েছ তাকে। অবশ্য তুমি এখন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছ এবং এখন দেহগত আনন্দ বা জীবনটাকে বড় করে দেখছ। কিন্তু আমার কথা শোন, দেহ নিয়ে এত উল্লসিত হবার কিছু নেই। জেনে রেখো, ঈশ্বর বলে সত্যিই যদি কোন বস্তু থেকে থাকে তাহলে তা অচিরে মানুষের জীবন থেকে সব দেহগত উপাদান অপসারিত করে মানুষের আত্মাকে আরো এক স্তর উঁচুতে অধিষ্ঠিত করতে চলেছেন।

কনি বলল, কিন্তু আমি তোমার কথা কেমন করে বিশ্বাস করব ক্লিফোর্ড, যখন আমি দেখছি তুমি যেটাকে জড়দেহ বলছ আমার সেই জড়দেহের মাঝে তোমার ঈশ্বর প্রত্যুষের প্রথম আলোকতরঙ্গের মত খেলা করছে? আমি যখন আমার মধ্যে তোমার কথার উল্টোটা অনুভব করছি তখন কেমন করে তোমার কথাকে মেনে নিই?

হ্যাঁ ঠিকই মানা উচিত। এই যে তুমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছ এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের উত্তেজনায় মাতাল হয়ে, এই যে তুমি ভেনিসে যেতে

চাইছ, তোমার মধ্যে সহসা এই বিপরীতমুখী পরিবর্তন কে জাগাল ?

কনি বলল, তুমি কি মনে করো এই আনন্দের উত্তেজনাটা খারাপ, একটা কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার ?

কিন্তু সে উত্তেজনা এমন অকুণ্ঠভাবে এমন সরলভাবে বাইরে প্রকাশ করাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

তাহলে আমি সেটা গোপন করে রাখব ?

মোটেই না। তোমার উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন বাইরে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, তুমি যাচ্ছনা কেন আমার সঙ্গে ?

ক্লিফোর্ড বলল, এ রকম উত্তেজনার অভিজ্ঞতা এর আগে অনেক লাভ করেছি আমরা। আমার মনে হয় বর্তমান এই পরিবেশকে সাময়িকভাবে বিদায় দেবার সময় এমনি এক উত্তেজনা জাগে। মুহূর্তের জন্য সব কিছুকে বিদায় দেবার মধ্যে এক আনন্দ আছে উত্তেজনা আছে। কারণ সব বিদায়ের অন্তরালে এক মিলন আছে আর মিলন মানেই এক নতুন বন্ধন।

কিন্তু আমি কোন নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য বাইরে যাচ্ছি না।

ক্লিফোর্ড বলল, এ বড়াই করো না, দেবতাদেরও কান আছে।

কনি বলল, না, বড়াই করছি না।

কিন্তু মুখে যাই বলুক, পুরনো যত সব বন্ধন সাময়িকভাবে ছিন্ন করে দূরে যেতে পারার এক আনন্দ সত্যিই একটা মিষ্টি উত্তেজনা জাগাচ্ছিল কনির মধ্যে। এ উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারছিল না সে।

সেদিন রাতে ক্লিফোর্ড ঘুমোতে পারল না। সারারাত জুয়া খেলে কাটাল মিসেস বোল্টনের সঙ্গে। খেলা শেষ হলো তখন যখন মিসেস বোল্টন আর বসে থাকতে পারছিল না ঘুমের ঘোরে।

অবশেষে হিলদার আসার দিন এসে গেল। কনি মেলর্সকে জানিয়ে দিয়েছিল, যদি সব কিছু ঠিক থাকে, যদি তাদের রাত্রিবাসের পথে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে তার অভিজ্ঞানস্বরূপ সে তার ঘরের জানালায় একটা সবুজ শাল ঝুলিয়ে রাখবে আর যদি কোন অসুবিধা বা কোন বাধার উদ্ভব হয় তাহলে লাল শাল ঝোলাবে।

জিনিসপত্র ঠিকমত বেঁধে নিতে কনিকে সাহায্য করতে লাগল মিসেস বোল্টন। মিসেস বোল্টন বলল, এই বাইরে যাওয়াটা ম্যাডামের পক্ষে খুব ভাল হবে।

কনি বলল, আমারও তাই মনে হয়। ক্লিফোর্ডকে একা দেখাশোনা করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত ?

না না, কোন অসুবিধা হবে না। উনি যা যা চান একাই তা সব করতে পারি। দেখছেন না, উনি আগের থেকে অনেক ভাল আছেন।

হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি ওঁকে নিয়ে আশ্চর্যভাবে চালাচ্ছ।

দেখবেন সব পুরুষরাই এক। তারা সকলেই শিশুর মত। ওদের একটু তোষামোদ করলেই ওরা গলে যাবে। ওদের কোনরকমে বুঝিয়ে দিতে হবে ওদের মতে আমরা চলছি। আপনিও কি তাই মনে করেন না?

কনি বলল, এবিষয়ে আমার মোটেই কোন অভিজ্ঞতা নেই।

কনি এবার নীরবে কাজ করতে লাগল। কাজ করতে করতে মিসেস বোল্টনের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, তোমার স্বামীকেও কি তুমি শিশুর মত ভুলিয়ে রাখতে?

মিসেস বোল্টন একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, তবে সে আমার মনের কথা বুঝত। ও সেইমত চলার চেষ্টা করত। তবে সে আমার মতের বাইরে যেত না।

তাহলে সে কখনই নিজের মতে চলতে পারত না।

না, তা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে তার চোখদুটো রাগের আগুনে লাল হয়ে উঠত। আমি তখন বুঝতাম আমাকে হার মানতে হবে। সে যেমন কখনো প্রভুত্ব করত না আমার উপর আমিও তেমনি কখনো প্রভুত্ব করতাম না তার উপর। যখন তার সঙ্গে পেরে উঠতাম না তখন তার কাছে হার মানতাম।

আর যদি হার না মেনে বিরোধিতা করে যেতে?

আমি কখন তা করেছি তা মনে পড়ছে না। যখন দেখতাম সে কোন অন্যায় করলেও দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে সে অন্যায়কে, তখন আমি আর বিরোধিতা করতাম না। কারণ আমি আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনটা কোনমতেই ছিন্ন করতে চাইতাম না। যদি আপনি কোন পুরুষকে সত্যি সত্যিই মনেপ্রাণে চান, যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে না চান তাহলে অনেক সময় সে অন্যায় করলেও জেনে শুনে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। অনেক সময় আমি কোন বিষয়ে অন্যায়কে আঁকড়ে ধরে থাকলেও সে আমার বিরোধিতা করত না। আমার সঙ্গে মানিয়ে চলত।

কনি বলল, তুমি রোগীদের সঙ্গেও বোধ হয় এইভাবে চল?

রোগীদের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। আমি জানি কোনটা রোগীদের পক্ষে ভাল হবে। তাই তাদের ভালোর জন্যই আমি তাদের ভুলিয়ে কৌশলে তাদের সেই ভালোর দিকেই নিয়ে যাই। ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা এক্ষেত্রে খাটে না, সেটা আলাদা কথা। কেউ যদি একবার কাউকে প্রাণ দিয়ে সত্যি সত্যিই ভালবাসে তাহলে সে তার পরে আর পাঁচজনকেও ভালবাসতে পারবে।

মিসেস বোল্টনের এই কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে গেল কনি। ভয়ে ভয়ে বলল, আচ্ছা তুমি কি মনে করো কেউ শুধুমাত্র একবারই মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারে?

তার কোন মানে নেই। অনেক নারী জীবনে একবারও ভালবাসে না। আসলে তারা জানে না প্রকৃত ভালবাসা কাকে বলে। পুরুষরাও ঠিক তাই। কিন্তু আমি যখন নারীকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতে দেখি তখন স্তব্ধ হয়ে

তা দেখি।

কনি বলল, তুমি কি মনে করো পুরুষরা কোন বিষয়ে সত্যি সত্যিই রাগ করে ?

হ্যাঁ, যদি আপনি তাদের অহঙ্কারে আঘাত দেন। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যায়। শুধু নারী-পুরুষের অহঙ্কারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

কথাটা শুনে ভাবতে লাগল কনি। সে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটার বিভিন্ন দিকগুলো ভেবে দেখতে লাগল। কিছুকালের জন্য হলেও সে তার ভালবাসার লোককে বিদায় দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। অথচ তা জেনে চুপ করে থাকলেও লোকটা কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

তবু তা পরস্পরকে সহ্য করতে হবে। কারণ মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব বহির্জগতের ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আসলে। যন্ত্রবৎ সেই ঘটনার অমোঘ দুশ্ছেদ্য জালের মধ্যে আটকে গেছে কনি। তার থেকে বেরিয়ে আসতে সে পারে না। আর তা চায়ও না।

হিলদা এল বৃহস্পতিবার সকালে। এল তার কথামত ঠিক সময়ে। দুজনের বসার মত তার ছোট গাড়িটা চালিয়ে এল সে। তার সঙ্গে ছিল শুধু একটা সুটকেস। হিলদাকে আগের মতই কেমন কুমারী কুমারী দেখাচ্ছিল। বিয়ের পরেও সে চিরদিন স্বাধীন ও কুমারী রয়ে যায় মনে প্রাণে। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির স্বরূপটা অবশেষে জানতে পারায় তার স্বামী বেঁকে বসেছে। এবার সে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চলেছে। হিলদার অন্য কোন প্রণয়ী বা উপপতি না থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে সে সহায়তা করছে তার স্বামীকে। নিজের এই অবাধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হিলদা। তার দুটি শিশু সন্তানকে সে নিজের মনের মত করে মানুষ করে চলেছে। এতে সে সুখী।

কনি এখন শুধু হিলদার মত একটা সুটকেস নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার বাবার মারফৎ একটা বড় ট্রাঙ্ক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। তার বাবা আগেই ট্রেনযোগে রওনা হয়েছিল।

তার বাবা সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরেই আবার ইটালি যাত্রা করেছেন। সেখানে অতদূরে গাড়ী করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাই ট্রেনযোগে রওনা হয়েছেন তিনি।

হিলদা তার শান্ত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সহায়তায় ওদের যাওয়ার পার্থিব দিকটার সবকিছু ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর কনির সঙ্গে তার উপরতলায় বসে কথা বলতে লাগল।

কনি এক সময় ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু হিলদা, আমি আজকের রাতটার মত কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতে চাই। ঠিক এখানে নয়, কাছাকাছি

কোথাও।

হিলদা তার ধূসর রহস্যময় চোখের দৃষ্টি মেলে কনির পানে তাকাল। তাকে বাইরে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরটা তার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইছিল। প্রায়ই এমনি হয়।

হিলদা শান্তভাবে প্রশ্ন করল, সে জায়গাটি কোথায় ?

বলছি, তুমি জান, আমি একজনকে ভালবাসি।

হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু একটা বুঝতে পেরেছিলাম।

সে কাছেই থাকে। যাবার আগে এই শেষবারের মত এই রাত্রিটা আমি তার সঙ্গে কাটাতে চাই। আমি তাকে কথা দিয়েছি।

কনির কথার মধ্যে একটা জেদ ফুটে উঠল।

হিলদা প্রথমে তার মাথাটা নিচু করল। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, তুমি কি একবার আমাকে বলবে লোকটি কে ?

লজ্জাজর্জরিত এক শিশুর মত জড়োসড়ো হয়ে উঠল কনি। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, আমাদের শিকার রক্ষক।

বিতৃষ্ণায় নাকটা কুঞ্চিত করে হিলদা ধমকে উঠল, কনি !

এই স্বভাবটা তার মার কাছ থেকে পেয়েছে হিলদা।

আমি জানি সব। তবু সে সত্যিই সুন্দর। তার বোধশক্তি আছে। তার মনটা বেশ নরম।

লোকটার গুণগান করে হিলদাকে তুষ্ট করতে চাইল সে।

এদিকে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল হিলদা। ভয়ঙ্করভাবে রেগে গিয়েছিল সে। কিন্তু বাইরে সে রাগ প্রকাশ করল না কিছুমাত্র। কারণ জানত কনি হয়েছে ঠিক তার বাবার মত। একরোখা। তাকে বাধা দিতে গেলে সে হয়ে উঠবে অদম্য।

এটা অবশ্য ঠিক যে হিলদা মোটেই পছন্দ করত না ক্লিফোর্ডকে। ক্লিফোর্ডের অহঙ্কারী বড় বড় ভাবটা মোটেই পছন্দ করত না সে। তার মনে হত ক্লিফোর্ড কনিকে নির্লজ্জভাবে বোকার মত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাটাচ্ছে। সে চেয়েছিল তার বোন বিবাহবিচ্ছেদ করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত স্কট পরিবারের মেয়ে হিসাবে কোন কারণে নিজেকে বা নিজেদের পারিবারিক মর্যাদাকে ছোট করার কাজটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখত সব সময়। সে আবার কনির মুখপানে চোখ তুলে বলল, পরে তোমাকে দুঃখ করতে হবে। অনুশোচনা করতে হবে।

না, তা করতে হবে না। কনি জোর দিয়ে বলল, সে একটা ব্যতিক্রম। সত্যিই সে ভালবাসার যোগ্য।

হিলদা আবার ভাবতে লাগল। বলল, যত তাড়াতাড়ি পার তাকে ছেড়ে দেবে। পরে তার জন্য তোমার লজ্জাবোধ করতে হবে।

না, মোটেই না। আমি তাকে ভালবাসি। আমি তার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চলেছি।

কনি!

যেন হাতুরীর আঘাত ছিল হিলদার কণ্ঠে। রাগে মুখখানা ম্লান হয়ে উঠেছিল তার।

যদি সম্ভব হয় আমি তার সন্তান লাভ করব। আমি তাতে গর্ববোধ করব।

হিলদা ভাবল এ বিষয়ে আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

হিলদা বলল, ক্লিফোর্ড কোন সন্দেহ করে না?

না, সন্দেহ করবে কেন?

হিলদা বলল, আমার ত মনে হয় সন্দেহ করার প্রচুর সুযোগ তুমি তাকে দিয়েছ।

মোটেই না।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ত বোকামি। কোথায় থাকে লোকটা?

ঐ বনটার অপর প্রান্তে তার বাসায়।

সে কি অবিবাহিত?

না, তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

বয়স কত?

তা জানি না। তবে আমার থেকে বড়।

কনি প্রতিটি কথায় ভীষণভাবে রেগে উঠছিল। এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে তার মা রাগের উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতেন। হিলদা তবু বাইরে তার রাগের কোন আবেগ বা উত্তেজনা প্রকাশ করল না। সে শুধু শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আজ রাত্রিতে তার কাছে যেতাম না।

কনি বলল, আমি না গিয়ে পারব না। তার কাছে না গেলে আমার তেমিন যাওয়া হবে না।

অবশেষে এক কূটনীতির বশবর্তী হয়ে হিলদা মত দিল কনিকে। ঠিক হলো ওরা বাড়ি থেকে রওনা হয়ে ম্যানস্‌ফিল্ডে চলে গিয়ে সেখানে রাতের খাওয়া খাবে। তারপর সেখান থেকে কনিকে গাড়িতে করে দিয়ে যাবে বনের ধারে। পরদিন সকালে আবার তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

কনি পান্নার মত সবুজ রঙের একটা শাল জানালায় ঝুলিয়ে দিল।

রাগের মাথায় হিলদা কিছুটা নরম হলো ক্লিফোর্ডের প্রতি, যতই হোক, তার মন বলে একটা জিনিস আছে। অবশ্য তার যৌনশক্তি নেই। তার কোন রমণক্ষমতা নেই। কিন্তু সেটা না থাকায় তার বরং একরকম ভালই হয়েছে। এ বিষয়ে ঝগড়া হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এই যৌন ব্যাপারে

হিলদার আর কোন আগ্রহ নেই। যে যৌনক্রিয়ায় পুরুষরা শুধু চূড়ান্ত স্বার্থপরতা আর নোংরামির পরিচয় দেয় সে যৌনক্রিয়ায় সে কোনদিন কোন উৎসাহ দেখাবে না। এ বিষয়ে কনির বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই তাকে অপ্রিয় কিছু সহ্য করতে হয়নি।

এদিকে ক্লিফোর্ড ভাবল, হিলদা কনির থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী। হিলদা আর যাই হোক কোন পুরুষকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে তার সঙ্গে এক সহায়তা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাবের উপর ভিত্তি করে এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তার উপর নির্ভর করতে চায়; কিন্তু কনির উপর নির্ভর করা যায় না। ক্লিফোর্ড যদি রাজনীতি করত তাহলে কনি তার কোন কাজেই লাগত না। কনি এসব ব্যাপারে শিশুর মতই হিমশীতল।

সেদিন র‍্যাগবির হলঘরে চায়ের আসরটা একটু সকাল করে বসল। খোলা দরজা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝের উপর।

ক্লিফোর্ড বলল, বিদায় কনি, আবার ফিরে এসো আমার কাছে।

শান্তকণ্ঠে কনি উত্তর করল, বিদায় ক্লিফোর্ড। খুব বেশী দিন বাইরে থাকব না।

ক্লিফোর্ড বলল, বিদায় হিলদা, আশা করি তুমি কনির উপর নজর রাখবে।

হিলদা বলল, নজর মানে? আমি রীতিমত লক্ষ্য রাখব। ও খুব একটা দূরে যেতে পারবে না।

মনে রেখো তুমি কথা দিলে।

কনি মিসেস বোল্টনকে বলল, বিদায় মিসেস বোল্টন। আশা করি তুমি স্যার ক্লিফোর্ডকে যথাসাধ্য যত্ন করবে।

আমি যথাসাধ্য যত্ন করব ম্যাডাম।

কনি বলল, কোন খবর থাকলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবে। স্যার ক্লিফোর্ড কেমন থাকে জানাবে।

ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি তাই করব। আশা করি আপনার যাত্রা ও ভ্রমণ শুভ হোক। আপনি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ফিরে আসুন।

বিদায়ের সময় সবাই হাত নাড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। কনি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল দরজার সিঁড়ির উপরের ধাপটায় তার চলমান যান্ত্রিক চেয়ারটায় বসে আছে ক্লিফোর্ড। যতই হোক সে তার স্বামী। এই র‍্যাগবিই তার বাড়ি। এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিয়তির বিধানে।

মিসেস চেম্বার গেটটা খুলে দিতেই গাড়িটা বাড়ির সীমানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরল। বাইরে তখন কোলিয়ারির শ্রমিকরা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। বড় রাস্তাটা ছেড়ে ক্রসহিল রোড ধরল গাড়িটা। এই পথ ধরে ওরা যাবে ম্যানসফিল্ড। কনি একটা কালো চশমা পরল। ওরা রেললাইন পার হয়ে একটা ব্রিজের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কনি এক সময় বলে উঠল,

সামনের ঐ গলিপথটা দিয়ে বনের সেই বাসাটায় যেতে হবে।

হিলদা অধৈর্য হয়ে কনির পানে কড়াভাবে তাকিয়ে বলল, এটা ভয়ঙ্কর দুঃখের কথা যে তোমার জন্য আমরা সোজা গন্তব্যস্থলে যেতে পারছি না। আমরা নটার মধ্যেই পল মলে পৌঁছতে পারতাম।

কনি তার চশমার ভিতর থেকে তাকিয়ে বলল, তোমার জন্য আমি দুঃখিত।

আরো কিছুক্ষণ পর অবশেষে ওরা ম্যাসফিল্ডে পৌঁছল। এই ম্যাসফিল্ড একদিন বড় মনোরম ও রোমান্টিক জায়গা ছিল। আজ এটা শুধু একটা কোলিয়ারি শহর। একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল হিলদা। সেই হোটেলে একটা ঘর ভাড়া করল। পরিবেশটা মোটেই ভাল লাগছিল না হিলদার। ভিতরে ভিতরে সে এতদূর রেগে গিয়েছিল যে কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল না তার। অথচ কনির লোকটার ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করছিল।

হিলদা বলল, কি নামে ডাক তাকে? তুমি ত শুধু তার কথা হলে 'সে' বল।

আমি তাকে তার নাম ধরে ডাকি না, সেও আমাকে ডাকে না। তবে মাঝে মাঝে আমি তাকে জন টমাস আর সে আমাকে লেডি জেন বলে। তবে তার আসল নাম হলো অলিভার মেলর্স।

তুমি তাহলে কেমন করে লেডি চ্যাটার্লির পরিবর্তে মিসেস মেলর্স হতে চাও?

আমি তা হতে সত্যিই ভালবাসি।

কনির ব্যাপারে বলার কিছু নেই। তবু হিলদা নিজেকে বোঝাল, লোকটা যদি যুদ্ধের সময় চার পাঁচ বছর ধরে লেফটন্যান্টগিরি করে থাকে, তাহলে তাকে অপদার্থ বলা চলে না এবং তার পরিচয়টা বাইরে দেবার মত। তাছাড়া লোকটার চরিত্র আছে। হিলদা একটু নরম হলো।

তবু হিলদা বলল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তোমার মোহভঙ্গ হবে এবং তাকে ছাড়তে বাধ্য হবে। শ্রমিকদের সঙ্গে বেশীদিন কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু তুমি নাকি সমাজবাদী? তুমি আবার শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ওকালতি করে থাক।

আমি কোন রাজনৈতিক সংকটের সময় ওদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি কিন্তু ওদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েই আমি দেখেছি ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চলা আমাদের মত লোকের পক্ষে কত কঠিন, কত অসম্ভব। শুধু ধনবৈষম্য নয়, আসল কথা দুপক্ষের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। কোন ছন্দ বা মিলই নেই।

হিলদা যারা রাজনীতি করে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বাস করেছে। তার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। তার কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়।

হোটেলে সন্ধ্যাটা একরকম করে কেটে গেল। কেটে গেল নীরস নিরানন্দ

ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও। কনি তার ব্যাগে গোটা কতক জিনিস নিয়ে নিল। তারপর চুলটা একবার আঁচড়ে নিল।

কনি বলল, আমার মনে হয় হিলদা, প্রেমের মধ্যে যে একটা বিস্ময় আছে সে বিস্ময় সে চমক মানুষ তখনি অনুভব করে যখন সে বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

কনির কথার মধ্যে একটা অহঙ্কারের সুর ছিল।

হিলদা বলল, প্রত্যেকটি মশাও সৃষ্টির সময় প্রেমের এই বিস্ময় ও চমক অনুভব করে।

তুমিও তাই মনে করো নাকি? সত্যিই এটা বড় চমৎকার।

সেদিন রাত্রিটা ছিল আধো আলো আধো অন্ধকারে ভরা। নীরস ও নিরানন্দভাবে দীর্ঘ সন্ধ্যাটা কাটাবার পর হিলদা গাড়ি ছেড়ে দিল। বলসোভার হয়ে অন্য একটা পথ ধরল গাড়িটা।

কনি চোখে কালো চশমা আর মাথায় অদ্ভুত একটা ছদ্মবেশী টুপী পরে চুপচাপ বসে ছিল। লোকটার সঙ্গে তার ভালবাসাবাসির ব্যাপারে যত বাধা দিতে লাগল হিলদা, ততই মনে মনে শক্ত হয়ে উঠল কনি, ততই দৃঢ়তার সঙ্গে লোকটার পক্ষ অবলম্বন করে যেতে লাগল সে।

গাড়িটা ক্রসহিলের কাছে আসতেই একটা ট্রেন চলে গেল। হিলদা ধারণা করেছিল রেলের ব্রীজটার ওপারে তার শেষ প্রান্তে বাঁ দিকে হবে সেই গলিটা যেখানে কনি নেমে বনে চলে যাবে। ও তাই গাড়ির গতিটা শ্লথ করে দিল। ব্রীজটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকাল। গলিটার মোড়ের কাছে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল।

নিচু গলায় বলল, আমরা ঠিক জায়গায় এসে গেছি।

হিলদা গাড়ির আলোটা নিবিয়ে দিল। গলির মোড়ে ঘাসগুলোর উপর আলোটা পড়েছিল।

লোকটার কণ্ঠ শোনা গেল, আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন।

হিলদা গাড়িটা একটু পিছিয়ে গলিটার মোড়ে একটা এলম গাছের তলায় কিছু সবুজ ঘাস মাড়িয়ে দাঁড়াল। কনি নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল গাছটার তলায়।

কনি লোটাকে বলল, তুমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলে?

লোকটা উত্তর করল, খুব একটা বেশী সময় নয়।

ওরা আশা করেছিল হিলদাও গাড়ি থেকে নামবে। কিন্তু হিলদা গাড়িতে গুম হয়ে বসে রইল।

কনি বলল, আমার বোন হিলদা। তুমি আমার বোনের কাছে গিয়ে একবার কথা বলবে না? হিলদা, এ হচ্ছে মেলর্স।

মেলর্স তার মাথা হতে টুপীটা তুলল। কিন্তু হিলদার কাছে গেল না।

কনি হিলদাকে বলল, হিলদা, তুমি একবার বাসায় আসবে না? এখান থেকে বেশী দূর নয়।

হিলদা বলল, কিন্তু গাড়িটার কি হবে?

কত লোক গলির মোড়ে গাড়ি রাখে। তোমার কাছে ত চাবি আছে।

হিলদা চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল, গাড়িটা গলির ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে পারি?

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে পারেন।

হিলদা গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে গলির ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। তারপর গাড়িটায় চাবি দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তখন রাত্রি অন্ধকার হলেও স্বল্প আলোয় ছিল আলোকিত। পথ ঘাট মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। গলি পথটায় লোক চলাচল করে না বলে অব্যবহৃত পথটার দুধারে আগাছা গজিয়ে উঠেছে বড় বড়। বাতাসে ফুলের সুবাস ভেসে আসছিল। মেলর্স আগে আগে যাচ্ছিল, তারপর ছিল কনি, তারপর হিলদা। পথের উপর যে সব জায়গা-গুলোতে অন্ধকার জটিল হয়ে উঠেছিল সেই জায়গায় টর্চ লাইট জ্বালছিল মেলর্স। ওক গাছের উপর একটা পেঁচা ডাকছিল। ওদের পাশে পাশে যাচ্ছিল ফ্লসি। কেউ কোন কথা বলছিল না। বলার কোন কিছু ছিল না।

অবশেষে কনি একটা হলদে আলো দেখতে পেল। মেলর্সের বাসা থেকে আসছিল আলোটা। কিছুটা ভয় পেয়ে গেল কনি।

মেলর্স নিজের হাতে দরজার তালা খুলে প্রথমে নিজে ঘরে ঢুকল। খালি ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। ঘরটার একধারে চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল।

টেবিলের উপর একটা সাদা কাপড় পাতা ছিল। তার উপর দুটো প্লেট আর দুটো গ্লাস ছিল। হিলদা মুখ ঘুরিয়ে খালি ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। ঘরটাকে একেবারে নীরস নিরানন্দ মনে হলো তার। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে লোকটার পানে তাকাল সে।

লোকটার চেহারাটা মোটামুটি লম্বা আর একটু রোগা-রোগা। দেখতে সুন্দর বলা চলে। লোকটা যেন তার চারধারে সব সময় এক নীরব নিরুচ্চার দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। কথা কম বলে লোকটা।

কনি বলল, তুমি বসো হিলদা।

মেলর্স বলল, বসুন। আমি আপনাকে চা দেব না বীয়ার?

কনি বলল, বীয়ার।

হিলদাও বলল, বীয়ার দেবে আমাকে দয়া করে।

হিলদার কণ্ঠে ও চোখে মুখে একটা লজ্জার ভাব ছিল। মেলর্স তার দিকে মিটমিট করে তাকাল।

মেলর্স ঘরের একধারে গিয়ে একটা আলমারী থেকে একটা নীল কাচের

জার থেকে এক গ্লাস বীয়ার আনল। আসার সময় তার মুখের ভাবটার কিছু পরিবর্তন হলো।

কনি বসল দরজার দিকে। হিলদা বসল মেলর্সের চেয়ারটায়। কনি হিলদাকে বলল, ওটা ওর চেয়ার।

হিলদা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে, যেন সে আগুনের উপর বসে পড়েছিল।

মেলর্স তাড়াতাড়ি বলল, ব্যস্ত হবেন না। ব্যস্ত হবেন না মোটেই। স্থির হয়ে বসুন। আরাম করে বসুন।

হিলদাকে জার থেকে এক গ্লাস মদ ঢেলে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, আমার কাছে কোন সিগারেট নেই। আমি সিগারেট খাই না কি না। আশা করি আপনাদের কাছে সিগারেট আছে।

তারপর কনির দিকে তাকিয়ে বলল, কি খাবে তুমি?

মেলর্স এমনভাবে কথা বলল, যেন সে কোন হোটেলের মালিক।

কনি বলল, ওখানে কি রয়েছে?

মেলর্স বলল, আলুসিদ্ধ, মাখন, ছাড়ানো বাদাম—এতে হবে না কি?

কনি বলল, হ্যাঁ। হিলদা খাবে ত?

হিলদা মেলর্সের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, তুমি ইয়র্কশায়ারের ভাষায় কথা বল কেন?

একফালি ক্ষীণ অস্পষ্ট হাসি হেসে মেলর্স বলল, এটা ইয়ার্কশায়ারের ভাষা নয়, ডার্বির ভাষা।

হিলদা বলল, ডার্বির ভাষাই বা বলো কেন? তুমি ত প্রথমে সহজ স্বাভাবিক ইংরাজি ভাষায় কথা বলেছিলে।

জোর করে চেষ্টা না করলে আমার মুখ থেকে এই ভাষাই বেরিয়ে পড়ে। আপনাদের যদি একেবারে অসুবিধা না হয় তাহলে আমি এই ভাষাতেই কথা বলব।

হিলদা বলল, কথাগুলো কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়।

তা হতে পারে। আবার তেভারশালে আপনারা কথা বললে আপনাদের ভাষাও কৃত্রিম মনে হবে।

মেলর্স আবার তাকাল হিলদার দিকে। ইচ্ছা করে এক কৃত্রিম ব্যবধান রেখে চলল মাঝখানে।

এরপর খাবার আনতে লাগল মেলর্স। এদিকে দুই বোন নীরবে বসে রইল টেবিলের দুধারে। আর একটা প্লেট, ছুরি, কাঁটা চামচ প্রভৃতি সব নিয়ে এল মেলর্স। তারপর বলল, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কোটটা খুলে রাখব।

মেলর্স তার কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখে একটা ঘি রঙের ফ্লানেলের শার্ট পরে

টেবিলের ধারে বসে রইল।

মেলর্স বলল, আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনারা শুরু করে দিন।

মেলর্স রুটিটা কেটে দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল নীরবে। হিলদা কনির মতই তার দুরগ্রাহী নীরব ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য শক্তি অনুভব করতে লাগল বসে বসে। টেবিলের উপর রাখা লোকটার সেই রোগা-রোগা হাতগুলো লক্ষ্য করল সে। বুঝল, লোকটা সাধারণ শ্রমিক নয়। সে যেন শ্রমিকের অভিনয় করছে।

একটুখানি মাখন নিয়ে হিলদা বলল, তুমি যদি স্বাভাবিক ইংরাজি ভাষায় কথা বল তোমার আঞ্চলিক ভাষা ছেড়ে তাহলে সেটা আরো ভাল হবে।

মেলর্স হিলদার দিকে তাকিয়ে তার ইচ্ছার মধ্যে এক শয়তানী বুদ্ধির গন্ধ পেল। এরপর বলল, আপনি স্বাভাবিক কাকে বলছেন? আপনি যদি আপনার বোন ফিরে আসার আগেই আমাকে নরকে পাঠাবার কথা বলতেন আর তার উত্তরে আমি ঐ ধরনের কিছু অপ্রিয় শক্ত কথা বলতাম সেটা কি খুব স্বাভাবিক হত?

হিলদা বলল, মার্জিত ভদ্র আচরণ সব সময়ই স্বাভাবিক।

মেলর্স বলল, আপনি দ্বিতীয় সত্তার কথা বলছেন?

তারপর সে হেসে বলল, না, আমি ভদ্র আচরণ করতে পারব না।

এর উত্তর দিতে পারল না হিলদা। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ রেগে গেল সে। অন্ততঃ এটা তার বোঝা উচিত ছিল একথার মাধ্যমে হিলদা তাকে সম্মান দান করেছে। কিন্তু অভিনেতার মত এমন একটা প্রভুত্বমূলক ভাব দেখাল যাতে মনে হবে ওই হিলদাকে সম্মান দান করল তার কথার দ্বারা। কী অবিবেচনার কাজ। কনি সত্যিই কুপথে যাচ্ছে, লোকটার খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।

তিনজনে নীরবে খেয়ে যেতে লাগল। খাওয়ার টেবিলটা কিভাবে সাজিয়েছে তা লক্ষ্য করতে লাগল হিলদা। সে বেশ বুঝতে পারল তার থেকে লোকটা এসব দিকে অনেক সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। এ দিক দিয়ে হিলদার নিজের স্কটজাতিসুলভ একটা আলগা ভাব আছে। কিন্তু অন্য দিকে লোকটার মধ্যে আছে ইংরাজজাতিসুলভ এক আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রসাদের ভাব। লোকটাকে স্বমতে আনা একটা কঠিন কাজ।

আবার হিলদাকে স্বমতে আনাও তেমনি কঠিন কাজ মেলর্সের পক্ষে।

হিলদা কিছুটা শান্ত ও নরম গলায় বলল, তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে করো এই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে?

কিসের ঝুঁকি?

আমার বোনের সঙ্গে এই সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া।

মেলর্স কনির পানে তাকাল। বলল, এ সম্পর্ক ত তোমার হাতে পাতানো

মেয়ে। আমি ত তোমার উপর জোর করিনি।

কনি হিলদার পানে তাকাল। বলল, তুমি ঝগড়া করো না হিলদা।

হিলদা বলল, আমি তা চাই না। কিন্তু সব কিছু ভাল করে ভেবে স্থায়ী সম্পর্কের কথা ভাবা উচিত হয়। এভাবে ছেলেখেলা করা উচিত নয়।

মেলর্স বলল, স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথা বলছেন? তাহলে আমিও বলব আপনি নিজে কি এমন স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেছেন? আমার মনে হয় আপনি ত বিবাহবিচ্ছেদ করতে চলেছেন। আপনি যা এ বিষয়ে লাভ করেছেন তা হলো এক অনমনীয় মনোভাব আর এক মিথ্যা জেদের অবিচ্ছিন্নতা। আপনি শীঘ্রই বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠবেন এই অবিচ্ছিন্নতায়। আপনার নিজের এই নারীমনের অবিচ্ছিন্ন অনমনীয়তা আর আপন ইচ্ছাশক্তির উগ্র স্বাতন্ত্রে আপনি নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন একদিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ ধরনের কোন মনোভাব গড়ে ওঠেনি আমার মধ্যে।

হিলদা বলল, আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলার কি অধিকার আছে তোমার?

মেলর্স বলল, অধিকারের কথা বলছেন? আমি তাহলে বলব, আপনার অবিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে দেখার কি অধিকার আছে আপনার?

হিলদা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, শুনুন মশাই, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে?

মেলর্স বলল, আছে। অবশ্য এ সম্পর্ক জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনার উপর। কিন্তু সে যাই হোক আপনি আমার স্ত্রীর বোন।

এখনো সে সম্পর্ক অনেক দূরে।

আমিও বলে দিচ্ছি এ সম্পর্ক এখনো অনেক দূরের ব্যাপার নয়। আমি নিজের মত করে এ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আপনার তথাকথিত স্থায়ী সম্পর্কের থেকে এমন কিছু তা খারাপ নয়। আপনার বোন যদি আমার কাছে একটুখানি ভালবাসা আর যৌনতৃপ্তির জন্য আসে তাহলে সে জেনেশুনেই আসে। সে জানে কি চায় কি পায়। সে এর আগে আমার বিছানায় যতবার শুয়েছে আপনি যার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক পাতিয়েছেন তার কাছে ততবার শোননি। আমি আমার নিয়তিকে ধন্যবাদ দিই। আপনার বোনের মত মেয়ের থেকে যে কোন পুরুষ যে আনন্দ লাভ করতে পারে আপনার মত মেয়ের থেকে কোন পুরুষ তা পেতে পারে না। এটা সত্যিই দুঃখের কথা। কারণ আপনি একটু চেষ্টা করলেই ভাল হতে পারতেন। ইচ্ছা করলেই আপনি একটা সুন্দর কাঁকড়া বিছার পরিবর্তে ভাল আপেল হতে পারতেন। আপনার মত মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষা আর নবজীবন লাভ দরকার।

মেলর্স বরাবর হিলদার দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখের ক্ষীণ একফালি

হাসির মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক আসক্তির ভাব ছিল।

হিলদা বলল, আর তোমাদের মত যে সব লোক নিজের কুৎসিত নোংরা কামনা বাসনাকে জাহির করে বেড়ায় তাদেরও শিক্ষা দীক্ষার দরকার।

শুনুন ম্যাডাম। সব মানুষ কখনো এক হতে পারে না। তবে আপনি যা পাবার যোগ্য তাই পেয়েছেন। আপনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনেরই যোগ্য।

হিলদা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার ঝোলানো কোটটা তুলে নিল হাতে। বলল, আমি পথ চিনে ঠিক যেতে পারব।

মেলর্স বলল, না আপনি পারবেন না।

ওরা তিনজনেই সেই সংকীর্ণ গলিপথটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে। হিলদা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাড়িটায় গিয়ে উঠল। অন্ধকারে গাছের আড়ালে কোথায় একটা পেঁচা ডেকে চলেছিল। হিলদা গাড়ির এঞ্জিনে স্টার্ট দিল। মেলর্স আর কনি দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

কনি মেলর্সকে বলল, তোমাদের দুজনের মধ্যে এত কথা কাটাকাটি বা তর্ক বিতর্কের কোন দরকার ছিল না।

মেলর্স বলল, একজনের মাংস অন্যের কাছে বিষ হতে পারে।

হিলদা গাড়ির আলোটা জ্বেলে বলল, সকালে যেন আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় কনি।

কনি বলল, না, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। শুভরাত্রি।

গাড়িটা সশব্দে চলে যেতেই আবার আগের মত স্তব্ধ হয়ে উঠল নৈশ বনভূমি।

কনি ভয়ে ভয়ে মেলর্সের হাতটা ধরে গলিপথে হাঁটতে লাগল। একসময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে কনি বলল, আমাকে চুম্বন করো।

মেলর্স বলল, দাঁড়াও, গলিটা পার হতে দাও।

মেলর্সের হাতটা বরাবর ধরে রইল কনি। নীরবে পথ চলতে চলতে কনির বড় আনন্দ হচ্ছিল। মেলর্স চুপ করে ছিল। কনি ভাবল তার বোন তাকে মেলর্সের কাছ থেকে দূরে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মেলর্সের সঙ্গে আজ রাতে মিলতে পারায় বড় আনন্দ হচ্ছিল কনির।

বাসায় পা দিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল কনি। এ ঘরে এবার তারা একা, সম্পূর্ণ একা।

কনি বলল, কিন্তু তুমি হিলদার প্রতি অতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলে কেন?

যথাসময়ে তাকে গালে একটি চড় দিতে হত।

কিন্তু কেন? সে ত চমৎকার মেয়ে।

মেলর্স কোন কথা বলল না। নীরবে তার কাজ করে যেতে লাগল। বাইরে তাকে দেখে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু কনির উপর তার কোন রাগ নেই। কনি তা বেশ বুঝতে পারল। তবে মেলর্সের এই রাগের জন্য তাকে আরো

সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাকে বেশী আত্মস্থ আর উজ্জ্বল করে তুলেছিল। মেলর্সের সেই উজ্জ্বল ও স্তব্ধনিবিড় আত্মস্থতা দেখে আনন্দে কনির দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন গলে যেতে লাগল।

মেলর্স যেন কনিকে দেখেও দেখছিল না। এবার সে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। তারপর তার ভ্রূ দুটো তুলে কনির পানে তাকাল। তার সেই ভ্রূ দুটোর মধ্যে তখনো এক ক্রোধাবেগ নিবিড় হয়ে জমে ছিল।

মেলর্স বলল, চল বিছানায় যাবে না? এই বাতিটা নাও।

টেবিলে একটা বাতি জ্বলছিল। কনি সেটা পরম আনুগত্যের সঙ্গে তুলে নিল হাতে। তারপর শুতে গেল।

সে রাতের মত ইন্দ্রিয়াবেগের এমন উত্তাপ এমন প্রবলতা এর আগে কখনো দেখেনি কনি। কনি চমকে উঠল। এতটা হয়ত সে চায়নি। তবু আগের থেকে তীব্র ও প্রবল এক পুলকিত রোমাঞ্চের ফুলশরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার সারা অঙ্গ। প্রবল হলেও প্রতিটি মুহূর্তকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অথচ বাঞ্ছিত আবেগে বরণ করে নিচ্ছিল কনি। সে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেও কোন-রূপ বাধা দিল না মেলর্সকে। এক নির্লজ্জ নিবিড়তায় নিষ্ঠুর মেলর্সের অপ্রধৃষ্য পুরুষাঙ্গের প্রতিটি অপ্রতিরোধ্য আঘাতে কনির অন্তঃশায়ী নারীসত্তার এক একটি গোপন স্তর যেন উন্মোচিত হয়ে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল কে যেন তার আত্মাটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। যে আগুনে শুধু আত্মার সকল চেতনা চিন্তা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অথচ দেহের উপর কোন আঁচ লাগে না, সেই মধুস্রাবী অগ্নির স্পর্শশীতল লেহনে দেহটা তার যতই পুলকিত হয়ে উঠছিল আত্মাটা তার ততই পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কনির সব লজ্জাগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তার প্রতিটি গোপনাঙ্গে যে সব লজ্জা এতদিন গভীর হয়ে লুকিয়ে ছিল, যে সব লজ্জা এক আন্তরযন্ত্রীয় জটিলতায় সুপ্রাচীন সেই সব লজ্জাগুলোও সব পুড়ে যাচ্ছিল। কনিকে কোন কিছু করতে হলো না। তার পক্ষ থেকে কোন সক্রিয়তার প্রয়োজন ছিল না। এক প্রচণ্ড যৌন তৎপরতায় ফেটে পড়ে কনির শান্ত স্তব্ধ দেহটার উপর আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছিল মেলর্স। তার শৃঙ্গার ও সঙ্গমের শতমুখী পীড়নে নিপীড়িত হলেও ক্রীতদাসের মত এক বাধাহীন নিষ্ক্রিয়তায় নিস্পন্দ হয়ে ছিল তার সারা দেহটা। মেলর্সের প্রজ্জ্বলিত কামাগ্নির শিখাগুলো তখনো কনির বুক ও গর্ভদেশটাকে লেহন করে যাচ্ছিল, তার সর্বাঙ্গকে ঘিরে ছিল। যে আঘাত মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর, আবার মর্মস্পর্শিতায় মধুর সেই ভীষণ-সুন্দর আঘাতে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজন্ম ও নবজীবন লাভ করেছিল কনি। সে হয়ে উঠছিল অন্য মানুষ, অন্য এক নারীমন।

এর আগে এ্যাডিলার্ডের কথাটা বুঝতে পারত না কনি। এ্যাডিলার্ড নাকি বলেছিল হেলয়সের সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার এক বছরের মধ্যেই প্রেমের

সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করে একে একে সে। সেই এক প্রেমাবেগ বিচিত্ররূপে হাজার হাজার বছর ধরে আত্মপ্রকাশ করে আসছে অসংখ্য নরনারীর মধ্যে। তবে ইন্দ্রিয়াবেগের আতিশয্য ও আগুন দিয়ে এই প্রেমসম্পর্ককে মার্জিত করার প্রয়োজন সব যুগেই দেখা দিয়েছে। যে মিথ্যা লজ্জা যে ভীরুতা নরনারীর দেহগুলোকে গলিয়ে দিয়ে পরিণত করেছে এক নিরবয়ব শুচিতার বিশুদ্ধ নির্যাসে সে লজ্জা সে ভীরুতাকে ইন্দ্রিয়াবেগের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে।

আজকের এই বসন্ত রাত্রিতে অনেক কিছু শিখল কনি। আগে আগে ভাবত কনি, নারীরা লজ্জায় মরে যেতে পারে; সে কি ভয়ঙ্কর নিদারুণ লজ্জা! কিন্তু আজ লজ্জায় মরে যাওয়া ত দূরের কথা আজ সব লজ্জাই মরে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। যে লজ্জা, যে গভীর আন্তরযন্ত্রীয় লজ্জা, যে দেহগত ভয় তার অস্তিত্বের মর্মমূলে লুকিয়ে এতদিন আচ্ছন্ন করে ছিল তার নগ্ননির্জন স্বরূপটাকে, আজ মেলর্সের পুরুষাঙ্গের নিষ্করুণ তাড়নায় সে স্বরূপ লজ্জাভয়ের সব আচ্ছাদন ঝেড়ে ফেলে তার আপন প্রকৃতির অরণ্যে জেগে উঠেছে। আজ সে সম্পূর্ণরূপে নগ্ন ও নির্লজ্জ হতে পেরেছে। আজ তাই সমস্ত লজ্জা আর ভয় থেকে তার নারীমনের সমস্ত গোপনতা ও সমস্ত গভীরতাটুকুকে মুক্ত করতে পারার জন্য এক জয়ের গৌরব বোধ করল কনি। বুঝল আজ সার্থক হলো তার নারীজীবন। কোন এক দূরন্ত শিকারীর অব্যর্থ শরসন্ধানে তাড়িত বনকুরঙ্গীর মত তার নগ্ননির্মুক্ত আত্মা তার যথার্থ স্বরূপ তার লজ্জাভয়ের যত সব অরণ্য-জটিল আচ্ছাদন ঝেড়ে ফেলে তার আজন্মসঞ্চিত গোপনতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মিলিত হলো এক নগ্ননির্জন পুরুষের সঙ্গে। এই মিলনই যথার্থ মিলন। এ পুরুষ যেন তারই অন্য এক সত্তা। দুজনের নগ্নতা এক হয়ে দুজনকে করে তুলেছে এক অখণ্ড ও অভিন্ন।

অথচ সেই শিকারী পুরুষটা শয়তানের মত ভয়ঙ্কর। কী নির্মম তার শয়তানসুলভ আঘাত। সে আঘাত সহ্য করার শক্তি চাই তা যে-সে পারবে না। অথচ এ আঘাত ছাড়া নারীর কোন গত্যন্তর নেই। আন্তরযন্ত্রীয় লজ্জার শতপাকে জড়িয়ে থাকা জটিল শাখা-প্রশাখায় আকীর্ণ দেহযন্ত্রের অরণ্যগভীরে আজন্ম ঘুমিয়ে থাকা নারীমনের রহস্যায়িত স্বরূপটিকে একমাত্র এই পুরুষাঘাতই জাগাতে পারে। এই পুরুষাঘাতের প্রচণ্ডতাই উদ্‌ঘাটিত করতে পারে সেই অরণ্যগভীরের রহস্যময় গোপনতা।

অথচ এক অহেতুক ভয়ে এ আঘাতকে একদিন ঘৃণা করেছে কনি। উপেক্ষার চোখে দেখেছে। কিন্তু আজ সে বুঝল, এ আঘাতকে সত্যি সত্যিই কামনা করে এসেছে। কামনা করে এসেছে তার নারীমনের নিভৃত গোপনে। আত্মহননেচ্ছু এক আশ্চর্য বনহরিণীর মত এক অমোঘ পুরুষাঙ্গের অব্যর্থ শরাঘাতকেই কামনা করে এসেছে সে। আজ সেই বহুবাঞ্ছিত আঘাতকে লাভ

করে ধন্য হলো কনি।

কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ প্রভৃতি লোকগুলো কি মিথ্যাবাদী। তারা মিথ্যা করে প্রচার করে এবং মানুষকে একথা ভাবতে শেখায় যে মানুষ চায় ভাবালুতা, তারা বলে মানুষের মনই সব; অথচ সে নিবিড়ভাবে একান্তভাবে যা কামনা করে তা হলো এই পুরুষাঘাত, এই ভয়ঙ্কর দুর্বার ইন্দ্রিয়াবেগ। সে শুধু মনেপ্রাণে খুঁজে এসেছে এমনই একটি পুরুষকে যে সমস্ত লজ্জা ভয় হতে মুক্ত হয়ে কোন পাপপুণ্যের বিচার না করে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে এ আঘাত দান করতে পারে। এ আঘাত দান করার জন্য যদি কোন পুরুষ পরে লজ্জা পায় তাহলে তার থেকে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। ক্লিফোর্ড মাইকেলিস প্রভৃতি সব ছিল এই ধরনের ভীরু পুরুষ; ওরা শুধু একবাক্যে মনের স্বাস্থ্য আর পরম আনন্দের কথা বলে বেড়াত। কিন্তু একজন সুস্থ সবল নারীর কাছে মনের এই পরম আনন্দের কি মূল্য আছে? একজন সত্যিকারের পুরুষের কাছেই বা কি আছে? তাদের আপন স্বরূপ হারিয়ে তারা কুকুরের মত দাসমনোভাবের পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। তাদের অন্তরাত্মাকে ও আসল স্বরূপকে ঠিকমত জাগাবার জন্যও এই প্রচণ্ড নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়াবেগের উত্তাপ দরকার। ইন্দ্রিয়াবেগের এই উদ্ধত নির্লজ্জতা আর নির্ভীকতাই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে দান করতে পারে এক আশ্চর্য বলিষ্ঠতা আর দৃঢ়তা।

কনি আরো ভাবতে লাগল, হা ভগবান! পুরুষগুলো সব কেমন অদ্ভুত এক একটা জীব। কুকুরের মতই তারা শুঁকে শুঁকে সঙ্গম করে। কিন্তু এমন পুরুষ সত্যিই খুব কম আছে যে কোন কিছুতেই ভীত বা লজ্জিত নয়। মেলর্সের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল কনি, দেখল সে ঘুমোচ্ছে। পশুর মতই সে গভীরভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কনি তার গায়ে গা দিয়ে ঘন হয়ে শুল।

মেলর্স ঘুম থেকে জেগে না ওঠা পর্যন্ত কনি উঠল না। জেগে উঠে কনি দেখল মেলর্স বিছানার উপর বসে আছে। বসে বসে তার নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কনির মনে হলো মেলর্সের সংকোচহীন দৃষ্টি তার এক নির্লজ্জ চেতনার চাদর দিয়ে তার নগ্ন দেহটাকে ঢেকে দিয়েছে। বড় ভাল লাগছিল কনির। তার এই মদালস, রতিক্লান্ত, অর্ধতন্দ্রাভিভূত ও ভারী ভারী দেহটা নিয়ে টান-টান ভাবে শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল তার।

কনি বলল, এখন ওঠার সময় হয়েছে?

এখন সাড়ে ছটা বাজে।

কনিকে গলিটার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঠিক বেলা আটটার সময়। সব সময় একটা কাজের তাড়া থাকবেই। অবাধ অবিচ্ছিন্ন রতিসুখের কোন নীরব নিশ্চিন্ত অবকাশ নেই।

মেলর্স বলল, আমি তাহলে প্রাতরাশ তৈরি করে এখানে নিয়ে আসি?

আসব ত ?

হ্যাঁ, এস।

ফ্লসি নিচেতে ডাকছিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখহাত মুছল মেলর্স। কনি নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কোন পুরুষের বুক যখন এমনি করে সাহস আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে থাকে তখন তাকে সত্যিই কত সুন্দর দেখায়।

কনি বলল, পর্দাটা একটু টেনে দেবে ?

সকালের সবুজ সজীব বনভূমির পটভূমিকায় মেলর্সকে বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কনি তার ঝুলন্ত স্তনগুলোকে হাতে ধরে জানালার ভিতর দিয়ে বনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। মেলর্স তখন পোষাক পরছিল। কনি তখন শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মত ভাবছিল এই মিলন এই সাহচর্যই হলো প্রকৃত জীবন। সত্যিকারের সুখী জীবন।

কনির মনে হচ্ছিল মেলর্স যেন পোষাক পরছে না, তার নগ্নতাকে সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে।

কনি বলল, আমার অন্তর্বাসটা কি হারিয়ে গেছে ?

মেলর্স তা হাত বাড়িয়ে বিছানার তলা থেকে এনে দিল।

কনি বলল, ঠিক আছে, ওটা ছিঁড়ে গেছে। এখানেই থাকবে।

মেলর্স বলল, ভাল হবে তাহলে। আমি রাতের বেলায় দুটো পায়ের মাঝখানে ওটাকে চেপে ধরব। ওটা আমাকে সঙ্গ দান করবে।

কনি আবার স্বপ্নাবিষ্টের মত জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জানালা দিয়ে বাইরের বন থেকে সকালের স্নিগ্ধ বাতাস আসছিল। পাখি উড়ে যাচ্ছিল গাছের মাথার উপর দিয়ে। সকাল হয়ে যাওয়ায় খুশিতে ছোটাছুটি করছে ফ্লসি।

কনি শুনতে পেল মেলর্স আগুন ধরাচ্ছে, জল পাম্প করছে। কিছুক্ষণ পর একটা বড় ট্রেতে করে প্রাতরাশ আর চা এনে বিছানার উপর রাখল। কনি তা খেতে শুরু করতে কাপে চা ঢালতে লাগল মেলর্স। চা ঢেলে মেলর্স একটা চেয়ারে বসে তার খাবারের প্লেটটা হাঁটুর উপর রাখল।

কনি বলল, একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতে খুব ভাল লাগছে।

মেলর্স শুধু কনির যাবার সময়টার কথা ভাবতে লাগল। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। একটু পরেই চলে যেতে হবে কনিকে।

কনি বলল, হায়, আমি যদি একসঙ্গে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য থাকতে পারতাম আর র‍্যাগবি যদি এখান থেকে অনেক লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে হত। তুমি হয়ত জান, আমি আসলে র‍্যাগবি থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি কিছুকালের জন্য।

মেলর্স সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

কনি বলল, তুমি তাহলে কথা দিচ্ছ আমরা একসঙ্গে থাকব। তুমি আর

আমি একসঙ্গে।

হ্যাঁ, সম্ভব হলে নিশ্চয় থাকব।

কনি মেলর্সের গায়ে হেলান দিয়ে তার হাতের চা কিছুটা ফেলে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা থাকব।

মেলর্স চাটা ঝেড়ে ফেলে বলল, হ্যাঁ থাকব।

আপাততঃ একসঙ্গে থাকতে পারছি না। তাই নয়কি?

মেলর্স হেসে বলল, না, আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে রওনা হতে হবে।

কনি বলল, আমাকে যেতে হবে?

সহসা হাত বাড়িয়ে চুপ করতে বলল মেলর্স। বাইরে ক্লসি ঘেউ ঘেউ করে কার যেন আগমন ঘোষণা করছে।

মেলর্স নিজে ঘরের বাইরে গেল। তার বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে বাইরে গিয়ে দেখল সাইকেলে করে পিওন এসে তাকে ডাকছে। একটা রেজেস্ট্রী চিঠি আছে।

মেলর্স সই করে নিল চিঠিটা। তার এক সহকর্মী কানাডা থেকে পাঠিয়েছে তাকে। মেলর্স বিরক্ত হয়ে বলল, রেজেস্ট্রী করার কি আছে?

চিঠিটা নিয়ে আবার কনির কাছে ফিরে এল মেলর্স। কনিকে বলল, পিওন এসেছিল।

এত সকালে?

চিঠি থাকলে ও সকাল সাতটার মধ্যেই এসে দিয়ে যায়।

তোমার বন্ধু কি তোমাকে কোন সুখবর পাঠিয়েছে?

না। ও শুধু বৃটিশ কলাম্বিয়ার এক জায়গার কিছু ছবি আর সেই সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র পাঠিয়েছে।

তুমি কি সেখানে যেতে চাও?

যেতে পারলে ত ভালই হত।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আমিও তাই মনে করি। বড় সুন্দর জায়গা।

কিন্তু হঠাৎ পিওন আসায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মেলর্স। তার সমস্ত উদ্যম হঠাৎ মুষড়ে গিয়েছিল।

মেলর্স বলল, তোমাকে এবার তৈরি হতে হবে। সময় হয়ে গেছে।

সে উঠে প্রড়ল। বলল, আমি একটু ঘুরে আসি। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

মেলর্স তার বন্দুক আর ক্লসিকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়ে গেল। কনি বিছানা থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিল। ইতিমধ্যে মেলর্স বাইরে থেকে এসে গেছে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মেলর্স তালা দিল দরজায়। মেলর্স এবার

গলিপথ দিয়ে ওদের গন্তব্যস্থলে না গিয়ে বনের ভিতর দিয়ে অন্য পথে গেল

কনি একসময় বলল, গতরাত্রিটা কী চমৎকার কেটেছে।

বিষণ্ণ মনে মেলর্স বলল, এখন তার স্মৃতিটা নিয়ে শুধু আমাকে কাটাতে হবে।

ওরা নীরবে পথ চলতে লাগল। একসময় কনি বলল, আমরা কিন্তু একদিন একসঙ্গে দুজনে থাকব। বাকি জীবনটা কাটাব।

মেলর্স অন্য দিক থেকে মুখটা না ঘুরিয়েই বলল, হ্যাঁ, সময় হলে থাকব। আপাততঃ তুমি ভেনিস অথবা অন্য কোন জায়গায় চলে যাচ্ছ।

মেলর্স ডান দিকে একটা জায়গার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐখানে গাড়ি আসবে।

কনি মেলর্সের গলাটা জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি বলল, আমার জন্য তোমার ভালবাসা রেখে দেবে। গত রাতে আমার বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু তুমি আমাকে মনে রাখবে ত ?

মেলর্স নীরবে চুম্বন করল কনিকে। বুকের উপর চেপে রেখে দিল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চুম্বন করল।

মেলর্স বলল, আমি আগে গিয়ে একটু দেখে আসি গাড়িটা এসে গেছে কিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল মেলর্স, এখনো গাড়ির দেখা নেই। মনে হয় কিছুটা দেরী আছে।

মেলর্সকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। বলল, ঐ শোন।

ওরা দুজনেই কান পেতে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল। গাড়িটা ব্রীজের উপর এসে গতিটা শ্লথ করে দিয়েছে। মেলর্স চলে গেল। বলল, তুমি যাও, আমি আর যাব না। কনি হতাশ হয়ে তার পিছু পিছু যেতে লাগল। মেলর্স একসময় কনিকে একটা চুম্বন করেই ছেড়ে দিল।

এদিকে হিলদা তখন গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। কনিকে কাঁটাগাছের কাছে গলিপথ থেকে একটু দূরে দেখতে পেয়ে বলল, এখানে কি করছিস ? সে কোথায় ?

কনি বলল, সে আসবে না।

চোখে জল নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল কনি। হিলদা তাকে কালো চশমা আর ওড়নাটা দিল। বলল, পরে নাও।

হিলদা গাড়ি ছেড়ে দিল। কনি মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকাল। মেলর্সের চিহ্ন নেই কোথাও। তার মনে হলো ওদের মিলনটা নিবিড় হয়ে উঠতে না উঠতেই তার মাঝে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল মৃত্যুর মতই বিচ্ছেদের এক কৃষ্ণ যবনিকা।

ক্রসহিল গাঁটাকে পাশ কাটিয়ে হিলদা বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কিছুদিনের মত তুমি দূরে থাকবে লোকটার কাছ থেকে।

ওরা লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে লাঞ্চটা সেরে নিল। কনি বলল, জানিস হিলদা, প্রকৃত ভালবাসা আর প্রকৃত যৌনাবেগ কাকে বলে তা তুই কখনো বুঝতে পারিসনি। একই লোকের কাছ থেকে এই দুটো জিনিস পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

হিলদা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, দয়া করে তোমার অভিজ্ঞতার কথা আর বলো না। আমি সত্যিই এমন লোককে কখনো পাইনি যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে আমার। আমি তেমন মানুষ পাইনি। তাদের আত্মপ্রসাদধন্য মনগড়া ভালবাসা বা ইন্দ্রিয়াবেগ আমি চাইনি। আমি তাদের পোষা বিড়াল বা তথাকথিত ভালবাসার দাস হতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতা। আমি তা পাইনি এইটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কথাটা নিয়ে ভাবল কনি। পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতা। ঐকান্তিক আত্মমিলন। কনি ভাবতে লাগল আসলে নরনারীর ভালবাসাবাসির ক্ষেত্রে যেটা দরকার তা হলো পরস্পরের অকুণ্ঠ আত্মোদ্‌ঘাটন। এই আত্মোদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ প্রেম মানেই পারস্পরিক আত্মচেতনার বিনিময়। তার মানেই এটা একটা রোগ।

কনি তার বোনকে বলল, তোমার একটা দোষ হিলদা, যে কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তুমি নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠ।

হিলদা উত্তর করল, আমার মনে হয় আমি কখনো কারো ক্রীতদাসী হইনি, নিজেকে বিকিয়ে দিইনি।

কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তাই হয়েছ। তুমি হয়েছ তোমার উগ্র আত্ম-সচেতনতার বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের ক্রীতদাসী।

দুর্বিনীত কনির এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল হিলদা। কিছুক্ষণ পরে রেগে বলল, আত্মচেতনার দাস হই বা না হই, আমার সম্বন্ধে অপরের ধারণার দাস হইনি। আমার স্বামীর ভৃত্য হয়ে উঠিনি।

শান্ত কণ্ঠে বলল কনি, তুমি জান আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

কনি বরাবরই হিলদার কথা মেনে আসত। তার কথামত চলে আসত। কিন্তু আজ সে অন্তরে আঘাত পেলেও এবং অন্তরটা তার কাঁদতে থাকলেও হিলদার-আধিপত্য থেকে একেবারে মুক্ত। সব নারীই কেমন যেন ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্করভাবে আত্মপরতান্ত্রিক।

তার বাবার কাছে গিয়ে খুশি হলো কনি। সে ছোট থেকে তার বাবার

প্রিয়পাত্রী ছিল। কনি আর হিলদা পল মলের একটা হোটেলে রইল আর ওদের বাবা স্যার ম্যালকম রইলেন একটা ক্লাবে। কিন্তু সন্ধ্যের সময় তিনি মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। মেয়েরাও তাদের বাবার সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসত।

বয়স হলেও স্যার ম্যালকম দেখতে ভালই ছিলেন। তাঁর চেহারার বাঁধুনিটা শক্ত ছিল। তবে তাঁর চারপাশে সমাজে সংসারে আধুনিকতার যে স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তাতে মনে মনে কিছুটা বিব্রত বোধ করতেন তিনি। তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর স্কটল্যাণ্ডে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স তাঁর থেকে কম এবং তাঁর থেকে বেশী সংগতিসম্পন্ন। কিন্তু তিনি যতদূর সম্ভব বড় বড় ছুটির দিনগুলো বাইরেই একা একা ঘুরে বেড়াতেন।

সেদিন ওরা একটা অপেরায় গিয়েছিল নাটক দেখতে। কনি বসেছিল তার বাবার পাশে। স্যার ম্যালকমের চেহারাটা বেশ মোটাসোটা। সবল সুগঠিত দেহ; বেশ শক্ত জানু। একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষের যে ধরনের জানু ও পা হওয়া দরকার স্যার ম্যালকমের ছিল তাই। তাঁর সে জানু ও পা দেখে বেশ বোঝা যায় জীবনে অনেক ভোগ করেছেন তিনি। কনির মনে হলো তার বাবার সারা জীবনের অপ্রতিহত প্রমোদাভিলাষ, উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ আর অবাধ ইন্দ্রিয়পরতার সমস্ত অলিখিত ইতিহাস মূর্ত হয়ে আছে এই জানু আর পায়ের গঠনের মধ্যে। তার বাবা ছিলেন পুরুষের মত এক পুরুষ। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, বৃদ্ধ হয়ে আসছেন। এটা সত্যিই দুঃখের। কিন্তু কনি আবার এটাও বুঝেছে যে তার বাবার সে জানু আর পায়ের গঠনে ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। যে ভালবাসা মানুষের যৌনজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, যে ভালবাসার শক্তি এক মধুর অবিস্মরণীয়তায় বেঁচে থাকে সারাজীবন সে ভালবাসার শক্তি কোনদিন জাগেনি স্যার ম্যালকমের মধ্যে।

আজ হঠাৎ মানুষের মুখের থেকে এই পায়ের গুরুত্বের প্রতি সবচেয়ে বেশী মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল কনি। আজ মুখের সৌন্দর্যের কোন দাম নেই তার কাছে। সে সৌন্দর্য অসত্য এবং ম্লান হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যে। দোকানে বা বিভিন্ন জায়গায় কনি যত মানুষ দেখেছে তাদের মধ্যে অনেকের পা ও উরুদেশ সবল ও সুগঠিত, আবার অনেকের পা ও উরুদেশ কাঠির মত সরু সরু। কিন্তু তাদের তার বাবার মত ইন্দ্রিয়াবেগের বলিষ্ঠতা নেই। আসলে তারা সবাই সাধারণ মানুষ। যেন প্রাণহীন, অস্তিত্বহীন।

কিন্তু কনির মনে হলো নারীর পা বা জানু যাই হোক, তারা প্রাণহীন বা অস্তিত্বহীন দেখায় না পুরুষদের মত।

কনি কিন্তু লণ্ডনে এসে মোটেই খুশি হতে পারল না। এখানকার লোকগুলোকে দেখে কেমন যেন ভুতুড়ে মনে হলো। তাদের দৃষ্টিগুলো শূন্যতায় ভরা; কোন প্রাণচঞ্চলতা নেই তাদের মধ্যে। তাদের বাইরে দেখতে বেশ ব্যস্ত আর

সুদর্শন হলেও বেশ বোঝা যায় তাদের মনগুলো জীবন্ত সুখে ভরপুর নয়। কোন সৃষ্টিশীল আশার অভাবে মনগুলো তাদের যেন সব বন্ধ্যা। কনি কিন্তু সব সময় নারীসুলভ এক অন্ধ সুখের আকাঙ্খায় সততচঞ্চল। সব সময় সে শুধু এক বিরামহীন সুখের অবিচ্ছিন্ন আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে চায়।

প্যারিসে এসে সেখানকার মানুষদের মধ্যে কিছুটা ইন্দ্রিয়াবেগ দেখতে পেল। কিন্তু সে ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যে কোন ভালবাসার শক্তি না থাকায় কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাদের। কনির মনে হলো প্যারিস যেন এখন সবচেয়ে বিষণ্ণ নগরী। তাছাড়া সমস্ত শহরটা এক অপরিসীম যান্ত্রিকতা আর কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। শহরের লোকগুলোর ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যেও কৃত্রিমতা ঢুকে গেছে। কৃত্রিমতার সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্লান্তি। টাকার পিছনে ছুটে ছুটে ওরা সবাই ক্লান্ত। ক্লান্তিতে যেন মৃতপ্রায়। আবার ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে আছে ক্রোধ আর অহঙ্কার। কিন্তু ওরা আমেরিকা ও লণ্ডনবাসীদের মত নিজেদের ক্লান্তি কোন কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে ঢাকতে পারে না। উপর থেকে দেখে ওদের মনে হয় ফোটা ফুলের মত সজীব; কিন্তু আসলে ওরা ভীষণভাবে ক্লান্ত। ওদের মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান নেই। ভালবাসার অভাবে ওদের কৃত্রিম প্রাণমন দিনে দিনে নীরস হয়ে যাচ্ছে। আপন ক্লান্তি আর কৃত্রিমতার ভারে ওরা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওরা নয়, সমস্ত জগৎটাই জীর্ণ হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক। এ যেন এক ধরনের অরাজকতা। ক্লিফোর্ড আর তার রক্ষণশীল অরাজকতা। এ অরাজকতা বোধ হয় স্থায়ী হবে। ক্রমান্বয়ে এটা হয়ত পরিণত হবে এক মৌন ও ব্যাপকতম নৈরাস্যবাদে।

এই জীর্ণ ক্লান্ত জগৎটার কথা ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল কনি। তবে মাঝে মাঝে কতকগুলো জায়গায় গিয়ে আনন্দ পেত সে। সেগুলো হলো বুলভার্ড, বয় আর লুক্সেমবার্গ। সেখানে গিয়ে কিছুটা আনন্দ পেত কনি। কিন্তু আমেরিকান আর ইংরেজদের ভিড়ে ভরে গেছে প্যারিস শহরটা। আমেরিকানরা অদ্ভুত পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়; আবার তার সঙ্গে কিছু বেরসিক ইংরেজও থাকে যাদের বিদেশে বড় বেমানান দেখায়।

এবার ওদের এগিয়ে যাবার পালা। একটার পর একটা করে নতুন নতুন জায়গায় থেকে ভালই লাগছিল কনির। তখন গ্রীষ্ম পড়ে গেছে। আবহাওয়াটা বেশ গরম থাকাতে হিলদা প্যারিস থেকে প্রথমে গেল সুইজারল্যাণ্ডে। পরে সেখান থেকে ভেনার ও দোদোকান্তে হয়ে ভেনিসে। এই যাত্রা ও ভ্রমণের ব্যাপারে সব কিছু দায়িত্ব হিলদার। সে বরাবর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হিলদা এতে খুশি। কনি নীরবে এই সব কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছিল। উপভোগ করেছিল। সেও ছিল এতেই খুশি।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সত্যিই বড় আনন্দদায়ক। তবু কনি শুধু আপন মনে মনে বলতে লাগল, কেন আমি এ আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না?

কেন আমি এই সব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি না? এটা ভাবতেও কেমন লাগে। আমি যেন সেই সেণ্ট বার্ণার্ডের মত যিনি লুসার্নের হ্রদে নৌকাভ্রমণ করাকালে হ্রদের সবুজ জল বা তীরবর্তী পাহাড়ের কোন কিছুই লক্ষ্য করেননি। আসল কথা প্রাকৃতিক কোন দৃশ্য আর আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু এ দৃশ্য দেখারই বা কি আছে? কেন আমি তা দেখব? আমি তা দেখতে চাই না।

না, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড বা ইতালিতে দেখার মত কিছুই পেল না কনি। সে শুধু এই সব চোখের দেখা দেখে এসেছে। আর এই সব দেখতে দেখতে তার শুধু মনে হয়েছে র‍্যাগবির থেকে এই সব দৃশ্য বেশী সত্য নয়। সে যদি এই সব জায়গায় আর কখনো না আসে, এই সব দৃশ্য আর কখনো না দেখে জীবনে, তাহলেও কিছু যাবে আসবে না তার। র‍্যাগবি যত ভয়ঙ্করই হোক এই সব কিছুর থেকে অনেক বেশী সত্য।

যদি মানুষদের কথা ধরা যায় তাহলে বলতে হয় সব জায়গারই সব মানুষ প্রায় একই ধরনের। খুঁটিয়ে দেখলে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে পার্থক্য খুবই সামান্য। তারা শুধু কিভাবে তোমার আমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে হয় তা বেশ জানে। আর যদি দেশভ্রমণকারী হয় তাহলে পথের দুপাশের পাথরগুলো পিষে তার থেকে রক্ত বার করার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ কি না নিষ্প্রাণ যত সব পাহাড় আর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো থেকে কোন প্রকারে যদি একটুখানি পুলকের রোমাঞ্চ পাওয়া যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আসলে চারপাশের বস্তুর মধ্যে কোন আনন্দ নেই; আসল আনন্দ আছে মানুষের মনে আর যত সব পথিক আর পরিব্রাজকের দল আপন আত্মার আনন্দই এক সংকল্পিত তৎপরতায় উপভোগ করে যায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

না, আমি তা করব না, পারব না। মনে মনে বলল কনি। তার থেকে আমি বরং র‍্যাগবিতেই ফিরে যাব। সেখানে আর যাই হোক, আমাকে আর কোন কিছু দেখতে বা কোন দিকে তাকাতে হবে না, এই ধরনের এক কৃত্রিম আনন্দের যান্ত্রিক উত্তেজনায় বোকার মত লাফাতে হবে না। নিজেকে নিজে উপভোগ করার এই মিথ্যা সমারোহ আত্ম অবমাননার-ই নামান্তর। মানব জীবনের এক চরম ব্যর্থতারই সামিল।

র‍্যাগবিতেই আবার ফিরে যেতে চাইল কনি। ফিরে যেতে চাইল পঙ্গু ক্লিফোর্ডের কাছে। ক্লিফোর্ড আর যাই হোক, এই সব প্রমোদাভিলাষী ভ্রমণকারীদের মত অতখানি নির্বোধ নয়।

কনি কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার সেই মনের মানুষের সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক রেখে চলেছিল। এ সম্পর্ক তার কোনক্রমেই ত্যাগ করা চলবে না। এ সম্পর্কের সুতোটা কোনরকমে একবার ছিন্ন হয়ে গেলেই সে হারিয়ে যাবে এই পৃথিবীতে। এই অমিতব্যয়ী অবিমৃষ্যকারী আনন্দশিকারীদের ভিড়ে হারিয়ে

যাবে সে। আধুনিক জীবনের এও যেন একটা রোগ।

মেস্তারের এক গ্যারেজে ওদের গাড়িটা রেখে স্টীমারে করে ভেনিস রওনা হলো ওরা। হ্রদের জলে ঢেউ দিচ্ছিল। গ্রীষ্মের শেষ বিকেলের রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল ঢেউ খেলানো জলে। জলের ওপারে ভেনিস শহরটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

ঘাটে গিয়ে এক খেয়াপারের লোককে ওরা ওদের গন্তব্যস্থলের ঠিকানাটা দিল। লোকটা দেখতে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু বেশ উৎসাহী। ঠিকানাটা হাতে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভিলা এসমারালদা। ওখানকার এক ভদ্রলোককে আমি প্রায়ই নৌকাভ্রমণে নিয়ে যেতাম। কিন্তু জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূর।

সবুজ গাছপালা আর ধোবাদের বস্তীর মধ্য দিয়ে খালটা চলে গেছে। হিলদা আর কনি সামনের দিকে বসেছিল নৌকোটার। ওদের পিছনে বসেছিল ওদের বাবা।

লোকটা দাঁড় টানতে টানতে সাদায় আর নীলে মেশানো রুমালটা দিয়ে মুখ মুছে বলল, মশাই কি ঐ ভিলাতে বেশী দিন থাকবেন?

হিলদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালিতে বলল, দিন কুড়িক থাকব। আমরা দুজনেই বিবাহিত মহিলা।

লোকটা বলল, কুড়ি দিন?

একটু থেমে আবার বলল, তাহলে আপনাদের ত একটা নৌকো লাগবে। কুড়ি দিন থাকবেন। রোজ বা সপ্তায় একদিন দুদিন কখন কি লাগবে বলে দেবেন।

হিলদা আর কনি দুজনে ভাবতে লাগল। ভেনিসে থাকতে হলে একটা নিজস্ব নৌকো ভাড়া করে রেখে দেওয়া দরকার। যেমন স্থলপথে একটা গাড়ি দরকার। এখানে জলপথই বেশী।

হিলদারা বলল, ভিলাতে কি আছে?

ভিলাতে একটা মোটর লঞ্চ আর ডিঙ্গি নৌকো আছে। কিন্তু—এই 'কিন্তুর' মানে হলো সেই সব লঞ্চ বা নৌকো পাওয়া যাবে না।

তোমার পারিশ্রমিক কত?

রোজ তিরিশ শিলিং অথবা সপ্তায় দশ পাউণ্ড।

এটাই কি তোমার বাঁধা দর?

না মশায়, আমার বাঁধা রেটের থেকে কম বললাম।

দুই বোনে আবার ভেবে দেখতে লাগল ব্যাপারটা। তারপর বলল, আচ্ছা কাল সকালে এস ওখানে। তখন ঠিক করা যাবে। তোমার নাম কি?

তার নাম জিওভানি। লোকটা জানতে চাইছিল ওখানে গিয়ে কাদের ডাকবে। অর্থাৎ একটা পরিচয়পত্র চায়। হিলদার কাছে কোন তার নামের

কার্ড ছিল না। কনির কাছে একটা ছিল। লোকটা তা নিয়ে পড়তে লাগল, মিলোভি।

কনি বলল, মিলোভি কন্‌তানৎসা।

কথাটার পুনরাবৃত্তি করল লোকটা। তারপর কার্ডটা তার জামার মধ্যে রেখে দিল।

ভিলা এসমারালদা বাড়িটা সত্যিই অনেক দূর। জলের ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা বাড়িটা খুব একটা পুরনো নয়। ভিলাটা হলো বোগিয়ার কাছাকাছি। দূর থেকে বাড়ির ছাদটা দেখা যায়। বাড়ির নিচে চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট বাগান। বড় বড় কালো গুঁড়িওয়ালা গাছে ভর্তি বাগানটা।

ভিলাটার মালিকও স্কটল্যাণ্ডের লোক। মধ্যবয়সী মোটাসোটা চেহারার ভদ্রলোক যুদ্ধের আগে ইটালিতে অনেক সম্পত্তি করে যুদ্ধের সময় দেশপ্রেমে প্রচুর উৎসাহ দেখানোর জন্য নাইট উপাধি পায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীর চেহারাটা রোগা রোগা; কিন্তু চোখে মুখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব। ভদ্রমহিলার নিজস্ব কোন সুখশান্তি নেই। তাকে সব সময় প্রেমঘটিত ব্যাপারে অত্যুৎসাহী উচ্ছৃংখল স্বামীকে চোখে চোখে রাখার এক উদ্বেগের বোঝাকে বয়ে বেড়াতে হয়। কি করে কোন সৌভাগ্যবলে এই স্বামীরত্নকে সে লাভ করল? এতে কি সুখ সে পায়? ভদ্রমহিলার মতে পুরুষগুলো সব মানুষের পোষাকপরা এক একটা কুকুর; কখন কোন মেয়ে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বোলাবে, কখন কোন মেয়ের পেটের উপর নিজের পেটটা চেপে জাজ নাচের আসরে নাচবে তার জন্য তারা লালায়িত হয়ে আছে সব সময়।

হিলদাও জাজ নৃত্য ভালবাসত। সেও তার নাচের অংশীদার কোন লোকের পেটে পেট চেপে নাচতে ভালবাসত এবং লোকটা যখন নাচতে নাচতে তার হাত ধরে মেঝের উপর তার গতিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করত তখন তার ভাল লাগত। কনির কিন্তু মনে কোন শান্তি ছিল না। কারণ সে হিলদার মত কোন জাজ নাচের আসরে কোন লোকের পেটে পেট দিয়ে নাচতে পারে না। নাচের আসরের নগ্নপ্রায় মেয়েপুরুষগুলোকে মোটেই ভাল লাগে না তার। স্যার আলেকজাণ্ডার আর লেডি কুপারকেও তার ভাল লাগত না। মাইকেলিস বা অন্য কেউ তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় এটাও সে চায় না।

কনির সবচেয়ে ভাল লাগে সমুদ্র থেকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা এই লবণহ্রদের ওপারে গিয়ে কোন এক নির্জন মাঠে গিয়ে হিলদার সঙ্গে স্নান করতে। ওরা যখন নির্জন ঘাটটায় স্নান করে তখন ওদের গণ্ডোলা অর্থাৎ সেই খোয়াড়ী একটু দূরে বসে থাকে।

জিওভানি বিশেষ যত্নের সঙ্গে মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যায়। তাদের আদেশ পালন করে। এর আগেও সে বহু মেয়ের হুকুম তামিল করেছে। তারা চাইলে তাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে রাজী আছে। ও আশা

করেছিল হিলদাদের সঙ্গে কোন পুরুষসঙ্গী না থাকায় ওকে ওরা সঙ্গদানের কথা বলবে। কিছু ভাল উপহার দেবে যাবার সময়। তাছাড়া সে বিয়ে করতে চলেছে এবং সে কথা হিলদাদের জানিয়েছে কথায় কথায় এবং তারাও আগ্রহ সহকারে শুনেছে। তাই সে আশা করে ওরা যাবার সময় কোন কিছু ভাল উপহার দিয়ে যাবে।

আজ যখন হিলদারা লবণহ্রদের ওপারে স্নান করতে যাবার কথা বলে তখন জিওভানি ভাবে নিশ্চয় ওরা তাকে নিয়ে নির্জনে প্রেম করতে যাচ্ছে। তাই সে আর একটা গণ্ডোলাকে ভাবে। কারণ সে ভাবে দুজন মেয়ের জন্য দুজন যুবক দরকার। সে আরো ভেবেছিল বড় বোন হিলদা সব কিছুর ব্যবস্থা করলেও ছোট বোন তাকে সাময়িকভাবে প্রেমিক হিসাবে বেছে নেবে এবং বেশ কিছু টাকা দেবে।

জিওভানি যাকে এনেছিল তার নাম ড্যানিয়েল। তার নৌকোটা বড় এবং সে দেখতেও বেশ ভাল। তার দেহের গড়ন, মাথার চুল, ভাসা ভাসা নীল চোখ, মুখ সব সুন্দর। সে কথা কম বলে। একমনে এমনভাবে নৌকোর দাঁড় বায় যাতে মনে হবে নৌকোয় সে কেবল একা; অন্য কোন আরোহী নেই। কোন মেয়ের প্রতি তার যেন কোন আগ্রহ নেই। তাকে দেখে কনির মনে হলো সে যেন ঠিক মেলর্সের মত, স্বাধীনচেতা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক পুরুষ যে মেয়েদের কাছে কোনক্রমেই বিকিয়ে দেয় না নিজেকে। কনির মনে হলো জিওভানির যে স্ত্রী হবে তার জন্য কোন সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করে নেই। কিন্তু ড্যানিয়েলের স্ত্রী যে হবে সে সত্যিই ভাগ্যবতী।

স্নান করে বাড়ি ফিরেই কনি হয়ত ক্লিফোর্ডের একটা চিঠি পাবে। আজকাল ক্লিফোর্ড তাকে প্রায়ই চিঠি লেখে। কিন্তু সে চিঠির ভাষা বইএর লেখ্য ভাষা বলে তার মধ্যে কোণ প্রাণ খুঁজে পায় না কনি। কনির সে সব চিঠি মোটেই ভাল লাগে না।

কনি যখন স্নান করতে আসে তখন তার খুব ভাল লাগে। স্নান করে ছায়াচ্ছন্ন তীরে শুয়ে থাকা আর জগতের সব কিছু ভুলে এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া, নৌকোতে করে হ্রদের জলে বেড়ানো—সব মিলিয়ে কনির খুব ভাল লাগছিল। সবচেয়ে তার ভাল লাগল যখন সে তার মধ্যে গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে উঠল। এই সংশয়াতীত নিশ্চয়তা তার ভেনিস-ভ্রমণের সকল আনন্দকে দান করল এক আশ্চর্য পূর্ণতা।

কনিরা যে ভিলাটায় থাকত তাতে আরো অনেকেই ছিল। ওরা ছাড়া সেখানে ছিল আর এক স্কটপরিবার—স্বামীস্ত্রী আর দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে। ইতালির এক বিধবা কাউন্টপত্নী, জর্জিয়ার এক রাজকুমার আর এক ইংরেজ যাজক। স্যার আলেকজাণ্ডার কুপারের কিছুদিন আগে একবার স্ট্রোক হয়। তারপর থেকে অনেকটা শান্ত হন।

দিনগুলো কনির মোটের উপর মন্দ কাটে না। স্যার ম্যালকম আর লেডি কুপার দুজনেই ছবি আঁকেন। লবণহ্রদ আর তার চারপাশের বনপ্রকৃতিই সে ছবির বিষয়বস্তু। দেড়টায় ওরা সবাই মিলে হোটেলে লাঞ্চ খায়। সন্ধ্যের সময় প্রায়ই ডান্স বা ককটেল পার্টির আসর থাকে। মাঝে মাঝে মাইকেলিস এসে কনিকে বেড়াতে নিয়ে যায়। বলে, চল আইসক্রীম খেয়ে আসি।

সেদিন স্নান করে এসেই কনি একটা চিঠি পেল ক্লিফোর্ডের। ক্লিফোর্ড লিখেছে, আমাদের এখানেও এখন এক ঘটনায় দারুণ উত্তেজনা চলছে। শোনা যাচ্ছে আমাদের শিকার রক্ষক মেলর্সের পলাতকা স্ত্রী আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মেলর্সের কাছ থেকে কোন অভ্যর্থনা পায়নি। মেলর্স তাকে তাড়িয়ে ঘরে চাবি দিয়ে দেয়। কিন্তু ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে তার বিছানায় শুয়ে আছে। মেলর্স তখন তেভারশালে তার মার বাড়িতে চলে যায়। এখনো তার স্ত্রী তার বাসাতেই আছে এবং সেটা তার বাড়ি বলে দাবি করছে।

অবশ্য মেলর্স আমার কাছে এসে কোন কথা বলেনি। এসব আমার বিশ্বস্তসূত্রে শোনা। মিসেস বোল্টনই এসব কথা শোনায় আমাকে। সেই সঙ্গে একথাও বলে যে আমাদের ম্যাডাম আর বন দিয়ে বেড়াতে যাবেন না যদি মেয়েটা মেলর্সের বাসা ছেড়ে না যায়। আমাকে যে ছবিটা পাঠিয়েছ তা আমার ভাল লেগেছে। ছবিটাতে আছে স্যার ম্যালকম সমুদ্রের বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, তার মাথার সাদা ধবধবে চুলগুলো উড়ছে আর সূর্যের আলোয় তার সুন্দর গোলাপী গাত্রত্বক চকচক করছে। আমি দোষ দিচ্ছি না স্যার ম্যালকমকে। মানুষের যত বয়স হয় ততই সে দেহসর্বস্ব হয়ে ওঠে, ততই সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। মানুষ একমাত্র যৌবনেই অমরত্বের আস্বাদ পেতে পারে।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কনি যখন তার প্রমোদভ্রমণের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করছিল সেই সময় এই খবরটা পেয়ে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে সে। সেই ঘৃণ্য মেয়েটা তাহলে আবার এসেছে। তার প্রতি কনির বিরক্তিটা ক্রোধে পরিণত হলো। কিন্তু মেলর্স তাকে কোন চিঠি দেয়নি। অবশ্য তাদের মধ্যে কথা হয়েছিল কনি বাইরে থাকাকালে তাদের কেউ কাউকে চিঠি লিখবে না। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার কথা তাকে জানানো উচিত মেলর্সের। কনি মেলর্সের কাছ থেকে সব কিছু শুনতে চায়। যতই হোক, মেলর্সের সন্তান সে আজ গর্ভে লালন করছে।

কিন্তু কি ঘৃণার কথা। এখন সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। নীচু সমাজের লোকগুলো সত্যিই কত নোংরা। তার থেকে এসব জায়গা কত ভাল। এই নীল নির্মল আকাশ আর উজ্জ্বল সূর্যালোক কত সুন্দর। এর তুলনায় মিডল্যাণ্ডের সেই পরিবেশ কত ঘৃণ্য, কত জঘন্য।

কনি তার গর্ভসঞ্চারের কথাটা কারো কাছে এমন কি হিলদাকেও বলল না। মেলর্সের ব্যাপারে আরো কিছু জানাবার জন্য মিসেস বোল্টনকে একটা চিঠি দিল।

এমন সময় ডানকান ফোর্বে নামে তাদের এক পুরনো শিল্পী বন্ধু ভিলাতে এল রোম থেকে। সে ওদের সঙ্গে নৌকোয় করে বেড়াতে যেতে লাগল।

একদিন মিসেস বোল্টনের একখানি দীর্ঘ চিঠি পেল কনি। মিসেস বোল্টন লিখেছে :

স্যার ক্লিফোর্ডকে দেখে আপনি খুবই খুশি হবেন ম্যাডাম। তাঁর চেহারাটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এবং প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে তিনি কাজকর্ম করছেন। অবশ্য আপনার ফিরে আসার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছেন। আমাদের প্রিয় ম্যাডাম না থাকার জন্য গোটা বাড়িটা নীরস নিরানন্দ ও শূন্য দেখাচ্ছে। আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিকে তাই আমরা বরণ করে নিতে চাই।

মেলর্স সম্বন্ধে স্যার ক্লিফোর্ড আপনাকে কি লিখেছেন তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে তার স্ত্রী একদিন হঠাৎ ফিরে আসে তার কাছে। একদিন মেলর্স বন থেকে তার বাসায় এসে দেখে ঘরের বাইরে সিঁড়িতে তার স্ত্রী বসে রয়েছে। তার স্ত্রী বলে সে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে, সে তার বৈধ স্ত্রী; তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। সে আবার তার স্বামীর সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু মেলর্স সে কথা শুনল না। সে ঘরের তালা না খুলে সেখান থেকে চলে যায়। সে ভেবেছিল তার স্ত্রী চলে যাবে ঘরের দরজা খোলা না পেয়ে। কিন্তু রাত্রিবেলায় ফিরে এসে দেখে তার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর ঢুকে মেলর্স দেখে তার স্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছে। তার গায়ে কোন কম্বল নেই। মেলর্স তার স্ত্রীকে কিছু টাকা দিতে চায়। কিন্তু তার স্ত্রী বলে সে টাকা নেবে না, তাকে স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে নিতে হবে। এরপর তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয় অথবা সেখানে কি দৃশ্যের অবতারণা হয় তা আমি বলতে পারব না। মেলর্সের মা আমাকে এই সব কথা বলে। তাকে ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত দেখা যায়। মেলর্স তার মাকে বলে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার থেকে সে মরবে। তাই সে তার বাসা থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে তার মার কাছে তেভারশাল পাহাড়ে বাস করতে চলে যায়। এদিকে তার স্ত্রী বেগার্লিতে তার ভাইএর কাছে সব কথা বলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। পরদিন মেলর্স তার বন্ধু টম ফিলিপকে সঙ্গে করে তার বাসায় গিয়ে তার সব জিনিস তার মার বাসায় বয়ে নিয়ে আসে। ঘর খালি হয়ে যাওয়ায় তার স্ত্রী তখন বেগার্লিতে এক বুড়ী মুহিলার কাছে বাস করতে থাকে। কারণ তার ভাইএর বউ তাকে তাদের ঘরে ঢুকতে দেয়নি। তবু এইখানেই ব্যাপারটার শেষ হয়নি। তার স্ত্রী তার মার বাড়িতে প্রায়ই তার খোঁজে যায়। সে নাকি কোন এক উকীলের কাছেও যায়। মেলর্সের কাছে খোরাকপোষাকের দাবি জানায়।

বলে সে তার বৈধ স্বামী।

সে-ই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ সে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে। তার শোবার ঘরে সেন্ট আর একটা সিগারেটের কৌটো পেয়েছে। ওই অঞ্চলের পিওন নাকি বলেছে সে একদিন সকালে চিঠি বিলি করতে গিয়ে মেলর্সের বাসায় কার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে মেলর্সকে। আমি জানি মেলর্সের কোন দোষ নেই। কিন্তু তার স্ত্রী বাইরে এমনভাবে প্রচার করতে থাকে তার সম্বন্ধে যেন মেলর্স ভয়ঙ্কর রকমের এক দুশ্চরিত্র ও নারীলোলুপ লোক। তার স্ত্রী মেলর্সের থেকে বয়সে বড়। এখন তার গায়ে প্রচুর মেদ জমেছে। এই বয়সে মেয়েদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। তখন ওদের সমাজের অনেক মেয়ে পাগল হয়ে যায়।

চিঠিটা পড়ে একটা নোংরা আঘাত পেল কনি। সে ভাবল এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে একদিন ছিল। ঐ নোংরা জীবনের অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল সে। মেলর্সের উপর দারুণ রাগ হলো কনির। তার স্ত্রী বার্থার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলা উচিত ছিল। এই ধরনের বিয়ে করাটাই তার উচিত হয়নি। আসল কথা কি, নোংরামি আর নীচতার প্রতি একটা সহজাত স্বাভাবিক প্রবণতা ও আসক্তি আছে। ওখান থেকে আসার আগের দিন রাতে সঙ্গমকালে সারারাত ধরে ইত্তরসুলভ যে জঘন্য নোংরামির পরিচয় দেয় তা হয়ত তার স্ত্রী ঐ নোংরা মেয়েটা বার্থার কাছ থেকেই শেখা। এটা সত্যিই বিতৃষ্ণাজনক। মেলর্সের মত লোকের কবল থেকে নিজেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত করা যায় ততই ভাল। লোকটা সত্যিই অতি সাধারণ, অতি নীচ, নোংরা। তার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল।

সমস্ত ব্যাপারটার প্রতিই এক তীব্র ঘৃণা জেগে উঠল কনির। এখন তার সবচেয়ে ভয় করতে লাগল শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত অপমানজনক যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নীচতা আর নোংরামির প্রতি ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কনি যেন স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক মান সম্ভ্রমের প্রতি লালায়িত হয়ে উঠল সহসা। ক্লিফোর্ড ব্যাপারটা জানতে পারলে কত অপমানের জ্বালাই না সহ্য করতে হবে তাকে। ভাবতে ভাবতে আবেগের মাথায় মনে হলো কনির তার গর্ভস্থ সন্তানের হাত থেকেও মুক্তি পেতে চায় সে। মোট কথা, একদিনের সেই বহুবাঞ্ছিত ব্যাপারটা আজ একান্তভাবে ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত হয়ে উঠল সহসা তার কাছে।

সেন্টের শিশি সম্বন্ধে তার কথা হচ্ছে এই যে এটা তার নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। তার বোকামির জন্যই মেলর্সের ড্রয়ারে তার সেই আতরের শিশিটা পাওয়া যায়। আসলে সে তার আতরের শিশি থেকে কিছু আতর

নিয়ে মেলর্সের দুটো জামায় দেয়। তারপর শিশিটা তার ড্রয়ারে রেখে দেয়। সে ভেবেছিল ঐ আতরের শিশিটা দেখলেই তাকে মনে পড়বে মেলর্সের। আসলে তার স্মৃতির সুবাস জড়িয়ে থাকবে তার ফেলে আসা আতরের শিশির সঙ্গে। তবে মেলর্সের ঘরে সিগারেটের যে টুকরো পাওয়া গেছে তা হলো হিলদার।

কনি তার নতুন শিল্পীবন্ধু ডানকান ফোর্বেকে বিশ্বাস করে মেলর্সের কথাটা বলল। অবশ্য সে একথা বলল না যে সে তাকে ভালবাসত। সে শুধু বলল, লোকটাকে সে কিছুটা পছন্দ করত। তারপর তার সমগ্র জীবনকাহিনীটা বলল।

সব কিছু শুনে ডানকান বলল, লোকটা তার জাতভাইদের ছেড়ে তার শ্রেণীর লোকদের ছেড়ে একটু স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনভাবে থাকতে চেয়েছিল। কোন দোষ করেনি। কিন্তু এই জন্যই ওর শ্রেণী ও সমাজের লোকেরাই ওকে টেনে নামিয়ে আনবে। দেখবে ওকে একদিন নামিয়ে আনবে।

কনির মনের মাঝে বইতে থাকা ঘৃণার স্রোতটা হঠাৎ বিপরীত মুখে বইতে থাকল। কি করেছে লোকটা? কনির কি ক্ষতি সে করেছে? সে শুধু কনিকে এক চরম যৌনানন্দ দান করেছে এবং তার বহুদিনের অবরুদ্ধ যৌনাবেগকে এক উত্তপ্ত মুক্তি দান করেছে। এই জন্যই কি ওরা তাকে তার আত্মমর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে আনবে?

না না, কখনই তা হতে পারবে না। লোকটার এক নগ্ন প্রতিমূর্তি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। লোকটা যেন তার ধবধবে সাদা দেহগাত্র আর তামাটে রঙের হাত আর মুখ নিয়ে মাথাটা নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তার উত্থিত পুরুষাঙ্গকে সম্বোধন করে কি সব বলছে। লোকটার কণ্ঠস্বর কনি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। লোকটা যেন সেদিনকার মত বলছে, এমন যোনিদেশ খুব কম মেয়েরই আছে। কনির মনে হলো লোকটার একটা হাত তার তলপেট, পাছা থেকে শুরু করে গোপনাঙ্গের সমস্ত প্রদেশ জুড়ে এক মেদুর মদিরতায় সঞ্চালিত হচ্ছে। সহসা এক দুরন্ত উত্তাপের ঢেউ তার দুই জানুর মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে তার গর্ভদেশের গভীর পর্যন্ত বয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে মনে মনে বলতে লাগল, না, আমি আর তার কাছে যাব না। ফিরে যাব না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলল, আমি তাকে ছাড়ব না, তার কাছে যা পেয়েছি আমি তা এই সব কিছু সত্ত্বেও ভুলব না। যে মধুর উত্তাপ আমার জীবন এতদিন পায়নি সে উত্তাপ একমাত্র সেই দেয় আমাকে।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কনি মিসেস বোল্টনকে একটা চিঠি লিখল। সেই সঙ্গে মেলর্সকে একটা চিঠি লিখে মিসেস বোল্টনকে সেটা তার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করল। কনি মেলর্সকে লিখল:

তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আমি তা সব শুনে বিশেষ

দুঃখিত হয়েছি। তবে কিছু মনে করো না। এটা তার সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। এ উত্তেজনা হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়। তবে আমি সত্যিই দুঃখিত এ ব্যাপারে। আশা করি এ নিয়ে তুমি খুব একটা চিন্তা করবে না। মেয়েটা মানসিক রোগগ্রস্ত। সে তোমাকে অকারণে আঘাত দিতে চায়। দিন দশেকের মধ্যেই আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিন কতক পরেই ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। সে লিখেছে, তুমি আগামী ষোল তারিখে ভেনিস ত্যাগ করছ শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু এই প্রমোদভ্রমণ যদি সত্যি সত্যিই সুখকর ও আনন্দদায়ক হয় তোমার পক্ষে তাহলে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমরা তোমার অভাব অনুভব করছি, সমস্ত র‍্যাগবি তোমাকে চাইছে এটা ঠিক, কিন্তু ওখানকার পর্যাপ্ত সূর্যালোকের সবটুকু আশ মিটিয়ে উপভোগ করা উচিত। যদি তুমি সত্যি সত্যিই আনন্দ পাও ওখানে তাহলে আরো কিছুদিন থেকে যাও, ওখানকার ভয়ঙ্কর শীত কাটাবার জন্য উপযুক্ত প্রাণশক্তি সঞ্চয় করো।

মিসেস বোল্টন আমাকে এক আশ্চর্য তৎপরতা ও মনোযোগের সঙ্গে দেখাশোনা করে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি মানুষ কী আশ্চর্য ও অদ্ভুত জীব। কখনো মনে হয় কোন কোন মানুষের আছে একশোটা পা আর কোন কোন মানুষের আছে ছটা পা। মানুষের কাছে যে সংগতি আর আত্মমর্যাদা আশা করা হয় আসলে তার কোন অর্থ নেই।

শিকার রক্ষকের ব্যাপারটা নিয়ে যে লোকনিন্দার গুঞ্জন উঠেছে তা ক্রমশই বরফের জলের মত গড়িয়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে। মিসেস বোল্টনের কাছ থেকে আমি সব কিছু শুনতে পাই। মিসেস বোল্টন আমাকে এক ধরনের মাছের কথা বলে যারা নিজেরা কোন কথা বলতে পারে না; কিন্তু নীরবে গুজব ছড়ায়। আর পাঁচজনের জীবনের ঘটনা থেকে বাঁচার উপজীব্য গ্রহণ করে চলে।

মিসেস বোল্টন এখন মেলর্সের কুৎসা রটনার কাজে প্রচুর ব্যস্ত। আমি যদি একবার তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করি, একবার যদি সে শুরু করে এ বিষয়ে কোন কথা বলতে থাকে তাহলে আর রক্ষা নেই, সে এ ঘটনার গভীরে নিয়ে যাবে আমাকে। তার যত কিছু ঘৃণা আর ক্রোধ হলো মেলর্সের স্ত্রীর উপর। ওর নাম নাকি বার্থা কাউটস। ওদের নোংরা জীবনকাহিনীর ক্লেদাক্ত আবর্তের গভীরে আমি যেন ডুবে যাই, তলিয়ে যাই। তারপর সে কাহিনী শেষ হয়ে গেলে আমি পৃথিবীপৃষ্ঠের আলো হাওয়ায় উঠে আসি, উজ্জ্বল দিবালোকের দিকে যখন তাকাই তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তখন বড় আশ্চর্য বোধ হয়।

এক সময় একটা কথা আমার কাছে খাঁটি সত্যি বলে মনে হয়। মনে হয়, আমরা যেটাকে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ বলি আসলে সেটা যেন এক মহাসমুদ্রের তলদেশ। আমাদের চারপাশের গাছপালা সব হলো জলজ আগাছা আর পৃথিবীর মানুষগুলো হচ্ছে মাছ। আমরা যাকে বাতাস বলি তার থেকে শ্বাস গ্রহণ করি আসলে সেটা হলো জল। এই অনন্ত গভীর জলরাশির বহু ঊর্ধ্বে আছে প্রকৃত বাতাস। নির্মল বাতাস।

মাঝে মাঝে আমাদের আত্মা এই জীবন সমুদ্রের অনন্তগভীর জলতল ভেদ করে আবেগের সঙ্গে ঊর্ধ্বে আলো হাওয়ায় উঠে গিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। এটাই আমাদের ভাগ্য। এই হচ্ছে বিধির বিধান—আমাদের এই জলজীবন যাপন করে যেতে হবে। জলান্তরালবর্তী এই পিচ্ছিল মৎসজীবনের কুটিল অরণ্য থেকে বহু ঊর্ধ্বে অনন্ত আলোহাওয়ার চির-উজ্জ্বল রাজ্যে উঠে যাওয়াই হলো প্রতিটি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পারাটাই হলো অমরত্ব অর্জন। মানবাত্মার এই আলোকোজ্জ্বল উৎক্রমণই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ।

আমি যখন এ ব্যাপারে মিসেস বোল্টনের মুখ থেকে ওদের নোংরা জীবনের যত সব কথা আর কাহিনী শুনি তখন তরল ও পিচ্ছিল মানবজীবনের এই মৎস-সুলভ স্বভাবের এক ক্লেদাক্ত গভীরে ডুবে যাই আমি। দেহগত ক্ষুধার নিরন্তর তাড়নায় প্রতিটি মানুষ মাছের মত শিকারের সন্ধানে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আলো হাওয়াহীন এই তরল গভীরতা আর গোপন অন্ধকার থেকে আলো হাওয়ার রাজ্যে, এই অতল অন্তহীন জল থেকে স্থলভাগে যাওয়াই সব মানুষের সাধনার শেষ লক্ষ্য। কিন্তু মিসেস বোল্টনের সাধনা হলো এই মৎস্য-সুলভ জলজীবনের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া। উপরে উঠতে চায় না, শুধু নিচে তলিয়ে যেতে নেমে যেতে চায় মিসেস বোল্টন।

আমার ভয় হচ্ছে আমাদের শিকার রক্ষককে হয়ত হারাতে হবে। ব্যাপারটা কমার পরিবর্তে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যত পারছে মেলর্সের বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোলিয়ারির অন্য সব মেয়েদের হাত করেছে মেলর্সের স্ত্রী। সারা গ্রাম এখন এই সব কুৎসিত কথাবার্তায় মুখর।

আমি শুনলাম মেলর্সের স্ত্রী বার্থা কাউটস নাকি একদিন মেলর্সের মার বাড়ি আক্রমণ ও অবরোধ করে। বাড়ির ভিতর ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। ওদের মেয়েটা স্কুল থেকে তখন আসছিল। মেয়েটাকে তার মা নিতে যায়। কিন্তু মেয়েটা তার মার হাত কামড়ে দেয়। তখন তার মা তার গালে এক চড় বসিয়ে দেয় এবং মেয়েটা পথের উপর ঘুরে পড়ে যায়। তখন তার ঠাকুরমা কোনরকমে তাকে উদ্ধার করে।

মেলর্সের স্ত্রী অর্থাৎ বার্থা কাউটস নামে মেয়েটি কুৎসার এক বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। ওদের দাম্পত্য জীবনের এমন সব গোপন খুঁটিনাটির কথা বাইরে বলে বেড়াচ্ছে যা একমাত্র বিবাহিত নরনারীই জানে এবং যা

সাধারণতঃ এক নিরুচ্চার গোপনতার সলাজ গভীরে সযত্নে সমাহিত থাকে। দশ বছর পর আজ ওদের দাম্পত্য জীবনের গোপন কথাগুলো বলে বেড়াচ্ছে। আমি এসব কথা লিনলে এবং ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছি। এসব কথাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু নেই। তবু যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন অদ্ভুত অস্বাভাবিক ধরনের আসন বা ভঙ্গির প্রতি সব মানুষেরই একটা কৌতূহল থাকে। কোন লোক যদি যৌনক্রিয়ার সময় তার স্ত্রীর উপর এই সব অদ্ভুত আসন বা ভঙ্গি প্রয়োগ করে তাহলে সেটা তার রুচির কথা। কিন্তু আমাদের শিকার রক্ষককে এতদিন দেখে আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি যে ও এত সব কলাকৌশল জানে। যাই হোক, এটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে বাইরের কারো নাক গলাবার কোন অধিকার নেই।

আমার মত এ সব কথা সবাই শুনেছে। আজ দশ বারো বছর আগে সমাজে সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা শালীনতাবোধ ছিল। তখনকার দিনে এ রকম কোন ব্যাপার ঘটলে লোকে জোর করে ব্যাপারটার মধ্যে ছেদ টেনে দিত। জোর করে চেপে দিত সব। কিন্তু গাঁয়ের প্রতিটি ছেলে বুড়ো সকলেই এটা প্রকাশ্যে আলোচনা করছে। সকলেই মজা দেখে যাচ্ছে। আজকাল মনে হয় তেভারশাল গাঁয়ের প্রতিটি কুমারী মেয়েই এক একটা জোয়ান অফ আর্ক। কিন্তু মেলর্সকে দেখে মনে হয় ভয়ঙ্কর এক নরঘাতক।

কাজকর্মের ব্যাপারে মেলর্সের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকে দেখা করতে হয়েছিল। বনের সীমানা থেকে তার স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এমত অবস্থায় কিভাবে সে তার কাজকর্ম করে যাবে তা আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্য সে আগের মতই কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাকে যে যাই বলুক সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, এই ধরেনের একটা ভাব। তবু আমি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন এমনই একটা কুকুর যার লেজের সঙ্গে একটা খালি টিন বাঁধা আছে। ও অবশ্য সম্পূর্ণ মুক্ত এমনি একটা ভাব দেখায়। মেলর্স তেভারশাল গাঁয়ের ভিতর কোন কারণে একবার গেলেই ওর পিছনে যত সব গাঁয়ের ছেলেদের লেলিয়ে দেয় বার্থা। ওর অবস্থা এখন স্পেনের কাহিনীকাব্যের নায়ক ডন রোডারিগোর মত।

আমি একদিন মেলর্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার কাজকর্ম ঠিকমত করতে পারবে কি না। সে তার উত্তরে বলল সে কোনদিন তার কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে বলে মনে হয় না। আমি তখন বললাম তোমার বাসায় যখন তখন একটা মেয়ে আসবে এটা ঠিক নয়। সে তখন বলল, সে কোনক্রমেই মেয়েটাকে আটকাতে পারে না। আমি তখন তার বিরুদ্ধে যে সব কুৎসিত রটানো হয়েছে তার একটা আভাস বা ইংগিত দিলাম। ও তখন বলল, গাঁয়ের লোকেরা পরের নিন্দে শুনতে যেমন ভালবাসে পরের ভাল তেমন শুনতে বা সহ্য করতে পারে না।

তার কথাবলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। অবশ্য সে যা বলল তা সত্য।

কিন্তু সে যাই বলুক, তার বিরুদ্ধে প্রচারিত ব্যাপক লোকনিন্দার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। গাঁয়ের যাজক ও সব বিশিষ্ট লোকদের অভিমত এই যে মেলর্সের উচিত এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

আমি একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার বাসায় মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করত একথা ঠিক কি না। সে তখন আমাকে প্রশ্ন করল এ কথায় আপনার কি দরকার স্যার ক্লিফোর্ড?

সে আরো বলল, লোকে যদি বদনাম দেব মনে করে তাহলে আমার মেয়ে-কুকুর ফ্লসির নামেও বদনাম রটাতে পারে।

তার বেয়াদবি সত্যিই অসহ্য আমার পক্ষে।

আমি তাকে বললাম অন্য কোথাও একটা কাজ খুঁজে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে কি না। সে তখন বলল, আপনি যদি আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চান ত সহজেই সেটা পারেন।

অর্থাৎ চাকরি থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করল না মেলর্স। আমি তাকে বললাম, আমার ভূসম্পত্তির সীমানার মধ্যে কোন অপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দিতে চাই না আমি।

ঠিক হলো, সে পরের সপ্তার শেষের দিকে চলে যাবে এখান থেকে ওর চাকরি ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জো চেম্বারস নামে এক যুবককে ওর পদে বহাল করার ব্যাপারে রাজী হলো ও। আমি বললাম, ওকে আমি একমাসের মাইনে বাড়তি দেব। ও বলল, রেখে দিন, পরে ক্ষেত্রবিশেষে ও টাকার সদ্ব্যবহার করবেন।

আমি এ কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, সে কোন বাড়তি কাজ করেনি; সুতরাং বাড়তি মাইনের টাকা সে নিতে পারবে না।

যাই হোক, ব্যাপারটার এইখানেই নিষ্পত্তি হলো। মেয়েটা এখান থেকে চলে গেছে। সে তেভারশাল গাঁয়ে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। শোনা গেছে মেয়েটা নাকি জেলকে খুব ভয় করে। মেলর্স আগামী সপ্তার শনিবার চলে যাবে। সুতরাং আমাদের জায়গাটা আবার শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে কনি, প্রিয়তম আমার, যদি তোমার ভাল লাগে এবং যদি তুমি আগস্টের প্রথম পর্যন্ত ভেনিস অথবা সুইজারল্যাণ্ডে কাটাতে পার তাহলে খুব ভাল হয়। আমি তাহলে খুব খুশি হব। তাহলে তোমাকে এখানে এসে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার যত সব নোংরা কলঙ্কন আর শুনতে হবে না। সে কলঙ্কন এ মাসের শেষের দিকেই স্তব্ধ হয়ে যাবে একেবারে।

তাহলে তুমি বুঝতে পারছ, আমরা হচ্ছি সব গভীর জলের জলজ জন্তু। আমাদের মধ্যে এক একটা জন্তু মাঝে মাঝে যখন কাদা ঘেঁটে বেড়ায় তখন সকলের মাঝে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আমাদের তখন দার্শনিকের মত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে ব্যাপারটা উপেক্ষার চোখে দেখা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

ক্লিফোর্ডের চিঠিখানার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন রাগ ছিল আর ছিল সহানুভূতির এক শোচনীয় অভাব। কনি এর অর্থ ভাল করে বুঝতে পারল মেলর্সের কাছ থেকে আসা এক চিঠিতে। মেলর্স লিখেছে :

থলে থেকে অন্য বিড়ালদের সঙ্গে বিড়াল পালিয়ে গেছে। তুমি হয়তো শুনেছ আমার স্ত্রী বার্থা আমার কাছে ফিরে এসেছিল। কিন্তু কোন ভালবাসা আমার কাছে পায়নি। সে আমার বাসাতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখান থেকে সন্দেহের কিছু উপকরণ পায়। সে পায় একটা সেন্টের শিশি। সে আমার শোবার ঘরে আমাদের বিয়ের ছবি পোড়ানোর প্রমাণ পায়। এতে রেগে গিয়ে দারুণ হৈ চৈ করে বেড়ায়। ফটোর ভাঙ্গা কাঁচ দেখতে পায়। একদিন হঠাৎ সে কুঁড়েটাতে চলে যায়। ঘরটার মধ্যে সে তোমার একখানা বই পায়। তাতে তোমার নাম সই করা ছিল। প্রথম পাতাতেই লেখা ছিল কন্‌সট্যান্স স্টুয়ার্ট রীড। এর পর সে বলে বেড়াতে থাকে আমার প্রেমিকা লেডি চ্যাটার্লি ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে গাঁয়ের রেকটর আর স্যার ক্লিফোর্ডের কানে কথাটা যায়। তাঁরা তখন আইনসম্মত ব্যবস্থা নেন বার্থার বিরুদ্ধে। বার্থা পুলিশের ভয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্যার ক্লিফোর্ড এর পর ডেকে পাঠান আমাকে। আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি নানারকমের কথা বলতে থাকেন। তাঁর কথা শুনে বোঝা যায় তিনি আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। শেষে তিনি বললেন, আমার মনিবপত্নীর নামও জড়িয়ে পড়েছে এই কুৎসিত ঘটনার সঙ্গে একথা আমি জানি কিনা। আমি বললাম, আমার ঘরে একটা ক্যালেণ্ডারে রাণী মেরীর ছবি আছে। তাহলে কি বলতে হবে রাণী মেরী আমার অঙ্কশায়িনী হয়েছেন? আমার বক্রোক্তির অর্থ উনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি নাকি আমার প্যান্টের বোতাম খুলে সব সময় বেড়াচ্ছি। আমি তখন তাঁকে শুনিয়ে দিলাম তার বোতাম খোলার মত কিছু নেই। এজন্য তিনি আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। আমি এখান থেকে চিরদিনের মত তাই আগামী শনিবার চলে যাচ্ছি। আর কখনো এ মুখে আসব না আমি।

আমি আপাততঃ লণ্ডন যাচ্ছি। আমার বাড়িওয়ালী হলেন মিসেস ইঙ্গার। ঠিকানা ১৭ কোনবার্গ স্কোয়ার। তিনি আমায় একটা ঘর দেবেন তাঁর বাড়িতে অথবা যোগাড় করে দেবেন অন্য কোথাও।

তোমার পাপকর্ম একদিন প্রকাশিত হবেই। বিশেষ করে তুমি যদি

আমায় বিয়ে করো। মনে রেখো তার নাম বার্থা।

এত কথা লিখলেও মেলর্স কিন্তু কনি সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি। এতে রাগ হলো কনির। সে কিছু সান্ত্বনা বা আশ্বাসের কথা লিখতে পারত। তা না করে সে আমায় মুক্তি দিয়েছে আমি যাতে আমার ইচ্ছামত র‍্যাগবিতে ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে যেতে পারি। এতে রাগ হলো কনির। এত উদারতা ও বীরত্ব দেখাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কনি চায় সে ক্লিফোর্ডের মুখের উপর বলতে পারত, হ্যাঁ আমি তাকে ভালবাসি। সে আমার প্রেমিকা এবং এতে আমি গর্বিত। কিন্তু তার সাহস এতদূর এগোতে পারেনি।

তাহলে তার নামও তেভারশালের বস্তীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ভুলে যাবে সব।

কনি খুব রেগে গেল। এক জটিল ক্রোধজালে মনটা তার এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল যে কোন কাজ করতে ইচ্ছা হলো না। বিকল হয়ে উঠল তার সমস্ত দেহমন। কি করবে কি বলবে কিছুই খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল হতবুদ্ধি হয়ে। তবে ডানকান ফোর্বেকে নিয়ে ভেনিসের লবণহ্রদে গিয়ে স্নান করল। গল্প করে ও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা কাটিয়ে দিল। ডানকান আজ হতে দশ বছর আগে একবার ভালবেসেছিল তাকে। দুজনের মধ্যে তখন ভালবাসা হয়। পরে ছাড়াছাড়ি হয়। দীর্ঘ দশ বছর দেখা নেই। পরে আবার দেখা। আবার ভালবাসা শুরু করল ডানকান। কিন্তু কনি বলল সে পুরুষদের কাছ থেকে একটা জিনিসই চায়। তা হলো তাদের কাছ থেকে দূরে একা একা থাকতে। ডানকানও কোনরকম জোর করল না। এমন আলতো হালকাভাবে কনিকে ভালবেসে যেতে লাগল সে যাতে কোন-রূপ বিব্রতবোধ না করে কনি।

একদিন ডানকান কনিকে বলল, জান সব মানুষ কত বড় উদাসীন। কেউ কারো কোন খবর রাখে না। তোমরা ড্যানিয়েলকে দেখছ। দেখতে কত সুন্দর ও। কিন্তু তোমরা কেউ জান না ও বিবাহিত এবং ওর ছেলে পরিবার আছে।

কনি বলল, ওকে শুধিয়ে দেখ।

ডানকান তাকে জিজ্ঞাসা করলে ড্যানিয়েল বলল, সে বিবাহিত। বাড়িতে তার স্ত্রী আর দুটি পুত্রসন্তান আছে। একটির বয়স নয় আর একটির বয়স সাত। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই।

কনি বলল, যাঁরা একা একা থাকতে ভালবাসে, যারা আত্মস্থ তারাই মানুষকে ভালবাসতে পারে, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে। বেশীর ভাগ লোকই জিওভানির মত নরনারীর কাছে কাছে থাকতে ভালবাসে। কনি মনে মনে ডানকানকেও জিওভানির দলে টানল।

অধ্যায় ১৮

কনিকে মনস্থির করে ফেলতেই হলো অবশেষে। সব ঠিক করে ফেলল কনি। আর দিন ছয় পরে সে ভেনিস ছেড়ে চলে যাবে। ও যেদিন ভেনিস ছাড়বে সেইদিন অর্থাৎ শনিবার মেলর্স র‍্যাগবি ছেড়ে চলে যাবে। এর পর সোমবার লণ্ডনে পৌঁছবে সে। তারপর মেলর্সের সঙ্গে তার দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবে। মেলর্সকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল সে যেন হার্টল্যাণ্ড হোটেলে এ চিঠির উত্তর পাঠায় এবং সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় তার সঙ্গে দেখা করে।

এসব কথা লিখে চিঠি দিলেও মনের ভিতরের রাগটা তখনো যায়নি কনির। সে হিলদাকে বিশ্বাস করে কোন কথা বলল না। তার সঙ্গে কনি ভাল করে কথা না বলায় হিলদা এখন অন্য এক ওলন্দাজ মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করছে। মেয়েতে মেয়েতে এই ধরনের মেলামেশা পছন্দ করে না কনি। কিন্তু হিলদা ভালবাসে এই সব।

স্যার ম্যালকম কনির সঙ্গে যেতে চাইলেন। ডানকান যাবে হিলদার সঙ্গে। ডানকান ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে আসন সংরক্ষণ করল। কনির তা ইচ্ছা ছিল না। তবু এতে তাড়াতাড়ি প্যারিস যাওয়া যাবে।

স্যার ম্যালকম কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবার সময় একটা অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বাইরেই ভাল থাকেন। প্রথম স্ত্রীর আমল থেকেই তিনি তাঁর এই স্বভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে এক শিকারের আয়োজন করা হয়েছে। তাই শিকারে তাঁর কৃতিত্ব দেখানোর জন্য তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে।

সেদিন কনি তার রোদেপোড়া সুন্দর মুখখানা নিয়ে নীরবে বসে ছিল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে কোন হুঁস ছিল না তার।

কনির মনমরা ভাব দেখে তার বাবা বললেন, র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বোধহয় কিছুটা?

তার বাবার চোখে চোখ রেখে তার বাবাকে চমকে দিয়ে কনি হঠাৎ বলে উঠল, আমি র‍্যাগবিতে ফিরে যাব কিনা তারই ঠিক নেই।

তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে এই ধরনের এক বিপন্ন ভাব দেখা দিল স্যার ম্যালকমের মুখের উপর।

স্যার ম্যালকম বললেন, তুমি কি বলতে চাও প্যারিসে কিছুদিন থেকে যাবে?

না, আমি বলতে চাই আমি আর কখনই র‍্যাগবিতে ফিরে যাব না।

স্যার ম্যালকম সব সময় নিজের ব্যক্তিজীবন নিয়ে জর্জরিত। তাই তিনি

নতুন করে কনির কোন সমস্যা ঘাড়ে নিতে চাইছিলেন না। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত কেন নিলে ?

আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি।

এই প্রথম একথা এক জীবন্ত মানুষের সামনে উচ্চারণ করল কনি। একথা ঘোষণা যেন তার জীবনের এক বিচ্ছেদকে সূচিত করছে।

তার বাবা বললেন, কেমন করে বুঝলে ?

কনি মৃদু হেসে বলল, কেমন করে আবার বুঝব ?

তবে ক্লিফোর্ডের ঔরসজাত সন্তান নয় নিশ্চয়।

না, অন্য লোকের।

তার বাবাকে বিব্রত করে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছিল কনি।

স্যার ম্যালকম বললেন, লোকটার পরিচয় জানতে পারি কি ?

না, তুমি তাকে চিনবে না। কখনো দেখনি তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

তোমার পরিকল্পনা কি তাহলে ? কি করতে চাও তুমি ?

তা জানি না। সেইটাই হলো সমস্যা।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না তুমি ?

কনি বলল, ক্লিফোর্ড এ সন্তানকে গ্রহণ করবে। সে আমাকে এর আগে বলেছিল আমি যদি সুবিবেচনা সহকারে কারো সন্তান গ্রহণ করি তাহলে সে কিছু মনে করবে না।

এমন অবস্থায় সে মানুষের মতই কথা বলেছে। আমার মনে হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ত কোন সমস্যাই নেই।

কনি বলল, কোন দিক থেকে কোন সমস্যা নেই ?

কনি তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মতই তার বাবার চোখদুটো নীল ; কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক ভাসা ভাসা অস্বস্তি।

সে দৃষ্টির অস্বস্তি কখনো কোন দুরন্ত বালকের মত চঞ্চল, আবার কখনো অতৃপ্ত স্বার্থের এক অবদমিত ক্রোধাবেগে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা শান্ত মনে হচ্ছিল।

স্যার ম্যালকম বললেন, তুমি ক্লিফোর্ড ও চ্যাটার্লি পরিবারকে এক উত্তরাধিকারী উপহার দিতে পার। উপহার দিতে পার এক ছোট্ট ব্যারণ।

স্যার ম্যালকম একটুখানি হাসলেন। তাঁর সে হাসিতে কিছুটা ছিল এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসিকতার ভাব।

কনি জবাব দিল, আমি তা চাই বলে মনে হয় না।

ক্লিফোর্ডের প্রতি এক টান অনুভব করে স্যার ম্যালকম বললেন, কেন নয় ? এ বিষয়ে আমার আসল কথাটা হলো এই যে জগৎ চিরকাল এগিয়ে চলবে। র‍্যাগবিও দাঁড়িয়ে থাকবে। বাইরের দিক থেকে এই জগৎ সংসার একেবারে

স্থির। তার সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়। বাইরের সব কিছুই স্থির থাকে ; পরিবর্তন হয় শুধু আমাদের আবেগ আর অনুভূতির। তুমি এ বছর একজনকে পছন্দ করতে পার, আবার পরের বছর আর একজনকে। কিন্তু র‍্যাগবি ঠিক অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। র‍্যাগবি তোমাকে যতখানি চাইবে তুমিও র‍্যাগবিকে ততখানি চাইবে। তারপর বাইরে তুমি আনন্দ করে বেড়াতে পার। কিন্তু তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে কোন লাভই হবে না তোমার। অবশ্য ইচ্ছা করলেই তুমি সব ছিন্ন করে দিতে পার। তোমার নিজস্ব আয় আছে যাতে তোমার সারাজীবন ভালভাবেই চলে যাবে। কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে র‍্যাগবিকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। দেখবে তাতে আনন্দ আছে।

কথাগুলো বলে স্যার ম্যালকম আবার হাসলেন। কনি কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্যার ম্যালকম বললেন, অবশেষে তাহলে তুমি এক প্রকৃত মানুষ খুঁজে পেয়েছ।

কনি বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। সেইখানেই সমস্যা। এ রকম লোক বেশী পাওয়া যায় না। চিন্তান্বিতভাবে স্যার ম্যালকম বললেন, না, সত্যিই তা নেই। তবে সে সত্যিই ভাগ্যবান তোমার দিক থেকে দেখতে গেলে। নিশ্চয় সে তোমাকে কোন কষ্ট দেবে না।

না, মোটেই না। সে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই চলতে দেয়।

ভাল, ভাল, খুব ভাল। যে মানুষের মত মানুষ হবে সে অবশ্যই তা করবে।

একথা শুনে খুশি হলেন স্যার ম্যালকম। কনি তাঁর বেশী প্রিয়। তার মধ্যে নারীসত্তার যে ধাতু তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর একান্ত মনোমত ; হিলদা হয়েছে অনেকটা তার মার মত। ক্লিফোর্ডের তা কখনই পছন্দ হত না। সুতরাং খুশি হলেন স্যার ম্যালকম। তাঁর প্রিয় কন্যার সন্তানসম্ভাবনায় সুখী হলেন তিনি বিশেষভাবে।

কনিকে নিয়ে তিনি মোটরে করে হার্টল্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে উঠলেন। কনি সেখানে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলে স্যার ম্যালকম তাঁর ক্লাবে চলে গেলেন সন্ধ্যের সময়। কনি তাঁর সঙ্গে গেল না।

মেলর্সের একখানা চিঠি পেল কনি। সে লিখেছে, আমি তোমার হোটেলে যাব না। তবে ঠিক সাতটায় এ্যাডাম স্ট্রীটের গোল্ডেন ককে অপেক্ষা করব।

কালো রঙের একটা প্যাণ্ট পরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল মেলর্স। তাকে বেশ লম্বা আর রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। কনি দেখল, মেলর্সকে ঠিক তাদের সমাজের লোকদের মত অতটা মার্জিত না দেখালেও তার একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব আছে যেটাকে তাদের সমাজের লোকদের থেকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।

মেলর্স বলল, তাহলে তুমি এসেছ। তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে!

হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তা দেখাচ্ছে না।

কনি উদ্বেগের সঙ্গে মেলর্সের মুখপানে তাকাল। তার মুখখানা আগের থেকে কত রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। তার মুখের হাড় চোয়াল বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল এক মিষ্টি হাসি যা দেখে আশ্বস্ত হলো কনি। নিজের চেহারাটাকে লোভনীয় করে তোলার জন্য আর কোন চেষ্টা করতে হবে না তাকে। মেলর্সের দেহটাকে যতই দেখতে লাগল কনি ততই মনের ভিতর একটা আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগল। নারীমনের সহজ স্বাভাবিক সুখপিপাসা তৃপ্ত হওয়ায় মনে মনে বলে উঠল কনি, 'ও যতক্ষণ আমার কাছে থাকে আমি বেশ সুখে থাকি।' তার মনে হলো সুন্দরী সমুদ্রবর্তিনী ভেনিসের পর্যাপ্ত সূর্যালোক তার সারা অন্তর জুড়ে ঢেউ খেলে যাওয়া এই তৃপ্তি আর আনন্দকে এতখানি প্রসারতা দান করতে পারেনি।

একটা টেবিলের দুদিকে দুজনে বসেছিল। কনি জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি খুব খারাপ লাগছিল?

মেলর্সকে সত্যিই রোগা দেখাচ্ছিল। তার হাতদুটো আলগাভাবে ছড়ানো ছিল দুপাশে ঠিক ঘুমন্ত লোকের মত। হাতদুটো টেনে নিয়ে চুম্বন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কনির। কিন্তু সাহস পেল না তা করতে।

মেলর্স বলল, সাধারণ লোক সব সময়ই ভয়ঙ্কর।

তোমার মনে কি খুব কষ্ট হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল এবং একথা মনে পড়লেই চিরকাল কষ্ট হবে আমার।

কনি বলল, তোমার অবস্থাটা কি লেজে টিনবাঁধা কুকুরের মত হয়েছিল? ক্লিফোর্ড তোমাকে ত তাই বলেছিল?

মেলর্স বিরক্তির সঙ্গে কনির পানে তাকাল। কনির একথাটা নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার অহংবোধে আঘাত লাগে।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই হয়েছিল।

মোটেই কোন অপমান সইতে পারে না মেলর্স। কোন অপমানের আঘাত পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাগে আগুন হয়ে ওঠে। এক তিক্ততার জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকল। তারপর কনি বলল, তুমি আমার অভাবটা অনুভব করেছিলে?

তুমি তখন ওখানে না থাকায় আমি খুশিই হয়েছিলাম।

আবার চুপ হয়ে গেল দুজনে। কনি বলল, তোমার আমার এই সম্পর্কের কথাটা কি লোকে বিশ্বাস করে?

আমার ত তা মনে হয় না।

ক্লিফোর্ড তা বিশ্বাস করে?

আমি জানি না। ক্লিফোর্ড এ বিষয়ে ভাল করে চিন্তাভাবনা না করেই আমাকে ছাড়িয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয়। সে দেখতে চায় এ বিষয়ে আমি শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াই।

আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি।

সহসা মেলর্সের মুখ থেকে সব আলো মুছে গেল নিঃশেষে। সব অন্ধকার হয়ে উঠল সহসা। আর তার সেই অন্ধকার মুখখানা নিয়ে এমনভাবে তাকাল কনির দিকে যে কনি তার চোখের দৃষ্টির কোন অর্থ খুঁজে পেল না।

কনি মেলর্সের হাতদুটোর খোঁজ করতে করতে অনুনয়ের সুরে বলল, বল তুমি খুশি হয়েছ?

কনি দেখল প্রকৃত আনন্দের একটা তরল আবেগ ফুটে উঠল মেলর্সের মুখের উপর। কিন্তু সে আবেগের অভিব্যক্তি কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন। এক দুর্বোধ্য জাল দিয়ে ঢাকা। কনি কিছুতেই তা ভেদ করতে পারছিল না।

মেলর্স বলল, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছি।

কনি আবার বলল, কিন্তু তুমি কি খুশি নও? বল।

আমি ভবিষ্যৎকে কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

কনি বলল, কিন্তু তোমাকে কোন দায়িত্বের কথা ভাবতে হবে না। ক্লিফোর্ড সে সন্তানকে গ্রহণ করবে নিজের সন্তান বলে।

মেলর্সের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল একেবারে। সে কোন কথা বলল না।

কনি বলল, আমি কি ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এক ক্ষুদ্র সামন্ত সন্তান দান করব?

তেমনি ম্লান মুখে কনির পানে তাকাল মেলর্স। তার সেই ম্লান মুখের উপর ফুটে ওঠা একটুকরো ক্ষীণ হাসিটাকে কুৎসিত দেখাচ্ছিল। মেলর্স বলল, তুমি কিন্তু সেখানে গিয়ে এ সন্তানের পিতা কে তা কিছু বলবে না।

আমি সেকথা তাকে বললেও এ সন্তান সে গ্রহণ করবে।

মেলর্স নীরবে কি ভাবতে লাগল। শেষে বলল, হ্যাঁ, গ্রহণ করবে।

আবার নীরবতার এক জমাট ব্যবধান বিরাজ করতে লাগল দুজনের মাঝখানে।

কনি বলল, কিন্তু আমি র‍্যাগবিতে থাকতে যাব না নিশ্চয়।

তাহলে কি করতে চাও তুমি? মেলর্স বলল।

কনি সহজভাবে বলল, আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন একটা আগুনের শিখা মেলর্সের পেটের ভিতর ঢুকে গেল। তার মাথাটা ঢলে পড়ল। কনির পানে বারবার তাকাতে লাগল মেলর্স।

মেলর্স বলল, তোমার এতে ইচ্ছা থাকলেও আমার ত কোন সংস্থান নেই।

কনি বলল, তোমার যা আছে তা অনেক লোকের নেই।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, একদিক দিয়ে। আমি তা জানি।

কিছুক্ষণ ভেবে মেলর্স আবার বলতে লাগল, লোকে বলে আমি নাকি মেয়েদের মত। কারণ আমি গুলি করে পাখি মারতে পারি না, কারণ আমি টাকা রোজগার করতে পারি না। আমি অবশ্য যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি সেখানকার লোকদের ভালবাসতাম, তারাও আমাকে ভালবাসত। আমি কিন্তু আজকালকার সমাজের লোকদের মোটেই দেখতে পারি না। এই শ্রেণীবৈষম্য, টাকা রোজগারের এই ব্যাপারটাকে একেবারে বোকামি বলে মনে হয়। এই হলো জগতের রীতি। কিন্তু আমি মেয়েদের কি দেব? আমার ত কিছুই নেই দেবার মত।

কনি বলল, কিন্তু দেবার কথা কেন ভাবছ? এটা ত দর-কষাকষির কথা নয়। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি—এটাই যথেষ্ট।

মেলর্স বলল, না না জীবন মানেই গতি। বাঁচা মানেই এগিয়ে চলা। আমি তা পারি না বলেই পুরনো টিকিটের মতই আমি অচল। সুতরাং আমি কোন নারীকে আমার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। যতদিন না আমি কোথাও না কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি, যতদিন না আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠি ততদিন কোন নারীকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। নিজের জীবনকে কোন দিকে অর্থময় করে না তুলতে পারলে কোন পুরুষ কোন নারীকে কিছুই দিতে পারে না। নারী যদি সত্যিকারের নারী হয় তাহলে তাকে নিয়ে মনে প্রাণে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা যায় না। পুরুষরা যেমন নারীদের রক্ষিতা রাখে তেমনি আমি তোমার কাছে রক্ষিতার মত থাকতে পারি না।

কনি বলল, কেন নয়?

কেন আবার, আমি তা পারব না এবং তুমিও অল্পকাল পরে ঘৃণা করবে।

কনি বলল, মনে হয় তুমি ঠিক আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।

মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে মেলর্স বলল, তোমার টাকা, তোমার পদ-মর্যাদা; সুতরাং সব সিদ্ধান্ত তুমিই গ্রহণ করবে। আমি শুধু তোমার কাছে শোব।

এছাড়া আর কি হতে বা করতে চাও তুমি?

তুমি অবশ্য তা বলতে পার। কিন্তু আমি কিছু একটা হতে চাই। আমার অস্তিত্বের যা হোক একটা মানে বুঝে নিতে চাই যদিও আমি বেশ জানি অস্তিত্বের এই অর্থ কেউ বুঝতে চায় না।

আমার সঙ্গে বাস করলে তোমার অস্তিত্বের মানে কি কমে যাবে?

একটু থেমে মেলর্স বলল, হতে পারে।

কনিও ভাবতে লাগল তারপর বলল, তোমার অস্তিত্বের মানেটা কি শুনি?

আমি তোমাকে আগেও বলেছি, সে মানে অদৃশ্য। আসল কথা আমি এই জগৎ আর তার অগ্রগতি, মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে মোটেই বিশ্বাস করি

না। অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি না। মানবজাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে সবকিছুর মধ্যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন আনতে হবে।

কিন্তু সেই ভবিষ্যতের রূপটা কি হবে?

ঈশ্বর তা জানেন। আমার মনের মধ্যে এক প্রবল রাগের সঙ্গে মেশানো একটা অনুভূতি শুধু আঁকপাঁক করে বুঝতে পারি। কিন্তু সেটা কি তা বুঝতে পারি না।

কনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তা বলব? তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা অন্য সব পুরুষের মধ্যে নেই। আমার মতে এইটাই এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমি তা বলব?

বল, কি তা।

তা হলো তোমার আসক্তির নিবিড়তার একটা সাহস। তুমি যেভাবে যত সাহসের সঙ্গে ও স্বাভাবিকভাবে হাত দাও তা সত্যিই বিরল।

মেলর্সের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, তাই নাকি?

তারপর সে আবার বসে ভাবতে লাগল। কিছু পরে বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। যাকে বল পরস্পরের সঙ্গে গায়ে গায়ে মাখামাখি। এর মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠবে। আসক্তি ও মমতা গড়ে উঠবে। যৌন ব্যাপারটা হলো দেহগত স্পর্শের নিবিড়তা। এই নিবিড়তাই আমাদের জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু এই নিবিড়তা আমাদের আজকাল নেই বলেই আমরা যেন অর্ধচেতন ও অর্ধমৃত হয়ে আছি। আমাদের ইংরাজ জাতির এই গুণটা বেশী থাকা দরকার।

কনি তার দিকে তাকাল। বলল, তবে কেন আমাকে ভয় পাও তুমি?

ভয় পাই টাকা, পদমর্যাদা আর তোমাদের সমাজকে।

কনি বলল, কিন্তু আমার মধ্যে কি কোন মমতা বা ভালবাসা নেই?

কালো কালো চোখগুলো তুলে মেলর্স বলল, হ্যাঁ আছে বটে, কিন্তু আমারই মত আসে আর যায়। সব সময় স্থির থাকে না।

কনি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, কিন্তু তুমি আমার সে মমতায় বিশ্বাস কর না?

কনি দেখল মেলর্সের মুখে আর সেই প্রেমাসক্তির ভাবটা নেই। সে বলল, হয়ত করি।

তারা দুজনেই চুপ করল। কনি বলল, আমি চাই তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, আমাকে চুম্বন করে বল আমাদের সন্তান আসায় তুমি খুশি।

কনিকে দেখতে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে মেলর্সের পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব শিউরে উঠল। সে বলল, চল আমরা আমার ঘরে যাই। যদিও এখানে কুৎসার ভয় আছে।

কনি দেখল মেলর্সের মুখে আবার সেই আগেকার প্রেমাসক্তির ভাবটা ফুটে উঠেছে। সে আবার জগতের সব কথা ভুলে গেছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে

কোবার্গ স্কোয়ারে চলে গেল। সেখানে একটা বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় মেলর্স একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে সে নিজের হাতে রান্না করে খেত। ঘরটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কনি প্রথমে তার পোষাকটা খুলে ফেলল। তারপর মেলর্সকেও খুলতে বলল। প্রথম মাতৃত্বের আবির্ভাবে বেশ নরম ও নধর হয়ে উঠেছে কনির দেহটা। বেশ একটা পূর্ণতা লাভ করেছে।

মেলর্স বলল, আমি চাই তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি চলে যাও।

কনি বলল, না, না ও কথা বলো না। আমাকে তুমি চিরদিন ভালবেসে যাবে। আমাকে তুমি তোমার কাছে রেখে দেবে। আমাকে কোথাও যেতে দেবে না।

কনি মেলর্সের নগ্ন ও শক্ত দেহটার গা ঘেঁষে ঘন হয়ে উঠল। তার মনে হলো, সারা পৃথিবীর মধ্যে এইটাই হলো তার আসল ঘর। মেলর্সের বুকটাই হলো তার জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

কনিকে দু হাত দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে বলল মেলর্স, হ্যাঁ, আমি তোমাকে রেখে দেব। আমার কাছে রেখে দেব।

কনি আবার সেই কথাটা বলল, বল সন্তান আসায় তুমি খুশি। আমার পেটটার উপর চুম্বন করো।

কিন্তু মেলর্সের পক্ষে এ কাজটা সত্যিই কঠিন। সে বলল, কোন সন্তানকে আমি পৃথিবীতে আনতে চাই না, কারণ তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।

কিন্তু তুমি আমার মধ্যে সন্তান উৎপাদন করেছ। তার প্রতি তোমার মমতা দেখাও। এই মমতা বা স্নেহই হবে তার ভবিষ্যৎ। চুম্বন করো।

মেলর্স কেঁপে উঠল। কনির কথাটাই সত্যি। কনি ঠিকই বলেছে, ওর প্রতি একটু মমতা দেখাও, এই মমতাই ওর ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবে।—মুহূর্ত মধ্যে কনির প্রতি এক গভীর প্রেমাসক্তি অনুভব করল মেলর্স। সঙ্গে সঙ্গে কনির পেটটাকে চুম্বন করল। তার স্তনযুগল থেকে শুরু করে তলপেট পর্যন্ত সব চুম্বন করে গেল।

কনির মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, আমাকে ভালবাস, আমাকে ভালবাস তুমি। মেলর্স অনুভব করল তার জঠরাভ্যন্তর থেকে একটা মমতা আর আসক্তির স্রোত বেরিয়ে এসে কনির জঠরাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

কনির সঙ্গে সঙ্গমকালে মেলর্স বুঝতে পারল এ সঙ্গমের প্রয়োজন ছিল। তার আত্মমর্যাদাবোধ বা ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না করে এই দেহগত স্পর্শের এই নিবিড়তম অভিজ্ঞতার দরকার ছিল। মেলর্সের হঠাৎ মনে হলো, তার টাকা নেই, পদমর্যাদা নেই, বিষয়সম্পত্তি কিছু নেই, কিন্তু তা না থাক, তার মমতা আছে ভালবাসা আছে আর আছে প্রবল আত্মাভিমান।

কনি যদি কখনো তাকে কোন ক্ষেত্রে অপমান করে আত্মাভিমানে আঘাত দেয় তাহলে সেও সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে তার সব মমতা ভালবাসা প্রত্যাহার করে নেবে। এইভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক দেহগত স্পর্শ আর ভালবাসার প্রতীক হিসাবে কনির সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে বজায় রেখে যাবে। এ বিষয়ে কনি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার সহধর্মিণী। এইভাবে সে আধুনিক জগৎ আর যন্ত্রসভ্যতাজনিত যত সব বাঁদরামি আর অর্থহীন লোলুপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। আর কনি তাকে তার পিছন থেকে তার সহায়তা করে যাবে। হে ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, এতদিনে আমি মনের মত এমন এক নারী পেয়েছি যে আমাকে ভালবাসে, যে আমাকে বোঝে। মেলর্সের মনে হলো তার নিম্নাঙ্গ হতে স্খলিত বীর্য কনির গর্ভদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র অন্তরাত্মাও যেন অনুপ্রবিষ্ট হলো তার মধ্যে। এ সঙ্গম যেন এক সাধারণ প্রজননক্রিয়া নয়, এ সঙ্গম হলো তার থেকে অনেক বড় সৃষ্টিশীল দুটি প্রাণপ্রবাহের মিলন।

কনিও এবার আরো দৃঢ়ভাবে সংকল্প করে বলল, তাদের মধ্যে যেন কোন ছাড়াছাড়ি না হয়। এখন শুধু কিভাবে কোথায় বাস করবে এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলো কি হবে সেটা শুধু ঠিক করতে হবে।

কনি একবার তাকে প্রশ্ন করল, তুমি বার্থা কাউটস্‌কে ঘৃণা করো ?

তার কথা তুমি আমার কাছে বলো না।

কনি বলল, হ্যাঁ, বলতে হবেবৈকি। কারণ একদিন তুমি তাকে পছন্দ করতে। তাকে ভালবাসতে। আজ আমার সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছ তেমনি একদিন তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছিলে। সুতরাং আমাকে বলতে হবে তোমায় একদিন এত ভালবাসার পর আজ কেন তাকে এত ঘৃণা করতে হচ্ছে। কেন এমন হলো ?

আমি ঠিক জানি না। সে সব সময় আমার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছার ধ্বজা উড়িয়ে চলত। তার ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা আর তার অপব্যবহারের ফলেই সে স্বৈরিণী হয়ে ওঠে।

কনি বলল, কিন্তু সে তোমার থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। সে কি তোমাকে এখনো ভালবাসে ?

মোটেই না। সে যদি আমার কাছ থেকে এখনো মুক্ত হতে না চায় তাহলে বুঝতে হবে সে আমার উপর রাগে উন্মাদ হয়ে আছে এবং যে কোনভাবে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসতেও পারে।

না না, সে আমাকে কোন মুহূর্তে ভালবাসত না। ভালবাসা দিতে না দিতে সে ফিরিয়ে নিত। সে আমাকে ঘৃণা করত। তার গভীরতম বাসনা ছিল আমাকে ঘৃণা করা, আমাকে কষ্ট দেওয়া। তার সে ভয়ঙ্কর বাসনা প্রথম

থেকেই ভুল পথে চলেছিল।

কিন্তু এমনও হতে পারে তোমার ভালবাসা চেয়েছিল; কিন্তু তোমার ভালবাসা না পেয়ে সেই ভালবাসায় তোমাকে বাধ্য করতে চায়।

ওঃ, সে কি ভয়ঙ্কর কাজ।

কিন্তু তুমি ত সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসতে না। এ বিষয়ে তুমি তার প্রতি অন্যায় করেছ।

কেমন করে আমি অন্যায় করলাম? আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সে-ই নিজেকে ছিনিয়ে নেয় আমার সে ভালবাসা থেকে। তার কথা আর বলো না। সত্যিই সে অভিশপ্ত মেয়ে। শেষবার যখন সে আমার কাছে আসে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে যেন গুলি করে মেরে ফেলি। কোন নারীর ভ্রান্ত উন্মত্ত ইচ্ছাশক্তি যখন আপন উগ্রতায় সব কিছুকে তুচ্ছতায় ভাসিয়ে বা উড়িয়ে দিতে চায় তখন সে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তখন তাকে গুলি করে হত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু পুরুষরাও যখন ঐ ধরনের ইচ্ছাশক্তির উগ্রতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে তাহলে তাদেরও কি হত্যা করতে হবে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু তার থেকে আমাকে আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি করতে হবে। তা না হলে সে আবার আসতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদ করতেই হবে। সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমরা যেন একসঙ্গে রাস্তায় ঘোরাফেরা না করি। সে যদি সত্যি সত্যিই কোনদিন তোমার আমার মাঝে এসে পড়ে তাহলে আমি তা সহ্য করতে পারব না।

কনি এ বিষয়ে ভাবতে লাগল।

কনি বলল, তাহলে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না?

ছ মাস বা আরো কিছু কালের জন্য। আমার মনে হয় আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ সেপ্টেম্বরেই হয়ে যাবে। তাহলে মার্চ মাস পর্যন্ত আলাদা থাকতে হবে।

কিন্তু আমাদের সন্তানের জন্ম হবে খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারিতে।

মেলর্স চুপ করে রইল। তারপর বলল, ক্লিফোর্ড আর বার্থা যদি মরে যেত তাহলে সব জ্বালা চুকে যেত।

কিন্তু তাদের প্রতি এটা তোমার মমতার চিহ্ন নয়।

তাদের প্রতি মমতা? তাদের প্রতি সবচেয়ে মমতা বা ভালবাসার কাজ হলো তাদের মৃত্যুদান করা। তাদের আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। তারা শুধু জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। একমাত্র মৃত্যুই তাদের ও আমাদের শান্তি হতে পারে।

কনি বলল, কিন্তু তুমি এ কাজ করবে না আশা করি।

হ্যাঁ করব। এ কাজ আমি এক পশু হত্যা করার মতই করে ফেলব।

কোন কুণ্ঠাবোধ করব না। আমি ওদের গুলি করে মারব।

আমার মনে হয় এ কাজে তুমি হয়ত সাহস পাও না।

ভালভাবেই সাহস পাই।

কনিকে এখন অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। মেলর্স এখন বার্থার কাছ থেকে চিরদিনের মত মুক্ত হতে চায়। কনির মনে হলো সে ঠিকই করছে। বার্থার শেষ আক্রমণের ঘটনাটা বড়ই দুঃখজনক। মেলর্সকে মুক্ত হতেই হবে তার হাত থেকে। তার মানে কনিকে একা থাকতে হবে আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত। এই অবসরে সেও ক্লিফোর্ডের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা সেরে নিতে পারবে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? মেলর্সের নাম করলে তার বিবাহবিচ্ছেদ কোন কালেই হবে না। কি ঘৃণ্য ব্যাপার। তার থেকে যদি পৃথিবীর দূর প্রান্তে কোন জায়গায় চলে যাওয়া যায়?

কিন্তু তাও বোধ হয় সম্ভব নয়। আজকাল চেয়ারিং ক্রস থেকে পৃথিবীর যে কোন দূর প্রান্ত পাঁচ মিনিটের পথ নয়। যতক্ষণ বেতার থাকবে পৃথিবীতে দূর বলে কোন কিছু থাকবে না। আজকাল তাহোমির রাজা বা তিব্বতের লামা লাওস বা নিউ ইয়র্কের কথা শোনে।

থাম, থাম, ধৈর্য ধরো। এখন সারা জগৎ জুড়ে আছে যন্ত্রের জাল পাতা। সেই জাল থেকে মানুষ সহজে মুক্তি পেতে পারে না।

কনি এবার তার বাবাকে বিশ্বাস করে কথাটা খুলে বলল। সে বলল, বুঝলে বাবা, আমার সেই লোকটি হলো ক্লিফোর্ডের শিকার রক্ষক। কিন্তু সে একদিন ভারতে নিযুক্ত এক সামরিক অফিসার ছিল। ফ্লোরেন্স নামে একজন কর্ণেলের দয়াতেই সে অফিসার হয়।

স্যার ম্যালকম কিন্তু ফ্লোরেন্স নামে সেই কর্ণেলের দয়াদাক্ষিণ্যের মধ্যে কোন অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পেলেন না। ব্যাপারটা কেমন দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালি মনে হলো তাঁর। তিনি বরং দেখলেন, বিনয়ের অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন আত্ম-প্রচার এবং সেখানে আত্ম অহঙ্কারই বেশী।

স্যার ম্যালকম বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই শিকার রক্ষকের জন্ম হয় কোথায়?

সে হচ্ছে তেভারশাল গাঁয়ের এক খনিশ্রমিকের সন্তান। তবে তাকে এখন যে কোন উঁচু সমাজে নিয়ে যাওয়া যায়।

নাইট স্যার ম্যালকম আরো রেগে গেলেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি এক সোনার খনি আর লোকটা সেই খনি থেকে সোনা তুলে এনেছে।

কনি বলল, না বাবা, তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। একজন সত্যিকারের মানুষ। সে নত না হওয়ার জন্য ক্লিফোর্ড তাকে সব সময় ঘৃণা করত।

কিন্তু ক্লিফোর্ড একদিন নিশ্চয় ভাল চোখে দেখত তাকে।

আসলে স্যার ম্যালকমের ভয়টা ছিল কুৎসা আর লোকনিন্দার জন্য। তাঁর মেয়ে শিকার রক্ষককে যদি গোপনে ভালবাসত, যদি সেটা জানাজানি না হত তাহলে তাতে তার কোন আপত্তি থাকত না। তাদের এই অবৈধ প্রেমঘটিত

ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে এক কুৎসার ঝড় ওঠে অথবা লোকনিন্দার ঢেউ উঠে তাঁদের সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত হানবে—তাঁর আপত্তি এইখানে।

স্যার ম্যালকম বললেন, লোকটা যাই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না, বা তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখ এ ব্যাপারে যে কথা উঠবে, লোকনিন্দার যে কলগুঞ্জন উঠবে, তা তোমার সৎমার কানে উঠবে। সে কিভাবে ব্যাপারটা নেবে কে জানে।

কনি বলল, আমি তা জানি। সমাজে যারা বাস করে তাদের পক্ষে এই লোকনিন্দা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেও তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। এই সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তার থেকে আমি আমার সন্তানের পিতা হিসাবে অন্য লোকের নাম করতে পারি। মেলর্সের নাম একেবারে না করলেই হলো।

অন্য লোক? কে সে?

ডানকান ফোর্বের নাম। সে বরাবর আমার বন্ধু। সে একজন নামকরা শিল্পী এবং আমাকে ভালবাসে।

হা ভগবান! বেচারা ডানকান। এতে তার কি লাভ হবে?

তা জানি না। তবে এতে তার কোন আপত্তি হবে না।

তা হয়ত হতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তার সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার ঘটেছিল?

না। এ সব ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই। ও শুধু আমাকে ভালবেসেই খুশি। ওকে স্পর্শ করতে দেয় না।

হা ভগবান! কি অদ্ভুত লোক!

সে চায় আমি তার শিল্পের মডেল হই। আমি অবশ্য তা কখনো চাইনি।

ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। কিন্তু সব বিষয়েই সে বড় লাজুক।

তা হোক। তবু তার নাম আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তোমাদের বলার কিছু থাকবে না।

হায় কনি! যত সব জঘন্য চক্রান্ত করতে হবে।

আমি জানি এসব ঘৃণ্য কাজ। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল।

শুধু চক্রান্ত আর চক্রান্ত। বেশীদিন বাঁচাটাই পাপ।

আচ্ছা বাবা, তোমাদের আমলে এ ধরনের কোন চক্রান্ত করনি? তবে কেন এত কথা বলছ?

কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র।

সব সময় সবাই নিজের কথাটাকে স্বতন্ত্র ভাবে।

হিলদা এসে নতুন সমস্যার কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠল। সামান্য একটা শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার বোনের নামটা জড়িয়ে পড়ুক এটা সে চায় না।

কনি বলল, আমরা তাহলে বৃটিশ কলম্বিয়া বা কোন উপনিবেশে চলে যেতে পারি ত। তাহলে কোন নিন্দার ঝড় উঠবে না।

কিন্তু কোন পরিত্রাণ নেই। কথা যা ওঠার উঠবে, নিন্দা যা রটার তা রটবেই। হিলদার মত কনি এই লোকটাকে বিদেশে গিয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু তাতে সব সমস্যার সমাধান হবে। স্যার ম্যালকম অবশ্য তা মনে করেন না।

বাবা, তুমি তাকে একবার দেখবে ?

বেচারা ম্যালকমের কিন্তু এ বিষয়ে মোটেই কোন আগ্রহ নেই। বেচারা মেলর্সেরও তেমন কোন আগ্রহ নেই। তবু দুজনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। স্যার ম্যালকমের ক্লাবের একটা ঘরে দুজনে বসল। একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল অস্বস্তির সঙ্গে।

ওদের লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্যার ম্যালকম বেশী করে হুইস্কি খেলেন। মেলর্সও অনেকটা খেল। তারপর যখন কফি দেওয়া হলো এবং পরিবেশনকারী চলে গেল তখন ম্যালকম একটা সিগারেট ধরিয়ে আন্তরিকতার সুরে বললেন, তাহলে ছোকরা, আমার মেয়ের কি হবে ?

একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে। বলল, কি হবে স্যার ?

তার গর্ভে তোমার এক সন্তান এসেছে।

মেলর্স হেসে বলল, হ্যাঁ, সে সম্মান আমি লাভ করেছি।

স্যার ম্যালকম জোর হেসে বললেন, সম্মান। তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন চলছিল ?

ভালই।

ভাল হবেই আমি জোর করে বলতে পারি। আমার মেয়ে। আমার রক্ত আছে তার গায়ে। তার মা থাকা সত্ত্বেও আমি কোন ভাল মেয়ে কাছে পেলেই তার সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হয়েছি। তুমি শুকনো খড়ের গাদার মত তার দেহটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। তুমি একজন শিকার রক্ষক না ? শোন। বিশেষ মন দিয়ে শোন, আমরা কি করতে চলেছি এ বিষয়ে।

স্যার ম্যালকমের যতটা নেশা ধরেছিল মেলর্সের তা ধরেনি। মেলর্স খুবই কম কথা বলছিল।

তুমি একজন শিকার রক্ষক। এও এক ধরনের শিকার। ভাল শিকার ধরার মতই ভাল মেয়ে খুঁজে পাওয়াও কঠিন কাজ। তোমার বয়স কত ?

উনচল্লিশ।

তোমাকে যতদূর মনে হচ্ছে এখনো কুড়ি বছর তোমার যৌবন থাকবে দেহে। তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। তুমি ঠিক ক্লিফোর্ডের মত নও। ক্লিফোর্ডকে দেখতে শিকারী কুকুরের মত তেজী হলেও তার লিভারটা পচা ফুলের মত নরম। আমরা তোমার উপর বিশ্বাস রাখি। এবার কাজের কথাটা শোন। সারা জগৎটা বুড়ী মেয়েতে ভরে গেছে। সত্যিকারের মেয়ে কোথায় ?

স্যার ম্যালকমের কাজের কথা মানে যত সব রসের কথা। তিনি আবার বললেন, শোন ছোকরা, আমি তোমার জন্য যে কোন উপকার করতে পারি।

আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। তোমাকে আমি পছন্দ করি তুমি জান আমার মেয়ের কিছু টাকা আছে। খুব একটা বেশী না হলেও খাওয়া পরার কোন অভাব হবে না। তার উপর আমিও কিছু দিতে পারি। আমি সত্তর বছর ধরে কত বুড়ী মেয়ের স্কার্ট তুলে দেখেছি। কিন্তু একটাও মেয়ের মত মেয়ে পাইনি। সেদিক দিয়ে তুমি কত ভাগ্যবান।

আপনার কথায় আমি খুশি। লোকে আমাকে পিছন থেকে বাঁদর বলে।

বুড়ী মেয়েগুলো তোমাকে বাঁদর বলবে না ত কি বলবে?

ওরা বেশ আন্তরিকতার মধ্য দিয়েই বিদায় নিল। মেলর্স বেশ খুশি মনেই চলে গেল।

পরের দিন কনি আর হিলদার সঙ্গে কোন এক অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় লাঞ্চ খেল মেলর্স।

হিলদা বলল, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে এক কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

মেলর্স বলল, আমার ত বেশ মজা লাগছিল।

হিলদা বলল, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ধৈর্য ও যোগ্যতা অর্জন না করেই সন্তান উৎপাদন করতে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি।

মেলর্স বলল, ঈশ্বর ফুঁ দিয়ে সামান্য স্ফুলিঙ্গটাকে এত বড় করে দেবেন তা ভাবতে পারিনি।

হিলদা বলল, এতে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। অবশ্য তোমাদের দুজনের চলার মত টাকা কনির আছে। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা অসহ্য।

মেলর্স বলল, তাহলে আপনাদের অতি অল্পই ত্যাগ করতে হবে এ ব্যাপারে।

হিলদা বলল, কিন্তু তুমি যদি আমাদের শ্রেণীভুক্ত হতে তাহলে কিছু বলার ছিল না।

অথবা আমি যদি খাঁচার পশু হতাম তাহলে আরো ভাল হত।

এরপর সবাই চুপ করে রইল।

হিলদা বলল, সবচেয়ে ভাল হয় কনি যদি তার সন্তানের পিতা হিসাবে অন্য কারো নাম করে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম এ ব্যাপারে আমরা সত্য কথা বলব।

কিন্তু আমি বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবছি।

মেলর্স হিলদার মুখপানে চেয়ে রইল। কনি তার কাছে ডানকানের নামটা করেনি।

মেলর্স বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

হিলদা বলল, আমাদের একজন বন্ধু আছে যার নাম পিতা হিসাবে করা যেতে পারে আর তাতে সে রাজী হতে পারে।

আপনি একজন অন্য পুরুষের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ অবশ্যই তাই।

কিন্তু অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ত তার কোন সম্পর্ক নেই।

কনির মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাল মেলর্স।

কনি তাড়াতাড়ি বলল, না না, শুধু কেবল বন্ধুত্ব, কোন প্রেমের ব্যাপার নয়।

কিন্তু কেন সে এই কলঙ্কের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিতে যাবে যদি সে তার প্রতিদানে কিছু না পায় ?

হিলদা বলল, কিছু এমন লোক আছে যারা বড় উদার, যারা মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই চায় না।

কিন্তু কে সে লোক ?

আমাদেরই এক বন্ধু। স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি। ছোট থেকে আমরা দেখে আসছি। একজন শিল্পী।

মেলর্স সঙ্গে সঙ্গে বলল, ডানকান ফোর্বে।

কনি একবার তার কাছে ডানকানের নাম করেছিল। মেলর্স বলল, কিন্তু এই দোষ কেমন করে কোন যুক্তিতে চাপাবেন তার উপর ?

কেন, ধরে নাও কোন হোটেলে তারা একসঙ্গে কিছুদিন ছিল।

মেলর্ল বলল, আমার মনে হচ্ছে সামান্য একটা কারণে বৃথা হৈ চৈ করা হচ্ছে।

হিলদা বলল, এ ছাড়া আর কি করতে পার তুমি ? তোমার নাম করা হলে তোমার বিবাহবিচ্ছেদ কোনমতেই হবে না। ফলে তোমার স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাবে না তুমি।

হতাশভাবে মেলর্স বলল, তা অবশ্য ঠিক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেলর্স বলল, আমরা দূরে কোথাও চলে যেতে পারতাম।

কিন্তু কনি তা পারে না, কারণ ক্লিফোর্ড দেশে বিদেশে এক সুপরিচিত নাম।

আবার সেই হতাশাজনিত এক গভীর নীরবতা।

হিলদা বলল, তোমরা যদি দুজনে সুখে শান্তিতে বাস করতে চাও তাহলে বিয়ে করতে হবে। আবার বিয়ে করতে হলে বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে আগে। এখন দুজনকেই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু করে দিয়ে পৃথকভাবে থাকতে হবে।

মেলর্স বলল, তাহলে আপনি আমাদের এখন কি করতে বলেন ?

এখন প্রথমে ডানকানকে বলে দেখতে হবে সে এতে রাজী হয় কি না। তারপর তোমরা দুজনেই বিবাহবিচ্ছেদের কাজে এগিয়ে যাবে। এ কাজে সফল না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

মনে হচ্ছে পাগলা গারদের মধ্যে থাকতে হবে।

তা হতে পারে। কিন্তু তা না হলে জগতের সব লোক তোমাদের পাগল বলবে।

তার থেকে আর কি খারাপ ভাবতে পারে?

অপরাধী। আমার তাই মনে হয়।

ঠিক আছে, আমি মুক্ত শানিত তরবারির উপর আরো কয়েকবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

একটু চুপ করে থেকে মেলর্স আবার বলল, ঠিক আছে, আমি যে কোন ব্যবস্থাতেই রাজী। সারা দুনিয়াটাই পাগলা হয়ে গেছে। তাকে বাঁধবার বা মারবার কেউ নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের পরস্পরকে রক্ষা করা উচিত।

কনির পানে সে একই সঙ্গে অপমান, ক্রোধ, ক্লান্তি আর দুঃখের সঙ্গে তাকাল।

অবশেষে মেলর্স কনিকে বলল, হে আমার সুন্দরী, পাগলা দুনিয়াটা তোমার সুন্দর পাছাটায় নুনের রাশ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কনি বলল, আমরা বাধা দিলে তা পারবে না।

অবশেষে ডানকানকে একদিন কথাটা বলা হলো। ডানকানও একদিন মেলর্সকে দেখতে চাইল। সুতরাং আবার একদিন তাদের চারজনের একটা সাক্ষাৎকার হলো। ডানকান একটু বেঁটে ধরনের। তার বুকটা বেশ চওড়া। লম্বা লম্বা চুল। তার মুখে চোখে কেল্টসুলভ অহমিকার ভাব। তার শিল্পকলা অতি আধুনিক। রং আর রূপ নিয়ে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছে। কিন্তু তার মাঝেই তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মেলর্সের কিন্তু তা দেখে মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু মুখে তার সামনে তা বলতে পারল না। কারণ শিল্পটা ডানকানের কাছে এক ধর্মবিশ্বাসের মত। সেখানে কোন আঘাত ও সহ্য করবে না।

সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল ডানকানের বাড়িতে। তার স্টুডিওটা ওদের দেখাল ডানকান। ডানকানের ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ ছিল মেলর্সের উপর। কারণ সে তার ছবির গুণাগুণ সম্পর্কে মেলর্সের মতামত চায়। কনি আর হিলদার মতামত সে আগেই জেনেছে।

অবশেষে মেলর্স তার মত ব্যক্ত করল। বলল, এসব শিল্পকর্ম দেখে একটা হত্যার কাজ বলে মনে হচ্ছে।

হিলদা বলল, কিসের হত্যা? কে কাকে হত্যা করছে?

মেলর্স বলল, আত্মার নাড়ীভুড়িতে জড়িয়ে থাকা সব মায়া মমতাকে হত্যা করা হয়েছে।

শিল্পীর মুখে একটা ঘৃণার ঢেউ খেলে গেল। সে মেলর্সের কণ্ঠে স্পষ্ট এক ঘৃণাকে ফুটে উঠতে শুনল। সে মেলর্সের মুখ থেকে মায়া মমতার কথাটা

শুনেও রেগে উঠল।

তার লম্বা রোগা-রোগা চেহারাটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেলর্স। তার মুখে ঘৃণা আর অসন্তোষের ভাব। ডানকানের মনে হলো তার দৃষ্টিগুলোর উপর যেন এক ভীমরুল উড়ে বেড়াচ্ছে।

ডানকান বলল, আমার মনে হয় নির্বুদ্ধিতা, যতসব ভাবপ্রবণ নির্বুদ্ধিতাকে হত্যা করা হয়েছে।

আপনি কি তাই মনে করেন? আমার ত মনে হয় আপনার এই টিউব আর করোগেটের ছবিগুলোর কাজই এক নির্বুদ্ধিতা আর ভাবালুতায় ভরা। এক স্নায়বিক আত্মাভিমানের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছু নয়।

রাগ আর ঘৃণার ঢেউ খেলে গেল শিল্পী ডানকানের মুখখানায়। হলুদ হয়ে গেল সে মুখ। সে বলল, আমরা এবার খাবার ঘরে যেতে পারি।

ওরা সকলেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলল। কফি পরিবেশনের পর ডানকান বলল, পিতা হিসাবে আমার নাম দেওয়ার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একটা শর্তে। কনিকে আমার ছবির মডেল হতে হবে। আমি এর আগে অনেকদিন বলেছি একথা। কিন্তু ও শোনেনি।

মেলর্স বলল, আপনি তাহলে শর্তাধীনে এ উপকারটা করছেন।

ডানকান তার কণ্ঠে যতদূর সম্ভব মেলর্সের প্রতি ঘৃণা ঢেলে বলল, হ্যাঁ, শর্তাধীনেই করছি।

মেলর্স বলল, আমাকেসুদ্ধ মডেল করুন না কেন। আমি শিকার রক্ষকের কাজ করার আগে কামারের কাজ করতাম। আপনার শিল্পকলার জালে তাহলে ভালকান আর ভেনাস একই সঙ্গে ধরা থাকবে।

ডানকান বলল, ধন্যবাদ। ভালকানের চেহারা মোটেই মডেল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

কেন, তাকে টিউবের মধ্যে ভরে দিলেও নয়?

ডানকান রাগের বশবর্তী হয়ে কোন উত্তর দিল না।

সেদিনকার ভোজসভাটা একটা ভয়ঙ্কর নিরানন্দ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। মেলর্সের উপস্থিতিটা এক তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করে গেল ডানকান।

ওরা ডানকানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে কনি মেলর্সকে বলল, তুমি ওকে বুঝতে পারলে না; ও কিন্তু সত্যিই ভাল। ওর সত্যিই দয়া আছে।

মেলর্স বলল, ওর মেজাজটা গরম করোগেটের পাতের মত। ও আজ মোটেই ভাল ব্যবহার করেনি। তুমি কি ওর ছবির মডেল হবে?

কনি বলল, আমি তাতে কিছু মনে করি না। ও আমাকে ছোঁবে না। যদি তোমার আমার একসঙ্গে জীবনযাপনের পথ পরিষ্কার করা হয় তাহলে আমি এ ব্যাপারে কিছুই মনে করব না।

মেলর্স বলল, উনি শুধু তোমাকে ক্যানভাসের উপর ধরে রাখবেন।

কনি বলল, শুধু আমার দেহ সম্বন্ধে ওর অনুভূতিগুলো বিচিত্রভাবে ফুটিয়ে তুলবে। ও যদি তা করে আমার তাতে আপত্তি নেই। আমার গা ওকে ছুঁতে দেব না। ও যদি কখনো আমার দেহের দিকে পেঁচার মত তাকিয়ে থাকে ত থাকবে। সে আমাকে মডেল করে যত খুশি টিউব বা করোগেট বানাতে পারে। এটা তারই শিল্পীজীবনের কবরখানা হবে। তোমার কথা শুনে রেগে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে ওর শিল্প সম্বন্ধে তোমার কথাটাই সত্যি।

অধ্যায় ১৯

প্রিয় ক্লিফোর্ড, আমার মনে হয় তুমি আগে যা ভেবেছিলে তাই ঘটল পরিশেষে। আমি সত্যি সত্যিই একজনকে ভালবেসে ফেলেছি এবং আশা করি তুমি বিবাহবিচ্ছেদ করে আমাকে মুক্তি দেবে। বর্তমানে আমি ডানকানের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে রয়েছি। আমি তোমাকে লিখেছিলাম ভেনিসে ও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি তোমার জন্য ভীষণভাবে দুঃখিত; তবে তুমি যেন শান্তভাবে এটা গ্রহণ করো। আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আমার থেকে ভাল একজনকে গ্রহণ করবে। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই; আর আমি র‍্যাগবিতে ফিরে যেতেও পারছি না। আমি এজন্য ভীষণ দুঃখিত। আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী নই; আমি বড় অধৈর্য এবং স্বার্থপর। আর আমি তোমার কাছে গিয়ে একসঙ্গে বাস করতে পারছি না। একথা যতই ভাবছি ততই দুঃখ পাচ্ছি। তুমি যদি এ নিয়ে বেশী ভাবনাচিন্তা না করো তাহলে দেখবে কোন দুঃখই পাবে না। আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোন আশক্তিই নেই। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার থেকে তোমার নিজের মুক্তি রচনা করে নাও।

চিঠিখানা পেয়ে মনে মনে খুব একটা আশ্চর্য হলো না ক্লিফোর্ড। কারণ এর আগে থেকেই অনেকদিন ধরে সে ধরে নিয়েছিল কনি তাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বাইরে একথা সে স্বীকার করতে চাইত না। তাই বাইরের দিক থেকে একটা জোর আঘাত পেল ক্লিফোর্ড। কনির শান্ত ভাব দেখে তার উপর অনেকখানি আস্থা রেখেছিল।

এই রকমই হয়। অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির এক কৃত্রিম প্রবলতায় আমাদের স্বীকৃত চেতনার উপরিতল থেকে আমাদের অন্তরদৃষ্টিজনিত জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। আর এই বিচ্ছিন্নতা থেকে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ফলে যখন আঘাতটা সত্যি সত্যিই আসে তখন সে আঘাত দশগুণ মনে হয়।

বিক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত শিশুর মত আচরণ করতে লাগল ক্লিফোর্ড আঘাতটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

চিঠিখানা পড়ার পর তার বিছানার উপর এমন ভয়ঙ্করভাবে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল যে তা দেখে ভয় পেয়ে গেল মিসেস বোল্টন।

মিসেস বোল্টন ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, কি হয়েছে স্যার ক্লিফোর্ড? কি ব্যাপার।

কিন্তু কোন উত্তর নেই। উত্তর না পেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল মিসেস বোল্টন। তার ভয় হলো ক্লিফোর্ডের রক্তের চাপ হয়ত খুব বেড়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি তার চোখমুখ পরীক্ষা করে তার হাতের নাড়ী টিপে দেখল।

মিসেস বোল্টন বলল, কোথাও যন্ত্রণা হচ্ছে? কোথায় ব্যথা লাগছে আমাকে বলুন।

এবারও কোন উত্তর দিল না ক্লিফোর্ড।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি তাহলে শেফিল্ডে ডাক্তার ব্যারিংটন ও ডাক্তার লেকিকে টেলিফোন করব?

মিসেস বোল্টন সত্যি সত্যিই ফোন করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল ঘরের দরজার দিকে। কিন্তু এমন সময় ক্লিফোর্ড বলে উঠল, না।

মিসেস বোল্টন যেতে যেতে হঠাৎ থেমে ক্লিফোর্ডের দিকে তাকাল। দেখল, তার মুখখানা হলুদ হয়ে গেছে। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। তার সমস্ত মুখখানা এক বিহ্বল হতবুদ্ধি মানুষের মত।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কি বলতে চান কোন ডাক্তার ডাকব না?

ক্লিফোর্ড ভূতুড়ে গলায় উত্তর দিল, না, আমি ডাক্তার চাই না।

কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড, আপনি অসুস্থ। আমি কোন দায়িত্ব নিতে পারি না। আমি এখন ডাক্তার না ডাকলে আমাকে পরে দোষী হতে হবে।

কিছুক্ষণ থামার পর ক্লিফোর্ড আবার তেমনি ভূতুড়ে গলায় উত্তর করল, আমি অসুস্থ নই। আমার স্ত্রী আর ফিরে আসছে না।

মিসেস বোল্টনের মনে হলো যেন কোন প্রাণহীন প্রতিমূর্তি কথা বলল।

ক্লিফোর্ডের বিছানার কাছে সরে গিয়ে বলল, আপনি বলছেন আমাদের ম্যাডাম আর ফিরে আসছেন না? একথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। আমাদের ম্যাডাম ঠিক ফিরে আসবেন। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

এ কথায় সেই প্রাণহীন প্রতিমূর্তির কোন পরিবর্তন হলো না। সে শুধু একখানা চিঠি মিসেস বোল্টনের দিকে বাড়িয়ে বলল, এটা পড়।

কিন্তু এটা যদি আপনাকে লেখা ম্যাডামের চিঠি হয় তাহলে ম্যাডাম অবশ্যই এটা চাইবেন না যে এ চিঠি আমি আপনাকে পড়ে শোনাই। আপনি এ চিঠির মর্মার্থ আমাকে মুখে বলুন।

কিন্তু ক্লিফোর্ড আবার বলল, চিঠিটা পড়।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি শুধু আপনার আদেশ পালন করার জন্যই

এ চিঠি পড়ছি।

চিঠি পড়ে মিসেস বোল্টন বলল, আমি ম্যাডামের ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। তিনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন।

মিসেস বোল্টন দেখল ক্লিফোর্ডের মুখের উপর এক শূন্য কালো ছায়া গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠেছে। সে সৈন্যদের সেবা করতে গিয়ে অনেক দেখেছে, এটা হচ্ছে হিস্টিরিয়া রোগ। পুরুষদেরও হয়।

ক্লিফোর্ডের উপর কিছুটা রাগও হলো মিসেস বোল্টনের। ক্লিফোর্ডের মত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন লোকের এটা অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল, তার স্ত্রী অন্য কাউকে ভালবাসে এবং একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে নিজে এটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে। ক্লিফোর্ডও মনে মনে সেটা বেশ বুঝত; মুখে সে শুধু এটা স্বীকার করত না। বাইরে এটা স্বীকার করে সে যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করত তাহলে এটা মানুষের কাজ হত। কিন্তু তা না করে সে জেনে শুনে উপরে না জানার ভাণ করত। আসলে একটা আস্ত শয়তান যখন তার লেজ নেড়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন সে সেই শয়তানকেই দেবদূত ভেবে ভুল করে এসেছে। সেদিনের সেই ক্রমাগত মিথ্যাচরণটি আজ এক প্রবল আঘাত হেনে তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এমন এক রোগের যা উন্মাদ রোগেরই অন্যতম লক্ষণ। মিসেস বোল্টন ভেবে অবশেষে বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড নিজের সম্বন্ধে খুব ভাবত, নিজের অবিনশ্বর আত্মার গৌরবগান করত বলেই আজ এই আঘাতটা পেল। তার প্রবল আত্মাভিমান প্রবলতর এক প্রতিকূল ঘটনার আঘাত খেয়ে ছিন্নভিন্ন এক অসংলগ্নতা নিয়ে এল তার মনের মধ্যে।

হিস্টিরিয়া বড় বিপজ্জনক রোগ। যেহেতু সে একজন নার্স। তাকে এখন দেখতে হবে, ভাল করে তুলতে হবে। কিন্তু এখন তাকে এমন কোন কথা বলা চলবে না যাতে তার প্রতিহত ও লাঞ্ছিত পৌরুষচেতনা আবার জেগে উঠতে পারে। তাতে তার মনের কাঠামোটা আরো স্খলিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।

এখন তার একমাত্র উচিত কাজ হবে মনের অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করা। তার অবস্থা এখন টেনিসনের কবিতার সেই প্রস্তরীভূতপ্রাণা শোকাহত মহিলার মত যাকে অবশ্যই কাঁদতে হবে। না কাঁদলে মরে যাবে।

তাই মিসেস বোল্টন প্রথমে কাঁদতে লাগল। হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে জোরে ফুঁপিয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনি যে ম্যাডাম এমন করবেন। তার অতীত জীবনের বিস্মৃতপ্রায় যতসব পুরনো দুঃখের কথা ভেবে এক কৃত্রিম আবেগে গলে গিয়ে কাঁদতে লাগল মিসেস বোল্টন। তার কান্নাটা সত্যিই স্বাভাবিক কান্নার মত শোনাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই এই কান্নার কোন একটা কারণ ঘটেছে।

ক্লিফোর্ড এখন শুধু কনির বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা ভাবছিল। কনি তাকে কিভাবে কতখানি ঠকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বোল্টনের কান্না দেখে, তার কৃত্রিম শোকের ছোঁয়া পেয়ে তার চোখেও জল এল। ক্রমে চোখ থেকে সে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। সে কিন্তু অন্য কারো জন্য কাঁদছিল না, কাঁদছিল নিজের জন্য, নিজের আহত আত্মাভিমানের জন্য। অজস্র দিন ধরে যে আত্মাভিমান এক অপ্রতিহত প্রবলতায় অলক্ষ্যে উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে, আজ সহসা এক ঘটনার আঘাতে সেই উত্তুঙ্গ আত্মাভিমান শোচনীয়ভাবে ভূপাতিত হওয়ার জন্য না কেঁদে পারছিল না ক্লিফোর্ড।

এদিকে মিসেস বোল্টন যখন দেখল ক্লিফোর্ড এবার কাঁদছে তখন সে তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছে চুপ করল। তারপর তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এত উতলা হবেন না স্যার ক্লিফোর্ড।

এক কৃত্রিম আবেগের বিলাসিতায় গলে গিয়ে মিসেস বোল্টন আবার বলল, আপনি কাঁদলে শরীর খারাপ হবে। এতে শুধু আপনার শরীরের ক্ষতি হবে।

ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক ফোঁপানির চাপে সারা দেহটা একবার কেঁপে উঠল ক্লিফোর্ডের। তার দু গালের উপর অশ্রুর ধারা আগের থেকে আরো জোরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার বাহুর উপর সান্ত্বনার ভঙ্গিতে নিজের হাত রাখল মিসেস বোল্টন। আবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার চোখ থেকে। ক্লিফোর্ডের দেহটা আবার জোরে কেঁপে উঠতেই তার হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল সে। না না, আর উতলা হবেন না, দুঃখ করবেন না।

মিসেস বোল্টনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল সান্ত্বনা দিতে গিয়ে। এবার সে ক্লিফোর্ডের চওড়া কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে আনল আর ক্লিফোর্ডও মিসেস বোল্টনের বুকের মধ্যে মুখটা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তবে কান্নার তালে তালে তাঁর কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, ক্লিফোর্ডের নরম লম্বা চুলগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে বারবার বলতে লাগল, কিছু মনে করবেন না। কাঁদবেন না।

ক্লিফোর্ডও তখন দুহাত দিয়ে মিসেস বোল্টনকে জড়িয়ে ধরে তার দিকে টেনে আনল। চোখের জলে তার সাদা পোষাক ভিজিয়ে দিল। এতদিনে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করল মিসেস বোল্টনের কাছে।

মিসেস বোল্টন এবার ক্লিফোর্ডের মুখে চুম্বন করে তাকে বুকের উপর চেপে ধরে শিশুর মত আদর করতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হায় স্যার ক্লিফোর্ড, হায় মহান চ্যাটার্লি পরিবার, তোমাদের পর্বতপ্রমাণ উত্তুঙ্গ মাথা অবশেষে নত হল। তোমাদের উঁচু আসন থেকে তাহলে নেমে এলে।

এরপর শিশুর মত শান্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল ক্লিফোর্ড আর মিসেস বোল্টনও ক্লান্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত সে নিজেও হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপারটা একই সঙ্গে কত হাস্যাস্পদ ও ভয়ঙ্কর। কী

লজ্জার কথা! কত সাংঘাতিক অধঃপতন।

এরপর থেকে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার করতে লাগল ক্লিফোর্ড। সে তার হাত ধরত, তার বুকের উপর তার মাথাটা রাখত এবং যখন মিসেস বোল্টন তাকে চুম্বন করত তখন বলত, হ্যাঁ, আমাকে চুম্বন করো। মিসেস বোল্টন যখন তার গাটা টিপে দিত তখনও ক্লিফোর্ড বলত আমাকে চুম্বন করো। মিসেস বোল্টন তখন তার দেহের যে কোন জায়গায় আলতো-ভাবে একটা চুম্বন করত।

শিশুর মত অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকত ক্লিফোর্ড। মিসেস বোল্টনের দিকে এমন গভীরভাবে তাকিয়ে থাকত যাতে মনে হবে সে ম্যাডোনা, উপাসনা করছে পরম ভক্তিভরে। তারপর হঠাৎ এক নোংরা ছেলেমানুষির ভঙ্গিতে মিসেস বোল্টনের বুকের উপর হাত দিয়ে চাপ দিত এবং আবেগের সঙ্গে তা চুম্বন করত।

একই সঙ্গে এক লজ্জা আর পুলকের শিহরণ অনুভব করত মিসেস বোল্টন। একই সঙ্গে ভালবাসা আর ঘৃণা জাগত তার মধ্যে। তবু সে কখনো ক্লিফোর্ডের অগ্রসরমান বিকৃত কামাবেগকে কোনভাবে প্রতিহত করত না বা ভর্ৎসনা করে দূরে ঠেলত না। এইভাবে নিবিড় হতে নিবিড়তর এক দেহসংসর্গের মধ্যে সে পড়ল জড়িয়ে। এ দেহসংসর্গের অর্থ হলো শুধু এক বিকৃত বিপথগামী কামচেতনার উচ্ছ্বাস। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে ক্লিফোর্ডের এই দেহগত সম্পর্কের নিবিড়তা যেন শুধু একটা দেহগত ব্যাপার নয়। এটা ধর্মগত এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বাহ্য প্রতীক। ওরা যখন পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় তখন ওদের দেখে মনে হয় ক্লিফোর্ড যেন ম্যাডোনার কোলে শিশু আর মিসেস বোল্টন যেন অসীম শক্তিসম্পন্না সেই দেবীমাতা যিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক ইচ্ছাশক্তিবলে এই বিরাট শিশুটিকে একান্তভাবে তার দেহমনের অধীনস্থ করে রেখেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ থেকে ক্লিফোর্ড যখন এক বিরাট বিকৃতমনা শিশুতে পরিণত হল তখন তার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি সবই প্রখর হয়ে উঠল আগের থেকে। ব্যবসায়ী হিসাবে তার কূটবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আরো। তার দেবীমাতার কাছে এক অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ এবং তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিম্নাঙ্গের যৌন নিষ্ক্রিয়তা হয়ত পার্থিব সকল ব্যাপারে দান করেছিল তাকে এক অমানবিক শক্তি আর উদ্যম। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে তার এই দেহসংসর্গের এই বিকৃত আবেগ এতদিনে ক্লিফোর্ডকে দান করল যেন এমন এক দ্বিতীয় সত্তা যা দেহ ও পার্থিব সকল ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন, কূটনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় হিমশীতল এবং ইন্দ্রিয়তৎপরতায় অত্যুৎসাহী।

এ ব্যাপারে মিসেস বোল্টনেরই যেন জয় হলো। স্ফীত হয়ে উঠল তার অহংবোধ। আজকাল প্রায়ই আপন মনে বলে মিসেস বোল্টন, কেমন সে ধরা দিয়েছে। এসব আমার কৌশলেই সম্ভব হয়েছে। ও কিন্তু লেডি

চ্যাটার্লির সঙ্গে এসব করতে পারত না। দেহসংসর্গের ব্যাপারে চ্যাটার্লি তাকে কখনই এতখানি স্বাধীনতা দিত না। কারণ সে ছিল দারুণ স্বার্থপর মেয়ে।

কিন্তু কনির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে এক অদ্ভুত মনের পরিচয় দিল ক্লিফোর্ড। সে আবার কনিকে দেখার জন্য জেদ ধরল। এত কিছু সত্ত্বেও সে আবার কনিকে র‍্যাগবিতে নিয়ে আসার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। এ বিষয়ে সে বদ্ধপরিকর। কনিও শেষে আসবে বলে কথা দিয়েছে।

মিসেস বোল্টন তার নারীমনের অন্তঃস্থলে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করত। সেখানে ক্লিফোর্ডকে তার মনে হত যেন অক্ষম অব্যবহার্য একটা পশু। অবশ্য সে তার নারীদেহের অটুট স্বাস্থ্য দিয়ে ক্লিফোর্ডের বিকৃত কামাবেগকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করার চেষ্টা করত। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তরের নিভৃতে ক্লিফোর্ডের প্রতি অপরিসীম এক বর্বর ঘৃণাও পোষণ করত। মনে হত ক্লিফোর্ডের থেকে রাস্তার একটা ভবঘুরেও ভাল।

কনি সম্বন্ধে ক্লিফোর্ডের সব কথা শুনে মিসেস বোল্টন বলল, এর কি কোন দরকার আছে? ও যখন যেতে চাইছে, একেবারে ওকে চলে যেতে দিতে পার না? তার থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে পার না?

না, সে বলেছে সে ফিরে আসছে এবং তাকে আসতে হবে।

মিসেস বোল্টন আর বাধা দিল না। ক্লিফোর্ড একটা চিঠিতে কনিকে লিখল, তোমার চিঠিখানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা বলার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি একটু চেষ্টা করে কল্পনা করলেই তা বুঝতে পারবে। অবশ্য আমার জন্য এই কষ্টটুকু করার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। তোমার চিঠির উত্তরে আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি। সেটা হলো এই যে, আমি তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই। তারপর যা হোক একটা কিছু করা যাবে। কিন্তু কিছু করার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব, কথা বলব আমি। তুমি ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিলে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তোমার সে কথা। আমি তোমার সেই প্রতিশ্রুতিটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কথা বিশ্বাস করব না, কোন কথা বুঝব না। এখানে তোমার সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার ফিরে আসার ব্যাপারটাতে কোন অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। তারপর আমাদের কথাবার্তা হওয়ার পর যদি তুমি পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাক তাহলে আমরা তখন একটা চুক্তির মধ্যে আসব।

কনি চিঠিখানা মেলর্সকে দেখাল।

চিঠিখানা কনির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মেলর্স বলল, ও তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে।

কনি প্রথমে চুপ করে রইল। একটা জিনিস দেখে কনি বড় আশ্চর্য হলো।

সে দেখল ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে যেতে তার ভয় করছে। মনে হচ্ছে ক্লিফোর্ড যেন একটা শয়তান বা বিপজ্জনক লোক।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর অবশেষে র‍্যাগবিতে যাওয়ারই ঠিক করল কনি। হিলদা তার সঙ্গে যাচ্ছে। একথা জানিয়ে ক্লিফোর্ডকে চিঠি দিল কনি। তার উত্তরে ক্লিফোর্ড লিখল, আমি তোমার বোনকে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন অংশ-গ্রহণ করতে দেব না। অবশ্য তা বলে তাঁকে যে বাড়ি ঢুকতে দেব না তা নয়। আমার প্রতি তোমার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করার ব্যাপারে তিনিই যে তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং তোমাকে সমস্ত মদত যুগিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। সুতরাং তাঁকে দেখে আনন্দিত হব আমি এটা কখনই আশা করতে পার না তুমি।

কনি আর হিলদা দুজনেই একসঙ্গে একদিন র‍্যাগবি গেল। বাড়িতে তখন ক্লিফোর্ড ছিল না। ওরা পৌঁছলে মিসেস বোল্টন অভ্যর্থনা জানাল। বলল, হে ম্যাডাম, আপনার এই প্রত্যাবর্তন কিন্তু খুব একটা সুখের হলো না।

কনি বলল, তাই নাকি ?

কনির মনে হলো মিসেস বোল্টন সব কথা জানে। কিন্তু আর কজন চাকর এসব কথা শুনেছে বা সন্দেহ করতে শুরু করেছে তা সে জানে না।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কনির মনে হলো এ বাড়ির প্রতিটি ইটকে সে তার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ঘৃণা করে। এই বিরাট বাড়িটা যেন এক ভয়ঙ্কর বস্তু হিসাবে তাকে গ্রাস করতে আসছে। এখন সে যেন এ বাড়ির কর্ত্রী নয়, এক বলির পশু।

হিলদাকে চুপি চুপি বলল কনি, আমি বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না।

কনি সহজভাবে তার শোবার ঘরে ঢুকতে পারল না। কিছুই হয়নি একথা সে ভাবতে পারল না। এবাড়ির মধ্যে একটা মুহূর্তও কাটাতে ঘৃণাবোধ হচ্ছিল তার।

রাতের খাওয়ার আগে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার দেখা হলো না। ক্লিফোর্ড ফিটফাট পোষাক আর কালো নেকটাই পরেছিল। তাকে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছিল। খাওয়ার সময় খুব ভদ্রভাবে আচরণ করল সে। বেশ মোলায়েম বোধ হচ্ছিল তার কথাগুলো। তার সে কথাগুলোর বেশীর ভাগ ছিল অর্থহীন। যেন উন্মাদের কথা।

কনি একসময় ক্লিফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল, ঝি চাকরেরা আমার এ সব কথা কতদূর জানে ?

তোমার অভিপ্রায়ের কথা ? কিছুই না।

কিন্তু মিসেস বোল্টন জানে।

ক্লিফোর্ড বলল, মিসেস বোল্টনকে ত ঠিক চাকর বলা যায় না।

ও, আমি ত জানি না।

এইভাবে কফি খাওয়া পর্যন্ত মন-কষাকষি চলল। কফি খাওয়ার পর হিলদা বলল, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

হিলদা চলে যাওয়ার পর কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে সামনাসামনি নীরবে বসে রইল। কনি একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলো। ক্লিফোর্ড খুব একটা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েনি তার জন্য। শক্ত কথা বলে কনি যথাসম্ভব ক্লিফোর্ডের মেজাজটাকে উগ্র রাখার চেষ্টা করছিল। কনি চুপ করে তার হাতগুলোর পানে তাকিয়ে রইল।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি আশা করি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে।

কনি বলল, আমি তা পারছি না।

তুমি না পারলে কে পারবে?

আমার মনে হয় কেউ পারবে না।

ক্লিফোর্ড কনির দিকে তাকিয়ে রইল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে এক শীতল রাগের আগুন যেন জমাট বেঁধে ছিল। কনি যেন তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

তার অখণ্ড ব্যক্তিত্বকে খণ্ড বিখণ্ড ও তার দৈনন্দিন অস্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করার এমন দুঃসাহস কোথা থেকে পেল কনি?

ক্লিফোর্ড বলল, কেন তুমি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইছ?

ভালবাসা।

ডানকান ফোর্বের প্রতি ভালবাসা? তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন সে ভালবাসা কোথায় ছিল? তুমি কি বলতে চাও তাকে তুমি এখন তোমার জীবনে সব কিছুর থেকে ভালবাস?

কনি বলল, সব মানুষেরই জীবনে পরিবর্তন আসে।

নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্তনের কারণটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ডানকানের প্রতি তোমার ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু বিবাহবিচ্ছেদের কাজটা সেরে ফেলবে। আমার অনুভূতি নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু কেন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ করতে যাব?

কারণ আমি এখানে আর থাকতে চাই না। আর তুমিও আমাকে সত্যি সত্যিই চাও না।

মাপ করবে; আমার কোন পরিবর্তন হয়নি। যেদিন থেকে তুমি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী হয়ে আস সেদিন থেকেই আমি চেয়ে আসছি তুমি আমার বাড়ির মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। দরকার হলে তোমার ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি সব ঝেড়ে ফেলে দেবে। আমিও তা অনেক দিয়েছি। আমাদের এই দাম্পত্য সম্পর্ককে ছিঁড়ে দেওয়ার অর্থ হবে আমার মৃত্যুর সামিল। তুমি যদি কোন খেয়ালখুশিবশতঃ আমার দৈনন্দিন জীবনের

চারদিকে জমে থাকা যত সব স্বপ্নের কুয়াশাগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দাও তাহলে র‍্যাগবিতে আমি আর থাকতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে কাটিয়ে কনি বলল, কিন্তু কোন উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে। আমার সন্তান হবে।

ক্লিফোর্ড কথাটা শুনে ভাবতে লাগল নীরবে। পরে জিজ্ঞাসা করল, একমাত্র সন্তানের জন্যই কি তোমাকে যেতে হবে?

কনি মাথা নাড়ল।

কিন্তু কেন? ডানকান কি তার সন্তানের প্রতি এতখানি আগ্রহ পোষণ করে?

কনি বলল, তোমার থেকে বেশী আগ্রহ।

কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে চাই এবং তাকে যেতে দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। যদি আমার বাড়িতে তার সন্তান হয় তাহলে সে সন্তানকেও আমি বরণ করে নেব যদি অবশ্য আমাদের দাম্পত্য জীবনের উপযুক্ত মর্যাদা ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়। তুমি কি বলতে চাও তোমার উপর আমার থেকে ডানকানের জোর বেশী আছে? আমি তা মনে করি না।

আবার দুজনেই চুপ।

কনি বলল, কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারছ না আমাকে যেতেই হবে। যাকে আমি ভালবাসি তার সঙ্গে আমাকে বাস করতে হবে।

না, আমি তা মনে করি না। আমি তোমার ভালবাসা আর তোমার সেই ভালবাসার মানুষকে কোন মূল্যই দিতে চাই না। এ সবে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

কিন্তু আমি করি।

তাই নাকি? হে আমার প্রিয়তমা ম্যাডাম, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী ডানকানের প্রতি তোমার ভালবাসার ব্যাপারে তুমি খুবই সচেতন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো তুমি, ঠিক এই মুহূর্তেও তুমি আমাকেই বেশী ভালবাস। সুতরাং আমি কেন এই সব বাজে বোকামিতে বিশ্বাস করব?

কনি ভাবল ক্লিফোর্ড ঠিক কথাই বলছে। সুতরাং আর তার চুপ করে থাকা চলে না। আসল কথাটা এবার বলা দরকার।

কনি এবার ক্লিফোর্ডের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ডানকানকে আমি ভালবাসি না। তার জন্য যাচ্ছি না। তোমার সম্ভাব্য রাগটাকে এড়াবার জন্যই তার নাম করেছিলাম।

আমার রাগ এড়াবার জন্য?

হ্যাঁ, আমি যাকে ভালবাসি এবং যার নাম করলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে সে হলো মেলর্স, আগে আমাদের এখানে যে শিকার রক্ষকের কাজ করত।

ক্লিফোর্ড যদি পারত তাহলে সে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠত

চেয়ার থেকে। তা না পারলেও কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা হলুদ হয়ে গেল তার। তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠল রাগে।

অবশেষে খাড়া হয়ে বসল ক্লিফোর্ড। ভয়ঙ্করভাবে বলল, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছ ত?

কনি বলল, হ্যাঁ, সত্যি বলছি তা তুমি জান।

কখন তুমি তার সঙ্গে এই প্রেমসম্পর্ক গড়ে তোল?

গত বসন্তের সময়।

পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত এক নিষ্ফল আক্রোশে স্তব্ধ হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড।

তাহলে তার বাসায় শোবার ঘরে তখন তুমিই ছিলে?

এই কথাই সব সময় মুখে কিছু না বললেও মনে করত সে।

কনি বলল, হ্যাঁ।

এবার ক্রুদ্ধ পশুর মতই কনির পানে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তাহলে ত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

কনি ক্ষীণভাবে অস্ফুট স্বরে বলল, কেন?

ক্লিফোর্ড সেকথা না শুনে আপন মনে গর্জন করতে করতে বলল, একটা পাজী হতভাগা বদমাস লোক, তার সঙ্গে তুমি এখানে থেকে প্রেম করে গেছ। সে ছিল আমার এক সামান্য চাকর। হা ভগবান! নারীদের এই পৈশাচিক নীচতার কি কোন শেষ নেই?

রাগে অন্ধ ও আত্মহারা হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। কনি জানত সে তা হবে। ক্লিফোর্ড বলল, তুমি বলছ সেই শয়তানটার সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ করেছ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কতদিন হলো এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছ তুমি?

জুন মাস থেকে।

ক্লিফোর্ড নির্বাক হয়ে বসে রইল। তার চোখের শূন্য দৃষ্টিটা শিশুর মত মনে হচ্ছিল

ক্লিফোর্ড বলল, এই সব সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়।

কোন সন্তান?

কোন কথা না বলে ভয়ঙ্করভাবে কনির পানে তাকিয়ে রইল ক্লিফোর্ড। আসল কথা সে মেলর্সের মত লোকের অস্তিত্বকেই কোনপ্রকারে সহ্য করতে পারছে না। তার নামের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে থাক এটা সে চায় না।

ক্লিফোর্ড অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও? তার মানে তার ঘৃণ্য নামটা বহন করতে চাও?

হ্যাঁ, আমি তাই চাই।

আবার হতবাক হয়ে গেল ক্লিফোর্ড। তারপর বলে চলল, হ্যাঁ, আমি তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম তা সব সত্যি। তুমি এক স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্না

নারী নও। তুমি হচ্ছ অর্ধোন্মাদ বিকৃতমনা সেই মেয়েদের অন্যতম যারা সব নীতিবোধ হারিয়ে ব্যভিচারের ধ্বজা উড়িয়ে যায়।

ক্লিফোর্ডের মনে হলো, একা সেই হলো ন্যায় ও নীতির মূর্ত প্রতীক আর কনি ও মেলর্স সব দুর্নীতির ক্লেদাক্ত জীব।

কনি ফাঁক পেয়ে বলল, তুমি কি মনে করো না আমাকে ত্যাগ করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট কারণ?

ক্লিফোর্ড বলল, না, তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। কিন্তু আমি তোমাকে আইনগতভাবে ত্যাগ করব না।

কেন করবে না?

এক অর্থহীন অক্ষম গোঁড়ামিতে অনড় হয়ে বসে রইল ক্লিফোর্ড।

কনি বলল, তাহলে কি সন্তানটাকে তোমার বৈধ সন্তান বলে মেনে নেবে? তোমার উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নেবে?

আমি সন্তানের ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করি না।

কিন্তু এ সন্তান যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে তোমার উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে।

আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

কিন্তু তোমাকে গ্রাহ্য করতেই হবে। কারণ আমি যদি পারি এ সন্তান যাতে তোমার বৈধ সন্তান বলে গণ্য না হয় তার জন্য চেষ্টা করব। এ সন্তান যদি মেলর্সের নামে চিহ্নিত না হয় তাহলে আমি এ সন্তান অবৈধ বলে ঘোষণা করব। তুমি কি তাই চাও?

ক্লিফোর্ড তেমনি অনড় হয়ে বসে রইল।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না? কেন, তুমি ত কারণ হিসাবে ডানকানের নামটা ব্যবহার করতে পার। তার কোন আপত্তি নেই।

না আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।

এই সংকল্পটাকে যেন তার মাথায় পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে

কিন্তু কেন? আমি এটা চাই বলে?

আমি নিজের মত ও ইচ্ছানুসারে চলি। কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয়।

ক্লিফোর্ডকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা। তাই উপরে চলে গেল কনি। হিলদাকে গিয়ে সব বলল।

হিলদা বলল, ঠিক আছে। চল, কালই আমরা চলে যাই। ওর চৈতন্য হোক।

অর্ধেক রাত জেগে তার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিল কনি। সকাল হতেই ক্লিফোর্ডকে কিছু না বলে তার বাক্সটা স্টেশনে পাঠিয়ে দিল। সে ঠিক করল, একমাত্র শুধু বার হবার সময় বিদায় জানাবে।

কনি মিসেস বোল্টনকে বলল কথাটা। বলল বিদায় মিসেস বোল্টন, তুমি জান কেন আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আশা করি তোমার উপর বিশ্বাস রাখি, তুমি কাউকে বলবে না এ সব কথা।

এ বিষয়ে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ম্যাডাম। আমাদের অবশ্য এখানে আপনাকে ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি সুখী হবেন আপনার মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে।

মনের মানুষ আর কেউ নয়, মেলর্স। স্যার ক্লিফোর্ড জানে। কিন্তু অন্য কাউকে একথা বলো না। ক্লিফোর্ড যদি কোনদিন বিধিমত আমাকে ত্যাগ করতে চায় ত আমাকে জানিও। আমি যাকে ভালবাসি তাকে বিধিমতে বিয়ে করতে চাই।

নিশ্চয় তা পারবেন ম্যাডাম। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি আপনাদের দুজনের প্রতিই বিশ্বস্ত। আমি জানি আপনি আপনার দিক হতে ঠিকই করেছেন।

ধন্যবাদ। আমার কথাটা মনে রেখো।

এইভাবে কনি র‍্যাগবি ছেড়ে হিলদার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেল। মেলর্সও ওদের দেশে গিয়ে একটা খামারবাড়িতে চাকরি নিল। ঠিক হলো, ছমাস ধরে মেলর্স কাজ করে যাবে। পরে কনি কিছু টাকা দিয়ে ওদের একটা নিজস্ব খামার কিনে তাতে দুজনেই দেখাশোনা করবে। দুজনেই একটা কাজ আর আয়ের একটা উৎস পাবে।

অবশ্য তারা এখন একসঙ্গে থাকতে পাবে না। ওদের সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রেঞ্জ ফার্ম।

১৯শে সেপ্টেম্বর।

আমি অনেক চেষ্টা করে এই কাজটা যোগাড় করেছি। পেয়েছি, তার কারণ আমি কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ার রিচার্ডকে চিনতাম। ও আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করত। এই খামারটা ব্যক্তিগত কোন লোকের নয়, এটা হচ্ছে বাটলার এ্যাণ্ড স্মিথাম কোলিয়ারি কোম্পানির অধীনস্থ এক খামার। এই খামারে যা খড়বিচালি হয় তা কোলিয়ারির ঘোড়াগুলো খায়। এখানে অনেক গরু ও শুয়োরও পালন করা হয়। আমি আমার শ্রমের বেতন হিসাবে সপ্তায় তিরিশ শিলিং করে পাই। এ খামারের অধ্যক্ষ বোলে নানা রকম কাজ দেয় করতে। ফলে পরবর্তী ঈস্টারের আগে আমি অনেক কিছু শিখে নিতে পারব। আমি বার্থা সম্বন্ধে কোন কথা আর শুনিনি। সে এখন কোথায় কি করছে, আমার কোন খোঁজ কেন করেনি তার কিছুই জানি না। এইভাবে আগামী মার্চ পর্যন্ত কাটাতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তুমিও স্যার

ক্লিফোর্ডের কথা ভেবো না। সে তোমার থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করবেই।

একটা পুরনো কটেজে সুন্দর একটা বাসা পেয়েছি। কটেজটা একজন এঞ্জিন ড্রাইভারের। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, মুখে দাড়ি আছে। ভদ্রমহিলার নজরটা উঁচু দিকে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে। দুঃখের বিষয় ছেলেটি যুদ্ধে মারা যায়। মেয়েটি স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি অবসর সময়ে তাকে তার পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করি। আমি এই পরিবারে একজন আত্মীয় হয়ে গেছি। ওরা খুব ভাল লোক, আমার প্রতি খুবই সদয়। আমি তোমার থেকে বেশই সুখে আছি।

আমি চাষের কাজকর্ম ভালবাসি। এতে প্রেরণা পাবার মত আদর্শের অবশ্য কিছু নেই। তা না থাক। আমি গরু ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে থাকতে অভ্যস্ত। আমি যখন কোন গাই গরুর দুধ দোহাই তখন আমার ভালই লাগে। ওদের ছটা ভাল জাতের গরু আছে। ওট ফসল উঠে গেছে। আমার ভালই লেগেছে। তবে বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হয়েছে। আমি অবশ্য এখানকার সব লোকের সঙ্গে মিশি না। কিন্তু ওদের মন্দ লাগে না। ওদের সঙ্গে আমি মিলিয়ে নিয়েছি নিজেকে।

তেভারশালের মত এ জায়গাটাও খনি অঞ্চল। এখানকার খনিগুলো আরো ভাল; কিন্তু এখন খনিগুলো ভাল চলছে না। কাজে মন্দা যাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে ওয়েলিংটনে বসে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলি। তারা অনেক অভিযোগ করে; কিন্তু তারা আসলে কোন পরিবর্তন চায় না। লোকে বলে নটস্ ডার্বি খনির লোকেরা ভালই আছে। আমি কিন্তু এই ভালর কোন চিহ্ন দেখলাম না। লোকগুলোকে আমার ভাল লাগলেও তাদের অবস্থায় আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। তারা প্রায়ই খনি জাতীয়করণের কথা বলে। কিন্তু অন্যান্য খনি জাতীয়করণ না করে শুধু কয়লাখনি জাতীয়করণ করলে তাতে কোন ফল হয় না। ঐসব খনির মালিকেরা ক্লিফোর্ডের মত কয়লাগুলোকে অন্যভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবে। কিন্তু এই সব জল্পনা কল্পনায় আমার কোন আস্থা নেই। মোট কথা, এই সব খনিশ্রমিকদের জীবন দুঃখ আর অভিশাপে ভরা। ওদের মত আমিও একথা মনে করি, বিশ্বাস করি। যুবকরা মাঝে মাঝে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার কথা বলে। কিন্তু তাতে ওদের কোন গভীর বিশ্বাস নেই। যে কোন ব্যবস্থাই হোক, কয়লা উৎপাদনের থেকে কয়লা বিক্রি করার সমস্যাটা বেশী।

এই শিল্পাঞ্চলের লোকদের খাওয়া পরার সমস্যার কোন শেষ নেই। আজকাল পুরুষদের থেকে মেয়েরা বেশী বিক্ষুব্ধ। যুবকদের বিক্ষোভ টাকার জন্য। ফূর্তি করার মত টাকা নেই। লোকগুলোর চলাফেরার মধ্যে এক নিবিড় হতাশার ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তাদের প্রতিটি গতিভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ওরা যেন আশাহীন আলোহীন এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে

এগিয়ে চলেছে। এই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা। খনিগুলো সপ্তায় মাত্র আড়াই দিন চলে। সুতরাং পঁচিশ থেকে তিরিশ শিলিংএ এক সপ্তা চালাতে হয় শ্রমিকদের। ফলে বাড়ির মেয়েদের সবচেয়ে কষ্টভোগ করতে হয়। তারা পাগলের মত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার উন্নতির কোন আশা নেই।

যদি তুমি তাদের বল সত্যিকারের জীবনযাপনের সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন যোগ নেই তাহলে সেকথা বুঝতে পারবে না তারা। সেকথা বলায় কোন ফল হবে না। ওরা যদি ঠিকমত লেখাপড়া শিখত তাহলে ঐ পঁচিশ তিরিশ শিলিংএই ওরা ভালভাবে সংসার চালাতে পারত। তারা যদি কম দামী ঘোর লাল পায়জামা পরত, তারা যদি অবসর সময়ে নাচ গান করত তাহলে অনেক খরচ কম হত। তাদের অনেক সুন্দর দেখাত। তারা যদি মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারত, মেয়েদের সামনে অকুণ্ঠভাবে উলঙ্গ হতে পারত, মেয়েদের সঙ্গে নাচ গানের মধ্য দিয়ে মেয়েদের আনন্দ দান করতে পারত এবং মেয়েদের থেকে নিজেরাও আনন্দ পেত। তারা যদি তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলোকে কারুকার্যখচিত করতে পারত এবং সূচীশিল্পের দ্বারা তাদের নামকে অলঙ্কৃত করতে পারত তাহলে তাদের টাকার চাহিদা অনেক কমে যেত। আজ দেশের শিল্পগত সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হলো মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগানো এবং সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে শেখানো। সাধারণ মানুষকে চিন্তাশীল হতে হবে না। তারা হবে একমুখী, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। তারা শুধু একটি দেবতার উপাসনা করবে, সে দেবতা হলো প্যান। তারা হবে সবাই পেগান। তাদের মধ্যে দু চার জন ইচ্ছা করলে অন্য কোন মহত্তর দেবতার ভজন করতে পারে।

কিন্তু এখানকার কোলিয়ারির লোকরা পেগান নয় মোটেই। তারা হচ্ছে নীরস নিরানন্দ জীবনের লোক, নারীদের কাছে নির্জীব; জীবনে বেঁচে থেকেও মৃত প্রাণহীন। যুবকরা মাঝে মাঝে মোটর বাইকে করে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যায়, জাজ নাচের আসরে যোগদান করে। তবু তারা মৃত। টাকা থাকাও খারাপ, না থাকাও খারাপ। টাকা মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তোলে, টাকা না থাকলে মানুষকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়।

তোমার হয়ত এই সব কথা মোটেই ভাল লাগছে না; হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠছ মনে মনে। কিন্তু আমার কথা বলার মত কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি এখন। তোমার সম্বন্ধে আমি এখন আর কিছুই ভাবতে চাই না। ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এটা ঠিক যে এখন আমি যা কিছু করছি, যে জীবন যাপন করছি তা শুধু তোমার জন্য, তোমায় আমার একসঙ্গে বসবাস করার জন্য। আমি কিন্তু বাতাসে শয়তানের গন্ধ পাচ্ছি। আজকের সমাজজীবনের এই পঙ্কিলতা, অর্থলোলুপতার এই বিষ হয়ত একদিন আমাদের জীবনকেও গ্রাস করবে। জীবনের প্রতি এই ব্যাপক ঘৃণার অন্তহীন

গরলে আমরাও হয়ত একদিন নীল হয়ে উঠব। আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমাদের মত যারা টাকা ছাড়াই বাঁচতে চাইছে, জীবনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে চাইছে তাদের গলা টিপে মারার জন্য দুটো কালো হাত বাতাসে ভাসছে। মনে হয় এক বিরাট দুর্দিন আসছে। যদি এইভাবে দিন চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে শিল্প শ্রমিকদের ধ্বংস আর মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সময় যত খারাপই আসুক, দুর্দিন যত ঘনিয়েই উঠুক না, এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণচঞ্চলতাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারে না, কেউ নারীপ্রেমের উচ্ছ্বাসকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে পারে না। সুতরাং ওরা যাই করুক, যাই চাক, তোমার প্রতি আমার কামনাকে গলা টিপে হত্যা করতে পারব না, তোমার প্রতি আমার সকাম অনুরাগের সকল বর্ণচ্ছটাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে পারবে না। পরের বছর আমরা মিলিত হবই। মাঝে মাঝে আমার ভয় করলেও আমাদের এই মিলনে আমি বিশ্বাস করি। আমরা ভবিষ্যৎকে কেউ চোখে দেখতে পাই না। আমরা যদি অন্তহীন সীমাহীন ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে আমাদের ওই জীবনকে প্রসারিত করে না দেখি, আমাদের মধ্যে এক বৃহত্তর ও মহত্তর শক্তিকে বিশ্বাস না করি তাহলে আমরা কখনই বাঁচার মত বাঁচতে পারব না। তোমার আমার মধ্যে এই সম্পর্কের নিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হবে না কোনদিন। তোমার স্মৃতির উত্তাপ আজও আমাকে সঙ্গ দান করে আমার কত নির্জন মুহূর্তে। উত্তপ্ত করে তোলে আমার দেহকে।

আমি তোমার কথা বেশী ভাবি না। ভাবলে বড় কষ্ট হয়। কষ্ট হয় তোমাকে ছেড়ে থাকতে। ধৈর্য, ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ আমার বয়স চল্লিশ। চল্লিশটি শীত আমি কাটিয়েছি। কিন্তু চল্লিশটি শীতের হিমশীতল জড়তার পর আজ অর্থাৎ এবারকার শীতে কিছুটা শান্তি পাব তোমার কথা ভেবে। যদিও তুমি স্কটল্যাণ্ডে আছ আর আমি আছি সুদূর মিডল্যাণ্ডের এক খামারে তথাপি, যদিও আমি এই মুহূর্তে তোমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারি না, তথাপি এক আত্মিক ভাবসম্মিলনের রহস্যে বিশ্বাস করি আমি। আমাদের সেই সঙ্গমের কথা আজ খুব বেশী করে মনে পড়ে। সেই সঙ্গমের এক অনাস্বাদিতপূর্ব যে নিবিড়তা আমাদের আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় স্বচ্ছন্দে সেই নিবিড়তার স্মৃতি আজ শান্তি দেয় আমার আত্মাকে, তৃপ্তি দেয় আমার দেহকে।

এখন আমি সত্যিই ভাল হয়ে গেছি। সঙ্গম বা দেহতৃপ্তিজনিত এক নিবিড়তম প্রশান্তিতে স্তব্ধ হয়ে আছে আজ আমার সকল যৌনক্ষুধার জারজ চঞ্চলতা। এখন আমি ভাল হতে চাই। ভাল হতে ভাল লাগে আমার। মনে হচ্ছে সেদিনের সেই সব উদ্ধত কামনার অগ্নিশিখাগুলো সহসা জমাট বেঁধে গেছে তুষারশীতল এক স্তব্ধতায়। তারপর যখন সত্যি সত্যিই বসন্ত আসবে, যখন

আমাদের মিলন ঘটবে, তখন এই তুষারশীতল অগ্নিশিখাগুলো আবার হলুদ হয়ে জ্বলে উঠবে। তখন আমার আত্মার মধ্যে এই শীতল জলের শান্ত নদীটার বুক দিয়ে বয়ে যাবে আমার জ্বলন্ত কামনার অত্যুষ্ণ স্রোত। কিন্তু এখন নয়। এখন আমাকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে। সংযত থাকতে হবে। আর তাছাড়া তা পারবই বা না কেন? যারা ডন জুপলের মত রমণক্ষমতাহীন, যারা কোন নারীকে দান করতে পারে না সঙ্গমের অগাধ তৃপ্তির এক শান্ত তরল স্তব্ধতা, তারা কোনদিন শান্ত ও সংযত থাকতে পারে না। তৃপ্তিজনিত চঞ্চলতার শেষ হয় না তাদের কখনো।

আজ এত কথা বলতে হলো কারণ তোমাকে আজ স্পর্শ করতে পারছি না। অবশ্য আজ যদি তোমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে শুতে পেতাম তাহলেও এমনি শান্ত ও সংযত থাকতাম। দেহমিলনকালে যেমন একদিন চূড়ান্ত অসংযমের পরিচয় দিয়েছি তেমনি আবার সংযমের পরিচয়ও দিতে পারি।

আজ আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই পৃথক থাকতে হবে। দূরে থাকতে হবে। কিছু মনে করো না। দুঃখের কিছু নেই। স্মৃতির এক কৃত্রিম শীতল উত্তাপই যথেষ্ট।

কিছুমাত্র ভয় করো না। ক্লিফোর্ড তোমার কিছুই করতে পারবে না। একদিন সে তোমাকে ত্যাগ করবেই। ত্যাগ করবে এক ঘৃণ্য জীব হিসাবে। আর যদি নাই করে তাহলে আমরাই তার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করে নেব। তবে মনে হয় তার আর দরকার হবে না।

আজ এ চিঠি আমি শেষ করতে পারছি না। অন্তহীন কথার স্রোত বেরিয়ে আসছে তোমাকে লক্ষ্য করে। তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

কিন্তু দেখা হলে অর্থাৎ তোমার আমার মিলন ঘটলে আরো অনেক কথা হবে। এখন এখানেই থাক। অল্পদিনের মধ্যে যাতে আমাদের একবার দেখা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমার জন টমাস কিছুটা নতমুখে বিদায় জানাচ্ছে লেডি জেনকে। তবে অন্তরে তার আশার অন্ত নেই।

॥ শেষ ॥